ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

বনফুলের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক বিচার

সারসংক্ষেপ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. ফাতেমা কাওসার
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
শামীমা আক্তার
শিক্ষাবর্ষ: ২০২১-২০২২
রেজি.নম্বর: ৮৫

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

মে ২০২৪

Dhaka University Institutional Repository

এক.

ডাক্তারি পেশা এবং সাহিত্যের নেশা যার মধ্যে সমানভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তিনি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। জীবন অভিজ্ঞতা, সহজাত পরীক্ষা-প্রবণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, চমক সৃষ্টি, ভাষানৈপূণ্য, সমাজ ভাবনা, সময়-জ্ঞান ও গভীর জীবনবোধে অন্বিষ্ট তাঁর সাহিত্য-ভুবন। বিষয়ের অভিনবত্ব এবং কলাকৌশলে নিয়তই ভিন্নমাত্রা সংযোজনে পারঙ্গম লেখক বনফুল জীবন ও জগতকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। তাঁর সেই দেখা জগৎ থেকে উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা যাদের জীবনের সাথে চিকিৎসা সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিলেন তিনি। ডাক্তারি সেবা এবং সাহিত্যচর্চা – এই দুই ক্ষেত্রেই তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল মানুষ। বনফুল তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মানুষ বহু বিচিত্র আর মানুষই তাঁর লেখার অনুপ্রেরণা। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের পাশে থাকতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে তিনি শহরের চাকুরি জীবন ছেড়ে বিহারের ভাগলপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। গড়ে তোলেন `The Sero-Bactro Clinic'। শুরু হয় ভিন্ন দৃষ্টিতে জীবনকে অবলোকন করার প্রয়াস।

ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষয় ও রচনারীতিতে বনফুল আধুনিক, গতিশীল ও গবেষণাধর্মী মননের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস শুধুই সুসংহত গ্রন্থিবদ্ধ সরল কাহিনির সমষ্টিমাত্র নয়, তা কখনো আত্মজীবনী বা ডায়রিধর্মী রচনা, যেমন – *উদয়-অস্ত* (১৯৫৯), *কিছুক্ষণ* (১৯৩৭), কখনো অলৌকিক রূপক, যেমন – *বৈতরণী তীরে* (১৯৩৬), গদ্যে-পদ্যে রচিত *তৃণখণ্ড* (১৯৩৬), কবিতা, নাটক ও গদ্য-বিবরণের সংমিশ্রণে রচিত *মৃগয়া* (১৯৪০), আবার *দ্বৈরথ* নামে একটানা দীর্ঘ কাহিনিও লিখেছেন। কখনো উপন্যাসের সমগ্র কাহিনিটিই বিবৃত করেছেন উত্তম পুরুষের জবানিতে, যেমন – *স্থাবর* (১৯৫১)। তিনি বাস্তব ও মায়ার জগতের মধ্যে যে সমন্বয় সাধন করেছেন তা তাঁর প্রকরণের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র নিরীক্ষার ফল। *বৈতরণীর তীরে* এবং *সে ও আমি* (১৯৪৩) রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর এ ধরনের উপন্যাস রচনার শুরু। *অগ্নি* (১৯৪৫), *স্বপ্নসম্ভব* (১৯৪৬), *পক্ষীমিথুন* (১৯৬৪), *মানসপুর* (১৯৬৬), *রূপকথা এবং তারপর* (১৯৭০) জীবনবৈচিত্র্যের ভিন্নধর্মী প্রকাশ। বৈজ্ঞানিক মনন, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনীতির প্রসঙ্গ, নৃতাত্ত্বিক বিষয়, অতিপ্রাকৃত উপাদান, ঐতিহাসিক আবহ, পুরাণতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় তাঁর উপন্যাসে জীবনের বিচিত্র দিককে উদ্ভাসিত করেছে।

দুই.

'বনফুলের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক বিচার' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভে সাতটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বনফুলের জীবনবোধ ও শিল্পভাবনাবিষয়ক আলোচনায় তাঁর শৈশব ও কৈশোরের জীবন এবং শিল্পভাবনা স্থান পেয়েছে। শিল্পভাবনায় লেখকের মানস-প্রবণতা তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় 'মধ্যশ্রেণির জীবনবৈচিত্র্য ও অন্ত্যজ সমাজের কথকতা' – এখানে বিহার প্রদেশের ভাগলপুরের বনফুলের দেখা মধ্যবিত্ত ও অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্রগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত ও কারখানার শ্রমিক শ্রেণির চরিত্রও রয়েছে তাঁর উপন্যাসে। মধ্যবিত্তের জীবন-সংগ্রাম, বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো, প্রেম, রাজনীতি, স্বদেশ ভাবনা, জাতীয়তাবোধ – সবকিছুই বর্ণিত হয়েছে। *অধিকলাল* উপন্যাস ব্যতীত পৃথকভাবে মধ্যবিত্ত জীবন-কেন্দ্রিক বা অন্ত্যজ জীবন-কেন্দ্রিক উপন্যাস বনফুল লেখেননি। তাঁর উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্রগুলো মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দুই শ্রেণির চরিত্রের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই মধ্যবিত্ত চরিত্র থেকে অন্ত্যজ চরিত্রগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্রকে ঘিরে আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্র। মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলোর মধ্যে লেখকের সহজাতবশত ডাক্তার চরিত্রও রয়েছে। আর ডাক্তার চরিত্রের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত অন্ত্যজ চরিত্ররা। উল্লেখ্য, মধ্যবিত্ত চরিত্রকে এখানে মধ্যশ্রেণির চরিত্র হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় 'রাজনীতি অবলম্বী জীবনের চালচিত্র'। রাজনীতি বিষয়ে বনফুলের মনোভাব, তাঁর রাজনীতি ভাবনার রূপান্তর অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো রাজনীতিক দল নয়, মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর মানবতাবাদ মনোভাবকে তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ইতিহাস-আশ্রয়ী জীবনকথা। ইতিহাসের পাতা থেকে তিনি কোন কোন ইতিহাসের ঘটনার খণ্ডাংশকে আশ্রয় করে বা ঐতিহাসিক কোন চরিত্রকে অবলম্বন করে উপন্যাস লিখেছেন বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে ঘিরে কেমন কল্প-কাহিনি সৃষ্টি করেছেন – সেই বিষয়টি এখানে আলোচনা করা হয়েছে। কেনো উপন্যাস ত্রয়ীকে সরাসরি ঐতিহাসিক-উপন্যাস না বলে ইতিহাস-আশ্রয়ী জীবনকথা বলা হয়েছে তারও ব্যাখ্যা রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে অতীতের নৃতাত্ত্বিক মানবসমাজ। নৃতত্ত্ব কী, নৃবিজ্ঞানের আলোকে তাঁর স্থাবর উপন্যাসের আলোচনা এবং *প্রথম গরল এ* বনফুল মানব সভ্যতার ইতিহাসে কোন ঘটনাটিকে প্রথম গরল বলে আখ্যায়িত করেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় 'সামন্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস'। সামন্ত জীবন কী, উপন্যাসে সামন্ত জীবন কীভাবে উঠে এসেছে এবং এ জীবন ক্রমান্বয়ে কীভাবে ক্ষয়ে যাচ্ছে সে বিষয়টি লেখক কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন তার আলোচনা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় 'উপন্যাসের আঙ্গিক বিচার'। এখানে বনফুলের মৌলিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে আমাদের আলোচিত উপন্যাসগুলো সাতটি আঙ্গিকে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি আঙ্গিক সম্পর্কে ধারণা দিয়ে নির্ধারিত উপন্যাসগুলোর আঙ্গিক বিচারের চেষ্টা করা হয়েছে।

তিন.

সমাজের মধ্য পর্যায়ে যারা অবস্থান করেন তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এদের উপরে উচ্চবিত্ত এবং নিচে নিম্নবিত্ত শ্রেণি রয়েছে। সময় ও যুগের ধর্মের সাথে মধ্যবিত্তের স্বরূপ পাল্টায়। কারণ তারা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সচেষ্ট থাকে, কখনও উচ্চবিত্তের শ্রেণিতে উঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আবার কখনও কখনও নিম্নবিত্ত শ্রেণিতে যেন কোনো অবস্থাতেই নামতে না হয় সে চেষ্টাও করে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবেচনায় উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্য মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত। বিশ শতকের ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে যারা রয়েছে তারা হলেন – সরকারি চাকুরে, বণিক, এজেন্ট, আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক, সাংবাদিক – এইসব পেশার সাথে জড়িত মানুষ। তাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায় – সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব, জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্বদান, শহরকেন্দ্রিকতার মানসিকতা, চাকরিতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রাধান্য, বেকারত্ব।

বনফুলের উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্তের বৈশিষ্টগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন – দেশপ্রেম, স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশা, জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রেম, মানবতাবাদ, বন্ধু বিশ্বাসে ফাটল, অসহায়দের প্রতি দরদবোধ, কাজের প্রতি সততা, আঘাত সামলে নিয়ে এগিয়ে চলা, নিম্নশ্রেণির মানুষদের সম-মর্যাদা দেয়ার মানসিকতা, কৃষক-শ্রেণির সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া, জীবনের মানে খুঁজতে যেয়ে জগত সম্পর্কে নির্মোহ হয়ে বোহেমিয়ান জীবনযাপন করা, জীবন সংগ্রামে জয়ী নারীর স্বাধীন জীবন-যাপন, বিবাহিত জীবনে শিক্ষা লাভের অদম্য ইচ্ছে থেকে ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন এবং বৃহৎ কল্যাণের আহ্বানে সাড়া দেয়া, শেষ বয়সে নিজের মোটো থেকে সরে এসে সবার রঙে রঙ মেলানোর ইচ্ছে পোষণ – এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। চিকিৎসা সূত্রে বনফুল অন্ত্যজ মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং তাদের জীবনকে অবলোকন করেছেন অনেক কাছ থেকে। তিনি উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবনের চিত্র যথেষ্ট মননশীলতা এবং বাস্তবতার সাথে তুলে ধরেছেন। এই সব অন্ত্যজ মানুষের চারিত্রিক সততা ও মহানুভবের পরিচয়ও পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাসে। তবে তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসে অন্ত্যজ চরিত্রগুলো প্রতিবাদী চরিত্রের মর্যাদা লাভ করেনি এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও তারা সচেতন ছিল না। তবে শেষ দিকের কিছু কিছু উপন্যাসে অন্ত্যজ চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রতিবাদী মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, *অধিকলাল* এ অধিকলাল, তার বাবা রংলাল, মা সমুন্দরি, *হাটেবাজারে* গীতা, ছিপলি, *মানসপুর* এ কারখানার শ্রমিক নেত্রী মহুয়া,

Dhaka University Institutional Repository

প্রচ্ছন্ন মহিমার ক্ষেন্তি, *এরাও আছের* আতরি চরিত্র। অন্ত্যজ সমাজের মানুষেরা যেন তাদের অধিকার নিয়ে মর্যাদাপূর্ণভাবে সমাজে বসবাস করতে পারে – সে দিকের প্রতি লেখক জোর দিয়েছেন।

স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের মধ্যবিত্ত ও অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনচিত্র তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো অনেক বেশি জীবন-ঘনিষ্ট ও বাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়। বনফুলের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলোর বড় একটা অংশজুড়ে রয়েছে ডাক্তার চরিত্র। কোনো কোনো উপন্যাসে ডাক্তারের দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ ও জীবনের চিত্ররূপ চিত্রিত হয়েছে আবার কোনো কোনো উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতার আলোকে দেখা হয়েছে ডাক্তারকে। তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত চরিত্রের বিকাশে অন্ত্যজ চরিত্রগুলো উঠে এসেছে। তাঁর উপন্যাস কেবল মধ্যবিত্ত চরিত্রকেন্দ্রিক নয় আবার অন্ত্যজ চরিত্র নির্ভর কোনো উপন্যাস তিনি লিখেননি *অধিকলাল* ব্যতীত। সেখানেও মধ্যবিত্ত ডাক্তার চরিত্রের সহায়তায় দোসাদ চরিত্রটি জীবনে সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে।

বনফুল বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনকে এবং অন্ত্যজ মানুষদের তাঁর উপন্যাসে তুলে এনেছেন। বিশ শতকের তিরিশ থেকে সত্তর দশকের মধ্যবিত্ত ও অন্ত্যজের জীবন বাস্তবতাকে তিনি উপন্যাসে রূপদান করেছেন। মধ্যবিত্তের নানা মানসিকতা তাঁর উপন্যাসের জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে তা-ই নয়, আমরা জানি, *মধ্যবিত্ত* নামে বনফুলের একটি নাটকও রয়েছে। বনফুলের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত চরিত্রকে ঘিরে রয়েছে অন্ত্যজ চরিত্র। অন্ত্যজ বলতে সাধারণত নিচজাতি, শূদ্র, চণ্ডাল এদেরই বোঝায়। কৃষক, জেলে, শ্রমিক অর্থাৎ খেটে খাওয়া মানুষরা যে সমাজে বসবাস করে তাদের সমাজই অন্ত্যজ সমাজ। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এদেরকে নিম্নবর্গের বা নিম্ন আয়ের মানুষ বা প্রাকৃতজন বা ব্রাত্যজন বলেও কেউ কেউ আখ্যায়িত করে থাকেন। এদের জীবনের হাসি-কান্না, ঘাত-প্রতিঘাত, বিরহ-বেদনা, মান-অভিমান, ভালোবাসা-ঘৃণা – জীবনের কথকতাই লেখক তুলে এনেছেন সাবলীলভাবে।

তৃণখণ্ড (১৯৩৫), *কিছুক্ষণ* (১৯৩৭), *নির্মোক* (১৯৪০), *অগ্নীশ্বর* (১৯৫৯), *উদয়-অস্ত* (১ম খণ্ড-১৯৫৯, ২য় খণ্ড-১৯৭৪), *হাটেবাজারে* (১৯৬১) – এইসব উপন্যাসের কেন্দ্রিয় মধ্যবিত্ত চরিত্র একজন চিকিৎসক। নিম্নশ্রেণির মানুষদের সহায়, তাদের অবলম্বন মধ্যবিত্ত চিকিৎসক চরিত্রগুলো। বনফুল নিজে ছিলেন পেশায় একজন চিকিৎসক বা ডাক্তার। *সে ও আমি* (১৯৪৩) উপন্যাসে 'সে' লেখকের অর্থাৎ উত্তমপুরুষ 'আমি'র নারীরূপিনী বিবেক। প্রতি রাতেই 'সে' হানা দেয় লেখকের ঘরে। লেখক যখন তাঁর ব্যর্থ জীবনের কাহিনি লিখতে বসেন ঠিক তখনই 'সে' এসে উপস্থিত হয়। 'সে' লেখকের জীবনের আগাগোড়া সব কথাই জানে। লেখকের প্রেমের কথা, পরিবারের কথা, বিদেশে বসবাসকালীন সব কথা। সময়ে সময়ে সেসব ঘটনা লেখককে শুনিয়ে প্রমাণ দেয় তাঁর বিবেক। পাশাপাশি তাঁর দোষত্রুটির কথা বলতেও ছাড়ে না। আর তার এইসব কর্মকাণ্ডে লেখক অবাক থেকে অবাকতর হন। তাকে

Dhaka University Institutional Repository

চেনার জন্যে লেখক কৌতূহলী হয়ে উঠেন। একপর্যায়ে 'সে' লেখকের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের মধ্যবিত্ত মানসিকতার অস্থিরচিত্তই লেখক প্রেমসিন্ধুর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। *জঙ্গম* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শঙ্কর বিহারের গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে একটি কলেজে ভর্তি হয়। হোস্টেলে থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে সে পড়াশোনা করে। তাকে কেন্দ্র করেই অজস্র ঘটনা ও চরিত্র এ উপন্যাসে শাখা বিস্তার করেছে। জীবনের প্রথম দিকে শঙ্করকে দেশপ্রেম পরে বিজ্ঞান-চর্চা, সাহিত্য-চর্চা, কখনও টিউশনি, কখনও প্রুফ-রিডার আবার কখনও পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করতে হয়েছে। এক সময় শহরের জীবনযাত্রা ও মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে শঙ্কর গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। সেখানে অন্ত্যজ মানুষদের সান্নিধ্যে এসে তাদের সব রকম প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করে। মহামারী দেখা দিলে সে বিদেশি স্বেচ্ছাসেবকের সাথে মিলে কাজ করে। এসময় গ্রামের যাদের কাছে থেকে সাহায্য পাবার আশা করেছিল তাদের কাছ থেকে সে তা পায়নি। এই ব্যাপারটি তাকে পীড়া দেয়। অন্ত্যজ মানুষদের ভালোবাসার টানে সে তাদের সাথে মিশে তাদের একজন হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের নেতা হয়ে আর নয়। *ডানা* (তিন খণ্ড, ১৯৪৮, ১৯৫০ ও ১৯৫২) উপন্যাসটি পাখি-গবেষণাবিষয়ক তথ্যসমৃদ্ধ পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্বাধীনচেতা নারীর জীবন-জিজ্ঞাসা। পাখি পর্যবেক্ষণ বনফুলের অন্যতম একটি নেশা ছিল। সেই নেশা থেকেই *ডানা* উপন্যাসের সৃষ্টি। ডানা উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র রহস্যময়ী এক নারীর যার নাম ডানা। অপর চারটি চরিত্র – কবি সুন্দরের সন্ধানী, সন্ন্যাসী জীবনসত্যের সন্ধানী, রূপচাঁদ ভোগলিপ্সু এবং বৈজ্ঞানিক রহস্য সন্ধানী। উপন্যাসটিতে পাখি নিয়ে অনেক কবিতা আছে – কবিতাগুলো পাখির স্বভাব, সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে। অমরেশ বাবুর পাখির জগৎ, আনন্দমোহনের কবিতা, রূপচাঁদের কামুকতা কোনো কিছু ডানাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে জীবনের মানে খুঁজতে যেয়ে ডানা বৈরাগী জীবন বেছে নেয়। *কষ্টিপাথর* (১৯৫১) উপন্যাসে চিঠির মাধ্যমে ঘটনার রহস্য উন্মোচন। কেন্দ্রিয় চরিত্র হাসির জন্ম রহস্যের জট উন্মোচন করতে চিঠির মাধ্যমে একটির পর একটি ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। এখানে চিঠি-লেখক এক একটি চরিত্র। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী অসিত। অসিত চরিত্রটি একটি উদারমনস্ক চরিত্র। হাসির আত্মগোপন থাকার ব্যাপারটিকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে কিন্তু কোনো রকম কৈফিয়ত চায়নি সে। *অধিকলাল* (১৯৬৯) বিহারের অন্ত্যজ সমাজের একটি চরিত্র। জাতিতে সে দোসাদ। বাবা রেলওয়ের কুলি। ছোটবেলা থেকেই পড়ালেড়ার প্রতি তার আগ্রহ বেশি ছিল। ডাক্তার পরিবারের সান্নিধ্যে থেকে উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে নিজের প্রতিভার জোরে সে ম্যাজিস্ট্রেট হয়। কিন্তু এ সম্মানের চাকুরি সে করতে পারেনি তার চারপাশের অনৈতিক, আদর্শহীন কর্মকাণ্ডে বীতশ্রদ্ধ হয়ে। চাকুরি ছেড়ে সে নিজ গ্রামে এসে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়ে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলার লক্ষে। স্বাধীনতা উত্তর দেশের ভগ্ন অবস্থা, বড় বড়

Dhaka University Institutional Repository

অফিসারদের স্বার্থপরতা, ঘুষ নিয়ে অযোগ্যকে উচ্চ পদে আসীন করা – সর্বোপরী দেশের দুর্দশায় অধিকলালের ভগ্নমনোরথ হওয়া পক্ষান্তরে বনফুলের ভগ্ন হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। বনফুল আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, মোটরকার কেনার সুবাদে মোটর ওয়ার্কশপের লোকদের সাথে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। *এরাও আছে* (১৯৭২) উপন্যাসের বিষুণ মিস্ত্রি, রবি হব্বি চরিত্র নির্মাণে ভাগলপুরের মোটরওয়ার্কশপের বনফুলের দেখা চরিত্রদেরই ছায়াপাত ঘটেছে। বনফুলের সাথে এদের ভালোবাসার সম্পর্কটি বোঝাতেই এই উপন্যাসের সৃষ্টি। 'এই উপন্যাসে ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের মতই বৃদ্ধ চিকিৎসক হিরন্ময় মুখার্জির অবসর জীবন অতিবাহিত হয়েছে নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে – মোটরমিস্ত্রি, ড্রাইভার, ফেরিওয়ালা, চাকর-ঝিদের মধ্যে। এদেরই সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, নানা পারিবারিক সমস্যা – এসবের অংশীদার হয়ে তাদের একান্ত আপনার হয়ে উঠেছেন উপন্যাসের বুড়ো ডাক্তার।' (উর্মি নন্দী, ১৯৯৭: ১৯৮)

চার.

বনফুল সক্রিয় রাজনীতি-কর্মী ছিলেন না কিন্তু রাজনীতি সংক্রান্ত খবর সবসময় তাঁর মনকে বিচলিত করতো। একজন উঁচু দরের সাহিত্যিক সমাজ বাস্তবতায় রাজনীতিকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। বনফুল এর ব্যতিক্রম নন। প্রকাশ্যভাবে তিনি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, ঠিক। কোনো ইজম তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাঁকে আঘাত করেছিল তা অবশ্যই গণতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা নয়। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম অপশক্তির বিরুদ্ধে চলার আন্তর্জাতিক লড়াইকে দুর্বল করবে – এ বিশ্লেষণ থেকে কমিউনিস্ট পার্টি বেয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিপক্ষাচার করেছেন। এ বিপক্ষাচার এবং সে সঙ্গে পরবর্তীকালে মুসলিমদের পাকিস্তানের দাবিতে অবিমিশ্র সমর্থন দেওয়ায়, বনফুল এবং তাঁর মতো কংগ্রেসপন্থী যারা ছিলেন তাঁরা এ বিষয়গুলো মেনে নিতে পারেননি। এসব কারণে বনফুল সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। মূলত সমাজ-ইতিহাস-কমিউনিজম সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, রাশিয়ায় যে অর্থে সমাজতন্ত্র সম্ভব হয়েছে, এ দেশে তা সম্ভব নয়। আর্য সভ্যতার আলোকে এদেশে যে সাম্যবাদ চলে এসেছে তাই শ্রেয়। সাম্যবাদ কেবল অর্থের সমতায় বিচার্য নয়, সাম্যবাদ বিচার্য মনে। তিনি কংগ্রেসপন্থী ছিলেন বটে তবে সব ক্ষেত্রে তিনি কংগ্রেসের সব সিদ্ধান্ত মেনে নেননি। কংগ্রেসের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতারণা, তাদের অসততার কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি। আমরা বলতে পারি যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। *সপ্তর্ষি* উপন্যাসে বনফুলের কোনো রাজনীতিক দলের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দৃশ্য হয়নি। পরবর্তী সময় *স্বপ্নসম্ভব*, *অগ্নি*, *পঞ্চপর্ব*, *ত্রিবর্ণ* উপন্যাসগুলোতে পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থক কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বনফুলের একরকম বিরাগ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ.

বনফুলের ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাসের আলোচনায় রয়েছে – *মহারাণী*, *গোপালদেবের স্বপ্ন* ও *সন্ধিপূজা*। *মহারাণী*তে বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশের এক জমিদারের বাড়িতে সিপাহি বিদ্রোহের নেতা নানাসাহেবের নাটকীয় আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং নানাসাহেবকে ঘিরে কাহিনির অভিনব পরিসমাপ্তি। নানাসাহেবের সাথে মহারাণীর আলাপচারিতার বিষয়টি এবং নানা সাহেবকে পালাতে সুযোগ করে দিতে তাঁর যে সাহসী পদক্ষেপ তা আসলেই পাঠককে ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি দেয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দেশের অরাজকতা পরিস্থিতি থেকে মানুষকে উদ্ধারের উপায়স্বরূপ লেখক ঐতিহাসিক গোপালদেব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে লেখক মাৎস্যন্যায়ের সাথে তুলনা করে তা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ গোপালদেবের মতো দেশ-নেতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন গভীরভাবে। *গোপালদেবের স্বপ্ন*-তে ঐতিহাসিক চরিত্র গোপালদেবের প্রভাব দেখানো হয়েছে কাল্পনিক চরিত্র গোপালদেবের মধ্যে। উপন্যাস ত্রয়ীকে সরাসরি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়নি, ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস বলা হয়েছে। কারণ ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ উপন্যাসগুলোতে পরিস্ফুট হয়নি। ঐতিহাসিক ঘটনাকে যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি। কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার পরম্পরা রক্ষা করে চরিত্রগুলো বিকশিত হয়েছে, এমন বলা যাবে না। ইতিহাসের ঘটনার সত্যতা *সন্ধিপূজা*-তে অনুপস্থিত। সেখানে ঐতিহাসিক চরিত্র নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে কেন্দ্র করে কাল্পনিক কাহিনি গড়ে উঠেছে। চরিত্রগুলো ইতিহাসের আবহ মেনে সৃষ্টি হয়নি। তবে অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রগুলোতে ইতিহাসের ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে প্রভাব ফেলেছে। কিছু কিছু চরিত্র ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড ঘটনার দ্বারা আলোড়িত হয়েছে চরমভাবে। *সন্ধিপুজার* প্রধান চরিত্র – ধুর্জটিমঙ্গল চরিত্রটির কথা ধরা যাক। ধুর্জটির পরিবার নবাবের লোকের কালো থাবায় কীভাবে নিঃস্ব হয়েছে এবং তার ফলে ধূর্জটির জীবনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠেছে। আবার কাহিনির ধারাবাহিকতায় নয়, অনেক চরিত্রের স্মৃতিতে ইতিহাসের টুকরো টুকরো ঘটনা উঠে এসেছে। যেমন, ধূর্জটিমঙ্গলের দূর সম্পর্কের বোন ঝকমারির মানসপটে কখনও রানি দুর্গাবতী, সম্রাট আকবর, সেনাপতি আসফ খাঁর কথা উঠে এসেছে।

ছয়.

অতীতের নৃতাত্ত্বিক মানবসমাজ অংশে *স্থাবর* ও *প্রথম গরল* উপন্যাসের আলোচনা রয়েছে। মানবজাতির যে কাহিনি ইতিহাসের অন্ধকারে স্থাবর হয়ে আছে তারই ধারাবাহিকতার কাহিনি *স্থাবর* উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এ বিষয়বস্তুকে জঙ্গমতায় রূপ দিতে লেখক নৃতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সাংস্কৃতিক দিকের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন সার্থকভাবে। উপন্যাসটিতে কৃষি-সভ্যতা গড়ে উঠার পূর্ব পর্যন্ত ধারাবাহিক কাহিনির বর্ণনা রয়েছে বৈচিত্র্য সন্ধানী বৈজ্ঞানিক মেজাজের লেখক বনফুল তাই মানবজাতির ক্রমবিবর্তন ধারার চিত্র তুলে ধরতে কাল্পনিক আখ্যায়িকাকে নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন ইতিহাসে যার সমর্থন রয়েছে। নিরন্তর পথ চলার অমোঘ চরিত্র 'আমি'র জীবনের ধারাবাহিক সময়ের ঘটনাংশ স্থান পেয়েছে এ উপন্যাসে। সময়ের প্রয়োজনেই ইশারা-ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশের পর উত্তম পুরুষের জবানীতে মুখের ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। পাশাপাশি পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়, আমি'র হিংস্র আচরণ থেকে মানবিক আচরণ, নারী মাংস ভক্ষণ থেকে নারীকে জীবন চলার পথে অপরিহার্য করা, বিয়ে, বংশ স্থাপন, সন্তানকে না মেরে, না খেয়ে তাকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা, গোত্র-গোত্র লড়াই, ভূমি দখল, কল্পনাশক্তির বিকাশ, রোমান্টিক হয়ে ওঠা, কৃষিকাজ করে জীবন ধারণ করা – মোদ্দা কথা মানবজাতির সভ্য সমাজে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্রমবিন্যাস দক্ষতার সাথেই বর্ণনা করেছেন লেখক। প্রকৃতি ও পরিবেশের বর্ণনাও আদিম যুগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নৃ-তাত্ত্বিক মানব সমাজের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস *প্রথম গরল*, *স্থাবর* প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘ তেইশ বছর পর প্রকাশিত হয়। কৃষি-সভ্যতার অনেক ধাপ পেরিয়ে যে-জীবনে এসে পৌঁছেছে নায়ক জংলা সে-জীবনে সে হয়েছে টালা। এতো বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত হলেও *প্রথম গরল* সময়ের ব্যবধানকে ছাপিয়ে গেছে। *প্রথম গরল* এ কৃষি সভ্যতা যুগের সব বৈশিষ্ট্যকে লেখক তুলে ধরেছেন। ভূমি দখলকে কেন্দ্র করেই মানুষের জীবন সংকটাপূর্ণ হয়েছে, তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাই ভূমিকেই মানুষের জীবনের প্রথম গরল বা বিষ বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে উপন্যাসে।

সাত.

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সামন্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের আলোচনায় রয়েছে *দ্বৈরথ* এবং *মৃগয়া*। *দ্বৈরথ* এর তিন বছর পর প্রকাশিত হয় *মৃগয়া*। *দ্বৈরথ* এ সামন্ত শ্রেণির যথাযথ চিত্র অংকনে রবীন্দ্রনাথ বনফুলের উচ্চ-প্রশংসা করেছেন। বরীন্দ্রনাথ যথার্থ মন্তব্যই করেছেন। বনফুলের অনেক উপন্যাসেই অসহায়, দরিদ্র প্রজাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের চিত্র উঠে এসেছে। তবে *দ্বৈরথ* ও *মৃগয়া* উপন্যাস দুটিতে স্বাভাবিকভাবেই বিহারের জমিদারদের নিপীড়নের চিত্র রয়েছে। বনফুল জীবনের দীর্ঘ আটষট্টি বছর কাটিয়েছেন বিহারের পরিবেশে। তাই সেখানকার পরিবেশ-প্রতিবেশ-পারিপার্শ্বিকতায় লালিত জমিদার ও প্রজাদের মধ্যকার শোষণের জীবন ছবি *দ্বৈরথ*। উপন্যাসটি উত্তর-পূর্ব বিহারের দুই জমিদারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বন্ধুত্বের অন্তরালে জিঘাংসু মনোবৃত্তি চরিতার্থ এবং পাশাপাশি আধুনিক ধ্যান-ধারণার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে প্রাগ্রসর মানসিকতার প্রকাশ। *মৃগয়ায়* তথাকথিত সমান্ততান্ত্রিক জীবনধারার বদলে দেখতে পাওয়া যায় ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। যার মধ্যে নতুন যুগের প্রবেশকে স্বাগত জানিয়েছেন বনফুল। জমিদারের মা, সেকেলে বৃদ্ধা গৃহিণীর যুগের সাথে একালের মেয়েদের ব্যবধানকে তুলে ধরার

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে দিয়ে দুই কালের শিক্ষা, সংস্কৃতি, উৎসব-পার্বণ, পোষাক-পরিচ্ছেদ, জীবনধারা, পরিবার-প্রথা – এসব প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

আট.

সপ্তম অধ্যায়ে আঙ্গিক বিচারে আমরা, বনফুলের মৌলিক উপন্যাসগুলোকে সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি। এই বিভাজনের বাইরেও তাঁর উপন্যাস রয়েছে। প্রচলিত রীতির উপন্যাসের তালিকায় রেখেছি – *দ্বৈরথ*, *ভুবন সোম*, *নবদিগন্ত*, *ওরা সব পারে*, *মহারাণী*, *তীর্থের কাক* ও *সন্ধিপূজা;* গদ্য-পদ্যে রচিত উপন্যাস – *মৃগয়া* ও *তৃণখণ্ড*; মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উপন্যাস – *জঙ্গম*, *স্থাবর* ও *ডানা*; পত্রোপন্যাস – *কষ্টিপাথর;* ডায়েরিধর্মী উপন্যাস – *অগ্নীশ্বর* ও *হাটেবাজারে*; নাট্য-উপন্যাস – *ত্রিনয়ন* এবং কোলাজধর্মী উপন্যাস *কিছুক্ষণ*। প্রতিটি পর্যায়ের আঙ্গিক বিচারে লেখকের দৃষ্টিকোণ ও জীবন দর্শনকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

নয়.

ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষয় ও রচনারীতিতে বনফুল আধুনিক, গতিশীল ও গবেষণাধর্মী মননের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস শুধুই সুসংহত গ্রন্থিবদ্ধ সরল কাহিনির সমষ্টিমাত্র নয়, তা কখনো আত্মজীবনী বা ডায়রিধর্মী রচনা, যেমন- উদয়-অস্ত, কিছুক্ষণ; কখনো অলৌকিক রূপক, যেমন- *বৈতরণী তীরে*; গদ্যে-পদ্যে রচিত *তৃণখণ্ড*, কবিতা, নাটক ও গদ্য-বিবরণের সংমিশ্রণে রচিত *মৃগয়া*; আবার *দ্বৈরথ* নামে একটানা দীর্ঘ কাহিনিও লিখেছেন। কখনো উপন্যাসের সমগ্র কাহিনিটিই বিবৃত করেছেন উত্তম পুরুষের জবানিতে, যেমন- *স্থাবর*। তিনি বাস্তব ও মায়ার জগতের মধ্যে যে সমন্বয় সাধন করেছেন তা তাঁর প্রকরণের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র নিরীক্ষার ফল। *বৈতরণীর তীরে* এবং *সে ও আমি* রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর এ ধরনের উপন্যাস রচনার শুরু। *অগ্নি*, *স্বপ্নসম্ভব*, *পক্ষীমিথুন মানসপুর রূপকথা এবং তারপর* জীবনবৈচিত্র্যের ভিন্নধর্মী প্রকাশ। বৈজ্ঞানিক মনন, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনীতির প্রসঙ্গ, নৃতাত্ত্বিক বিষয়, অতিপ্রাকৃত উপাদান, ঐতিহাসিক আবহ, পুরাণতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় তাঁর উপন্যাসে জীবনের বিচিত্র দিককে উদ্ভাসিত করেছে। *পশ্চাৎপটে* বনফুল উল্লেখ করেছেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে নানা রং। আর এসব রঙের রহস্যভেদই তাঁর সাহিত্য জীবনের মূল লক্ষ্য বলে আমাদের মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বনফুলের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক বিচার

শামীমা আক্তার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

মে ২০২৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, শামীমা আক্তার (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৮৫, শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১, পুন:) কর্তৃক পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'বনফুলের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক বিচার' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি তাঁর একক গবেষণার ফল। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

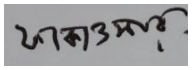

(ড. ফাতেমা কাওসার)
তত্ত্বাবধায়ক ও
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আমি শামীমা আক্তার (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৮৫, শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১, পুন:) পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত আমার 'বনফুলের উপন্যাস: বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক বিচার' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. ফাতেমা কাওসার আপার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। এটি আমার একক গবেষণার ফল। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উল্লেখিত সহায়ক তথ্য ও গ্রন্থের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে, বাকি মতামত আমার। এখানে কুম্ভলক বৃত্তির কোনো ঘটনা ঘটেনি। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

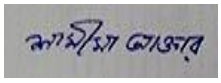

(শামীমা আক্তার)
পিএইচ ডি গবেষক
শিক্ষাবর্ষ: ২০২১-২০২২
রেজি. নম্বর: ৮৫
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

ছোটোবেলা থেকেই পড়ালেখায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেয়ার একটি সুপ্ত বাসনা মনে ছিল। বাবা প্রায় বলতেন, 'তোমার নানাভাই আলিয়া মাদরাসার গোল্ডমেডেলিস্ট, নানুমনি-দাদাভাই শিক্ষক ছিলেন। তোমাদেরও অনেক পড়াশোনা করতে হবে। তখন থেকেই পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। আত্মবিশ্বাসও দৃঢ়তর হতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে অনার্স ও এম এ করার পরের সেশনেই এমফিল এ নিবন্ধনকৃত হই। এমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান স্যারের তত্ত্বাবধানে 'বনফুলের ছোটগল্প (১৯৩৬-১৯৪৭): বিষয় ও রচনারীতি' শিরোনামে গবেষণার কাজ শুরু করি এবং ২০০৭ সালে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করি। পরবর্তী সময়ে বনফুলের উপন্যাস নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হয়ে উঠি। 'বনফুলের উপন্যাস: বিষয় বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক বিচার' শীর্ষক পিএইচ ডি গবেষণা কর্মে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে নিবন্ধনকৃত হই। আমার সৌভাগ্য পি এইচ ডি গবেষণার কাজ আনিসুজ্জামান স্যারের তত্ত্বাবধানেই শুরু করি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় ব্যস্ততা থাকা, পারিবারিক নানা সমস্যা, ছোটো বোনের মৃত্যু – এসব কারণে আমার গবেষণাকর্ম শ্লথ গতিতে চলছিল। একপর্যায়ে যখন গবেষণায় পূর্ণ মনোযোগ দেয়ার কথা ভেবে এগোচ্ছিলাম তখনই বিশ্ব মহামারির করাল গ্রাসে পড়তে হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক এ সময় শ্রদ্ধেয় স্যার প্রয়াত হন। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার কারণে গবেষণার কাজ বিলম্বিত হয়েছে। আবার উঠে দাঁড়াবার মনোবল নিয়ে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. ফাতেমা কাওসার আপার শরণাপন্ন হলাম। যাঁর প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ঋণ।

অভিসন্দর্ভ গঠন-পরিকল্পনা এবং রূপরেখা প্রণয়নে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন আমার শিক্ষাগুরু ড. সৈয়দ আকরম হোসেন। তিনি আমার অভিসন্দর্ভের অধ্যায়-বিভাজনসহ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর প্রতি ঋণের শেষ নেই। আমার গবেষণার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক আনিসুজ্জামান কলকাতা থেকে দুষ্প্রাপ্য এবং প্রয়োজনীয় বই দিয়ে সাহায্য করেছেন। বলা বাহুল্য, এ সময় আমি কানাডিয়ান গভর্নমেন্ট ফান্ডেড বাংলাদেশ সরকারের আইন মন্ত্রণালয়ের উকিলদের বিজ্ঞদের (উকিলদের) সুবিধার্থে একটি 'আইন শব্দকোষ' প্রকল্পের গবেষণা কাজে ড. আনিসুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা জাস্টিস হাবিবুর রহমান স্যারের টিমের সাথে 'গবেষণা সহযোগী হিসেবে' কর্মরত ছিলাম। এসময় হাবিবুর রহমান স্যার আমার গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন। আমাকে বই দিয়ে এবং অভিসন্দর্ভের কিছু অধ্যায় নিয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বাংলা বিভাগের অগ্রজ অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম আজম। তাঁর কাছে আমি ঋণি। তাছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

তাগাদা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে গবেষণা কাজকে তরান্বিত করেছেন ড. বেগম আকতার কামাল, ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী, ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, ড. সৌমিত্র শেখর স্যার। তাঁদের সবার প্রতি আমার অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা।

গবেষণার কাজে আমি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা, কলকাতার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, ঢাকার কেন্দ্রিয় পাবলিক লাইবেরি, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র (শাহবাগ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের লাইব্রেরিতে, বাংলা বিভাগের সেমিনার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব গ্রন্থাগারের সজ্জন, শুভানুধ্যায়ী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের প্রতি রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ।

যিনি তাঁর মূল্যবান সময় ও শ্রম দিয়ে আমাকে পরিবারের সবরকম কাজ থেকে অব্যহতি দিয়ে গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছেন তিনি আমার মেজো বোন হাসিদা বেগম। তাঁর ঋণের কথা বলে শেষ করা সহজ নয়। অনেক ভালোবাসার, অপরিশোধ্য ঋণের ভাণ্ডার শ্রদ্ধেয় মা সৈয়দা সাফিয়া খাতুন বারবার ফোন করে আমার কাজের খোঁজ নিয়েছেন এবং সব সময় দোয়া করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন তাঁর কথা ব্যক্ত করার ভাষা নেই। পরিবারের বড় ভাই এস এম আজদুউদ্দিন, ছোটো ভাই সরদার মুহাম্মদ শাউদ্দিন, বড় বোন রাশিদা বেগম, সুষমা আক্তার তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে কাজের গতি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের কাছে আমার অকৃত্রিম ভালোবাসার ঋণ। আমার সহধর্মী মোহাম্মদ জাকির হোসেন সংসারের অনেক ঝামেলা নিজে মাথায় নিয়ে আমাকে কাজের পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা।

আরও যাঁরা অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শারমিন আক্তার লাকি, আমার কর্মস্থল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী ড. মাহফুজা হিলালী, ড. নিমাই চন্দ্র মণ্ডল, ড. ইসমাইল হোসেন সাদী, চৈতী চক্রবর্তী, পারভীন আক্তার, রেজাউল করিম রাজু, সবার প্রতি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় **১৯-৫২**
বনফুলের জীবনবোধ ও শিল্পভাবনা

দ্বিতীয় অধ্যায় **৫৩-১৫০**
মধ্যশ্রেণীর জীবনবৈচিত্র্য ও অন্ত্যজ সমাজের কথকতা

তৃতীয় অধ্যায় **১৫১-১৭৫**
রাজনীতি-অবলম্বী জীবনের চালচিত্র

চতুর্থ অধ্যায় **১৭৬-১৯১**
ইতিহাস-আশ্রয়ী জীবনকথা

পঞ্চম অধ্যায় **১৯২-২১৩**
অতীতের নৃতাত্ত্বিক মানবসমাজ

২১৪-২২২

ষষ্ঠ অধ্যায়
সামন্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস

সপ্তম অধ্যায় **২২৩-২৭০**

আঙ্গিকবিচার

- প্রচলিত রীতির উপন্যাস
- গদ্য-পদ্য রচিত উপন্যাস
- মহাকাব্যিক উপন্যাস
- পত্রোপন্যাস
- ডায়েরিধর্মী উপন্যাস
- নাট্য-উপন্যাস
- কোলাজধর্মী উপন্যাস

উপসংহার **২৭১-২৭৮**

গ্রন্থপঞ্জি **২৭৯-২৮৩**

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

চিকিৎসক-সাহিত্যিক বনফুল সাহিত্য-চর্চা অব্যহত রাখতে সরকারি চাকুরি ছেড়ে বিহারে এসে বসবাস করেন। তিরিশের দশক থেকে শুরু করে সত্তরের দশক পর্যন্ত লিখে গেছেন অবিরত। লেখক জীবনের পঞ্চাশ বছর সময়ের দেশ-কাল-রাজনীতির সমাজ বাস্তবতার পাশাপাশি বিশেষ করে মধ্যবিত্ত এবং অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন বাস্তবতা ও মনোজাগতিক দিকটি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁকে মধ্যবিত্ত ও অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্র সৃষ্টির সার্থক রূপকার বলা যায়। কারণ বাংলা সাহিত্যে তিনিই একমাত্র লেখক যিনি জীবনের শুরু থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত এসব চরিত্রের সংস্পর্শে কাটিয়েছেন। তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়েছেন একান্তভাবে। স্কুল জীবন থেকেই লেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। এ সময় তিনি হাতেলেখা পত্রিকা বের করেন যা তাঁর বোর্ডিং জীবনে অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাঁর ডাক্তারি জীবন থেকে সাহিত্যিক জীবন অনেক বেশি দীর্ঘ। তাই জীবনের শেষ অবধি সাহিত্যের নেশায় তিনি মজে ছিলেন। তাঁর পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যিক জীবনের বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি যেমন লিখেছেন তেমনি গল্প ও উপন্যাসে অভিনব আঙ্গিকের ব্যবহার করেছেন। চরিত্রের উপর আলোকপাত করে উপন্যাসের বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে। কারণ সমাজ, রাজনীতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা একটি চরিত্র গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

'বনফুলের উপন্যাস: বিষয় বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক বিচার' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভে সাতটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বনফুলের জীবনবোধ ও শিল্পভাবনাবিষয়ক আলোচনায় তাঁর শৈশব ও কৈশোরের জীবন এবং পাশাপাশি শিল্পভাবনা স্থান পেয়েছে। শিল্পভাবনায় লেখকের সাহিত্যিক প্রবণতা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে মধ্যশ্রেণির জীবনবৈচিত্র্য ও অন্ত্যজ সমাজের কথকতা। এখানে বিহার প্রদেশের মধ্যবিত্ত ও অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তথাপি, কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত ও কারখানার শ্রমিক শ্রেণির চরিত্রও রয়েছে তাঁর উপন্যাসে। মধ্যবিত্তের জীবন-সংগ্রাম, বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো, প্রেম, রাজনীতি, স্বদেশ ভাবনা, জাতীয়তাবোধ – সবকিছুই বর্ণিত হয়েছে। পৃথকভাবে মধ্যবিত্ত জীবন-কেন্দ্রিক বা অন্ত্যজ জীবন-কেন্দ্রিক উপন্যাস বনফুল লেখেননি। তাঁর উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্রগুলো মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলোর সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। দুই চরিত্রের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই মধ্যবিত্ত চরিত্র থেকে অন্ত্যজ চরিত্রগুলো পৃথকভাবে আলোচনা সাপেক্ষ নয়। অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্রকে ঘিরে আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্র। মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলোর মধ্যে সহজাত বশত ডাক্তার চরিত্রও রয়েছে। আর ডাক্তার চরিত্রের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত অন্ত্যজ চরিত্ররা। মধ্যবিত্ত চরিত্রকে এখানে মধ্যশ্রেণির চরিত্র হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে রাজনীতি অবলম্বী জীবনের চালচিত্র। রাজনীতি বিষয়ে বনফুলের মন্তব্য, তাঁর রাজনীতি ভাবনার রূপান্তর প্রক্রিয়াটি সর্বোপরি কোনো নির্দিষ্ট রাজনীতিক দল নয়, মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর মানবতাবাদ মনোভাবকে তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আছে ইতিহাস-আশ্রয়ী জীবনকথা। ইতিহাসের পাতা থেকে তিনি কোন কোন ইতিহাসের খণ্ডাংশকে আশ্রয় করে বা ঐতিহাসিক কোন চরিত্রকে অবলম্বন করে উপন্যাস লিখেছেন বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে ঘিরে কীরূপ কল্প-কাহিনির সৃষ্টি করেছেন – সেই বিষয়টি এখানে আলোচনা করা হয়েছে। কেনো উপন্যাস ত্রয়ীকে সরাসরি ঐতিহাসি-উপন্যাস না বলে ইতিহাস-আশ্রয়ী জীবনকথা বলা হয়েছে তারও ব্যাখ্যা রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে অতীতের নৃতাত্ত্বিক মানবসমাজ। নৃতত্ত্ব কী, নৃবিজ্ঞানের আলোকে তাঁর স্থাবর উপন্যাসের আলোচনা এবং *প্রথম গরল এ* বনফুল মানব সভ্যতার ইতিহাসে কোন ঘটনাটিকে প্রথম গরল বলে আখ্যায়িত করেছেন তা আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে সামন্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস। সামন্ত জীবন কী, উপন্যাসে সামন্ত জীবন কীভাবে উঠে এসেছে এবং এ জীবন ক্রমান্বয়ে কীভাবে ক্ষয়ে যাচ্ছে সে বিষয়টি লেখক কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন তার আলোচনা রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে উপন্যাসের আঙ্গিক বিচার। এখানে বনফুলের মৌলিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে আমাদের আলোচিত উপন্যাসগুলো সাতটি আঙ্গিকে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি আঙ্গিক সম্পর্কে ধারণা দিয়ে নির্ধারিত উপন্যাসগুলোর আঙ্গিক বিচারের চেষ্টা করা হয়েছে।

উপসংহার অংশে সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভের সারকথা অর্থাৎ বনফুলের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিকবিচার বিষয়ে মূল সূত্রগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
বনফুলের জীবনবোধ ও শিল্পভাবনা

সাহিত্যের প্রায় সবকটি শাখায় যাঁর স্বতন্ত্র ও সার্থক পদচারণা তিনি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯)। সাহিত্যিক ছদ্মনাম 'বনফুল'। বনফুলের পিতার নাম সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, মাতা মৃণালিনীদেবী। তাঁদের আদিনিবাস ছিল হুগলী জেলার শেয়াখালা গ্রামে। 'কাটাবুনে মুখুজ্জে' নামে পরিচিত এই পরিবারটির পূর্বপুরুষদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। বনফুলের প্রপিতামহ মহেশচন্দ্র ছিলেন সেকেলে পণ্ডিত। (বনফুল, ১৯৯৯: ৯) আর তাঁর পিতামহ কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বনফুল জানিয়েছেন, তিনি ছিলেন সংগীতজ্ঞ কালীসাধক। 'উদয় অস্ত' উপন্যাসে সূর্য সুন্দরের বাবার পরিচয়ে 'কেদারনাথ' নামটির উল্লেখ রয়েছে। এই কেদারনাথ ছিলেন একটু আলাদা গোছের মানুষ। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি বিপত্নীক হন কিন্তু নতুন করে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখেননি। একটি সেতারকে জীবনের অবলম্বন করে বাকিটা সময় কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বনফুলের বাবা সত্যচরণ ছোটবেলায় মাতৃহীন হন। আর পিতা কেদারনাথ সংসার-বিরাগী তান্ত্রিক কালীসাধক হওয়ায় মামার বাড়িতে থেকেই বড় হন তিনি। তাঁর কর্মস্থল ছিল সাহেবগঞ্জে। সেখানে তিনি লেখাপড়া শেখেন পরে ক্যামবেল মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাস করেন। সাহেবগঞ্জের ওপারে মনিহারিতেই জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি। মনিহারিতে দাতব্য চিকিৎসালয়ের মেডিকেল অফিসারও ছিলেন সত্যচরণ। ধনি-দরিদ্র সর্বস্তরের মানুষেরই প্রিয়ভাজন সত্যচরণ যখন মনিহারিতে চিকিৎসা করাতে আসেন তখন মনিহারি নিতান্তই গ্রাম ছিল। আধুনিক চিকিৎসার তেমন সুযোগ ছিল না এখানে। তাঁর উদারতায়, অতিথি বৎসলতায়, চিকিৎসার নৈপুণ্যের গুণে জমিদার থেকে সাধারণ দরিদ্র মানুষের অজস্র ভালোবাসার তাগিদে তিনি সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যান। তারা তাকে জমিজমা কিনে প্রতিষ্ঠা কওে দেন। মনিহারি অঞ্চলের আমলা-গোমস্তারা মামলা-মোকাদ্দমা উপলক্ষে প্রায়ই কাটিহার বা পূর্ণিয়ায় যেতেন। সত্যচরণ যেহেতু ধনী-দরিদ্র মুটে-মজুর সকলেরই ডাক্তার ছিলেন, তাই তারা বিনা সংকোচে তাঁর বাড়িতে এক-আধাবেলা খেতেন, থাকতেন। গঙ্গাঘাট তাঁর বাড়ির কাছেই থাকাতে গঙ্গাস্নান উপলক্ষেও তাঁর বাড়িতে প্রচুর লোকের সমাগম হতো। সরকারি অফিসাররাও তাঁর বাড়িটিকে হোটেল বা ডাক বাংলোর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতেন। আত্মীয়-পরিজন, চাকরিপ্রার্থী, এমনকি পাখিশিকারিরাও কখনো কখনো আসতেন। তাছাড়া সত্যচরণের ছিল থিয়েটারের শখ। এ কারণে এই শ্রেণির লোকরাও সমাগম হত তাঁর বাড়িতে। গুণীলোকের সন্ধান পেলে সত্যচরণও তাকে আপ্যায়ন করতে ভালোবাসতেন। কেশবমশাই তাদেরই একজন– নাচতেন, বেহালা বাজাতেন, অভিনয় করতেন। কেশবমশাইয়ের মতো তারাপদ পণ্ডিতও তাঁর বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছেন। তিনি ছিলেন জমিদার সুরেন্দ্রনাথ সিংহের কাছারির গোমস্তা সতীশচন্দ্রের ভাই। বনফুলের

Dhaka University Institutional Repository

হাতেখড়ি তাঁর কাছেই হয়। তাঁর স্নেহময় স্বভাব, সরলতা এবং গুণের কথা বনফুল পরবর্তী জীবনে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। সত্যচরণকে লোকজন শুধু ডাক্তার হিসেবেই শ্রদ্ধা করতেন না, তাঁর অমায়িক ব্যবহারও সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। সবাই তাঁর বাড়ির যেকোনো কাজেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সদা প্রস্তুত থাকতেন।

এতো কর্মব্যস্ততার মাঝেও সত্যচরণের সংগীতানুরাগ ছিল অব্যাহত, শুধু তাই নয়, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতিও তাঁর দরদ ছিল। সেকালের বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় প্রধান পত্রিকাগুলোর গ্রাহক ছিলেন তিনি। বান্ধব, সুপ্রভাত, প্রদীপ, বসুমতী, হিতাদী, বঙ্গবাসী, প্রবাসী, সাহিত্য– সবই তাঁর বাড়িতে নিয়মিত রাখা হতো। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বনফুলের জীবনে সাহিত্যপ্রীতি জন্মানোর ভূমিকাস্বরূপ ছিল পত্রিকাগুলো। পাশাপাশি পিতার জীবনের আদর্শও বনফুলের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার অন্যতম প্রেরণা ছিল (উর্মি নন্দী, ১৯৯৭: ৪)।

বাল্যকাল

বনফুলের জন্ম হয়েছিল শ্রাবণ মাসে। তাঁর জন্মের অনেকদিন আগে থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল প্রতিদিন। মনিহারি গ্রামটি গঙ্গা আর কোশী নদীর সঙ্গমস্থলে ছিল। ফলে বৃষ্টির সময় বা বর্ষায় দুই নদীর জলে তাঁদের বাড়িটিকে দ্বীপে পরিণত করে দিয়েছিল। সত্যচরণের বন্ধু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় সাহেবগঞ্জ থেকে মনিহারিতে নৌকা করে বনফুলকে দেখতে এসেছিলেন। এই সময়ের একটি ঘটনা বনফুল তাঁর মায়ের কাছে শুনেছিলেন, তা হলো–বনফুলের বালিশের নিচে সবার অগোচরে একটি সর্পশিশু আশ্রয় নিয়েছিল তখন। বালিশটি সরানো মাত্র সাপটি যে কোথায় চলে যায়, কেউ তার হদিস পায়নি। (বনফুল, ১৯৯৯: ১০)। বলা যায়, একরকম জন্মলগ্ন থেকেই বনফুলের বিরূপ পরিবেশ এবং বন্যপ্রাণীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার মানসিকতায় গড়ে ওঠেন।

এ সময়ই বনফুলের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বীজও অঙ্কুরিত হতে থাকে। প্রাসঙ্গিক ঘটনাটি হলো, বনফুলের দ্বিতীয় ভাই ভোলানাথ বনফুলের দেড় বছরের ছোট হওয়ায় বনফুল মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত হন। ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে মেলিনস ফুড খাওয়ানো হতো। কিন্তু সেটি তাঁর পেটে সইছিল না। এসময় সত্যচরণের চাষাবাদে সাহায্যকারী এক মুসলমান মজুর চামরু, তার বউ ছিল মজুরনি। এই মজুরনির তখন এক কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। বনফুলের বাবা নবজাতকের নাম রাখেন চামেলী। তো মজুরনি একদিন বনফুলের মাকে বলে – তার মেয়ে তার এক স্তনের দুধ খেয়েই সেরে উঠতে পারে না; যদি বনফুলের মায়ের কোনো আপত্তি না থাকে তবে বনফুলের জন্য আরেক স্তন সে আলাদাভাবে রেখে দিতে পারে। মেলিনস ফুড বনফুলের পেটে সইছিল না বলে বনফুলের মাকে রাজি হতে হলো। বলাবাহুল্য, এই মজুরনির দুধ খেয়ে বনফুলের স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়েছিল। মজুরনি যখন বাড়ির উঠানে এসে চাকরদের ডাকতো, তখন বনফুল প্রথমে দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতেন। এ ব্যাপারটি বাড়ির অন্য লোকেরা যারা মজুরনির সমগোত্র, তারা ভালোভাবে গ্রহণ করতো না। একবার তাদেরই একজন বামন দিদি বনফুলের মার

Dhaka University Institutional Repository

কাছে গিয়ে নালিশ করে, কেন চামেলীর মা এটুকু শিশুকে নিয়ে মাঠে যাবে। মৃণালিনী দেবীও এ বিষয়টি নিয়ে ভাবনায় থাকতেন, কিন্তু তাঁর ভাবনায় ইতিবাচক লক্ষণ দেখা দিতো যখন দেখতেন চামেলীর মায়ের সরল সিগ্ধ হাসিমাখা মুখ। তাছাড়া বড় ব্যাপার, যে অন্যের সন্তানকে দুধ খাইয়ে বড় করে, সে কখনো তার অনিষ্ট করতে পারে না।

বনফুলের দুধ-মা তাঁর জীবনের অনেকখানি জুড়ে ছিল। বনফুল সারা জীবন তাঁর এই দুধ-মার কথা ভোলেননি। তার প্রমাণ রয়েছে *উদয়-অস্ত* উপন্যাসে। সেখানে সূর্যসুন্দরের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে বনফুল তাঁর দুধ-মার কথা স্মরণ করেছেন শ্রদ্ধাভরে। এই দুধ-মার কারণেই বনফুল খোলা মাঠ আর আকাশের নিচে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে শিখেছিলেন। দুধ-মা তারমেয়ে চামেলীকে সঙ্গে দিয়ে দিগন্তবিস্তৃত শস্য-শ্যামল মাঠের মাঝখানে একটি বুড়ো বটগাছের নিচে বনফুলকে বসিয়ে রাখতেন। আর রাখালরা পাহারায় থাকতো। কখনো নিয়ে যেত মনিহারির কাটাহা ফাঁসিতলায়, রঘুনাথ দিয়ারায়। বনফুল একটি লাঠি হাতে করে জঙ্গলে শস্যক্ষেত্রে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর এই ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য বাড়ির চাকররা বনফুলকে 'জংলিবাবু' বলে ডাকতো। সম্ভবত বনফুলের দুধ-মাই তাঁকে আদর করে এই নামে ডাকতো বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর কারণে। এভাবেই প্রকৃতিপাঠের দীক্ষা হয়েছিল বনফুলের। এখান থেকেই পরবর্তী সময়ে তাঁর পাখি পর্যবেক্ষণের নেশা জেগেছিল। এই নেশা থেকে তিনি তাঁর একটি উপন্যাস লিখেছিলেন *ডানা* (১৯৪৮) নাম দিয়ে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ছাত্র, পেশায় ইনকাম-ট্যাক্স বিভাগের অফিসার, প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত বনফুলকে প্রত্যক্ষভাবে পাখি চেনার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন।

বনফুলের মা মৃণালিনীদেবী ছিলেন শুচিবাইগ্রস্ত একজন ব্রাহ্মণ গৃহবধূ। তাঁর ছিল নানারকম বাছবিচার। তিনি অন্যধর্মের কাউকে স্পর্শ করলেই গঙ্গাজল ছিটিয়ে পবিত্র হয়ে নিতেন, বাড়িতে মাংস রান্না হত না বলা চলে। কিন্তু কখনো কখনো পরিস্থিতি তাঁকে উদার করে দিত। বনফুলের নিউমোনিয়া হলে ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে মুরগির মাংসের পথ্য খাওয়ানো হলো। বনফুলের মুরগির মাংসের প্রীতি দেখে তাঁর মা হাসতে হাসতে বলতেন, 'ওম্লেচ্ছ, হবেইতো। ছেলেবেলায় মুসলমানীর দুধ খেয়েছে যে।' (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ৮) বনফুলদের বাড়িতে ছিল ভৃত্যমহল। নানা বর্ণের, নানা গোত্রের ভৃত্যের সমাবেশ ঘটেছিল সেখানে। ভৃত্যরা সবাই সেখানে স্বাধীন জীবনযাপন করতো এবং প্রভুদের খুব সমীহ করতো। তাছাড়া বাড়িতে থাকতেন আরো বহু মানুষ। মনিহারির লোয়ার প্রাইমারি স্কুল যখন মাইনর স্কুল হলো তখন সেই স্কুলে বনফুলের পিতৃতুল্য চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হেডমাস্টার হয়ে এলেন। ('উদয়-অস্ত' উপন্যাসে একে সূর্যের ভাই চন্দ্র বলে এর বিস্তারিত চরিত্র আঁকা হয়েছে)। দুবরাজপুরের

Dhaka University Institutional Repository

সতীন দত্ত মাইনর স্কুলের হেড পণ্ডিত। তিনি বনফুলদের বাড়িতে থাকতেন, বনফুল আর তাঁর ভাই ভোলাকে পড়াতেন। চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তাঁরা নানা বিষয়ে শিক্ষা নিয়েছিলেন কিছু সময় – দাঁত মাজা, কাপড় পরা থেকে শুরু করে কবিতা আবৃত্তি করা, আকাশের তারা চেনা পর্যন্ত। পরবর্তী সময়ে হেডমাস্টার হয়ে যিনিই আসতেন, তিনিই বনফুলদের বাড়ির লোক হয়ে যেতেন। একবার এসেছিলেন ভূতনাথ পণ্ডিত যার দক্ষতা এবং নিপুণতার কারণে বনফুল মাইনর পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে বৃত্তি পান। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলে একজন প্রায় আসতেন। মুখে দাড়ি, মাথায় লম্বা চুল, গায়ে জামা নেই, খালি পা, শীতে একটা চাদরমাত্র গায়ে দেন তিনি। তাঁর মুখে সর্বদাই লেগে থাকতো হাসি। তিনি বাড়ির ছেলেদের পড়ার চাপ লঘু করে দিতেন। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি ইতিহাসের গল্প, রূপকথার গল্প, শেকসপিয়ারের গল্প পড়ে শোনাতেন। তিনি বাড়িতে সান্ধ্য পাঠের আয়োজন করতেন নিয়মিত। (পৃ. ১২) বান্ধব, সুপ্রভাত, সাহিত্য, প্রদীপ, বসুমতী, হিতবাদী, বঙ্গবাসী থেকে সুলভ সংস্করণের প্রকাশিত বইগুলো এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থও ছিল বনফুলদের বাড়িতে। যেদিন সত্যচরণ বাড়িতে অবস্থান করতেন সেদিন তিনি সন্ধ্যা বেলায় পড়তেন, বাড়ির সবাই তার পড়া শুনতেন। এরকম একটা সাহিত্যিক পরিমণ্ডল ও ভৃত্যমহলের মধ্যে দিয়েই বনফুলের বাল্যকাল কেটেছে।

লেখাপড়া ও সাহিত্যচর্চা

ভাই ভোলার সঙ্গে বনফুল ১৯১৪ সালে মনিহারির অন্য পারে অবস্থিত সাহেবগঞ্জের রেলওয়ে হাইস্কুলে ফোর্থ ক্লাসে ভর্তি হন। তখন তাঁর বয়স ১৫ বছর। এ বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে গঙ্গা-পারাপারের স্টিমার সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়। তাই নৌকা করে বনফুলকে যাতায়াত করতে হতো। বোর্ডিংয়ে পড়ালেখার খরচ বনফুল তাঁর বৃত্তির টাকায় চালিয়েছেন এবং সব ক্লাসেই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। বনফুল তাঁর স্কুলের শিক্ষকদের সম্পর্কে বলেছেন, হেডমাস্টারমশাই মহাদেব ঘোষ ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। মৈত্রমশাই ইংরেজি পড়াতেন – তিনি খুব সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। পালমশাই ঝড়ের বেগে পড়াতেন; কেউ বেয়াদবি করলে তার শাস্তি অনিবার্য হত। রামতারণ নসিপুরীমশাই ছোটখাটো মানুষ এবং খুব আস্তে আস্তে অঙ্ক কষতেন আর বাংলা পড়াতেন। তিনি ছাত্রদের লাইব্রেরি থেকে বই দিতেন। বনফুলের চেয়ে দুই বছরের বড় এক ছাত্র গোবরা তাঁর কাছে আলাদা পড়তেন এবং মাস্টারমশাইয়ের উৎসাহে বাইরের বই কিনে একটা লাইব্রেরিও বানিয়েছিলেন। বনফুল তাঁকে গোবরাদা বলে ডাকতেন। তাঁর কাছ থেকে প্রায়ই বই নিয়ে পড়তেন বনফুল। একারণে নসিপুরীমশাই বনফুলের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ফোর্থ মাস্টারমশাইয়ের কারণেই বনফুলের ইংরেজি অনুবাদ কর্মে পারদর্শিতা আসে। বনফুল তাঁর আত্মজীবনী *পশ্চাৎপটে* (১৯৭৮) লিখেছেন –

Dhaka University Institutional Repository

লাইব্রেরী হইতে ছেলেদের তিনি বই দিতেন। ...আমি প্রথম যেদিন বই লইতে গেলাম, দেখিলাম নিজেই তিনি মনোযোগ সহকারে একটি মোটা বই পড়িতেছেন। আমি গিয়া বই চাহিলে তিনি প্রশ্ন করিলেন–'এর আগে তুমি বই নিয়েছো কি? 'না।' তাহলে ওই এক নম্বর আলমারির প্রথম তাকের প্রথম বইটা নাও।' চাবি দিলেন আমাকে। আমি নিজেই গিয়া চাবি খুলিয়া বইটি বাহির করিয়া আনিলাম। বেশ মোটা লাল রঙের বই। সোনার জলে নাম লেখা– OLIVER TWIST নীচে লেখা – Charles Dickens রেজিস্টারে নাম লিখিয়া সে বইখানা লইয়া গেলাম। এমন একটা মোটা বাহারের বই পাইয়া ভারী আনন্দ হইল। তখন আমি ফোর্থ ক্লাসে পড়ি। পড়িবার সময় দেখিলাম এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না।...ফোর্থ মাস্টারকে সসঙ্কোচে বলিলাম–'এই বইটা বড় শক্ত স্যার। চার পাতার বেশী পড়তে পারিনি।'...এই বইটা আজও নিয়ে যাও, একটা রিডিং দিয়ে নিয়ে এস। তাহাই করিলাম।...তিন মাসের মধ্যে ডিকেন্স, স্কট, থ্যাকারে, এবং আরও অনেক বই পড়িয়া ফেলিলাম। একদিন ফোর্থ মাস্টার মহাশয় বলিলেন,'তুমি তো এত ইংরেজি বই পড়লে, এইবার এই বাংলা বইগুলোর ইংরেজিতে অনুবাদ কর না। পারবে না?' বলিলাম, 'পারব না কেন? দীর্ঘকাল আমি বাংলা হইতে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছি এবং ফোর্থ মাস্টার মশাই প্রত্যহ সন্ধ্যায় আসিয়া সেগুলি সংশোধন করিয়াছেন। (বনফুল, ১৯৯৯: ৪৫)

পরবর্তী জীবনেও তাঁর সাথে বনফুলের দেখা হয়েছিল। একবার বনফুল ভাগলপুর থেকে মনিহারি যাওয়ার উদ্দেশে ফিমেল ওয়েটিং রুমে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে রেখে নির্জন প্ল্যাটফর্মে সিগারেট হাতে পায়চারি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলেন, 'কে, বলাই নাকি?'। (বনফুল, ১৯৯৯: ৪৬) এ কথা শোনামাত্রই হাত থেকে সিগারেটটি ফেলে দেখেন নসিপুরীমশাই। এ সময় তিনি বনফুলের পরিবারের সঙ্গে দেখা ক রন এবং সন্তানদের আশীর্বাদ করেন। বনফুলের উপন্যাস পড়েছেন তার প্রমাণ দিলেন, এমনকি কিছু অংশ মুখস্থ বলে শুনিয়েও দিলেন। বনফুল ভাগলপুরে প্র্যাকটিস করছেন, সেকথাও তাঁর জানা আছে। বনফুলের ব্যাকরণ ভুল ধরলেন–'ভীষণ রজনী'র বদলে 'ভীষণা রজনী' হওয়া উচিত বলে জানালেন। ডাক্তার হয়ে বনফুল সিগারেট খাচ্ছেন বলে লজ্জা দিলেন। এরপরও তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল কাঁদিতে। এই ফোর্থ মাস্টারমশাইয়ের কথা বনফুল সব সময় মনে রেখেছে (প্রশান্তকুমার. ২০০০: ১৭)। তিনিই বনফুলকে সাহিত্য-জগতে প্রবেশে প্রেরণা ও সাহস জুগিয়েছিলেন।

মনিহারিতে থাকাবস্থায়ই বনফুল দুই-একটা কবিতা লিখেছেন। আর সাহেবগঞ্জে স্কুলে পড়ার সময়ে বনফুল হাতে লেখা *বিকাশ* পত্রিকা বের করে ফেললেন। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা থেকে শুরু করে সম্পাদকীয় বক্তব্য এবং ধাঁধা সবকিছুই বনফুলকে লিখতে হত, যদিও তাঁর ভাই মাঝেমধ্যে সেই পত্রিকায় লিখতেন (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ১৭)। *বিকাশ* পত্রিকার প্রচ্ছদের ছবি আঁকার কাজটি করতেন তারক মজুমদার, তিনি চলচ্চিত্রের পোস্টারের সিন আঁকতেন। তারক মজুমদারের ভাইয়ের নাম সুধাংশু শেখর মজুমদার, যিনি ভাগলপুর টিএনজে কলেজের বিএ ক্লাসের ছাত্র। তাঁর ডাকনাম বটু। তাঁকে বনফুল বটুদা বলে ডাকতেন। বটুদার অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাজ করতেন রেলে। তিনিও হাতে লেখা কাগজ বের করেছেন, নাম *বীণাপাণি*,বনফুল তাতে লেখা দিয়েছেন।

বনফুলের *বিকাশ* পত্রিকাটি সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে হাইস্কুলের ছাত্র-শিক্ষক সবার কাছে এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, হাতবদল হতে হতেই তা ছিঁড়ে যেত। বটুদা খুব বেশি উৎসাহিত হয়ে কবিতাগুলো মাসিকপত্রে ছাপাবার জন্য বনফুলকে পরামর্শ দেন এবং কয়েকটি কবিতা মাসিক পত্রে পাঠিয়েও দেন। এই বটুদার সাহায্য ও উৎসাহ না পেলে বনফুল সাহিত্য জগতে প্রবেশ করতে পারতেন না বলে জানিয়েছেন তাঁর আত্মজীবনীগ্রন্থে (বনফুল, ১৯৯৯: ৫৬)। বনফুল যখন থার্ড ক্লাসে পড়েন এখনকার ক্লাস এইট, ১৯১৫ সাল, তখনই কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত *মালঞ্চ* পত্রিকায় বনফুলের স্বনামে অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় নামে কবিতা ছাপা হয়। পত্রিকা সবসময় বোর্ডিংয়ে চলে যেত – এই ব্যাপারটিতে সবাই খুশি হলেন, কেবল একজন ছাড়া। তিনি হেডপণ্ডিত রামচন্দ্র ঝা, বনফুলদের সংস্কৃত পড়াতেন। তাঁর ধারণা, বনফুল কবিতা লেখেন বলেই সংস্কৃতে বরাবর আশি নম্বর পেয়েপ্রথম হতেন,কখনো একশ পাননি। কিন্তু বনফুলের পক্ষে একশ নম্বর পাওয়া সম্ভব যদি তিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেন। তিনি বনফুলকে কবিতা লেখতে বারণ করে দিয়ে বললেন, 'আর কবিতা লিখ না।' (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ১৮) চিন্তায় পড়ে গেলেন বনফুল। তিনি বটুদার কাছে গেলেন পরামর্শ চাইতে। আত্মজীবনীতে লেখক উল্লেখ করেছেন –

> সেই দিন খেলার মাঠে বৈকালে বটুদার সঙ্গে দেখা হইল। বটুদা ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। লেফট্ আউট হইতে খেলিতেন। খেলার পর বটুদাকে পণ্ডিত মশাইয়ের ক্রোধের কথা বলিলাম। অনুরোধ করিলাম আর যেন তিনি কোনো কবিতা কাগজে না পাঠান। বটুদা খানিকক্ষণ ভাবিলেন। তাহার পর বলিলেন, তুমি একটা ছদ্মনাম ঠিক কর সেই নামে কবিতা ছাপা হোক। ছেলেবেলায় ভৃত্যমহলে আমার নাম ছিল জংলিবাবু। বনজঙ্গল আমি খুব ভালোবাসি। বাল্যকালে আমি অনেক কীটপতঙ্গ প্রজাপতির পেছনে ঘুরিয়াছি। পরিণত বয়সেও পাখি চিনিবার জন্যে অনেক জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিতে হইয়াছে। বন চিরকালই আমার নিকট রহস্যনিকেতন। এই জন্যই বোধহয় ছদ্মনাম নির্বাচনের সময় 'বনফুল' নামটা আমি ঠিক করিলাম। আগেও বোধ হয় *বিকাশ* পত্রিকায় বনফুল নাম দিয়া দুই একটা কবিতা লিখিয়াছি। বটুদাকে কথাটি বলিলাম– তিনিও রাজি হইয়া গেলেন। ইহার পর হইতেই আমার কবিতা বনফুল নাম দিয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। (বনফুল, ১৯৯৯: ৪১)

বনফুল নামটি এতোই পরিচিতি পেয়েছে যে, পরবর্তীকালেব বনফুলকে কেউ আর বলাইচাঁদ বলে ডাকেনি। কথায় আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয় – হেডপণ্ডিত রামচন্দ্র ঝাকে বনফুল অনেকটা বাঘের মতোই ভয় পেতেন। কারণ তিনি বনফুলকে পড়ালেখার সময় নষ্ট করে কবিতা লিখতে বারণ করেছিলেন। একদিন কিন্তু বনফুলকে বাঘের কবলেই পড়তে হলো – হেডপণ্ডিত যখন টের পেলেন, বলাইচাঁদ 'বনফুল' ছদ্মনাম দিয়ে কবিতা লিখে যাচ্ছেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপারটি সত্য কিনা। বনফুল ভয়কে জয় কওে তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তির কথা জানালেন – তিনি না লিখে থাকতে পারেন না। এবার শিক্ষক তাঁকে কবিতা লিখতে অনুমতি দেন। অনুমতি পেয়ে বনফুল যারপরনাই খুশি হলেন এবং অনেকটা অবাকও হলেন। তিনি ভাবলেন অনুমতি পাওয়ার পেছনে বটুদার অবদান থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সংস্কৃত পণ্ডিত রামচন্দ্র ঝা বললেন,'বেশ, কবিতা লেখ।

আমি তোমাকে সংস্কৃত শ্লোক দিব, সেইগুলি তুমি কবিতাতে অনুবাদ কর।' (পৃ. ৪১) পণ্ডিতমশাই টানা দুই বছর বনফুলকে দিয়ে সংস্কৃত শ্লোক অনুবাদ করিয়ে ছাড়লেন। 'আমি যখন ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি (১৯১৮) প্রবাসীতে আমার সংস্কৃত হইতে অনুদিত একটি চার লাইনের কবিতা প্রকাশিত হইল। সে যে কি আনন্দ, তাহা বর্ণনা করিতে পারিব না। ইহার কিছুদিন পরে ভারতী পত্রিকাতেও আমার কবিতা প্রকাশিত হইল। অনুভব করিলাম– হয়তো ভুল করিয়াই করিলাম–যে এইবার আমি সাহিত্যের অভিজাত মহলে প্রবেশাধিকার পাইয়াছি।' (পৃ. ৪২)

বনফুলের জীবনে ১৯১৮ সাল বিশেষভাবে মনে রাখার মতো একটি বছর ছিল। এ বছরে তাঁর জীবনে তিনটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। এই বছর বনফুল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন,তাঁর চার লাইনের একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ *প্রবাসী* পত্রিকায় ও একটি কবিতা *ভারতী* পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয় এবং ১১ বছর বয়সের তাঁর ছোটবোন রাণীর বিয়ে হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর বনফুলের প্যারাটাইফয়েড হওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে তাঁর বাবা তাঁকে সেন্ট কলম্বাস কলেজে ভর্তি করালেন। সেন্ট কলম্বাস কলেজটি রেসিডেনশিয়াল মিশনারি কলেজ ছিল। কলেজের হুইটলে হলে নানা বিষয়ে এক্সটেনশন লেকচার দেয়া হতো। সেখানে ইতিহাসের অধ্যাপক জ্ঞানবাবু মানুষের অতীত বিষয়ে যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সে-বক্তৃতা শুনে তখনই বনফুল তাঁর *স্থাবর* উপন্যাসটি লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। দর্শন এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়েও বক্তৃতা দিয়েছিলেন যথাক্রমে গণিতজ্ঞ অধ্যাপক মহেষঘোষ এবং অধ্যাপক ডি কে রায়। কলেজে চারটি মেসের দুটি হিন্দুদের, বাকি দুটি মেস ছিল মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের জন্য। এখানে সব ধরনের খাবারই চলতো। ছাত্ররা নিজেদের সংস্কার অনুযায়ী যেকোনো মেসের মেম্বার হতে পারতেন। বনফুল হিন্দু কনজারভেটিভ মেসের মেম্বার ছিলেন।

কলেজটি ছিল উন্মুক্ত পরিবেশের মধ্যে। দূরে চারদিকে পাহাড়, খোলা মাঠ। কলেজে নর্থ, সাউথ ও কিংস নামে তিনটি ব্লক ছিল। তাছাড়া অ্যানেক্স নামে আরো একটি ব্লক ছিল। কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে সেখানে তাকে থাকতে হতো। কলেজের অধ্যাপক ছিলেন চারজন মিশনারি; অধ্যক্ষ কেনেডি, অধ্যাপক স্টিভেনসন এবং অধ্যাপক উইন্টার আর মিশনের সময়ে নেতৃত্ব দিতেন অধ্যাপক ফরেস্টার। তিনি পূর্বে ছিলেন অঙ্কের অধ্যাপক। রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৯৪) আত্মীয়। তিনি বাংলাও পড়াতেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন ডি কে রায়, তিনি ছিলেন বাঙালি। বনফুলের সহপাঠীদের কয়েকজনের মধ্যে একজন ছিলেন সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩-১৯৭২)। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে *নতুন ফসল*, *শতাব্দীর অভিশাপ*, *অনুষ্টপ ছন্দ*, *গৃহকপোতি* প্রভৃতি। তাঁর সাহিত্য-চর্চার বিষয়টি তখন তিনি বনফুলের কাছে বলেননি। কিন্তু এরই মধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে যে, বনফুলের কবিতা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে

এবং বনফুল একজন লেখক। একবার বাংলা ক্লাসে চারুচন্দ্র রায়চৌধুরী 'গরু' বিষয়ের ওপর একটি রচনা লিখতে বলেন, ফুল মার্কস– কুড়ি। বনফুল লেখা জমা দিলেন, দুদিন পর চারুচন্দ্র জানালেন, বনফুল কুড়িতে কুড়ি পেয়েছেন। তিনি পরে জোরে জোরে কবিতাটি পড়ে শোনালেন –

মানুষ তোমায় বেজায় খাটায়,
টানায় তোমায় লাগল গাড়ি;
যদি দোষ করেছ-
অমনি পড়ে লাঠির বাড়ি।
আপন জিনিস বলতে তোমার
নাই ক কিছুই এ বিশ্বেতে
তোমার বাঁটের দুধটুকু তা-ও
বাছুর তোমার পায়না খেতে।
মানুষ তোমার মাংস খাবে,
অস্থি দেবে জমির সারে,
চামড়া দিয়ে পরবে জুতো
বারণ কে তায় করতে পারে।
তোমার পরেই এ অত্যাচার
হে মরতের কল্পতরু,
কারণ নহ সিংহ কি বাঘ
কারণ তুমি নেহাৎ গরু। (পৃ. ৬৪)

পরে সরোজকুমার নিজে এসে আলাপ করে গিয়েছিলেন বনফুলের সঙ্গে। বনফুলের আরেক সহপাঠী-কবি অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬)। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি গুণী সাহিত্যিকদের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন– জর্জ বার্নার্ড শ, মেটারলিংক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বনফুলের সঙ্গে কবি অমিয় চক্রবর্তীর আলাপ দেরিতে হয়েছিল, কারণ বনফুল ছিলেন সায়েন্স গ্রুপের ছাত্র। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর দখল ছিল ভালো। বনফুল তাঁর ঘরে গিয়ে আড্ডা দিতেন এবং বহুপঠনশীলতার জন্য তাঁকে সমীহ করতেন।

বনফুলের কলেজে অতিবাহিত দিনগুলো ছিল বেশ আনন্দের ও মনে রাখার মতো। অধ্যক্ষ মহাশয়ের উদ্যোগে সবাই মিলে বাগান করেছেন, তরকারি ফলিয়েছেন, কলেরা-মহামারীতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন, মিশনারি অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে পরেশনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছেন। মিশনারি সি. উইন্টারের কথা তিনি বিশেষভাবে মনে করেছেন, যিনি বিলাতি ডিগ্রিধারী হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ২৫ টাকা বেতনে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

দুর্ভাগ্যবশত বনফুল আইএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়ে গেলেন। কারণ, বোটানির ব্যবহারিক পরীক্ষায় ন্যূনতম নম্বর অর্জন। পরীক্ষার সময় এক্সটারনাল একজামিনার যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কতগুলো ছোট কালো রঙের শুকনো ফুল এনে সেগুলোর 'ওভারি' কেটে কোন জাতের ফুল তা বার করতে বলেন ছাত্রদের। কিন্তু কোনো ছাত্রই পরীক্ষায় ভালো করেনি। পরে অনন্যোপায় হয়ে একজামিনার জবাফুল কেটে পরীক্ষা করতে বলেন। যেহেতু এটা একটা পরিচিত ফুল তাই সব ছাত্রই ভালো করলো। কিন্তু যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাতে খুশি হতে পারেননি। তিনি সবাইকে ন্যূনতম নম্বর দিলেন। এর ফলেই বনফুল প্রথম বিভাগ অর্জন করতে ব্যর্থ হলেন (পৃ. ৮৫)।

বনফুল কলকাতায় আসেন ১৯২০ সালে। এ বছরই তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়ে বনফুল ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। তখন তাঁর 'বাড়তি মাশুল' 'অজান্তে' ইত্যাদি গল্প 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয়। তবে মেডিকেল কলেজে থাকা নিয়ে বনফুলের সমস্যা হয়েছিল। তখন কলেজে হোস্টেল ছিল না। ছাত্রদের মেসে থাকতে হতো। ৩নং মির্জাপুর স্ট্রিটে বনফুলদের পরিচিত বিশুদা থাকতেন। তাঁর মাধ্যমে বনফুল জানতে পারলেন, মেসের ১২ জন ছাত্রের মধ্যে তিনজন ছাত্র আগামী ছয় মাসের মধ্যে ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। সেসময় একটা সিট হলেও খালি হবে। বনফুল দরখাস্ত লিখে বিশুদার কাছে দিয়ে এলেন এবং কলেজের সুপারিনটেন্ডেন্টকে বিষয়টি অবহিত করলেন। মেসে সিট পাবার ব্যাপারে বিশুদা তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। সিট পাবার অন্তর্বর্তীকালীন বনফুলকে ডেলি-প্যাসেনজারি করতে হয়েছে শেওড়াফুলি থেকে কলকাতা পর্যন্ত। কারণ তিনি শেওড়াফুলিতে তাঁর বাবার মামা দাদামশাইয়ের বাসায় উঠেছেন। ডেলি-প্যাসেনজারি করতে করতে বনফুলের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হল–

> নানা রকম বাঙালি দেখিলাম এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি চরিত্রের আভাসও পাইলাম। যাহাদের প্রত্যহ দেখিতাম তাহাদের অধিকাংশই অফিসগামী কেরানী। ছাত্রও কিছু কিছু থাকিত। ...এই ডেলি-প্যাসেনজারদের একটি সমাজও গড়িয়া উঠিয়াছিল ট্রেনের মধ্যে। খুড়ো, জ্যাঠা, মামা, দাদা প্রভৃতি সম্বোধনে অনেকে অনেককে ডাকিতেন। অনেকে অনেকের জন্যে কোনার সিটটি রিজার্ভ করিয়া রাখিতেন।...পরনিন্দা এবং পরচর্চার আমেজে কামরা অনেক সময় গুলজার হইয়া উঠিত। ফেরিওয়ালাদের নানারকম মজাদার ছড়াও ভালো লাগিত খুব।...ট্রেনে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ট্রেনের টাইম সম্বন্ধে ডেলি-প্যাসেনজারদের জ্ঞান নির্ভুল।... ট্রেনে বইও ফেরি করিত ফেরিওয়ালা।...ডেলি-প্যাসেনজারদের মধ্যে প্রবীণ বয়সের একজন ডিকেন্স পাঠকও আবিষ্কার করিয়াছিলাম। তবে অধিকাংশ লোকই খবরের কাগজ পড়িতেন। (পৃ. ৯৫-৯৬)

অবশেষে কিছুদিন পর বনফুল ৩নং মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে একটি সিট পেলেন। ডেলি-প্যাসেনজারি করার সময় বনফুল একটু অন্যরকম বিদ্যার দ্বারস্থ হলেন। সেটি হলো আকাশের তারা চেনার বিদ্যা। শেওড়াফুলিতে ফেরার পথে একদিন রাত দশটার সময়ে তিনি লক্ষ করলেন একজন ভদ্রলোক বাইনোকুলার হাতে দক্ষিণ আকাশের দিকে

তাকিয়ে আছেন। বনফুল তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন তিনি নক্ষত্র দেখছেন। বনফুল অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি আসলে নক্ষত্র চেনেন কিনা। এই ভদ্রলোক ছিলেন শেওড়াফুলি রেলওয়ে স্টেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার। তিনি বনফুলকে কিছুদিন তারা চেনা শেখালেন এবং তারা চেনার বিষয়ে তিনি বনফুলকে একটি বইও দিলেন। এক সময় বনফুল নিজ চেষ্টায় রাত জেগে সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি নক্ষত্রচর্চাও করেছেন। তারা বিষয়ে বনফুল বই লেখার চিন্তাভাবনা করেছিলেন কিন্তু পরে লেখা হয়ে ওঠেনি। তবে তিনি বিভিন্ন বইতে তারার উল্লেখ করেছেন (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ২৯)।

বনফুল যখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন তখন তাঁকে ঘিরে কৌতূহলের সৃষ্টি হলো। কারণ ইতোমধ্যে কবি হিসেবে জনসমাজে বনফুলের কিঞ্চিৎ পরিচিতি ঘটেছে। 'প্রবাসী' (১৯০২), 'ভারতী' (১৮৭৭), 'পরিচারিকা'(১৮৩১), 'কল্লোল'(১৯২৩) – এসব পত্রিকায় বনফুলের কবিতা ছাপা হয়েছে। কলেজের বাঙালি ছেলেরা এবং দু-একজন শিক্ষকও বনফুলের কবিতা পড়েছেন। অনেকে যেচে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একছাত্র সোমনাথ সাহা। তিনি এসে বনফুলকে বললেন, *ঝর্ণা* নামে একটি পত্রিকা বের করতে চান। সেখানে বনফুলকে কবিতা দিতে হবে। কিছুদিন পর *ঝর্ণা* বের হলে সেখানে বনফুলের একটি কবিতা ছাপা হয়। এবার সোমনাথ সাহা বনফুলকে সুসংবাদ দিলেন–কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বনফুলের কবিতাটি পড়েছেন এবং তাঁর কবিতাটি ভালো লেগেছে। পরবর্তীকালে কবি সত্যেন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ঝর্ণা' কবিতাটি সোমনাথ সাহার *ঝর্ণা* পত্রিকাতে ছাপা হয়েছিল। তখন 'প্রবাসী'র কষ্টিপাথর বিভাগে ভালো মানের কবিতা ছাপা হতো। সেখানে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) 'বল বীর বল চীর উন্নত মম শির' কবিতাটি 'প্রবাসী'র কষ্টিপাথর বিভাগে ছাপা হয়েছিল। এই সময় বনফুলের কিছু কবিতা 'প্রবাসী'তে ছাপা হতো, কিছু অমনোনীত হয়ে ফেরত আসতো। লেখা ফেরত এলেও তাতে বনফুলের উৎসাহ কমতো না বরং বেড়েই যেত। তিনি কবিতা লিখতেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় সেসব কবিতা পাঠাতেন।

মেডিকেলে পড়ার সময় বনফুল শিশিরকুমার ভাদুড়ীর (১৮৮৯-১৯৫৯) 'সীতা' নাটকটি বেশ কয়েকবার দেখেছেন। তাঁর নাটক বনফুলকে অভিভূত করেছে। এই সময় বনফুল 'রূপকথা' নামে একটি নাটক লিখে সমরেশকে নিয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর বাসায় যান। তাঁকে না পেয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। পরে শিশিরকুমার এলে সবাই মিলে থিয়েটারে গেলেন। সেখানে শিশিরকুমার শুয়ে মনোযোগ দিয়ে বনফুলের নাটকটি শুনেন। নাটক ভালো হয়েছে, বনফুলের নাটক লেখার হাত আছে বলে তিনি তাঁকে সামাজিক বিষয় নিয়ে নাটক লেখার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু একই সময়ে বনফুলের মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ফিজিওলজির ডেমনসট্রেটার ডাক্তার চারুব্রত রায় বনফুলকে ডাক্তার হওয়ার পর নাটক লেখার পরামর্শ দেন যেন তাঁর পড়ালেখার কোনো ক্ষতি না হয়। তিনি তাঁকে বলেন –

'এখন থেকে যদি শিশিরের কাছে যাও, আর তোমার টিকিটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।'(বনফুল, ১৯৯৯: ১০৩) বনফুল তাঁর কথা রেখেছিলেন। তবে বনফুল এসময়ে হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গ-কবিতা লিখেছেন বেশি। সেগুলো 'প্রবাসী'তে ছাপা হতো। 'বিবাহের ব্যাকরণ', 'ছারপোকা' তাঁর এসময়ের কবিতা। পত্রিকায় বনফুলের 'ফরমায়েসি প্রিয়া' কবিতাটি বিজলী (১৯২০) পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

বনফুলের মেডিকেল কলেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিবদাস বসুমল্লিক। দুজন মেডিকেল জীবনের অনেকটা সময় অন্তরঙ্গতায় কাটিয়েছেন। মজার ব্যাপার বনফুলের নামের পরেই ছিল শিবদাস বসুমল্লিকের নাম কিন্তু তাঁকে বনফুল ক্লাসে কখনোই দেখেননি। তাঁর সিটটি বরাবর খালিই থাকতো। তাঁর সঙ্গে বনফুলের সাক্ষাৎ ঘটেছে নাটকীয়ভাবে। ফার্স্ট ইয়ারের শেষে একদিন জুওলজির প্র্যাকটিকেল ক্লাস শেষে বনফুল বাইরে এসে দেখেন, মাঠে একটি মোটাসোটা ছেলে তাঁর পানে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। কাছে আসতেই ছেলেটি বনফুলকে জিজ্ঞাসা করে তিনি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় কিনা। বনফুল হ্যাঁ বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি তাঁকে প্রণাম করে। বনফুল অবাক হলেন, জানতে পারলেন এই সেই শিবদাস বসুমল্লিক। শিবদাসের হাসি বনফুলকে আকৃষ্ট করেছে। বছর দুই পর তাঁদের ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়েছে। শিবদাসের চরিত্রের মহত্ত্ব ও মাধুর্য বনফুলকে এতোটাই আকৃষ্ট করলো যে, একপর্যায়ে বনফুল হোস্টেল ছেড়ে শিবদাসের বাড়িতে কিছুদিন পেয়িং গেস্ট হিসেবে থেকেছেন। এই সময় শিবদাসের পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। *পশ্চাৎপটে* তিনি তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন –

> ভণ্টুর বাবা,দাদা, মেজদা, ছোট ভাই, ভণ্টুর বউ, দিদিমা, বিশেষ করিয়া বড় বউদি, তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সকলেই আমার পরম আত্মীয় হইয়া গেল। ইহাদের সুখ দুঃখের সহিত আমি অনেকদিন যুক্ত ছিলাম। এই সবের ছাপ আমার পরবর্তীকালে রচিত উপন্যাস *জঙ্গম* বইটিতে আছে। *জঙ্গমের* ভণ্টু চরিত্রের ভিত্তি শিবদাস। যদিও তাহাতে অনেক রং লাগাইয়াছি, তাহার জীবন চরিতের সহিত শিবদাসের জীবন চরিতের অনেক অমিল আছে। তবু ভণ্টু চরিত্রের কাঠামোটা শিবদাস বসুমল্লিকেরই। তাহার পরিবারবর্গের অনেকের চিত্রও উক্ত উপন্যাসে আছে। কিন্তু সেগুলি বাস্তব কল্পনায় মেশানো চিত্র, কোনোটিই হুবহু ফটোগ্রাফ নয়। (পৃ. ১০৭)

বিপদ যখন একবার আসে তখন বারবারই আসতেই থাকে। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় বনফুলের বাবার অসুখ হলো– কলকাতার সরকার বাইলেনে বাড়ি ভাড়া করে তাঁকে এনেছেন এবং সে আমলে বড় বড় ডাক্তারকে দিয়ে দেখিয়েছেন। এরই মধ্যে বাড়িওয়ালা তাঁদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। ছয় মাস চিকিৎসা শেষে বনফুলের পরিবার অর্থসংকটে পড়েন, বনফুলের বাবারও তখন আয় বলে কিছুই ছিল না। বেলগাছিয়ার একটি বাড়ি ভাড়া পাওয়া গেলেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে থাকা সম্ভব হয়ে ওঠেনি; তাই তাঁকে সেই বাড়ি ছেড়ে শেওড়াফুলিতে ভাই **ভোলার** বাসায় থাকতে হয়েছে। এ সময় চতুর্থ ভাই গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের (টুলুর) কলেরা

হয় আর পঞ্চম ভাই নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় (কালু) ছাদ থেকে পড়ে মাথা ফাটায়। ডাক্তার ধীরেনবাবুর চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সবাই সুস্থ হলো। কিন্তু এরই মধ্যে বনফুলের পড়াশোনায় অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। বনফুলের বাবা অসুস্থ হওয়ার কারণে বনফুল প্রিলিমিনারি সায়েন্টিফিক এমবি অর্থাৎ ফার্স্টইয়ারের শেষে ঠিক সময়ে পরীক্ষা দিতে পারেননি। সে পরীক্ষায় তিনি পাস করেছিলেন ছয় মাস পর। এরই মধ্যে তিনি 'ইরেগুলার স্টুডেন্ট' হয়ে যান। তাই কলেজে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যেমন অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি বিষয়ে পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেলেন না। ফার্স্ট এমবি পরীক্ষা দিয়ে তিনি পুনরায় রেগুলার স্টুডেন্ট হলেন। বনফুল তখন শিয়ালদহ স্টেশনের রেলওয়ে কোয়াটার্সে শিবদাসের দাদার বাসায় থাকতেন। একবার পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় শিবদাস ও বনফুল শখ করে ছাদের ওপর বসে আকাশের পানে চেয়ে রাতের খাবার খেলেন। শিবদাসের বউদি পূর্ণচন্দ্রগ্রহণের সময় খাবার খেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু বনফুল বারণ শোনেননি, বউদিকে বললেন, গ্রহণ দেখতে দেখতে খাবার খাবেন তিনি। ওইদিন রাতেই শরীর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে বনফুলের। ডাক্তার দেখে বললেন, 'লোবার নিউমোনিয়া'। চিকিৎসা চলছে তারপরও অসুখ বাড়তে লাগলো। একপর্যায়ে বনফুল প্রলাপ বকতে লাগলেন। ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসায় জ্বর ভালো হতে লাগলো। কিন্তু ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় একটু অন্যরকম চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বললেন। তার মতে, পাঁজরের হাড় কেটে পুঁজ বার করে দিতে হবে। কিন্তু বনবিহারীবাবু পরামর্শ দিলেন পুঁজ বার করার মতো দুরূহ চিকিৎসা না করে সোজা মনিহারিতে গিয়ে গাছের তলায় চৌকিপাতা বিছানায় শুয়ে থাকতে এবং দুধ, ভাত আর মুরগির ঝোল, কডলিভার অয়েল – এই খাবারগুলো খেতে। বনফুলের মা তাঁর সকল প্রকার গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে বনফুলকে এইরূপ চিকিৎসাই করালেন। বনফুল মাসখানেকের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেন। কলকাতায় আসার কথা ভাবছেন, ঠিক এসময় ডাক্তার তাঁকে আরো দুই মাস মনিহারিতে বিশ্রাম নিতে বললেন। তিন মাস পর কলকাতায় এলেন বনফুল। এবার আর শিবদাসের বাড়িতে উঠলেন না। ৩ নং মির্জাপুর মেসেও সিট পেলেন না। এ সময় তাঁর সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো লেখাপড়ার, তিনমাস পিছিয়ে পড়লেন তিনি। এজন্য তাঁকে খেসারতও দিতে হলো। অ্যানাটমি বিষয় ভুলে যাওয়ার দরুন ৪০ টাকা জমা দিয়ে অ্যানাটমি বিষয়ে আবার পাঠ নিতে হলো বনফুলকে।

বনফুলের জীবনে ১৯২৩ সালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। বনফুল তখন মেডিকেল থার্ড ইয়ারের ছাত্র। ওই সময় মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ভালো থিয়েটার করতো। বাংলা এবং ইংরেজি দুই নাটকেই তারা অভিনয় করতো সহজভাবে। এমনকি স্ত্রীর চরিত্রে পুরুষরা অবলীলায় অভিনয় করতে পারতো। অ্যানাটমির সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছাত্রদের অভিনয় শেখাতেন। ছাত্ররা তাঁকে ভয় পেত। তিনি একদিন হঠাৎ এসে বনফুলকে ধরে খুব করে বললেন, থিয়েটারের জন্যে একটি ভালো ওয়েলকাম সং লিখে দিতে। এবং সেটা ছাপানো

হবে। শিক্ষকের এইরূপ কথা শুনে বনফুলের গর্বে বুক ভরে উঠলো। কারণ এই ঘটনাটির পর মেডিকেল কলেজে বনফুলের সাহিত্যিক খ্যাতি আরেকটু বেড়ে গেছে। বাঙালি শিক্ষকরাও জানতে পারলেন তাঁদের একজন ছাত্র-কবি আছে। ওয়েলকাম সং-টি নিম্নরূপ –

মরণ লইয়া ঘর করি মোরা বেদনা মোদের সাথী
আর্ত আহত আতুড় লইয়া কাটাই দিবস রাতি
তারি মাঝখানে অবসরমত আজিকার দিনটিরে
ছন্দমুখর আনন্দগানে হাসিতে ফেলেছি ফিরে
এসো গো তোমরা সবে
মুখরিত করে তোল আজিকার আনন্দ উৎসবে।
আমরা সব দেখেছি শিখেছি জীবনটা কিছু নয়
মরণের সাথে আমাদেরই হয় নিতি নব পরিচয়
জীবনের কত বেদনা ও জালা ভালো করে তাহা জানি।
তবুও আমরা অমানুষ নই–হাসির দাবীটা মানি।
এসো গো তোমরা সবে
মুখরিত করে তোল আজিকার আনন্দ উৎসবে।
আজিকার এই মধু উৎসবে অপূর্ণ যাহা আছে
তাহার লাগিয়া বিনীত মিনতি জানাই সবার কাছে
কালো যাহা আছে আলো হয়ে যাবে তোমরা চাহিলে পরে
হরষে ও গানে কানায় কানায় সকলি উঠিবে ভরে।
এসো গো তোমরা সবে
মুখরিত করে তোল আজিকার আনন্দ উৎসবে। (পৃ. ১২৭)

এ সময় আরো একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে বনফুলের জীবনে। বনফুলের বাবার কাকা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গৃহশিক্ষক ছিলেন। বনফুলের বাবা চিঠি দিয়ে বনফুলকে ঠাকুর দাদার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসতে বলেন। তিনি যথারীতি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। মহেন্দ্রনাথ তখন আশুতোষকে প্রণাম করার কথা বললেন এবং বনফুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রকাণ্ড বৈঠকখানা অনেক লোকের সমাগম। অনেক বিষয়ে কথাবার্তা চলছে। একপর্যায়ে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ নিয়ে কথা উঠলে আশুতোষ বনফুলকে দেখিয়ে বললেন, এখানে কলেজের ছাত্র আছে সে ভালো বলতে পারবে কবে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু বনফুল সঠিক জবাব দিতে না পারায় বিব্রতবোধ করলেন। আশুতোষ ওই মুহূর্তে বনফুলকে কিছু বললেন না কিন্তু বৈঠকখানায় লোকজন কমে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই অবাক হয়ে যা

বললেন, বিজ্ঞানের ছাত্র বলে কি বনফুলের ইতিহাসের জ্ঞান থাকবে না, এ কেমন কথা। ঠিক ওই সময়েই তিনি বনফুলকে তাঁর লাইব্রেরিতে বসে ঈষানচন্দ্র ঘোষের ভারতবর্ষের ইতিহাস বইটা পড়ে তারপর বাড়ি যেতে বললেন। বনফুল তাই করলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর বনফুলের সঙ্গে আশুতোষ মুখোপ্যায়ের আবার সাক্ষাৎ হয়। ফার্স্ট এমবি পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেয়া নিয়ে। সেদিন বনফুলের নেতৃত্বে ছাত্ররা হেঁটে ভিসির বাড়ি গিয়েছিল। তাদের দেখে ভিসি রসিকতা করে জানতে চাইলেন, 'আমার বাড়ীতে এতগুলো ডাক্তার কেনো? বাড়ীতে তো কারো অসুখ হয়নি।' (পৃ. ১২৯) বনফুল ভাইসচ্যান্সেলরের সামনে গিয়ে সাহস করে তাদের দাবির কথা জানালেন, তাদের কোর্সই এখন শেষ হয়নি, তার আগে কী করে তারা ফার্স্ট এমবি পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষা যেন পিছিয়ে দেয়া হয়। আশুতোষ তাদের দাবি রেখেছিলেন। পরীক্ষার তারিখ তিনমাস পিছিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বনফুলের মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় বিদেশি নোংরা সাহিত্যের নকলে এ দেশেও নোংরা সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল। এসব লেখক নিজেদের বিদেশি বলে জাহির করতো। শুধু তাই নয়, তারা নিজেদের ঢোল নিজেরাই পেটাতো। তাদের এইরকম সাহিত্য চর্চাকে বনফুল ক্লেদাক্ত সাহিত্য বলে মন্তব্য করেছেন। সজনীকান্ত দাস তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন *শনিবারের চিঠির* মাধ্যমে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, ব্রহ্মদেশ হতে যেমন ছাত্ররা আসতো পড়তে, তেমনি ওইসব জায়গা থেকে রোগীরাও আসতো। বনফুল তাঁর *পশ্চাৎপট* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ওই সময় মেডিকেল ছাত্রদের মধ্যে অনেক গায়ক, বক্তা, অভিনেতা ও চিত্রকরও ছিল। বনফুলও তাদের মধ্যে একজন এবং তিনি হলেন কবি। বনফুল যখন মেডিকেল পঞ্চম বর্ষে তখন তাদের একাডেমিক বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় পড়ার তেমন সময় ছিল না। সবসময়ই মিডওয়াইফারি বা গাইনিকোলজির বই পড়তে হতো। মাঝে মাঝে সাহিত্যচর্চা করতেন। কিন্তু কোনো সাহিত্যিক আড্ডায় যেতেন না। কাগজে লেখা পাঠিয়ে নেপথ্যে থাকাই পছন্দ করতেন। এসময় তিনি 'কল্লোল' পত্রিকায় দু-একটা লেখা পাঠিয়েছেন বটে কিন্তু কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেননি। 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন অনেক পরে যখন পরিমল গোস্বামী (১৮৭৭-১৯৭৬) সম্পাদক ছিলেন তখন। আর এরই ফাঁকে অবসর পেলে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। কখনো সঙ্গে থাকতেন পরিমল গোস্বামী, কখনো শিবদাস বসুমল্লিক, কখনো বা সমর ভট্টাচার্য। কলকাতা শহর ও কলকাতার সদা-চঞ্চল জীবনধারাকে বনফুল খুব ভালো করে অবলোকন করতেন। *জঙ্গম* উপন্যাসের উপাদান ও চরিত্রাবলী এই সময়েই তার মনের প্রচ্ছন্ন লোকে ধীরে ধীরে জড়ো হচ্ছিল।

মেডিকেল ষষ্ঠ বর্ষে পড়ার সময় হঠাৎ বনফুলের কলকাতা জীবনে ছেদ পড়ে। বিহারে নতুন মেডিকেল কলেজ চালু হয়। তাই বিহার গভর্নমেন্ট বাংলা গভর্নমেন্টে জানায়, তাদের ছাত্রদের ফেরত পাঠাতে। বনফুল ফেরত পাঠানো ছাত্রদের মধ্যে পড়ে গেলেন। অসুখের কারণে তিনি পিছিয়ে পড়েন। তাঁর ব্যাচের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে পারেননি। ছয় বছর কলকাতায় থাকার ফলে একটা মায়ার জালে পড়ে গেলেন তিনি। মনে মনে সংকল্প করলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এমবি পরীক্ষার শেষ ডিগ্রিটা নেবেন। এ লক্ষ্যে তিনি আর. জি কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে তাকে অনুরোধ করলেন তাঁর কলেজে বনফুলকে ভর্তি করিয়ে নিতে। তিনি রাজি হলেন না বরং তাঁকে উপদেশ দিলেন, তিনি যেন পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকেই প্রথম ব্যাচে এমবি পাস করেন। তাহলে তাঁর আলাদা কদর হবে। বনফুল পাটনা ইউনিভার্সিটিতেই ভর্তি হলেন।

১৯২৬ সালে পার্টনার মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে বিহার থেকে আসা ছাত্রদের সেখানে চলে যেতে হয়েছিল। পাটনা মেডিকেল কলেজ বনফুলের পছন্দ হয়নি। তবে দুজন শিক্ষকের স্মৃতি মনে গেঁথে আছে যারা তাঁর কাছে কেবল শিক্ষকই নয়, উচ্চমর্যাদার অধিকারী হিসেবে স্মরণীয়। একজন ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, আরেকজন সনৎ বরাট। এখানে এসে বনফুল প্রথম হোস্টেলে সিট না পেয়ে এক আত্মীয়ের বাসায় উঠলেন। আত্মীয়টি তাঁর বাবার বন্ধু সম্পর্কের প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো অনুকূল জ্যাঠামশাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্যাপটেন পি বি মুখার্জি, রেডিওলোজিস্ট। বনফুল তাঁকে ফণীদা বলে ডাকতেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ব্যাঙ্গালোর যাত্রা। পাটনায় আসার আগে বনফুলের ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ড করা হয়নি। ফাইনাল পরীক্ষায় বসার আগে সব ছাত্রের ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ড সম্পন্ন করতে হয় অর্থাৎ ত্রিশটি প্রসব করাতে হবে। বিহার গভর্নমেন্ট ব্যাঙ্গালোরে Victoria হাসপাতালে ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ড করার ব্যবস্থা করে দিলেন। বনফুল হাসপাতালে পৌঁছে দেখেন তাঁর সঙ্গের তিন সহযাত্রী আগে পৌঁছার কারণে তারা প্রথম প্রসব করানোর কাজ সম্পন্ন করে রেখেছেন। এখন বনফুলের পালা। ঘণ্টাখানেক পরেই তাঁর ডাক পড়লো। যথারীতি প্রবেশ করলেন তিনি। কিন্তু তাঁর পোশাক ছিল একটু ব্যতিক্রম ধরনের। প্রসব করানোর কাজ শেষ হলে মেট্রন তাকে সাহেবি পোশাক পড়ার প্রয়োজনীয়তার কথা জানালেন। বনফুল একটা খদ্দের কাপড়ের প্র্যান্টালুম বানিয়ে তার ভেতর পাঞ্জাবিটাকে ঢোকালেন আর আস্তিনটাকে গুটিয়ে দিলেন। এভাবে সাহেবি পোশাকে রূপ দিয়ে কাজ চালিয়ে নিলেন। বনফুল যখন ব্যাঙ্গালোরে ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ডে কাজ করতেন তখন সেখানকার একজন স্কটিশ নার্স বনফুলকে শ্রদ্ধা করতেন, কারণ বনফুল এবং নার্স দুজনেই নিজ নিজ দেশের কাপড় ব্যবহার করতেন। তাছাড়া সেই নার্স খবর পেলেন যে, বনফুল কবিতাও লেখেন। নার্স বনফুলের বন্ধুদের কাছ থেকে বনফুল সম্পর্কে নানা খোঁজখবর নিলেন। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে আন্তরিকতা গড়ে উঠে। একদিন তিনি বনফুলের কাছ থেকে একটি ইংরেজি কবিতা চাইলেন। বনফুল ব্যাঙ্গালোর থেকে চলে আসার

ঠিক আগমুহূর্তে একটি ইংরেজি কবিতা লিখে তাঁকে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই কবিতাটি তিনি ডানা উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। কবিতাটি নিম্নরূপ –

Evening speaks in golden clouds
Morning speaks in light
Flowers speak in scented petals
Lightning speaks in light
The manner in which they express
is simple, plain and sweet
But what we do, we human beings?
we no not how to do it.
When the heart is full and feelings melting
We try to hide and alter
When the eyes speak, the tongue denies
Words fails or falter.
I know not how to words my feelings
How to call my Muse
I wish I had the knack of Nature
To sing in light and Muse. (পৃ. ১৪৭-১৪৮)

ব্যাঙ্গালোর থেকে বনফুল সরাসরি মনিহারিতে বাবা-মায়ের কাছে চলে গেলেন। এরপরই পাটনায় গিয়ে তাঁকে ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে হবে। তাই বাবা-মাকে প্রণাম করাও মনিহারিতে যাওয়ার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। মনিহারিতে আসার কিছুদিনের মধ্যে বনফুলের বিয়ে দিলেন তাঁর বাবা-মা। বেথুন কলেজের আইএ ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী শ্রীমতী লীলাবতীর সঙ্গে। অ্যাডভোকেট শ্রী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ মেয়ে লীলাবতী। গোপালচন্দ্র প্র্যাকটিস করতেন চীন সীমান্তের কাছে মিচিনা শহরে। বিয়ের বছর ছিল ১৯২৭। তাঁর বিয়েতে বাঙালি, বিহারি, হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারি সবাই অংশগ্রহণ করেছিল। (পৃ. ১৪৯) বিয়ের পর সিদ্ধান্ত হলো লীলাবতী বেথুন হোস্টেলে ফিরে যাবেন এবং আইএ ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে আসবেন। সিদ্ধান্ত মতো লীলাবতী হোস্টেলে আর বনফুলও পাটনায় চলে গেলেন। এসময় বনফুল লীলাবতীকে উদ্দেশ্য করে অনেক প্রেমের কবিতা এবং প্রেমপত্র

লিখেছিলেন। লীলাবতী চিঠিগুলোকে বাক্সবন্দি করে রেখেছিলেন – অনেক পরে বনফুল সেগুলো থেকে বাছাই করে কয়েকটি *কষ্টিপাথর* (১৯৫১) নামে একটি উপন্যাস লিখেন আর প্রেমের কবিতাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল *উত্তরা* পত্রিকায়, পরে *সুরসপ্তক* গ্রন্থে (১৯৭১) সংকলিত হয়।

পাটনা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডটন সাহেবকে বনফুল ব্যাঙ্গালোরে ৪৫টি ডেলিভারি কেস করার সার্টিফিকেট দেখালেন। এর কিছুদিন পর ডটন সাহেব বনফুলকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে বললেন, কলকাতা থেকে রিপোর্ট এসেছে – বনফুলের Mental Disease-এর ward করা হয়নি। কিন্তু বনফুল Mental Disease-এর সব ক্লাসই করেছেন বলে দাবি করছেন। এ অবস্থায় প্রিন্সিপাল ডটন বনফুলকে পরামর্শ দিলেন কলকাতায় গিয়ে সংশোধন করে আনতে। ৫০ টাকা বাড়তি মাশুল দিয়ে রিপোর্ট সংশোধন করে আনেন বনফুল। পরে তিনি পাটনায় ফিরে গিয়ে ডটন সাহেবকে সঠিক রিপোর্ট দেখালেন। তিনি ফাইনাল পরীক্ষার্থীরূপে বনফুলকে মনোনীত করে যথাস্থানে তাঁর নাম পাঠিয়ে দেন। বনফুল Final M.B.B.S পরীক্ষায় অংশ নেন। পরীক্ষার ফল কবে বের হবে সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে বাড়িতে গেলেন। বনফুলের জীবনে এবার রঙিন হলো। বাড়িতে নববধূ লীলা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। বনফুল তাঁর *পশ্চাৎপট* এ স্ত্রী লীলা সম্পর্কে লিখেছেন–

> সে আমার জন্যে কলেজ কামাই করিয়া বসিয়াছিল। তাহার পর আমার জীবনে নতুন রং লাগিল। আমার সাহিত্যেও নতুন মোড় ঘুরিল। লীলা হোস্টেলে চলিয়া গেল। প্রেমপত্র ও প্রেমের কবিতা লিখতে শুরু করলাম। পরিমল তাহার স্মৃতিচারণে লিখিয়াছে যে এই সময়টা আমি সাহিত্যচর্চা হইতে বিরত ছিলাম। মোটেই বিরত ছিলাম না। কিন্তু যে সাহিত্য আমি তখন রচনা করিয়াছিলাম তাহা মাসিকপত্রে প্রকাশযোগ্য ছিল না। তাহা লীলার নিকট প্রেরিত এবং সে তাহা বাক্স বন্দি করিয়া রাখিয়া দিত। এই চিঠিগুলির কয়েকটি পরে আমি কিছু পরিবর্তন করিয়া আমার *কষ্টিপাথর* উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছিলাম। প্রেমের কবিতাগুলি অনেকদিন পর সুরেশ তাহার 'উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিল এবং আমি সেইগুলি সুরসপ্তক পুস্তকে সংকলন করিয়াছি। (পৃ. ১৫২)

পরীক্ষা পাসের পর যত দ্রুত সম্ভব চাকরিতে যোগদানের জন্য সাধারণত মানুষ মুখিয়ে থাকে। ডাক্তারি পরীক্ষা পাস করার পরপরই বনফুলেরও পাটনা মেডিকেল কলেজে জুনিয়র হাউস সার্জন হিসেবে যোগদানের সুযোগ হলো। কিন্তু তাঁর পক্ষে সেই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হলো না। এর পেছনে যে ঘটনাটি ক্রিয়াশীল ছিল তা বনফুলের জন্য হিতকরই ছিল। বনফুল যখন হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেটের সঙ্গে দেখা করলেন তখন তিনি তাঁকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাবেন বলে বসতে দিয়ে ফাইল সই করছিলেন। এ সময় তিনি বনফুলকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, বনফুল এখানকার নিয়মকানুন জানেন না তখন তিনি তাঁকে একটি টাইপ-করা কাগজ দিলেন। বনফুল কাগজটি পড়ে দেখলেন তাতে লেখা ছিল – 'Whenever a junior officer or a student meets his superior he must show him respect by touching his forehead with his palm' লেখাটি পড়ামাত্রই বনফুল ডেপুটি সাহেবকে

Good bye বলে পাটনা স্টেশনের দিকে রওনা হলেন। (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ৩৮) তিনি ওয়েটিং রুমে বসে ভাবলেন, জেনারেল প্র্যাকটিশনার হলে রাতে সময় পাবেন না; কিন্তু যদি তিনি Pathology-তে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে বড় কোনো শহরে ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিস করেন তাহলে তিনি রাতের সময়টা পাবেন সাহিত্যচর্চার জন্য। তার এই ভাবনার কথা চিঠিতে তাঁর বাবাকে জানালেন। বাবা উত্তর পাঠালেন, কারো অধীনে ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিতে স্পেশাল ট্রেনিং নিতে এবং মাসে মাসে তিনি এর খরচও চালাবেন। বনফুলের বাবা ছিলেন এমন ব্যক্তি যিনি কখনো বনফুলকে তাঁর নিজের মনের বিরুদ্ধে কিছু করতে বলতেন না। ফলে বনফুল সেই পথেই হাটলেন, গেলেন চারুব্রত রায়ের কাছে। প্রথমে তিনি রাজি না হলেও পরে রাজি হলেন শর্ত আরোপ করে। তাঁর শর্ত ছিল, এক বছর কাজ শিখতে হবে, ল্যাবরেটরির সব যন্ত্রপাতি কিনতে হবে এবং কাজ শেখা হয়ে গেলে কলকাতার বদলে মফস্বলের শহরে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। বনফুল যন্ত্রপাতি কিনে ডক্টর চারুব্রত রায়ের কাছে কাজ শিখতে শুরু করলেন। রায়ও যত্ন করে তাঁকে কাজ শেখালেন। কাজ শিখতে শিখতে একবছর কেটে গেলো। ডাক্তার রায় তাঁকে বললেন, তাঁর আর কলকাতায় থাকার দরকার নেই। এক বছরে যা শিখেছে, তা যেন কোনো মফস্বলের হাসপাতালে গিয়ে প্র্যাকটিস করে। ১৯২৮ সালের কথা, বনফুল মেসে ফিরেই সেদিনের স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপন দেখে আজিমগঞ্জে মিউনিসিপ্যালিটির হাসপাতালে আবেদন করলেন, আবেদন মঞ্জুর হয়। বেতন ৮০ টাকা, কোয়ার্টারও ফ্রি, প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুযোগ আছে।

বনফুল ১৯২৮ সালেই আজিমগঞ্জ হাসপাতালে যোগদান করেন। তিনি গুরু চারুব্রত রায়ের একটি ছবি সাথে করে আনেন। আজিমগঞ্জে তাঁর নতুন সংসার শুরু হলো। সব আত্মীয়স্বজনের আনাগোনা হতে লাগলো তাঁর বাসায়। একবার মহামারী আকারে কলেরা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি রাতদিন নিরলস সেবা দিয়ে অনেক রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। পাশাপাশি অনেক সুনামও অর্জন করলেন। কিন্তু হাসপাতালের রাজনীতির বিষয়টি তাঁর একদমই ভালো লাগছিল না। মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতার রাজনীতিতে দলাদলি, চক্রান্ত সারাক্ষণ লেগেই থাকতো। বনফুলকে রাজনীতিতে আনার চেষ্টা চলছিল দুই পক্ষের রাজনীতিক দলের। বনফুল কোনো দলেই যোগ দিতে চাইলেন না। ফলে উভয় দলের বিরাগভাজন হলেন। এ অবস্থায় বনফুল সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি আজিমগঞ্জ ছেড়ে চলে যাবেন। বনফুলের বাবা তখন তাঁর বাসায় ছিলেন। তিনি ছিলেন অসুস্থ। বনফুলের পোষা কুকুরকে রেল লাইন থেকে বাচাঁতে গিয়ে তিনি নিজেই রেলে চাপা পড়ে আহত হলেন। তাই বাবা সুস্থ হলেই তিনি আজিমগঞ্জের হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবেন বলে মনস্থির করলেন। তাঁর ভাবনা ছিল ভাগলপুরের মতো বড় শহরে গিয়ে প্র্যাকটিস করলে আরো ভালো হবে। মনিহারির কাছেই ভাগলপুর। সেখানকার বড় বড় ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ল্যাবরেটরি খুলবেন। *নির্মোক*

(১৯৪০) উপন্যাসে বনফুল এই আজিমগঞ্জের মানুষ ও হাসপাতালের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। এখানেই বনফুলের প্রথম কন্যাসন্তান কেয়ার জন্ম হয় (১৯২৯)। এই জায়গাটিতে বনফুল বছরখানেক ছিলেন।

আজিমগঞ্জের মিউনিসিপ্যালিটির হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে ১৯২৯ সালে বনফুল ভাগলপুরে আসেন এবং ছিলেন ১৯৬৮ সালের জুন পর্যন্ত। এখানে বনফুলের প্রায় চল্লিশ বছর কেটেছে। এবং এখানেই তার সাহিত্য জীবনের প্রাচুর্যতা এসেছে। স্বাধীনভাবে প্যাথলজিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন, এই আশায় তিনি ভাগলপুরে এসে পরিকল্পনা মতোই কাজ আরম্ভ করেন। তিনি প্রথম দেখা করেন ডাক্তার মোহিনী মোহন ঘোষের সঙ্গে। তাঁর বিশাল প্র্যাকটিস। তিনি বনফুলকে ভাগলপুরে ক্লিনিকেল ল্যাবরেটরি খোলার জন্য উৎসাহ দিলেন এবং সহযোগিতারও আশ্বাস দিলেন। বনফুল খলিফাবাগে Sero-bactro নামে ক্লিনিক খুললেন। তাঁর ল্যাবরেটরিতে তিনি চারুব্রত রায়ের ফটো টানিয়ে দিলেন। বনফুলের আরো একটি সুবিধা ছিল। তাঁর ভাই ভোলানাথ তখন ভাগলপুর সদর হাসপাতালের সেকেন্ড মেডিকেল অফিসার ছিলেন। তিনি ভোলার কোয়াটার্সে গিয়ে উঠলেন। কিছুদিন পর ভোলার চাকরি চলে যায় কারণ এক সাহেব এসে সেকেন্ড মেডিকেল অফিসারের পদটি বাতিল করে দেয়। বনফুলকে তখন ভাড়া বাসায় গিয়ে উঠতে হয়েছে। তাঁর বাসাতে তখন থাকতো স্ত্রী লীলা, ভোলা, ছোট ভাই, মামাতো ভাই – এরা কলেজে পড়তো। আর থাকতো কনিষ্ঠ ভাই টুলু, সে স্কুলে পড়তো – সবার ভরণপোষণের ভার ছিল বনফুলের ওপর।

ইংরেজি বই পড়ার লোভে বনফুল ভাগলপুর ইনস্টিটিউট নামে একটি ক্লাবের মেম্বার হলেন। শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায় তাঁকে মেম্বার করিয়ে দিলেন। রোজ তাঁর সঙ্গে বনফুলের ক্লাবে দেখা হতো। একদিন বনফুলের ল্যাবরেটরিতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন। তিনি বরারীর ডাক্তার ভূবনবাবু, এসেছেন ইউরিন পরীক্ষা করাতে। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার একপর্যায়ে বনফুল জানতে পারলেন তিনি সৎ এবং কর্মক্ষম একজন ডাক্তার খুঁজছেন। তাঁকে দায়িত্বভার দিয়ে তিনি অবসরে যাবেন। বনফুল ভোলার কথা বলাতে ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন। বরারীতে এক জমিদারের হাসপাতালে ভোলার চাকরি হয়ে গেলো। আর ভদ্রলোক অবসরে গেলেন। এরই মধ্যে বিদ্বৎ সমাজে বনফুলেরও পরিচয় ঘটলো। ভাগলপুরের ভিখনপুরে বনফুলের ভাড়া বাসাটি ছিল। সেখান থেকে ল্যাবরেটরির পথের দূরত্ব বেশি হওয়ায় বনফুল আবার বরারীতে ভোলার কোয়াটার্সে গিয়ে উঠলেন। সেখান থেকে বনফুলকে ডেলি-প্যাসেনজারি করতে হতো। এ সময়ে বনফুল প্যারোডি রচনায়ও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। সামান্য বিষয় নিয়েও তিনি চমৎকার প্যারোডি রচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না' গানটির অবলম্বনে বনফুল তাঁর সুন্দর একটি ফাউন্টের পেন নিয়ে প্যারোডি লিখেন–

পেনখানি মোর হাতের মুঠোয় রইল না

সেই যে আমার নানা রঙের পেনগুলি
মোর আঙুলের চাপ যে তারা সইল না
সেই যে আমার নানা রঙের পেনগুলি। (বনফুল, ১৯৯৯: ১৭৭)

একসময় ডেলি-প্যাসেনজারি করা কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। এ পরিস্থিতিতে বনফুল একটি ফোর্থহ্যান্ড মোটর কিনলেন। তাতেও সুবিধা করে উঠতে না পেরে বনফুল ভাগলপুরে ফিরে এলেন এবং মোশাকচকে বাসা ভাড়া নিলেন। এবার বনফুল নতুন গাড়ি কেনেন। বাড়িতে পৌঁছতে হলে খোলা-খাটাপায়খানা পার হয়ে যেতে হতো। বনফুলের মা বাসাটি ছেড়ে দিতে বললেন। কিন্তু স্ত্রী দ্বিতীয়বারের মতো আসন্ন প্রসবা হওয়ায় কিছুদিন বাড়িতে থাকতে হলো। প্রথম ছেলে ও দ্বিতীয় সন্তান অসীমের জন্ম হলো। বনফুল অসীমের প্রসব করালেন নির্বিঘ্নে। ছেলের বয়স যখন ২১ দিন তখন বনফুল মোশাকচকের বাড়িটি ছেড়ে দিলেন। লায়াল রোডে উকিল ধীরেন সেনের বাড়িতে উঠলেন। এ বাড়ির সমস্যা হলো প্রচণ্ড গরম হাওয়া। তাই কিছুদিন পর এ বাড়িটিও ছেড়ে বনফুল ধীরেন সেনের পুরাতন আরেকটি বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। এ বাড়ির বারান্দায় বনফুল তাঁর ল্যাবরেটরি তুলে আনলেন। এ সময় বনফুলের লেখার চেয়ে পড়ার কাজটা বেশি হতো। ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ছিল। সেখান থেকে বনফুল সাহিত্যের বই এনে পড়তেন। মনে লেখার নানা উপকরণ সংগৃহীত হতে লাগলো। লেখার কাজটা কম হচ্ছিলো। কারণ প্রকাশককে লেখা দেয়ার কোনো রকম তাগাদা ছিল না। এসময় বনফুলের বন্ধু পরিমল গোস্বামীর বনফুলের বাসায় আসা যাওয়া চলতো। বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে পরিমল নিত্য খোঁজখবর রাখতেন। একবার এসে বনফুলকে বলেন, সজনীকান্ত দাস 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি নিচ্ছে। তিনি 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার ভার কাঁধে নিলেন। 'শনিবারের চিঠি' (১৯২৪) সম্পাদনার ভার ন্যাস্ত হলো পরিমল গোস্বামীর ওপর। এবার লেখার তাগাদা পেলেন বনফুল। তিনি নিয়মিত লিখছেন বিশেষ করে ব্যঙ্গ-কবিতা এবং প্রতি মাসেই সেসব প্রকাশিত হতে লাগলো শনিবারের চিঠিতে। ব্যঙ্গ কবিতার জন্য অনেক বাহবা পেলেন বনফুল। এসময় বনফুলের আরো একজনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্তপ্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত, পেশায় ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। তিনি ভোজনরসিকও বটে। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র প্রদ্যোৎকুমার রবীন্দ্রনাথের বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি ভাগলপুরে এলে সার্কিট হাউসে উঠতেন এবং বনফুলসহ অনেককেই সেখানে নিমন্ত্রণ করতেন এবং বনফুলের বাড়িতেও ভোজ হতো। তাঁর একজন রন্ধনবিশারদ ছিল, তার কাছ থেকেই বনফুল Mutton Roast, English Roast-এর রেসিপি শিখেছিলেন।

বনফুলের জীবনের অতীব দুঃখের ঘটনা ঘটে ১৯৩৪ সালে, যা মুহূর্তের মধ্যে বনফুলকে নিঃস্ব করে দিলো বিহারে প্রলয়ংকর ভূমিকম্প –

বেলা দুইটা পনেরো মিনিট। ১৫ জানুয়ারি...যে টেবিলটার উপর লিখিতেছিলাম সেই টেবিলটার আর এক প্রান্তে আমার Centrifugal Machine-টা ঘুরিতেছিল। ...আমার মনে হইল Centrifugal যন্ত্রটাই বোধহয় গোলমাল করিতেছে। ... বুঝিলাম ভূমিকম্প হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলাম। রাস্তায় বাহির হইয়াই খেয়াল হইল, লীলা হয়ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া খিড়কির দরজার দিকে গেলাম। দেখিলাম অসীমকে কোলে লইয়া লীলা বাহির হইয়া আসিতেছে। সেই ধোপানিটা তাহাকে ঘুমাইতে দেয় নাই। কেয়াও পাশের বাড়ি হইতে ছুটিয়া চলিয়া আসিল। ... চারদিকে একটা শব্দ উঠিল – যেন মোটরলরি আসিতেছে। ধুলায় চতুর্দিক ভরিয়া গেল। আমার বাড়িটাও আমার চোখের সামনে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া গেল। (বনফুল, ১৯৯৯: ১৮৯)

বলাবাহুল্য, বনফুলের তখন মাত্র আড়াই টাকা সম্বল ছিল। কিন্তু মনোবল ছিল অটুট আর দৃঢ়। এসময় তাঁর জীবনে একটি কাকতালীয় ঘটনা ঘটে। বনফুল যখন তাঁর ল্যাবরেটরির সব যন্ত্রপাতি (ভগ্নস্তূপ থেকে উদ্ধার করা) ডাক্তার অমূল্যবাবুর বাসায় রেখে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। রিকশাওয়ালা যন্ত্রপাতি তুলছিল আর বনফুল একটি কালভার্টের ওপর বসেছিলেন। এমন সময় প্রায় উলঙ্গ একজন মাতাল টলতে টলতে বনফুলের কাছে এসে দুটি টাকা চাইলেন। বনফুল টাকা দিতে পারলেন না, কারণ দুই টাকা কুলি আর আটআনা দিয়ে এক্কা গাড়ির ভাড়া দেবেন। এ হিসাব শোনার পর মাতাল লোকটি বনফুলকে বললেন, যদি বনফুলের কাছে বেশি টাকা থাকতো তাহলে কি তিনি তাকে টাকা দিতেন? জবাবে তিনি বললেন, নিশ্চয়ই দিতেন। তখন উলঙ্গ লোকটি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, একটু পরে বনফুল বত্রিশ টাকা পাবেন। সত্যি সত্যি তাই ঘটল। রক্ত পরীক্ষা করতে দুজন লোক এলেন বনফুলের কাছে। রীতিমতো জোর করে রক্ত দিয়ে বলে গেলেন বরফে রক্ত রেখে দিতে, পরে করলেও হবে। যাবার সময় বত্রিশ টাকা জোর করে দিয়ে গেলেন। যদিও বনফুল তাদের সপ্তাহখানেক পরে আসতে বলেছিলেন। কারণ তাঁর ল্যাবরেটরি এখন ভগ্নস্তূপের ভেতর। যন্ত্রপাতি এখনো জায়গা মতো বসাতে পারেননি। টাকা পাওয়া মাত্রই বনফুল মাতাল লোকটিকে খোঁজ করলেন কিন্তু তাকে পেলেন না। এমন ঘটনা বনফুলের জীবনে অনেক ঘটেছে।

আপাতত, অমূল্যবাবুর বাড়িতে বনফুল তাঁর ল্যাবরেটরির কাজ আরম্ভ করলেন। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন উকিল ও কংগ্রেসকর্মী প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব পটলবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো তাঁর। তিনি একমাসের মধ্যে মীরদুল্লা লেনে বনফুলের ল্যাবরেটরি তৈরি করে দিলেন এবং দুটি ঘর ও একটি বারান্দা সংবলিত ছোট একটি বাড়িও বানিয়ে দিলেন। মনিহারি থেকে পরিবারকে নিয়ে এলেন তিনি। এসময় বনফুল হাস্য ও ব্যঙ্গরসের কবিতা লিখতেন। পাশাপাশি তিনি কিছু গুরুগম্ভীর লেখাও লিখেছেন। *তৃণখণ্ড* তাঁর এসময়ের রচনা। উপন্যাসটি তিনি পরিমল গোস্বামীকে দিয়েছেন। কিন্তু পরিমল লেখাটি ফেরত দিলেন। কারণ শনিবারের চিঠির জন্য তিনি কেবল ব্যঙ্গ লেখাই চাচ্ছেন বনফুলের কাছ থেকে। এরই মধ্যে বনফুল একবার কলকাতায় গেলেন। তখন শনিবারের চিঠির অফিসেও

তাঁর বেশ কয়েকবার যাওয়া-আসা হয়েছে। সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে তাঁর আলাপ এবং অন্তরঙ্গতা হলো। বনফুলের কাকাবাবুর ছাত্র ইঞ্জিনিয়ার কপিল ভট্টাচার্য একসময় সাহিত্যচর্চাও করতেন। তিনি এসময় হঠাৎ বনফুলের বাসায় এসে হাজির হলেন। হাতে করে বনফুলের অনেক ছাপানো লেখা নিয়ে এলেন। সেসব লেখা দেখিয়ে বললেন, এতো ভালো ভালো লেখা, লেখাগুলো ভালো ছাপা হওয়া প্রয়োজন। এই বলে তিনি বনফুলের কাছ থেকে লেখা চাইলেন। সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে তিনি পার্টনারে পত্রিকা বের করবেন জানালেন। বনফুল তখন তৃণখণ্ড উপন্যাসটি তাঁকে দিলেন। পাণ্ডুলিপিটি কপিলের বেশ পছন্দ হয়েছে। তিনি সেটি ছাপাতে চান। খুশি হয়ে বনফুলকে একশ টাকা দিলেন তিনি। এ ঘটনায় বনফুল যারপরনাই খুশি হলেন। এরপর থেকেই বিভিন্ন প্রকাশকের কাছ থেকে বনফুলের লেখা ছাপানোর প্রস্তাব আসতে থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন সাহিত্য সভার নিমন্ত্রণও আসতে থাকে। ভাগলপুরের বিদ্বৎ সমাজের সঙ্গে বনফুলের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এসময় পাটনা কলেজ থেকে বনফুল সাহিত্য সভার নিমন্ত্রণ পান। বনফুলের সঙ্গে নিমন্ত্রণ পেলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৭১), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১৮৯৪-১৯৮৭), পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৭৬), সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬০) প্রমুখ। এদিকে 'শনি-রঞ্জন প্রেস' থেকে বনফুলের কবিতা ও তৃণখণ্ড ছাপা হচ্ছিলো। সজনীকান্ত দাসের কাছ থেকে বনফুল তাঁর গল্পের ফাইল সংগ্রহ করে হরিদাসকে দিলেন ছাপানোর জন্য।

প্রথম বই *বনফুলের গল্প* বের হলো ১৯৩৬ সালে। একই বছরে *বনফুলের কবিতা* এরপর উপন্যাস *তৃণখণ্ড* (১৯৩৬)ও *বৈতরণী তীরে*(১৯৩৬) প্রকাশিত হয়। এর আগে 'ভারতী' পত্রিকায় বনফুলের রাত্রি উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে। সজনী বনফুলকে বারবার চিঠি দিয়ে তাগাদা দিচ্ছিলেন আরো একটি উপন্যাস লেখার জন্য। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর পত্রিকার জন্য লেখা চাইলেন। 'আনন্দবাজার'(১৯২২) পত্রিকার সুরেশ মজুমদারও দোল ও পূজা সংখ্যার জন্য লেখার কথা বললেন। সজনীকান্ত দাসের বারবার তাগাদার পরিপ্রেক্ষিতে বনফুল একটি বড় গল্প লিখলেন। গল্পটি যেদিন শেষ হলো সেদিন পটলবাবু বনফুলের কাছে এলেন। এ সুযোগে বনফুল তাঁকে গল্পটি দেখালেন। তিনি পরামর্শ দিলেন এতে উপন্যাসের মাল-মসলা আছে, এটিকে আরো বড় করা হোক। পরে গল্পটি *দ্বৈরথ* (১৯৩৯) উপন্যাসে রূপান্তরিত হলো। *দ্বৈরথ* নামকরণটি করেছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আর হরিদাসবাবু উপন্যাসটি ছাপানোর জন্য 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন। এবার বনফুল পূর্ণ উদ্যমে উপন্যাস লেখায় মনোনিবেশ করেন। এরপর তিনি *বৈতরণী তীরে* লিখেন। উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ফলে বনফুলের লেখার গতি আরো বেড়ে যায়। বনফুলের বন্ধুবর অমূল্যকৃষ্ণ রায় এবং ভাগলপুরের প্রখ্যাত উকিল শ্রীরঞ্জিতকুমার সিংহের যৌথ উদ্যোগে এসময় ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

ভবন নির্মিত হয়। বনফুল এ পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। বনফুল যতদিন ভাগলপুরে ছিলেন, ততদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ভাগলপুরের টিএন জুবিলি কলেছ, মাড়োয়ারি কলেজে প্রতি বছর যেসব সাহিত্যিক সভা হতো, সেসব সভায় বনফুলকেই বারবার ডাকা হতো। বনফুল বাইরে থেকে সাহিত্যিক এনে সভাপতিত্ব করার প্রস্তাব দেন তাদেরকে। এই সময় অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা হয়েছে –

> যেসব সাহিত্যিকেরা আমার নিমন্ত্রণে আসিতেন, সাধারণত আমারই বাড়িতে তাঁহারা আতিথ্যগ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের সহিত একটা অন্তরঙ্গতা হইয়া যাইত। এইরূপে তদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যের নামজাদা সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার ভাব হইয়া গেল। আমি নিজের ঘরে বসিয়াই তাঁহাদের আপনজন হইয়া গেলাম। তাঁহাদের আড্ডায় যাইবার কোনো প্রয়োজন হইত না। কলকাতায় যখন আসিতাম, তখন সজনীর বাড়িতে কিংবা হোটেলে উঠিতাম। সেজন্যে সাহিত্যের বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর সহিত যুক্ত হইবার প্রয়োজন হয় নাই। শনিবারের চিঠিতে অনেক লিখিয়াছি, কিন্তু শনিবারের চিঠির দলভুক্ত ঠিক ছিলাম না। আমি সেখানে লেখকমাত্র ছিলাম। সে-কাগজের নীতি নিয়ন্ত্রণে আমি কোন দিন অংশগ্রহণ করি নাই। তবে সজনীকান্তের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সজনীর ব্যক্তিত্ব প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল আমাকে। সে আমার প্রকৃত হিতৈষী ছিল। ক্রমশঃ সে আমার ঘরের লোক হইয়া উঠিয়াছিল। (বনফুল, ১৯৯৯: ২০০)

বনফুল রবীন্দ্রনাথকে তাঁর লেখা দেখাতেন। রবীন্দ্রনাথ বনফুলের গল্প সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা নিম্নরূপ:

> তোমার ছোট গল্পগুলিও পড়ে দেখলুম--কাঁচায় পাকায় মিশেল। বাছাই করার দরকার ছিল--গোলে হরি বোলে হরিবোল আছে কিন্তু গোলের উৎপাত ক্ষতিগ্রস্ত। "টাইফয়েড" গল্পটি ভালো বোধ হয় *তৃণখণ্ড* থেকে এক অংশ ছিটকে পড়েছে। তুমি ডাক্তার নাকি। মুস্কিল এই, ভালো বলতে বলতে মাঝে মাঝে হুঁচট খেতে হয়। বনফুলেন কবিতা সম্বন্ধেও ওই একই রকম কথা। যদি বাহুল্যের বেগ সামলিয়ে হেঁকে দিতে পারতে তাহলে ভোজটা জমতো ভালোই। ...-কেননা সাচ্চা জিনিষ আছে যথেষ্ট, কিন্তু বহুলের ভিড়ে সে যথেষ্ট অসম্মানিত। কোনও কোনও রচনাকে ষোল ভাগ ভালো বলতে পারা যায় না বলে মনে ক্ষোভ হয়-কেননা আর একটু হলেই বলা যেতে পারত। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ ।(প্রশান্তকুমার, ২০০০: ৪৯)

একই বছর বনফুলের তিনটি বই বের হয়, একটি *বনফুলের আরও গল্প* (১৯৩৮), আর দুটি নাটক *মন্ত্রমুগ্ধ* (১৯৩৮) ও *রূপান্তর* (১৯৩৮)। এই বছরই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বনফুলের প্রথম যোগাযোগ হয়েছিল। এর পেছনে একটি ঘটনা আছে। রবীন্দ্রভক্ত বনফুল তাঁর একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছিলেন। কালীঘাটে পশুবলি বন্ধ করার জন্য রামচন্দ্র শর্মা নামের এক যুবক অনশন শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন, আর এ কারণে বনফুল চটে ছিলেন। বনফুল তাঁর কবিতায় যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন,'রবীন্দ্রনাথ ছাগ শিশুর প্রতি করুণা প্রকাশ করেছেন কিন্তু ফুলের তোড়া গড়তে যে জীবন্ত ফুল তুলে আনা হয়, তসর গরদের জামা পরতে যে লক্ষ কীটকে নৃশংসভাবে মেরে ফেলা হয়, আলতা পরবার জন্যে যে কত কোটি

প্রাণী প্রাণ দেয় তাঁর কথা কবি ভাবেননি কেন।' (পৃ. ৫৫) এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জীবনে প্রথমবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বনফুলের সাক্ষাৎ ঘটে সপরিবারে তাঁর বাড়িতে।

বনফুলের *মানুষের মন* (১৯৩৯) গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে বকশিশ দিতে চাইলে বনফুল বকশিশের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরনো জামা চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পুরনো জামা দিতে একদমই রাজি হলেন না। তখন বনফুল অনেকটা অভিমান করে বললেন, তবে তাঁর কিছু চাওয়ার নেই। এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হলেন বনফুলকে পুরনো জামা দিতে। তিনি পুলিন্দায় লিখে দিলেন –

> আমার এই অনেক দিনের সাজ, অতীতে যা ছিল আদৃত এবং বর্তমানে যা বর্জিত সেটি কল্যাণীয় বলাইকে দান করা গেলো। এরকম দানে দাতারও সম্মান নেই, গ্রহীতারও। নিজের মান রক্ষা অগ্রাহ্য করে অনুরোধ রক্ষাই স্বীকার করেছি, এই মানই আমার কৈফিয়ৎ।
>
> ১২ই জানুয়ারি, ১৯৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (পৃ. ৬০)

বনফুলের ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় দুটি উপন্যাস *নির্মোক* ও *মৃগয়া*, অঙ্গারপর্ণী নামে কবিতাসংগ্রহ, *চতুর্দশী* নামে ছোট কাব্যগ্রন্থ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী নাটক *শ্রীমধুসূদন*। বনফুল ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা ছিল আন্তরিক। এ সময় বনফুল রবীন্দ্রনাথকে লেখা পাঠাতেন, রবীন্দ্রনাথ সেসব লেখা পড়তেন। কখনো কখনো বনফুলের সঙ্গে বসে তা নিয়ে আলাপ করতেন। শান্তিনিকেতনে প্রথম বার রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে বলেছিলেন – "তোমাকে একটি গল্পের প্লট দেবো তুমিই ঠিক পারবে। ভেবে দেখলুম আমার পক্ষে গল্প লেখা অশোভন হবে। তুমি ওটাকে নিয়ে লেখ দিকি। তোমার হাতেই ওটা ওতরাবে।" (পৃ. ৬২) রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে প্লটটি পাঠিয়ে দেন বনফুলকে। বনফুল সেই প্লটটাকে *নির্মোক* উপন্যাসে রূপ দেন। এসময়ে বনফুল নতুন এক ধরনের লেখায় হাত দিলেন সেটি হলো জীবনী নাটক। *শ্রীমধুসূদন* নাটকটি ১ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিলো। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বনফুলের অনেক আলোচনা হয়েছে, বনফুল তাঁর রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট-এর দুটি ভাগ কৃষ্ণা ও শুক্লা, অমাবস্যা আর পূর্ণিমা। প্রেমের কবিতার দুটি ভাগ একটি বিষাদের, অন্যটি আনন্দের এবং উভয় অংশেই চোদ্দটি সনেট।

'আনন্দবাজার' (১৯২২), 'যুগান্তর'(১৯০৬) 'ভারতী', 'অলকা', 'সচিত্র' (১৮৫১) প্রভৃতি কাগজে বনফুলের গল্প প্রকাশিত হচ্ছিলো। বনফুল নিয়মিত লেখক ছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার। *দ্বৈরথ* উপন্যাসটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুস্তক আকারে উপন্যাসটি বের হয় ১৯৩৯ সালে। বনফুল *দ্বৈরথ* উপন্যাসটিকে চিত্ররূপ দিয়েছেন সিনেমার গল্প নামে। বোম্বের এক ফিল্ম কোম্পানি উপন্যাসটির চিত্রস্বত্ব ছয় হাজার টাকার বিনিময়ে কিনে নেয় এবং

অগ্রিম পাঁচশ টাকা সেজন্য দিয়েও যায় এই শর্তে যে, চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে উপন্যাসটির অদল-বদল করা যাবে। একই বছর তাঁর *কিছুক্ষণ* উপন্যাসটিও প্রকাশিত হয়। তিনি *পশ্চাৎপটে* উল্লেখ করেছেন– "এই সময়ে আমার মনে যেন প্রেরণার একটা জোয়ার আসিয়াছিল।" (বনফুল, ১৯৯৯: ২০২) এই সময় তাঁর *নির্মোক* উপন্যাসটি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হচ্ছিলো। তখন গার্লস কলেজে সন্ধ্যার পর বনফুল বাংলা পড়াতেন। সেখানে যোগীন্দ্রনাথ বসুর লেখা মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী পাঠ্য ছিল। পড়াতে গিয়ে বনফুল দেখলেন সেখানে মধুসূদন দত্তকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। বিষয়টি তাঁকে ভাবালো। এই ভাবনা থেকেই বনফুলের *শ্রী মধুসূদন* জীবনী নাটকের (১৯৪০) অঙ্কুরোদগমন হলো। *মৃগয়া* ও *নির্মোক* উপন্যাস দুটিও প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। ১৯৪১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আরেকটি জীবনী নাটক *বিদ্যাসাগর* ও *রাত্রি* উপন্যাস বের হয়।

এরই মধ্যে শুরু হয়ে যায় বিশ্ব রাজনীতির মারপ্যাঁচের লড়াই। ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস তখন আইন অমান্য আন্দোলন করছে। সাহিত্যিক-রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবী সবাই সাধারণ মানুষকে পুঁজি করে রাজনীতি-রাজনীতি খেলায় মত্ত। কেউ বা রাজনীতির মুখোশধারী কেউ বা রাজনীতি সচেতন মানুষ। তবে বনফুল প্রকাশ্যভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তথাপি রাজনীতির খবরাখবর তাঁর মনকে বিচলিত করতো। রাজনীতির প্রভাবে তাঁর মন আচ্ছন্ন থাকতো। তিনি কংগ্রেসপন্থী ছিলেন –

> মহাত্মা গান্ধীর উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল, তবু সে সময় খুব বড় আঘাত পাইয়াছিলাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইলেন। তখন, কেমন যেন আবছাভাবে মনে হইল, মহাত্মাগান্ধী একটি অবাঙালি দলের নেতা এবং সে দলে বাঙালিদের প্রভুত্ব চলিবে না। গান্ধীজির এই দলটিই পরে ভারতকে দুই ভাগ করিয়া পরে ইংরেজদের নিকট হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা লইয়াছিলেন। এই দলই পরে গদিতে বসিয়া সীতারাম পট্টভিকে দিয়া যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখাইয়াছেন, তাহাতে বাঙালী শহীদদের সম্মানের স্থান নাই।...দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় তখন মনটা আচ্ছন্ন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নেতাজির প্রতি কংগ্রেসের এই দুর্ব্যবহারে মনটা প্রসন্নও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ আমাকে বারবার মানা করিয়াছিলেন–পলিটিকসে ঢুকো না। ওর ভিতর সাহিত্যিক টিকতে পারে না। আমি কিছুদিন ছিলাম। তখনই আমার শিক্ষা হয়ে গেছে। ...কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইবার পরই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফতার করিয়া গভর্নমেন্ট তাঁহাকে গৃহবন্দী করিয়া রাখিলেন। ইহারই কাছাকাছি সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে, সুভাষচন্দ্র পুলিশের চোখে ধুলা দিয়া অন্তর্ধান করেন এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। (বনফুল, ১৯৯৯: ২০৭)

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগের দিন বনফুল সজনীকান্ত দাসের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল রবীন্দ্রনাথ খুব অসুস্থ, সজনীর কাছে বনফুল সম্পর্কে তিনি খোঁজখবর নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বনফুল যেন কলকাতায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখে আসেন। দুর্ভাগ্যবশত চিঠি পাওয়ার পরের দিনই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সংবাদ পেলেন বনফুল। সেদিন বনফুল কোনো কাজই আর করতে

পারেননি। কী করা উচিত, কী করবেন – ভেবে পাচ্ছিলেন না। রাতে তাঁর ঘুম হলো না। ভোরের দিকে একটি কবিতা লিখে 'প্রবাসী'তে এবং আরো একটি লিখে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় পাঠিয়ে দেন। তখনই বনফুলের মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একবার বলেছিলেন, তাঁকে নিয়ে একটি নাটক লিখতে। তাই বনফুল এই সময় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নাটক লেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের লাইব্রেরিতে বেশ পড়াশোনা করলেন। ল্যাবরেটরির কাজ বন্ধ রেখে তিনি নাটক লেখার কাজে মনোনিবেশ করেন। বনফুলের এরূপ মহৎ উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে কলেজের প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিতে বনফুলের জন্য একটি চেয়ার ও টেবিলের ব্যবস্থা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক নিশিনাথবাবুও বনফুলকে সাহায্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শনিবারের চিঠির যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাতে বনফুলের *অন্তরীক্ষে* নামে একটি একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনস্বরূপ ছিল এই নাটকটি। এই সময় বনফুল পটলবাবুর বাড়িতে সপরিবারে ভাড়া থাকতেন। এ বাড়িতেই মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) , করুনা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৮৭) পদধূলি পড়েছে। এরপর নিরুপম বাবুর বাড়িতে ছয়মাস থাকার পর আবার তিনি পটলবাবুর বড় বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে চলে আসেন। এসময় বনফুলের রাত্রি, বিদ্যাসাগর গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত দাস *বিদ্যাসাগর* (১৯৪১) নাটকটির ভূয়সী প্রশংসা করে শনিবারের চিঠিতে ছাপানোর কথা জানান।

এরপর আরো একটি ঘটনা বনফুলকে নাড়া দিয়েছিল। ঘটনাটি বিয়াল্লিশের আন্দোলন বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন নামে পরিচিত। এই সময় বনফুলকে রাজনীতির খবর দিতো স্বদেশি বিহারি যুবকরা। তারা প্রতি রাতে এসে বনফুলকে খবর দিয়ে যেত। একপর্যায়ে ব্রিটিশরা যখন পরাজিত হতে লাগলো তখন তারা সরকারি চাকুরেদের তাদের নিজ নিজ অফিসে এসে রেডিও জমা দিয়ে যেতে বললো। অনেক ভেবেচিন্তে বনফুল এক উপায় বের করেন। তিনি কিছু কল্পিত খবর বিহারি কংগ্রেসকর্মীদের দিতেন। তারা সে খবরগুলো চতুর্দিকে বিতরণ করতো এবং ল্যাম্পপোস্টে সেঁটে দিতো। এরকম একটি খবর ছিল Churchill has been shot dead-এরূপ মিথ্যা খবরের প্রতিক্রিয়ায় সরকার রেডিও ফেরত দিতে বাধ্য হলো।

বনফুলের ১৯৪২ সালে বের হয় ব্যঙ্গ রচনা *ভূয়োদর্শন*। শুধু তাই নয়, এই সময় তিনি বিশাল কলেবরে *জঙ্গম* উপন্যাসটিও লেখা শুরু করেছেন। এটি ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়টায় বনফুলের অনেক লেখালেখির কাজ হচ্ছিলো, নানারকম লেখা লিখছিলেন তিনি। তাঁর এতো লেখার পেছনে প্রেরণা ও উৎসাহদাতা ছিলেন সজনীকান্ত দাস ও পরিমল গোস্বামী। বলা যায়, শনিবারের চিঠির সবরকম চাহিদাই মিটিয়ে

ছিলেন তিনি। তাঁর অনেক লেখা বনফুল ছদ্মনাম ছাড়া অন্য নামেও প্রকাশিত হয়, তবে বেশিরভাগ লেখা বনফুল নামেই প্রকাশিত হয়েছে। "এ সময়টা আমি যেন একটা উন্মাদনার মধ্যে থাকিতাম। সমস্ত দিন ল্যাবরেটরীর কাজ আর রাতে সাহিত্য সাধনা।" (পৃ. ২০৪)

লেখকের ১৯৪৩ সালে *আহ্বনীয়* কাব্যগ্রন্থ, দুটি উপন্যাস একটি *সে ও আমি* আরেকটি এপিকধর্মী উপন্যাস *জঙ্গম*-এর প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড। পরের বছর ১৯৪৪ সালে বনফুলের দুটি বই প্রকাশিত হয়, একটি একাঙ্কিকার সংকলন, নাম – *দশভাণ*, অপরটি গল্পসংকলন, নাম *বিন্দুবিসর্গ।* পরিমল গোস্বামী বনফুলের অনেক কালের বন্ধু এবং তাঁর অসাধারণ ছোটগল্পগুলোর অনুরাগী। তাই *বিন্দুবিসর্গ* নামক গল্পসংকলনটি বনফুল তাঁকে উৎসর্গ করেছেন। ১৯৪৫ সালে *জঙ্গম*-এর তৃতীয় খণ্ড ও *সপ্তর্ষি* উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হয়।

বনফুলের *নএতৎপুরুষ* উপন্যাস বের হয় ১৯৪৬ সালে। উপন্যাসটি দস্তয়েভস্কির *The Eternal Husband*-এর ছায়া অবলম্বনে রচিত। তাছাড়া এই বছর বনফুল *স্বপ্নসম্ভব* ও *অগ্নি* উপন্যাস, *অদৃশ্যলোকে* গল্পসংকলন এবং সিনেমার গল্প চিত্রনাট্য প্রকাশ করেন। এই সময় ভারতবর্ষ রাজনীতিতে উত্তাল ছিল। ব্রিটিশ সরকার পার্লামেন্টে ঘোষণা দিয়েছে, তারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে। কোন দলকে স্বাধীনতা দেবে, কংগ্রেস না মুসলিম লীগকে– এই নিয়ে তখন নানা জল্পনা-কল্পনা চলছিল। জিন্নাহর দাবি, তারা একটি স্বতন্ত্র নেশন, তাদের স্বাধীনতা দেয়া উচিত। তারা আলাদা রাজত্ব কায়েম করতে চান। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু নেতারাও বিভিন্ন উপায়ে প্রতিবাদ করেছেন। এই সময়ে গান্ধীজি বলেন, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কোনো ঝগড়া নেই, ইংরেজ আছে বলে এই ঝগড়া। এই কথার বলার পর থেকেই দাঙ্গা চাঙ্গা হয়ে উঠলো। নোয়াখালীতে ভীষণ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধলো। এরপর বিহারসহ অন্যান্য জায়গায় এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লো। ক্যালকাটা কিলিং হলো। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বনফুল তাঁর *স্বপ্নসম্ভব* উপন্যাস লিখেছেন (পৃ. ২১৮)। *স্বপ্নসম্ভব* উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন শ্রীমান সৌরেন বসুকে। সৌরেন বসুকে উৎসর্গ করার পেছনে একটি ঘটনা রয়েছে, তা হচ্ছে– ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলো মুসলিম লীগ; পাকিস্তানের দাবি স্বীকার করিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে। চার দিনে চার হাজার লোক নিহত হয়েছিল। জখম হয়েছিল ১৫ হাজার, অন্যদিকে পুলিশ ছিল নিষ্ক্রিয়। ২৪ ঘণ্টা পর মিলিটারি নামলো। দাঙ্গার এই কলুষতা ছাড়িয়ে গেল নোয়াখালী, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে। এ অবস্থায় গান্ধীজি যখন দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় ঘুরছিলেন তখন চারজন দুঃসাহসিক তরুণ শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে নিরস্ত্র অবস্থায় নোয়াখালী গিয়েছিলেন গান্ধীজি নোয়াখালী যাওয়ার আগেই। তাঁদের একজন সৌরেন বসু। খবরের কাগজ পড়তে সৌরেন বসুর নাম জানতে পেরে বনফুল তাঁকে উৎসর্গ করেন পূর্বে আলাপ না থাকা সত্ত্বেও। পরে অবশ্য সৌরেন বসু ভাগলপুরে বনফুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ৮৩)।

বনফুলের দুটি বই প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। একটি *কঞ্চি* নাটক এবং অন্যটি গল্প সংকলন নাম *আরও কয়েকটি*। এর মধ্যেরয়েছে তিনটি নাট্যিক গল্প– 'ঝুলন পূর্ণিমা', 'নমুনা' 'অশ্রু'র উৎস। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মাগান্ধী নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডে বনফুল খুব মর্মাহত হলেন। হত্যাকাণ্ডের কিছু আগে ভাগলপুরে নোয়াখালীর দাঙ্গার প্রতিশোধ হিসেবে অনেক মুসলমান নিহত হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে একটা ভয়ের ছায়া নেমে এসেছিল, কারণ ধারণা করা হচ্ছিলো, মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী একজন মুসলমান। কিন্তু পরে জানা গেল হত্যাকারী মুসলমান নয়, হিন্দু। ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মহাত্মাগান্ধীর শোকসভায় বনফুল গান্ধীর নামে একটি কবিতা পড়েন –

হে মহাপথিক হে মহাশয়।
হে মহাসারথি, হে মহারথ
হে উজ্জ্বল;
নয়ন জল
নয়নে থাক
শুনেছি বন্ধু তোমারি ডাক,
যুগ যুগান্তে সে আহ্বান
ভরিয়া তুলিবে পাষাণ প্রাণ
অসাড় হৃদয় বারম্বার
নমস্কার। (পৃ. ৮৮)

কবিতাটি পরে বনফুল তাঁর *নতুন বাঁকে* (১৯৫৯) নামে কবিতা সংকলন গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। ১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয় *বন্ধন মোচন* নামে একটি নাটক। নাটকটির মূলে রয়েছে মনুষ্যত্বের জাগরণ, যদিও নাটকটি নারীর বন্ধনমুক্তির নামে অগ্রসর হয়েছে। নাটকটির শেষে এই প্রতিজ্ঞা ঘোষিত হলো – আজ সকলে প্রতিজ্ঞা করছে যে, কোনো কারণেই তারা মনুষ্যত্বহীন হবে না। নাটকটির দ্বিতীয় কোনো সংস্করণ মুদ্রিত হয়নি। এর বক্তব্য নিয়ে পরে *উজ্জ্বলা* নামে একটি উপন্যাস লেখেন, প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে।

ডানা উপন্যাসের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। দুই বছর করে গ্যাপ দিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড প্রকাশের পরের বছর উপন্যাস *নবদিগন্ত*, কবিতা সংকলন *করকমলেষু*, গল্প সংকলন *তন্বী* এবং বিদেশি উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত উপন্যাস *ভীমপলশ্রী* বনফুলের – চারটি বই প্রকাশিত হয়। সম্ভবত ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশের পূর্বে চার স্বাদের চারটি বই বের হওয়ার কারণে প্রথম কয়েকটি অধ্যায় টানা পাখিদের নিয়ে গবেষণামূলক তথ্য থাকার পর বাকি অধ্যয়গুলোতে পাখিদের নিয়ে আর কথা নেই দু'একটি কবিতা বাদে।

উপন্যাসটি পাখি-গবেষণাবিষয়ক তথ্যসমৃদ্ধ পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্বাধীনচেতা নারীর জীবন-জিজ্ঞাসা। পাখি পর্যবেক্ষণ বনফুলের অন্যতম একটি নেশা ছিল। সেই নেশা থেকেই ডানা উপন্যাসটির সৃষ্টি। উপন্যাসটি তিনি প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্তকে উৎসর্গ করেছিলেন। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের একজন বড় অফিসার প্রদ্যোৎকুমার ছিলেন বনফুলের একজন ভক্ত পাঠক। ডানা উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র রহস্যময়ী এক নারীর যার নাম ডানা। অপর চারটি চরিত্র – কবি সুন্দরের সন্ধানী, সন্ন্যাসী জীবনসত্যের সন্ধানী, রূপচাঁদ ভোগলিপ্সু এবং বৈজ্ঞানিক রহস্যসন্ধানী। উপন্যাসটিতে পাখি নিয়ে অনেক কবিতা আছে – কবিতাগুলো পাখির স্বভাব, সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত। তাছাড়া পাখিদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে।

১৯৫৪ সালে বনফুলের তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়–লক্ষ্মীর *আগমন*, *পিতামহ* ও *পঞ্চপর্ব* এবং গল্পসংকলন *নবমঞ্জরী*। *লক্ষ্মীর আগমন* উৎসর্গ করেছিলেন স্ত্রী লীলাদেবীকে। এ বছর বনফুলের বাবা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন। তখন সকলেই মনিহারিতে ছিলেন। পিতার জীবন অবলম্বনে তিনি *উদয়-অস্ত* নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। বনফুলের *ভুবন সোম* উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপ পেয়ে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন মৃণাল সেন। একই সালে বনফুলের *গল্প সংগ্রহ* ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। বনফুলকে এই বছর সংবর্ধনা জানিয়েছিল নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন। সেখানে তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন। আমন্ত্রিত হয়ে রেঙ্গুনে গিয়েছেন, সঙ্গে ছিলেন লীলাদেবী। ভাষণটি 'বাংলা সাহিত্য' নামে প্রবন্ধ হিসেবে তার *মনন* (১৯৬২) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে বনফুলের *জলতরঙ্গ*, *অগ্নীশ্বর* এবং *উদয়-অস্ত*– এই তিনটি উপন্যাস ও একটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। *জলতরঙ্গ* উপন্যাসটি নতুন উদ্বাস্তুর কাহিনি অবলম্বনে। উৎসর্গ করেছিলেন অনুজ ডাক্তার শ্রীলালমোহন মুখোপাধ্যায়কে (বনফুলের চতুর্থ ভাই)। দুইশ বিঘা ধানজমি এবং বসতবাটি গঙ্গার গ্রাসে চলে যাওয়ায় মুখচর গ্রামে মিশ্র পরিবারকে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছে। কলকাতার জীবনযাত্রা তাঁদের কাছে অসহনীয় মনে হয়েছিল তাই তারা আবার ফিরে এলো অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট সহ্য করে। এ পরিবারের দুই ভাইয়ের দুটি নেশা; একজন ছবি আঁকেন, নাম বনস্পতি এবং অন্য ভাইয়ের সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের নেশা, নাম বৃহস্পতি।গ্রামে বসেই তাঁদের এই কাজ চলত। *অগ্নীশ্বর* উপন্যাসটিকে বনফুলের ছোট ভাই টুলু (অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) চলচ্চিত্রায়িত করেছেন। *অগ্নীশ্বরের* চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে বনফুলের গুরু ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের (১৮৮৬-১৯৬৫) চরিত্র। ১৯৬১ সালে বের হয় বনফুলের *কন্যাসু* ও *হাটেবাজারে* – এ দুটি উপন্যাস। ১৯৬২ সালে *হাটেবাজারে* বইটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছিলেন। *কন্যাসু* উপন্যাসটির বিষয় হচ্ছে – কন্যাকে পাত্রস্থ করার ক্ষেত্রে কন্যার পিতামাতার পাত্র-অনুসন্ধান, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনের উত্তরে আসতে

থাকা প্রস্তাব, প্রাথমিক নির্বাচন, খোঁজখবর, পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে পাত্র খুঁজে দেয়ার তাগাদা, পাত্রীর বাবা-মার নানারকমের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের শর্তাবলি এবং এরই মধ্যে দিয়ে কাকতালীয়ভাবে চমৎকার পাত্র মিলে যাওয়া – এভাবেই উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। বনফুল তার কনিষ্ঠা কন্যা করবীর বিয়ের পাত্র খুঁজতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই এই উপন্যাসটি লিখেছেন। বনফুল যখন করবীকে পাত্রস্থ করার ব্যাপারে খুবই চিন্তিত, তখন বিখ্যাত অ্যাটর্নি তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বনফুলের বাড়িতে এসে বনফুলের মেয়েকে নিজের পুত্রবধূ করে নেয়ার প্রস্তাব দেন এবং তাঁর ছেলের সঙ্গেই বনফুল তাঁর মেয়েকে বিয়ে দেন।

১৯৬৩ সালে বনফুলের *পীতাম্বরের পুনর্জন্ম* নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হলো। চার্লস ডিকেন্সের (১৮১২-৭০) A Christmas Carol (১৮৪৩) উপন্যাসটির অনুসরণে লেখা। ডিকেন্সের উপন্যাসটির উৎসব হলো 'বড়দিন' আর বনফুলের উপন্যাসের উৎসব হলো 'দুর্গাপূজা'। তিনটি ভূত এসে কীভাবে কৃপণ পীতাম্বরকে বদলে দিয়েছিল তার একটা চমৎকার গল্প উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হলো উপন্যাস *তীর্থের কাক*।১৯৬৬ সালে রবার্ট লুই স্টিভেনসন (১৮৫০-৯৪) লিখিত Prince Otto উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে উপন্যাস *গন্ধরাজ* প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭ সালে বের হলো উপন্যাস প্রচ্ছন্ন মহিমা, ১৯৬৮ সালে স্মৃতিমূলক গ্রন্থ *রবীন্দ্রস্মৃতি*, ১৯৭১-এ উপন্যাস *তুমি*। এ উপন্যাসে এমন একজনকে তুলে ধরা হয়েছে, যে কোথাও নেই কিন্তু তবু, সে সর্বত্র আছে, সর্বত্রই তাকে দেখতে পাই আকস্মিক মহিমায় অপ্রত্যাশিত পরিবেশে। ১৯৭৩ সালের দুটি মৃত্যু বনফুলকে মুহ্যমান করে দিয়েছিল। ১৯৭৩-এর ১৪ জুলাই বনফুলের চতুর্থ ভাই লালমোহন মুখোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৭৩) এবং ৩ নভেম্বর দ্বিতীয় ভাই ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৩) ইহলোক ত্যাগ করেন। অতি আপনজনের একের পর এক শোক সয়ে ভেঙে পড়েননি, মানসিকভাবে শক্ত ছিলেন তিনি। ১৯৭৪ সালে বনফুলের দুটি গল্পসংকলন *বনফুল বীথিকা* এবং *বনফুলের শ্রেষ্ঠ* গল্প প্রকাশিত হয়।

১৯৭৫ সালে বের হলো বনফুলের *অদ্বিতীয়া* গল্পসংকলন। এতে মোট ৪১ গল্প আছে। ১৯৭৬ সালে বনফুলের পত্নী শ্রীলীলাবতী দেবীর জীবনাবসান হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছরের জীবনসঙ্গিনী চলে যাওয়াতে বনফুল মানসিকভাবে অনেকটা ভেঙে পড়েছিলেন। ১৯৭৮ সালে বনফুলের *লী* উপন্যাসটি বের হয়। উপন্যাসটি তাঁর স্ত্রীবিয়োগের শোককে আশ্রয় করে লেখা। উপন্যাসটির এক জায়গায় তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে লিখেছেন, তিনি বনফুলকে ছেড়ে থাকতেন না, যত সাহিত্য সভায় গেছেন, সঙ্গে গেছেন। যত জায়গায় বেড়াতে গেছেন, সঙ্গে গেছেন। বনফুলের গলব্লাডার অপারেশনের সময়ে নার্সিং হোমে বনফুল থাকতেন দিনরাত অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে বসে থাকতেন, তাঁর চরিত্রের মধ্যে ছিল দৃঢ়তা। বনফুল সংসারে অতিথির মতো কাটিয়েছে। স্ত্রীর দিকেও তিনি মনোযোগ দিতে

পারেননি। অথচ বাড়ির কারো অসুখ হলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। বিদেশ থেকে ছেলেদের চিঠি না এলে যার ঘুম হতো না রাতে। সেই তিনি হঠাৎ সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন –

> বেলা এগারোটা সময় আমি যখন দু'তিন রকমের মাছ কিনে নিয়ে বাড়িতে ঢুকতাম তখন সে হঠাৎ বলে উঠল, আমি আর পারছি না, আমি চললাম। একটা পাতলা কাপড় গায়ে দিয়ে এক বস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ভাবলাম পাড়ার কারও বাড়িতে গেছে বোধ হয়। ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, ফিরল না। তখন মোটর নিয়ে বেরুলাম খুঁজতে। চেনা শোনা সকলের বাড়িতে খুঁজলাম। কোথাও নেই। অবাক কাণ্ড। ...ফিরে এসেছিল আট দশদিন পরে। গিয়েছিল হরিদ্বারে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রমে। বলেছিল আর সংসার ভাল লাগছে না। আপনাদের কাছেই থাকব। ছেলেবেলায় মায়ের কাছেই ছিলাম। বাকী জীবনটাও তার কাছেই থাকব। আশ্রমের স্বামীজি অনেক বুঝিয়ে তাকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। সেই স্বামীজির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি তাকে যত্ন করেছিলেন। আসবার সময় একটি ভাল কম্বলও দিয়েছিলেন পথে গায়ে দেবার জন্য। তখন শীতকাল। আসবার ভাড়াও দিয়েছিলেন। সবই ফেরত দিয়েছিলাম স্বামীজিকে। কিন্তু তার স্নেহের ঋণ আজও শোধ করা হয়নি...'লীলা হঠাৎ চলে গিয়েছিল, হঠাৎ আবার ফিরে এল। মনে মনে হয়ত একটু অপ্রস্তুত বাইরে কিন্তু সপ্রতিভ। যেন কিছুই হয়নি, আবার লেগে গেল সংসারের কাজে। (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ১৪০)

লীলাদেবী ছিলেন বনফুলের সকল লেখার প্রথম পাঠিকা। প্রথম জীবনে বনফুল লীলাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে আকাশচর্চা করতেন রাত জেগে। পরে তাঁর আকাশচর্চার সঙ্গী ছিলেন তাঁর ছেলেমেয়েরা। অবশ্য তখনো লীলাদেবী এসে যোগদান করতেন। বনফুল *লী* উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছেন –

> পূর্ণিমা রাত্রি। সে, আমি আর আমার ছোট ভাই রাত একটা সময় চুপি চুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। যাব আমাদের আমবাগানে। সেখানে একটা ছোট ঘরও আছে। তার গানের গলা ছিল চমৎকার। কিন্তু বাড়ির সবার সামনে গান গাওয়ার রেওয়াজ ছিল না তখন। নতুন বউদের মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলাফেরা করতে হতো। আমরা রাত্রে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম আমবাগানে সেখানে ছোট ঘরটির বারান্দায় শতরঞ্জি পেতে বসতাম। সে বিনা হারমোনিয়মে গান গাইতে পারত, গান মুখস্থ থাকত তার। সামনে বই বা খাতা খুলে গান গাইত না সে কখনও। আমাদের প্রকাণ্ড বারান্দা জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। আম গাছগুলো কালো কালো স্কুপের মত দাঁড়িয়েছে আছে তারাও যেন শ্রোতা। বাড়ির বড় বউয়ের গান শুনবে বলে যেন প্রতীক্ষা করছে। (পৃ. ১৩৮)

বনফুল ১৯৭৭ সালে রূপকথামূলক একটি উপন্যাস লিখলেন। উপন্যাসটির নাম *সাত সমুদ্র তের নদী*। বনফুল উপন্যাসটিকে বয়স্ক ব্যক্তিদের রূপকথা বলেছেন। এ রূপকথার মধ্যে রয়েছে সাতজন পুরুষ আর তেরোজন নারী। পুরুষদের নাম সমুদ্রের নামে আর নারীদের নাম নদীর নামে। সাত পুরুষ সাত সমুদ্র– অব্ধি, রত্নাকর, জলধি এবং সমুদ্র। তেরো নদীর মধ্যে আছে তাপ্তি, ফল্গু,নর্মদা, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, মন্দাকিনী, বিতস্তা, ইরাবতী, ভোগবতী, ব্রাহ্মণী, পদ্মা, কাবেরী। সমুদ্রমন্থনের পৌরাণিক কাহিনির এক রূপক রূপকথার মধ্যে আছে। এরপর লিখেছেন মর্জিমহল নামে বনফুলের ডায়েরি। *পশ্চাৎপট* এ বনফুল উল্লেখ করেছেন–

> মর্জিমহল লিখিয়াছি ছয় খণ্ডে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমার বড় দৌহিত্রী ঊর্মি আমাকে একটি চমৎকার ডায়েরী উপহার দিল। বলিল-দাদা, তুমি এবার ডায়েরী লেখ। তাহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে মর্জিমহল লিখতে শুরু করিলাম। একখণ্ড মর্জিমহলগ্রন্থাগারে বাহির হইয়াছে। এই মর্জিমহল বর্তমান জীবনের পটভূমিকায় আমার নানা মেজাজ, নানা খুশি, অখুশি, নানা খেয়ালির আলেখ্য। এক হিসাবে এটা আমার জীবন-চরিত্রেরই একটা অংশ, যদিও তাহা ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা। (পৃ. ২৫৯)

মনের মতো করে এতে লিখেছেন; কারো কাছে কোনো দায়বদ্ধতা নেই – বাজার দর ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনির আসা যাওয়া: সভা-সমিতির খবর; স্ট্রাইকে বিপত্তি; বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পরিবেশের বর্ণনা, তারাশঙ্করের অসুস্থতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। ১৯৭৮ সালে বের হয় তাঁর আত্মজীবনী *পশ্চাৎপট*। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের পরিচয়, বাল্যজীবন থেকে শুরু করে লীলাবতী দেবীর জীবনাবসান পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সব ঘটনাকে তুলে ধরেছেন এবং উৎসর্গ করেছেন চার সন্তানের করকমলে। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বনফুলের লিখিত ভাষণগুলোর সংকলন *ভাষণ*। ড. সরোজমোহন মিত্রের মতে, বনফুল বইটি উৎসর্গ করেছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারকে (১৮৮৮-১৯৮০)। বনফুলের শেষ উপন্যাস বের হয়েছে ১৯৭৯ সালে। নাম *হরিশচন্দ্র*। বনফুলের শেষ জীবনের মতামত এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

ত্রিশের কোঠায় ডায়াবেটিস, চল্লিশের কোঠায় উচ্চ রক্তচাপ ও সাথে বাত নিয়েও দীর্ঘ সময় বেঁচে ছিলেন শুধু নিয়মমাফিক জীবনাচারের ফলে। বনফুল মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে জ্ঞান হারান। সপ্তাহখানেক অজ্ঞান থাকার পর ১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন বাংলা সাহিত্যের বহুমাত্রিক লেখক বনফুল।

জীবনবোধ ও শিল্পভাবনা:

বহুমাত্রিক ও ব্যতিক্রমধারার লেখক বনফুল ব্যাপক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জীবনকে অবলোকন করেছেন। তাঁর এক একটা সাহিত্যকর্ম এক একটা অভিজ্ঞতারই ফসল তা নির্দ্বিধায় বলা চলে। ডাক্তারি পড়ার অনেক আগে থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর এতটাই প্রীতি ছিল যে, স্কুল জীবন থেকেই তিনি লেখালেখি শুরু করেন। ক্লাসে শিক্ষকের দেয়া 'গরু' বিষয়ে কবিতা লিখে ফুল-মার্কস পেয়েছেন। তাঁর গরু বিষয়ে কবিতাটি দেখে শিক্ষক আঁচ করতে পেরেছিলেন যে তাঁর লেখার হাত আছে। পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও ডাক্তারি করার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য সাধনা করে গেছেন জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত। সাহিত্য সাধনায় যেন বিঘ্ন না ঘটে সেজন্যে চাকুরি ছেড়ে নিজের ল্যাবরেটরি দিয়ে লেখালেখির কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

বনফুলের গল্প, উপন্যাসের বিষয়ের বৈচিত্র্য সম্পর্কে অনেকের মতো লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীও বনফুলকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, গল্প-উপন্যাসের এতো প্লট তিনি কী করে পান। বনফুলের জবাব ছিল–'নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো লেখাটাও আমার পক্ষে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাল্যকাল হইতে ক্রমাগত লিখিতেছি তো। প্লট কি করিয়া মাথায় আসে তাহা জানি না। ওটা বোধ হয় ভগবানের লীলা বা অনুগ্রহ।' প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের লেখক জীবনে বনফুল গল্প লিখে যতটা সমাদৃত হয়েছেন, একইভাবে তাঁর ঔপন্যাসিক পরিচয়ও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ছোটগল্পের মতো উপন্যাসে জীবনের বহুবিধ বিস্তার, অসংখ্য চরিত্রের সমন্বয়সাধন, সাহিত্য ও ডাক্তারি রসের মিথস্ক্রিয়ায় জীবন প্রবহমানতা, কাহিনির গতিশীলতা পাঠকচিত্রকে মুগ্ধ করে রাখে বরাবর। জীবন তাঁর কাছে যেভাবে ধরা দিয়েছে, সাহিত্যেও ঠিক তেমনভাবে জীবনকে তিনি রূপায়িত করেছেন। শিল্পীমাত্রই জীবন-সন্ধানী,সে দৃষ্টিকোণ থেকে কথাশিল্পী বনফুল ছিলেন বিশেষভাবে জীবন-সন্ধানী। তাঁর কৌতূহলপূর্ণ জীবন-জিজ্ঞাসা বিচিত্র মাত্রায় নানামুখী আবেদন নিয়ে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই তিনি বলেছিলেন–

> জীবনের নানা বিচিত্র আবেষ্টনীতে পড়ে নানারকম মানুষ দেখেছি আমি। মানবজীবনের বৈচিত্র্যই আমাকে সবচেয়ে বেশী ইন্সপায়ার করে।' আরো স্পষ্ট করে বলেছেন-"মানুষই আমার বিষয় এবং প্রেরণা। আমার লেখায় একটি মেসেজ বা বলবার কথা আছে। সেটা হল মানুষ বহু বিচিত্র। মানুষকে অনুসরণ করে আমি আমার লেখার নিত্য নতুন বিষয় ও ভঙ্গি আবিষ্কার করেছি। (বনফুল, ১৯৯৯: ২৫৯)

কবিতা লেখার মধ্যে দিয়েই বনফুলের সাহিত্য জগতে হাতেখড়ি। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় তিনি যখন কবিতা লিখতেন তখন অগ্রজদেও প্রভাবমুক্ত হয়ে লিখতে হবে এমন ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রমোহন সেন, আরো অনেক উদীয়মান কবির কবিতা সাগ্রহে পড়তেন। তাদের সবার প্রভাব নিশ্চয় তাদের লেখা প্রভাবিত করতো কিন্তু তারপরও লেখক স্বপ্নেও ভাবেননি যে এইসব মনীষীদের প্রভাবমুক্ত হতে না পারলে বড় সাহিত্যিক হওয়া যাবে না। যেমন বনফুলদের সমসাময়িক বিশেষ করে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকদের মনে উক্ত চিন্তা জেগেছিল। ফলে তাঁরা সর্বশক্তি ব্যয় করে অরবীন্দ্রনাথ হতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি। তারা বিদেশি লেখকদের লেখা নকল করতে যেয়ে ধরা পড়েছে। কিন্তু বনফুলের মনে এই ধরণের চিন্তা জাগেনি। কারণ –

> আমার সাহিত্য-চর্চা কলিকাতার বাইরে শুরু হইয়াছিল। এ ধরনের হুজুগে মাতিয়া উঠিবার কোনো সুযোগই আমি পাই নাই। যখন যাহা মনে হইয়াছে, লিখিয়াছি। এবং কাগজে পাঠাইয়া দিয়াছি। তাহার বেশী আর কিছু করিবার ইচ্ছা আমার হয় নাই। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' লিখিয়াছেন। বইটি সুখপাঠ্য। কিন্তু আমার মনে হয় নামকরণে কিঞ্চিৎ ভুল হইয়াছে। নামটা হওয়া উচিৎ ছিল 'কল্লোল হুযুগ'। একটা স্বল্পজীবী মাসিক পত্রিকা যুগান্তর আনিয়াছে এ কথা হাস্যকর। বাংলা সাহিত্যে এখনও

> রবীন্দ্রযুগ চলিতেছে। ... রবীন্দ্র যুগে এবং রবীন্দ্রত্তোর যুগেও অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিকের অকপট সাহিত্য সাধনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ...স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপর কি কম লোকের প্রভাব পড়িয়াছিল? বিহারীলাল, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, শেক্সপিয়ার, শেলী, কিট্‌স, ব্রাউনিং, বৈষ্ণব-পদাবলী, কালিদাস, বাউল সংগীত–কত নাম করিব। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ। (বনফুল, ১৯৯৯: ৯৭-৯৮)

পশ্চাৎপটে বনফুল লিখেছেন, পরশুরামের প্রতিভা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। কারণ তাঁর কল্পনা, তাঁর অঙ্কিত সমসাময়িক সমাজের নিখুঁত চিত্র, তাঁর গল্পের গঠন-পরিপাঠ্য, হিউমার, ব্যঙ্গ, লেখার বিজ্ঞানী মেজাজ, বিদগ্ধ শিল্পীমনের সমন্বয় বাঙালি রসিকমহলে সাড়া জাগিয়েছিল। উল্লেখ্য, বনফুলকে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা লিখেছিলেন তিনি (পৃ. ২১০)। বনফুলের কলকাতায় ছয় বছরের জীবনে ডাক্তারি ক্লাস করা, পড়াশোনা ও শেখার পর্বটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পাশাপাশি এ সময় এমবি কোর্সের ছাত্র হিসেবে মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন শিক্ষকের সংস্পর্শে আশা, সাহিত্যচর্চা, থিয়েটার দেখা, মেসে থেকে নানা চরিত্রের মানুষের সাথে মেলামেশার অভিজ্ঞতা, পত্রপত্রিকা পড়া, বন্ধুলাভের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাও হয়েছে ব্যাপক। তাছাড়া নিজের ও বাবার অসুস্থতার সময় বিভিন্ন বাড়িওয়ালা ও পিতৃবন্ধুদের সামনে এসে অর্জিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, শেওড়াফুলি থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি সূত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা, সাহিত্যানুরাগী নানা মানুষের সাথে মিলিত হয়ে ও তাদের আড্ডা থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা, বিহারে পাটনায় প্রিন্স অব ওয়েলস মেডিকেল কলেজে অন্য ডাক্তার-শিক্ষকদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা, ব্যাঙ্গালোরে ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ডে কাজ করার অভিজ্ঞতা–এসব ঘটনাই বনফুলের মানস গঠনের পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্যবিত্তের জীবনবৈচিত্র্য ও অন্ত্যজ সমাজের কথকতা

বহুমাত্রিক ও ব্যতিক্রমধারার লেখক বনফুল ব্যাপক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনকে অবলোকন করেছেন। তাঁর এক একটা সাহিত্যকর্ম এক একটা অভিজ্ঞতারই ফসল – এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছেন তিনি। সৃষ্টিশীল বৈচিত্র্যই তাঁর সাহিত্যের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি বাংলা উপন্যাসের প্রথাগত রীতিনীতি অতিক্রম করে গেছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব আঙ্গিকে। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সান্নিধ্যে এসে এবং কল্লোল পত্রিকার লেখক হয়েও মৌলিকতা বজায় রেখেছেন বীরদর্পে। বনফুলের মৌলিক উপন্যাসের সংখ্যা পঞ্চাশ। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর রয়েছে। উপন্যাসে তিনি বিচিত্র বিষয়কে বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জীবনকে অবলোকন করেছেন কখনো রাজনীতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে আবার পুরাণ এমনকি পক্ষীতত্ত্বের মতো বিষয় তাঁর রচনায় সমান গুরুত্বে ও ভিন্ন প্রকাশরীতিতে উঠে এসেছে। এ দিক বিবেচনায়ও বনফুল স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা। আমার এই অভিসন্দর্ভের প্রধান লক্ষ্য মূলত বনফুলের উপন্যাসের বিষয় বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক বিচার। তাঁর মৌলিক ও প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাসগুলোই এখানে আলোচনা করা হবে।

বনফুলের অনেক আগে থেকেই সাহিত্যে অতি সাধারণ মানুষের জীবন উঠে এসেছে। এবং সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা গুরুত্ব লাভ করেছে। আর বনফুলের সাহিত্যে অতি নগণ্য, অতি সাধারণ বিষয় যা সচরাচর সবার নজর এড়িয়ে যায় সেই সব বিষয় স্থান লাভ করেছে কিন্তু তা কেবল সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, তা অবশ্যই তাঁর পরীক্ষাপ্রবণ বৈজ্ঞাননিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর মৌলিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে (গোপিকানাথ, ২০০০: ৩০৯)। বনফুল যখন ডাক্তারি পড়ছিলেন তখন ভাগ্যক্রমে তিনি তাঁর শিক্ষক ডাক্তার-সাহিত্যিক বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। চিকিৎসক এবং সাহিত্যিক এমন মানুষকে বনফুল খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁরা কেউ বনফুলের বাড়ির শিক্ষক ছিলেন, কেউ চিকিৎসক, কেউ বা তাঁর লেখার একজন সহৃদয় পাঠক ছিলেন (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ১)। তাই বনফুলের গল্প, উপন্যাস পাঠে পাঠক ডাক্তারি-রস ও সাহিত্যিক-রস দুই রসেরই স্বাদ পেয়ে থাকেন। মধ্যবিত্তের জীবনবৈচিত্র্য, তাদের জীবন জিজ্ঞাসা, তাদের অসহায়ত্বের চিত্র ও তাদের জটিল মনোজীবন বিচিত্র ভঙ্গিমায় বনফুলের উপন্যাসে উঠে এসেছে। বনফুলের উপন্যাসে 'মধ্যবিত্তের জীবনবৈচিত্র্য ও অন্ত্যজ সমাজের কথকতা' – আলোচনার পূর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে সমাজের কোন অবস্থানের মানুষদের বোঝানো হয়েছে, কারা এ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে এবং অন্ত্যজ সমাজের জীবন চিত্র বিষয়ে ধারণা দেয়া বাঞ্ছনীয়।

ইংরেজি `Middle Class' শব্দ দুটির বাংলা 'মধ্যশ্রেণি'। তবে মধ্যশ্রেণি শব্দটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবেই বাংলা ভাষায় বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। এ গবেষণায়ও আমরা সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির আলোচনায় অগ্রসর হবো। ফরাসি Bourgeousie শব্দ থেকে এসেছে বুর্জোয়া শব্দ। ফরাসি ভাষায় ইংরেজি Middle Class-শব্দের প্রতিশব্দ Bourgeoisie। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বুর্জোয়া শব্দটি নাগরিক বা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বুঝিয়ে থাকে (গোলাম কিবরিয়া, ২০১৩: ১৭)। আবার ইউরোপীয় Burgher শব্দ বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে মধ্যবিত্তের সঠিক সংজ্ঞা দেয়া আসলেই কঠিন কাজ। কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত যারা তারা সব সময় তাদের চিন্তা-চেতনায় কাজে-কর্মে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সীমানায় অবস্থান করে না। তারা সর্বদাই বিচিত্র পথে অবগাহন করতে তাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো একটি পরিবার আজীবন একই শ্রেণি সীমানায় থাকতে চায় না। কারণ সে তার অবস্থান প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। অপর পক্ষে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে কেবল মধ্য পর্যায়ে অবস্থান করলেই মধ্যবিত্ত বলা যাবে না। যদি না তার সাথে লেখাপড়া অর্জনের কোনো সংযোগ থাকে। আরও সহজ করে বলা যায় – একজন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি যখন শিক্ষা নির্ভর কাজ বা পেশায় সংশ্লিষ্ট থাকে তখন তাকে মধ্যবিত্ত পর্যায়ের বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যারা বিদ্যা-বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল থেকে জীবিকা অর্জন করে থাকে তারাই মধ্যবিত্ত শ্রেণি পর্যায়ের। The New Oxford Dictionary of English,Vol.1-এ Middle Class সম্পর্কে বলা হয়েছে, সমাজের উচ্চ শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যবর্তীতে অবস্থান করে যারা তারাই মধ্যবর্তী শ্রেণির লোক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। মধ্য অবস্থানে থেকে এসব লোক তাদের জীবিকা সন্ধানে নিয়োজিত থাকেন। ব্যবসায়িক কর্মী ও বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষেরা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে এবং এদের কাজের সাথে অর্থ ও সামাজিক মর্যাদার বিষয়টিও জড়িত থাকে।

এই বিষয়ে সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এর নাম সবার আগে স্মরণযোগ্য। কারণ তারাই শ্রেণির অবস্থান ও গুরুত্ব নিয়ে অনুসন্ধানী বিশ্লেষণ করেছেন। যদিও তাদের পূর্বে শ্রেণির অবস্থান সম্পর্কে মার্কস এর পূর্ব পুরুষেরা অবহিত ছিলেন এবং শ্রেণির ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন। ১৮৫২ সালে জোসেফ ভাইডেমাইয়ারকে একটি পত্রে মার্কস লিখেছেন, সমাজে শ্রেণির অবস্থানকে চিহ্নিত করার কৃতিত্ব তাঁর ছিল না। তাঁর আগে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো সমাজে শ্রেণির অবস্থান চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়াও Restoration যুগের একাধিক ফরাসি ঐতিহাসিক GULZOT, MIGNET সমাজে শ্রেণির অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে এঁদের কারোর আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ, গভীর ও ব্যাপক ছিল না। আর এ কারণেই আধুনিক শ্রেণি তত্ত্বের প্রবক্তা মার্কস-এঙ্গেলস জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। মার্কস-এঙ্গেলস এর শ্রেণি বিশ্লেষণ উৎপাদন নির্ভর। তাঁদের মতে, কেবল আদিম সাম্যবাদী সমাজই কেবল শ্রেণি নিরপেক্ষ ছিল। তাদের মতে,

সামাজিক উৎপাদন যতদিন সমাজে সব মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাত কিন্তু উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতো না ততদিন সমাজে শ্রেণি বিভাজন ছিল না। কিন্তু যেদিন থেকে প্রয়োজন মেটানোর পরও সামাজিক উৎপাদন উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে সেদিন থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম দেয় পাশাপাশি সমাজে শ্রেণিবিভাজনের সূত্রপাতও হয়। Class বা শ্রেণি ধারণাটির উৎসস্থল প্রাচীন রোমে। তবে ইতিহাস অনুসারে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে প্রাচীন গ্রিস ও মেসোপোটেমিয়াতে সমাজজীবনে শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। আর প্রাচ্য, ভারতবর্ষ ও চীনে শ্রেণির জন্ম হয় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে (সুধীর, ২০১০: ৫৯৬-৫৯৭)।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাজের একটি অপরিহার্য বিষয় এবং সমাজে অনেকটা অংশজুড়ে রয়েছে এই শ্রেণির অবস্থান। এই শ্রেণির উপরে থাকে উচ্চবিত্ত এবং নিচে নিম্নবিত্ত। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিক গঠন বিবেচনায় বলা যায় যে, এর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব অন্য দুই শ্রেণির দ্বন্দ্ব থেকে জটিলতর। মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য দেশ-কাল অর্থনীতি ভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ইউরোপ, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণি একরকম নয়। আঠার শতকের প্রথম দিকে ইউরোপে এই শ্রেণি বুর্জোয়া শ্রেণি হিসেবে পরিচিতি পায়। ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনে এরা বিকশিত হয়েছে। ফ্রান্সে এরা বুর্জোয়াজি এবং ইউরোপে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত। আবার অর্থনীতির দিক থেকে ইংল্যান্ডের মধ্যবিত্ত আর ভারতীয় মধ্যবিত্তের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইংল্যান্ডের মধ্যবিত্তরা অনেক বেশি ধনী। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ 'মধ্যবিত্ত' প্রবন্ধে লিখেছেন যে, বাংলায় নবাবী আমলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল। ইকতিদার আলম খাঁ তাঁর `The Middle Classes in the Mughal Empire' প্রবন্ধে বলেছেন যে, মোগল আমলে সরকারি কর্মচারী, উকিল শিক্ষক, হাকিম, বৈদ্য এদের নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। সময় ও যুগের ধর্মের সাথে মধ্যবিত্তের স্বরূপও পাল্টায়। সেই দিক বিবেচনায় উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) উচ্চ মধ্যবিত্ত

(খ) মধ্য মধ্যবিত্ত

(গ) নিম্ন মধ্যবিত্ত।

উচ্চ মধ্যবিত্তরা সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। এদের জমি আছে, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বড় ও মাঝারি ব্যবসায়ী, কালোবাজারী, মধ্যস্বত্বভোগী, এদের উদ্বৃত্ত অর্থ থাকায় এরা অভাব পূরণের সামর্থ রাখে। মধ্য মধ্যবিত্তদের সামান্য জমি আছে। প্রাচুর্য ও অভাব কোনোটাই এদের প্রবল নয়। এদের সবকিছুই মধ্য পর্যায়ের। এরা সামাজিক আন্দোলন কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। এরা স্বার্থ সচেতন, সুবিধাভোগী। ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়ে এরা কেউ কেউ

গোরা আবার কেউ কেউ নাস্তিক। সামাজিক পদমর্যাদা এদের কাছে মুখ্য বিষয়। আর নিম্ন মধ্যবিত্তরা চরমভাবে অর্থসংকটে ভোগে। এরা তাদের ঠিক উপরের শ্রেণির ওপর নির্ভরশীল থাকে। এদের কেউ কেউ ছোটখাট চাকুরি করে। জীবনের অনেকটা অংশজুড়েই থাকে এদের দীর্ঘশ্বাস। তবে এরা মূল্যবোধকে আঁকড়ে থাকতে সবসময় চেষ্টা করে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে যারা রয়েছে তারা হলেন, সরকারি চাকুরে, বণিক, এজেন্ট, আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক, সাংবাদিক – এইসব পেশার সাথে জড়িত মানুষ। এই সময়ের ভারতীয় মধ্যবিত্তের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় –

১. সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব
২. জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্বদান
৩. শহরকেন্দ্রিকতার মানসিকতা
৪. চাকরিতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রাধান্য
৫. বেকারত্ব

আবার স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, তারা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সচেষ্ট থাকে, তারা উচ্চবিত্তের শ্রেণিতে উঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে আবার কখনও কখনও নিম্নবিত্ত শ্রেণিতে যেন কোনো অবস্থাতেই নামতে না হয় সে ব্যাপারেও একটা শঙ্কাবোধ কাজ করে তাদের মধ্যে। সমাজ বিজ্ঞানিরা মধ্যবিত্ত চরিত্রদের সুনির্দিষ্ট একটি শ্রেণিতে আবদ্ধ করতে চান না। কারণ তাদেরই মধ্যে থেকে কেউ কেউ নিম্নবিত্তেও নেমে আসতে পারে। আবার শিক্ষিত কেউ কেউ ধনীদের সংস্কৃতি মেনে চলে পুঁজিপতিও হয়ে উঠতে পারে। মধ্যবিত্ত চরিত্র আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে। মূলত এসব কারণেই সমাজ বিজ্ঞানিরা মধ্যবিত্ত চরিত্রদের সুনির্দিষ্ট একটি শ্রেণিতে আবদ্ধ করতে চান না। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত চরিত্রদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তারা চারটি উপবিভাগ করেছেন – বাণিজ্যিক মধ্যবিত্ত, শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত, ভূমি-নির্ভর মধ্যবিত্ত এবং পেশাজীবী মধ্যবিত্ত।

বাংলা উপন্যাসের বিকাশ ধারায় মধ্যবিত্ত চরিত্রকে অনেক ঔপন্যাসিকই তাদের লেখায় স্থান দিয়ে উপন্যাসের জগৎকে বিস্তৃত করেছেন। কারণ মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন-যন্ত্রণা রূপায়ণের তাগিদেই উপন্যাসের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যর প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩); স্বর্ণকুমারী দেবী'র (১৮৫৫-১৯৩২) উপন্যাস *কাহাকে* (১৮৯৮) তে শিক্ষিত পেশাজীবী মধ্যবিত্ত চরিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯) *নয়নতারা* (১৮৯৯), *যুগান্তর* (১৮৯৫), ও *মেজবৌ* (১৮৮০) উপন্যাসে মধ্যবিত্তের

পারিবারিক জীবন-কথা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জগৎ অনেক বিপুল পরিসরে উঠে এসেছে। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা থেকে সরে এসে নিজেদের স্বতন্ত্র্য ব্যক্তিচেতনার মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়েছে। মধ্যবিত্ত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, একাকিত্ব, ব্যক্তিত্ববোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, দাম্পত্য নিঃসঙ্গতা তাঁর উপন্যাসের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) উপন্যাসে জাতপাতের দ্বন্দ্বে জর্জরিত গ্রামীণ ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের কথাই চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। বাল্যবিধবা, পতিতা, নারীর প্রেম, কৌলিন্য প্রথার কুফল, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন – মধ্যবিত্ত চরিত্রের এই সমস্যাগুলোই শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন। *অরক্ষণীয়া* (১৯১৬) উপন্যাসে দরিদ্র ঘরের কুমারী মেয়ের বিয়ের সমস্যা, *বামুনের মেয়ে* (১৯২০) উপন্যাসে কৌলিন্য প্রথার দোষের কারণে জীবন সংশয় হয়ে উঠে। তাঁর *পল্লীসমাজ* (১৯১৬), *পথের দাবী* (১৯২৬), *গৃহদাহ* (১৯১০), *দেনা পাওনা* (১৯২৩) উপন্যাসগুলোতে মধ্যস্বত্বভোগীর চরিত্র, ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত, চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত ও নাগরিক মধ্যবিত্তের চরিত্রও উঠে এসেছে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) উপন্যাসে মধ্যবিত্ত চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। তিনি তাঁর উপন্যাসগুলোতে মধ্যবিত্তের ছলচাতুরী, ভণ্ডামি, অর্থলিপ্সা, অর্থনৈতিক দুর্গতি, হতাশা, স্বার্থপরতা, জীবনসংগ্রাম, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা সবকিছুই তুলে ধরেছেন। এ কারণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মধ্যবিত্তের রূপকার বলা হয়। *চতুষ্কোণ* (১৯৪২), *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬), *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫) প্রভৃতি উপন্যাসে মধ্যবিত্তের সূক্ষ্ম জীবনবোধের পরিচয় রয়েছে। জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) উপন্যাসে সমকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা তীব্রভাবে উঠে এসেছে। *পূর্ণিমা* (১৯৩১), *জীবনপ্রণালী* (১৯৩৩), *সতীর্থ* (১৯৭৭), *বাসমতীর উপাখ্যান* (১৯৪৮), *জলপাইহাটি*(১৯৪৮) প্রভৃতি উপন্যাসে মধ্যবিত্তের সমকালীন জীবন যন্ত্রণার ছবি রয়েছে।

এবার আমাদের আলোচ্য ঔপন্যাসিক বনফুলের কথায় আসা যাক। পরিণত বয়স থেকেই বনফুল উপন্যাস লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসের প্রকাশ কাল ১৯৩৬ সাল। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি উপন্যাস লিখে গেছেন অনেকটা বিরতিহীনভাবেই। তিনি কবিতা, ছোটগল্পও লিখেছেন প্রচুর। ছোট, বড় মাঝারি সব আকারের, স্বাদের, ধরণের উপন্যাস লিখেছেন বনফুল। মধ্যবিত্তের নানা মানসিকতা তাঁর উপন্যাসের জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে তা-ই নয়, আমরা জানি, *মধ্যবিত্ত* নামে বনফুলের একটি নাটকও রয়েছে। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় বেড়ে উঠা বনফুলের উপন্যাসে উঠে এসেছে অসংখ্য মধ্যবিত্ত চরিত্র এবং তাদের ঘিরে রয়েছে অন্ত্যজ চরিত্র। অন্ত্যজ বলতে সাধারণত নিচজাতি, শূদ্র, চণ্ডাল এদেরই বোঝায়। কৃষক, জেলে, শ্রমিক অর্থাৎ খেটে খাওয়া মানুষরা যে সমাজে

বসবাস করে তাদের সমাজই অন্ত্যজ সমাজ। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এদেরকে নিম্নবর্গের বা নিম্ন আয়ের মানুষ বা প্রাকৃতজন বা ব্রাত্যজন বলেও কেউ কেউ আখ্যায়িত করে থাকেন। এদের জীবনের হাসি-কান্না, ঘাত-প্রতিঘাত, বিরহ-বেদনা, মান-অভিমান, ভালোবাসা-ঘৃণা – জীবনের কথকতাই লেখক তুলে এনেছেন সাবলীলভাবে।

বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদেই অন্ত্যজ মানুষের পরিচয় লক্ষগোচর হয়েছে। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ – সব যুগের সাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাসে এসব মানুষ উঠে এসেছে। ক্ষুধা ও দারিদ্রকে ঘিরে তাদের অসহায়ত্ব, চুরি, ডাকাতি সর্বোপরি তাদের জীবন সংগ্রামের কথাই সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে দেব-দেবীকে ঘিরে অন্ত্যজ মানুষের স্বরই ধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের সার্থক পদচারণা রয়েছে। *গোরা* (১৯১০), *ঘরে বাইরে* (১৯১৬), *চতুরঙ্গ* (১৯১৬) উপন্যাসে নিম্নবর্গের মানুষের কথা বলা আছে। *গোরা* উপন্যাসে তিনি অহমিকা ও সংস্কার বোধের মূলে আঘাত হেনেছেন। গ্রামীণ সমাজের অস্পৃশ্য অবহেলিত মানুষের প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। তাই উপন্যাসের শেষে গোরাকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন করতে দেখা যায়। ঘরে বাইরে উপন্যাসে জমিদারি শাসনের ভয়াবহতা এবং অসহায়দের জীবনের কথা উঠে এসেছে। রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ের সাহিত্যিকদের রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়–বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) ও *আরণ্যক* (১৯৩৯) ; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), *পুতুর নাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) ; তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *কবি* (১৯৪৪), *গণদেবতা* (১৯৪৩), *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা* (১৯৫১) ; সতীনাথ ভাদুরীর (১৯০৬-১৯৬৫) *জাগরী* (১৯৪৫) ও *ঢোঁড়াই চরিত মানস* (১৯৪৯-৫১, দুই খণ্ড) অন্ত্যজ মানুষেরই জীবন কাহিনি। বনফুলের অনেক উপন্যাসেই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের কথা গভীর মমতায় বাস্তবের নিরীখেই উঠে এসেছে। অন্ত্যজ সমাজের জীবন স্বাতন্ত্র, অতি সাধারণভাবে চিত্রিত করেছেন এই কথাশিল্পী তাঁর উপন্যাসে। এদের ওপর মানুষের নির্মম আচরণকে কটাক্ষ করেছেন লেখক। সর্বোপরি তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষে তাদের প্রতি লেখকের সহমর্মিতার ভাষাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায় তাঁর উপন্যাসে।

বনফুলের বেশিরভাগ উপন্যাসই চরিত্রপ্রধান বা চরিত্রকেন্দ্রিক। তাই এ গবেষণার প্রথম অংশ অর্থাৎ 'বনফুলের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য' আলোচনায় চরিত্রকে সামনে রেখে তাদের জীবনকে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। চরিত্র আলোচনার মধ্যে দিয়েই লেখকের সমাজ-ভাবনা, তাত্ত্বিক আলোচনার দিকটি উঠে এসেছে। এ অধ্যায়ে আমরা প্রকাশকাল অনুযায়ী উপন্যাসের আলোচনায় অগ্রসর হবো। এ অধ্যায়ের আলোচিত উপন্যাসগুলো – *তৃণখণ্ড* (১৯৩৫); *কিছুক্ষণ* (১৯৩৭); *নির্মোক* (১৯৪০); *সে ও আমি* (১৯৪৩); *জঙ্গম* ১ম খণ্ড (১৯৪৩); *জঙ্গম* ২য় খণ্ড

(১৯৪৫); *জঙ্গম* ৩য় খণ্ড (১৯৪৫); *ডানা* ১ম খণ্ড (১৯৪৮); *ডানা* ২য় খণ্ড (১৯৫০); *কষ্টিপাথর* (১৯৫১); *ডানা* ৩য় খণ্ড (১৯৫৫); *ভূবন সোম* (১৯৫৭); *অগ্নীশ্বর* (১৯৫৯); *উদয়-অস্ত*, ১ম খণ্ড (১৯৫৯); *হাটেবাজারে* (১৯৬১); *মানসপুর* (১৯৬৬); *উদয়-অস্ত*, ২য় খণ্ড (১৯৭৪); *প্রচ্ছন্ন মহিমা* (১৯৬৭); *অধিকলাল* (১৯৬৯); এরাও আছে (১৯৭২)। বনফুল যেমন শুধু মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো উপন্যাস লিখেননি তেমনি কেবল অন্ত্যজ জীবনকেন্দ্রিক তাঁর কোনো উপন্যাস নেই। তবে *অধিকলাল*-কে যদি কেবল অন্ত্যজ জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস বলি সেখানেও মধ্যবিত্ত চরিত্র ডাক্তারের আশ্রয়ে থেকেই অধিকলালের জীবন বিকশিত হয়েছে তা সহজেই বলা চলে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বনফুলের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত এবং অন্ত্যজ দুই শ্রেণির জীবনকথাই উপজীব্য হয়েছে সমান্তরালভাবে। তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জীবনকে ঘিরেই অন্ত্যজ জীবনধারা প্রবাহিত। তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো – সেবাপরায়ণ মনোভাব, বিচ্ছিন্নতা, বন্ধু-বিশ্বাসে ফাটল, বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা, দেশসেবা, পরোপকারী মনোভাব, গ্রাম উন্নয়নের মানসিকতা, ভোগলিপ্সু, সুন্দরের সন্ধানী, রহস্য সন্ধানী, জীবনসত্যের সন্ধানী, সহানুভূতি, সততার প্রতি নিষ্ঠাবান, আত্মকেন্দ্রিকতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত নৈরাশ্য ভাবনা, আর্থিক সহায়তাকারী, প্রেমহীনতা এবং অন্ত্যজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো –পরিশ্রমী, সততা, আত্মনির্ভরশীলতা, পরোপকারী, বিশ্বাসী, আত্মসম্মানবোধ, আত্মসচেতন, কখনো বিদ্রোহী, দেশসেবা লক্ষণীয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বনফুলের উপন্যাসে বিধৃত মধ্যবিত্তের জীবনবৈচিত্র্য ও অন্ত্যজ সমাজের কথকতা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে। এ ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে মূলত চরিত্রের প্রতি আলোকপাত করে উপন্যাসের বিষয়-বৈচিত্র্যের আলোচনা বিস্তৃততর হবে।

১

১.১

প্রথম উপন্যাস *তৃণখণ্ড* (১৯৩৬)। বনফুল উপন্যাসটি তাঁর দুজন শিক্ষক ডা. চারুব্রত রায় এবং ডা.বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে (১৮৮৬-১৯৬৫) উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছেন –"যাহারা নিজে তৃণখণ্ড হইয়াও এই তৃণখণ্ডকে সংসার সমুদ্রে ভাসমান করিয়াছেন তাঁহাদের শ্রীচরণে এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিতেছি– 'বলাই'।" উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার আগে লেখকের মানসিক অবস্থা এবং ওই সময় তিনি কী ধরণের লেখা লিখতেন সে সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। জীবন অভিজ্ঞতার এ পর্যায়ে বনফুল ব্যঙ্গ কবিতা লিখতেন এবং কবিতাগুলো প্রতি মাসেই পরিমল গোস্বামীর (১৮৯৭-১৯৭৬) 'শনিবারের চিঠি'তে ছাপানো হত। ব্যঙ্গ কবিতা লেখার এক পর্যায়ে বনফুলের একঘেয়েমি চলে আসাতে বনফুল স্বভাববশত লেখার ফর্ম পাল্টালেন। ফলশ্রুতিতে, গদ্য-পদ্য মিশ্রিত একটি উপন্যাস লিখে ফেলেন, নাম *তৃণখণ্ড*। *পশ্চাৎপটে* (১৯৭৮) বনফুল লিখেছেন তখনও তিনি

জানতেন না যে, সংস্কৃতে গদ্য-পদ্য মিশ্রিত লেখাকে 'চম্পুকাব্য' বলে। *তৃণখণ্ড* লেখার পরে তিনি সেটা জানতে পেরেছিলেন। উপন্যাসটি তিনি বন্ধু পরিমলকে পাঠালেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরিমল সেটা ছাপালেন না। ফেরত পাঠিয়ে দিলেন আর জানালেন 'শনিবারের চিঠি'র জন্যে তার ব্যঙ্গ-কবিতা চাই। বনফুলের মনে হলো *তৃণখণ্ড*টি হয়তো রসোত্তীর্ণ লেখা হয়নি। তাই তিনি *তৃণখণ্ড*টি বাক্সবন্দি করে রেখে দিলেন। আবার আগের মত পরিমলকে ব্যঙ্গ-কবিতাই পাঠাতে শুরু করলেন। উল্লেখ্য, 'শনিবারের চিঠি'তে তখন বনফুলের ব্যঙ্গ-কবিতার অনেক কাটতি ছিল। সে কারণেও হতে পারে পরিমল *তৃণখণ্ড*টি ফেরত পাঠিয়েছেন। এমনও হতে পারে পরিমল ব্যঙ্গ-রচনার পাঠকদের নিরাশ করতে চাননি। তাই বনফুলও ব্যঙ্গ কবিতা ছাপানো প্রক্রিয়া অব্যহত রাখলেন। এরই মধ্যে বনফুল একবার কলকাতায় এলেন তাঁর ল্যাবরেটরীর কাজে। এ সুযোগে বনফুল 'শনিবারের চিঠি'র অফিসে গেলেন। সেখানে বনফুলের সাথে সজনীকান্ত দারে (১৯০০-১৯৬২) সাথে আলাপ হয় এবং পরিচয় ঘটে – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বিভূতি বাঁড়ুয্যে (১৮৯৪-১৯০৫), বীরেন কৃষ্ণ ভদ্র (১৯০৫-১৯৯১), নীরদ চন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৫২) ও মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) প্রমুখ স্বনামধন্য লেখকের সাথে। পরবর্তী সময়ে 'শনিবারের চিঠি'র অফিসে সেখানকার সাহিত্যিক আড্ডার মাধ্যমে আরও পরিচয় ঘটেছে প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫-১৯৬৩) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭), ড. সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮), অশোক চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৮২) সঙ্গে। এ পর্যায়ে আরও একটি ঘটনা বনফুলের লেখার জগতে গতি সঞ্চার করেছে। বনফুলের কাকাবাবুর ছাত্র ইঞ্জিনিয়ার কপিল প্রসাদ ভট্টাচার্য প্যারিস থেকে হঠাৎ ভাগলপুরে 'শনিবারের চিঠি' ও কিছু মাসিকপত্র নিয়ে বনফুলের কাছে এলেন। তিনি বনফুলকে জানালের, সজনীর সাথে যুক্ত হয়ে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতে যাচ্ছেন। বনফুলের কাছে তিনি নতুন লেখা চাইলেন। বনফুল বাক্স-বন্দি *তৃণখণ্ডে*র পাণ্ডুলিপি এনে তাঁকে দিলেন। পরের দিন তিনি এসে *তৃণখণ্ড* সম্পর্কে 'অপূর্ব সৃষ্টি' বলে মন্তব্য করলেন। এবং ১০০ টাকা অগ্রিম দক্ষিণা দিয়ে গেলেন বনফুলকে। সাথে একথাও জানালেন, তাঁরা বনফুলের কবিতাগুলো সংগ্রহ করে কবিতার বইও ছাপাবেন। এই কপিল ভট্টাচার্যই বনফুলের প্রথম বইয়ের প্রকাশক। সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক তাঁর ছিল বাল্যকাল থেকেই। 'প্রবাসী'তে কপিল প্রসাদের 'রেলইয়ার্ডের বক্ষ পঞ্জরে' গল্পটি পড়ে বনফুল একসময় মুগ্ধ হয়েছিলেন। সজনী ও কপিলের রঞ্জন পাবলিশিং হাউস নামের প্রকাশনা সংস্থা থেকে *তৃণখণ্ড* এবং *বনফুলের কবিতা* নামে দুটি বই প্রকাশিত হয়।

বনফুলের ছত্রিশ বছর বয়সে *তৃণখণ্ড* প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসটিতে সুনির্দিষ্ট কোনো প্লট নেই। প্রধান মধ্যবিত্ত ডাক্তার চরিত্রকে কেন্দ্র করে অন্ত্যজ চরিত্রগুলো উঠে এসেছে। এখানে ডাক্তার নিরপেক্ষ থেকে অন্ত্যজ সমাজের জীবনচিত্রকে রূপদান করেছেন। চরিত্রের পর চরিত্র সাজিয়ে অন্ত্যজ জীবন প্রবাহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলোর সমাবেশ

রয়েছে উপন্যাসটিতে। এই ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ঘটনাগুলোই উপন্যাসের চরিত্রগুলোর ব্যক্তি বিশেষের জীবনে বড় ঘটনা হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানে ডাক্তারি অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বনফুল প্রতিটি চরিত্রের রূপদান করেছেন। তাঁর মনোদৃষ্টির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা চরিত্রগুলোকে বিকশিত করেছে। উপন্যাসটির মূল বক্তব্য উত্তম পুরুষের জবানীতে বিবৃত হয়েছে:

> ম্যালেরিয়া, আমাশয়, বেরিবেরি, ফোড়া, দাদ–মানুষের ব্যাধিরও শেষ নাই, আমাদের অজ্ঞতারও শেষ নাই! অথচ মজ্জমান লোকে তৃণখণ্ড জানিয়াই তাহার দিকে হাত বাড়াইবে, ইহা তাহার মজ্জাগত দুর্বলতা। আমরা সেই হতভাগ্য তৃণখণ্ড। ভাসিয়া চলিয়াছি–ডুবন্ত মানুষ কখন আমাদের দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে! (বনফুল, ২০১২/১: ১৩১)

আবার এইসব তৃণখণ্ডের অসহায়ত্বের কথাও রয়েছে উত্তম পুরুষের জবানীতে। আসলে ডাক্তাররা করতেই বা পারে কী। তাদের ক্ষমতা কতটুকু আছে। তারা রোগীর জন্যে তাদের সর্বস্ব দিয়ে খাটেন। ওষুধ দেন, রক্ত, মল, মূত্র সব পরীক্ষা করেন, কখনও অসুখ ধরা পড়ে কখনও ধরা পড়ে না। আবার অসুখ ধরা পড়লে রোগ সারে না। আবার কখনও রোগ সেরে যায়। তাহলে কী প্রমাণিত হয়? ডাক্তাররা অসহায়, প্রকৃত অর্থেই তারা অসহায়! রোগীরা প্রায় ভেবে থাকে ডাক্তাররা যেন তাদের প্রাণটা হাতে করে ঘুরে বেড়ান। উপন্যাসটিতে আরো রয়েছে বিবেকের সাথে তৃণখণ্ডের বোঝাপড়া:

> কি অসহায় আমরা ডাক্তারেরা। কতগুলো অসম্পূর্ণ জ্ঞানের বোঝা মাথায় করিয়া রোগীর হাটে তাহা ফেরি করিয়া বেড়াইতেছি। বিবেক বলিয়া যাহা মনে করি, তাহা আর কিছুই নয়, ফাঁকি! একই বিবেক নানা কথা কয়। যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেক তাহা করিতে চাহে না, যাহা অন্যায় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে দেখি বিবেকের সায় আছে! বিবেক মানে যুক্তি-মার্জিত বুদ্ধি নয়, বিবেক, সামাজিক বুদ্ধি। এই বিবেক বলেই লোকে এককালে সতীদাহ করিত, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দিত; আজও সেই বিবেকই কাপালিককে নরবলিতে প্রণোদিত করে, বিধবাকে উপবাসে দেহ শীর্ণ করিতে পরামর্শ দেয়, অসুখে পড়িলে, ঔষধ না খাইয়া মাদুলি লইতে প্রবুদ্ধ করে। সেই এক জাতীয় বিবেকই ডাক্তারকে নির্বিচারে একটা পশু করিয়া ফেলিয়াছে। সে ফর্ম মানিয়া চলিয়াছে, যুক্তির ধার ধারে না। (বনফুল, ২০১২/১: ১১৮)

উপন্যাসের অন্যতম একটি চরিত্র আসমানী। শরীরময় ঘা নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসে। ডাক্তার তাকে একটি প্রেসক্রিপশন লিখে দেন। প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ খেয়ে আসমানীর ঘা ভালো হয়ে যায়। সুস্থ হয়ে সে ডাক্তারের কাছে আসে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং ওষুধ চালিয়ে যাবে কিনা তা জানতে। ডাক্তার প্রথম দেখায় আসমানীকে চিনতে পারেননি কিন্তু পরে চিনতে পেরে তার অসামান্য রূপ দেখে অবাক হন তিনি। ডাক্তার আসমানীকে আরও এক শিশি কিনে খাওয়ার পরামর্শ দেন। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে ডাক্তার বুঝতে পারেন যে, আসমানী রূপোপজীবিনী। স্বাস্থ্য ও রূপ যখন সে ফিরে পেয়েছে তখন তার আর পয়সার অভাব হবে না। আসমানী চলে যাবার পর ডাক্তার তাঁর বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করেন, এমন মোহিনী অগ্নি-শিখাকে সমাজে ছেড়ে দিয়ে কি সৎকাজ

করেছেন তিনি! সে তো নিভে গিয়েছিল, তাকে তো ডাক্তার আবার জ্বালিয়ে দিলেন। ঠিক একই বিবেকের তাড়নায় রসুলপুরের জমিদারের বিধবা স্ত্রীর গর্ভপাত করাতে পারেননি তিনি। কিন্তু সামান্য দাই যখন জমিদার স্ত্রীর গর্ভপাত করাতে যেয়ে গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি করে তখন কিন্তু তাকে বাঁচাতে ডাক্তারের এ্যাটিকেটে বাধেনি। ডাক্তার তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করে রাণিজিকে সংকটাপণ্ন অবস্থা থেকে সারিয়ে তোলেন। উপন্যাসের শেষদিকে বারোতম অধ্যায়েও বক্তা, বিবেক বলতে এমনটাই বুঝিয়েছেন – 'প্রচলিত আইনের মত! সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখার শৃঙ্খল। ন্যায়-অন্যায়-সম্পর্ক-বিরহিত। দয়া-মায়া-স্নেহ-মমতার তোয়াক্কা রাখে না। সময় ও সুবিধা অনুযায়ী নিজের বেশ পরিবর্তন করে।' (পৃ. ১৩৭) তৃণখণ্ড মানে ডাক্তার, মানে রোগীর শেষ আশ্রয়স্থল। বনফুলের জীবন অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ এই ডাক্তার চরিত্র। উপন্যাসের খণ্ড ঘটনাগুলো ডাক্তারের পেশাগত জীবনের চলমান জীবনস্রোতের ঘটনা। জীবনস্রোতে সবকিছুই যেন তৃণখণ্ডের এতভেসে চলছে। পুরো কাহিনিটিকে আবার দুটি পর্বেও বিভক্ত করা যায়–একটি পর্বে বক্তা ডাক্তারের দেখা রোগীর অসুখের বৃত্তান্ত ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা আরেকটি পর্বে ডাক্তারের আত্মকথন অপরের বাগদত্তা নারী এবং ডাক্তারি পেশার সফলতা ও বিফলতা নিয়ে।

ডাক্তারের অসহায়ত্ব রোগী বুঝতে চায় না। রোগ যন্ত্রণায় রোগীর পাশাাশি ডাক্তারও যে কতটা অসহায় হতে পারে রোগী তা কখনই ভেবে দেখে না। রোগ থেকে নিরাময়ের জন্যে ডাক্তারকেই তারা একমাত্র অবলম্বন মনে করে। যেকোনো মূল্যে তাকে তৃণখণ্ড ভেবে আঁকড়ে ধরে উদ্ধার পেতে চায়। ডাক্তারও রক্ত মাংসের মানুষ, তাই জীবনস্রোতের মুখে সেও ভেসে যাচ্ছে তৃণখণ্ডের মত – এটাই মূলত উপন্যাসের মূল বিষয়। বলা চলে, বনফুল তাঁর ডাক্তারি অভিজ্ঞতার আলোকে উপন্যাসটিতে অন্ত্যজ সমাজের জীবনচিত্রেরই রূপদান করেছেন। তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়েছেন। এবং পাশাপাশি ডাক্তারও রোগীর মত অসহায় – এ দিকটিও উঠে এসেছে।

১.২

একটি মফঃস্বল স্টেশন ও তার চারপাশের এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় উপন্যাস *কিছুক্ষণ* (১৯৩৭) এর কাহিনি। কয়েক ঘণ্টার কাহিনি সম্বলিত এ উপন্যাসের ক্ষুদ্র পরিসরে লেখক নানা জাতের নানা মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন দিকের উন্মোচন করেছেন। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে, যদি কাহিনির নেপথ্যের প্রেক্ষাপটের দিকে আলোকপাত করা হয়। ব্যঙ্গ কবিতা সংগ্রহের কাজে বনফুলের বাসায় যাতায়াত ছিল পরিমলের। একবার বনফুল পরিমলকে আনতে স্টেশনে গেলেন। ট্রেন আসতে দেরি হবে শুনে ওভারব্রিজের উঠে পায়চারী করতে লাগলেন বনফুল। এ সময় তিনি লক্ষ্য করেন –

> দুইটি প্লাটফর্মে নানাজাতের প্যাসেনজার ট্রেনের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। অনেকে অনেকের ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, অনেকে আবার ঝগড়াও করিতেছে। হঠাৎ কিছুক্ষণ গল্পের আভাসটি আমার মনে যেন বিদ্যুৎ-চমকের এতখেলিয়া গেল। আমি ওভারব্রিজের উপর

পায়চারি করিতে করিতেই এই কল্পনাটির উপর তা দিতে লাগিলাম। অনেকদিন তা দিতে হইয়াছিল। তাহার পর গল্পের শাবকটি অণ্ড হইতে বাহির হইয়া পড়িল একদিন। কিছু সময় লাগিয়াছিল। (বনফুল, ১৯৯৯: ১৯৯)

কিছুক্ষণ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছেন বনফুল। ওই সময় রবীন্দ্রনাথ অচেতন অবস্থায় ছিলেন। কিছুদিন পর তিনি বইটি পড়ে বনফুলকে জবাব পাঠিয়েছিলেন।

কল্যাণীয়েসু

সাবাস। তোমার কিছুক্ষণ খুবই ভালো লাগলো। উল্টে পড়া রেলগাড়ি যে অসংলগ্ন জনতা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে তার মধ্যে থেকে তুমি যথেষ্ট রস আদায় করে নিয়েছো। এর মধ্যে ঝাঁঝ আছে কম নয়, সেটা যে কেবল স্বাদের পক্ষে ভালো তা নয়, পথ্যও বটে। সমস্ত বইখানার মধ্যে কেবল প্রথম প্যারাগ্রাফটার উপর আমি কালীর আঁচড় না চালিয়ে থাকতে পারিনি। আমার বেহোঁস অবস্থায় তুমি যে বইখানি পাঠিয়েছিলে সেটা আমার চৈতন্যলোকের নেপথ্যে মারা গেছে।

ইতি ২৪/১/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ৫১)

বনফুল কিন্তু প্রথম প্যারাগ্রাফটি বাদ দেননি। প্রত্যেক লেখকেরই নিজস্ব স্বাধীনতা রয়েছে তার ভাবকে ভাষার গাঁথুনিতে এঁটে দিতে। হয়ত সেই স্বাধীনতা থেকেই তিনি প্যারাগ্রাফটির বিলুপ্ত ঘটাননি। বনফুল প্রতিনিয়ত তাঁর লেখার বিষয় এবং ধরণে পরিবর্তন এনেছেন। কারণ তিনি জীবনকে দেখেছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা তাঁর সহজাত। স্বভাবতই *কিছুক্ষণ* উপন্যাসের বিষয়টিও হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী। উপন্যাসটি উত্তম পুরুষে রচিত। তৃণখণ্ড উপন্যাসের মত এখানেও কথক মধ্যবিত্ত চরিত্র, একজন ডাক্তার। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। মেডিকেল কলেজ খুলেছে বিধায় তিনি কলকাতায় যাচ্ছেন। স্টেশনে এসে দেখেন পশ্চিমগামী একটি গাড়ি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে আছে। ফলে ট্রেনের সব যাত্রী নেমে প্লাটফর্মে বিশাল জনতায় পরিণত হয়েছে। কথক গিয়ে তাদের সাথে সামিল হলেন। এবার উপন্যাসের একটির পর একটি চরিত্র এসে যেন তাদের পারফরমেন্স শো করে যাচ্ছে। কথকের প্রথম উক্তি ছিল যে, একটি লোকও তাঁর পরিচিত ছিল না। ঠিক ওই মুহূর্তে লেখকের পূর্ব পরিচিত ভদ্রলোক অর্থাৎ টেলিগ্রাফ অপারেটর এসে হাজির হলেন। তিনি লেখকের ব্যাগটি নিয়ে তার অফিস কক্ষে রেখে দিলেন। শুরু হলো কিছুক্ষণের কাহিনি, কিন্তু ঠিক কাহিনি নয়। যেন কিছুক্ষণ নামক ক্যানভাসে অনেক চিত্রের সমাহার। টেলিগ্রাফ অপারেটর মাখনবাবু ও তার স্ত্রী বিনোদিনী, স্টেশন মাস্টার ও তার স্ত্রী, মুচির মেয়ে বলে পরিচয় দেয়া মিস মার্থা, কাবুলিওয়ালা, মাড়োয়াড়ি, এক বিধবা মেয়ে যে নিষ্ঠা পালনে রত এবং তার বাবা, গাঁজাখোর রামদীন, শীর্ণ বৃদ্ধ-এরকম বহু চরিত্রের সঙ্গে লেখকের দেখা-সাক্ষাৎ-কথাবার্তা হয়েছে দিনব্যাপী। লেখকের ভাষা প্রয়োগের যথার্থতার গুণে প্রতিটি চরিত্র প্রাণবন্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্রগুলোর মুখের ভাষাই তাদের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিভাত করেছে।

খ্রিস্টান মিশনারিদের ভারতবর্ষে আগমনকে বনফুল ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন। তারা এতিম বা নিঃস্ব সন্তানকে মানবিক করে গড়ে তোলেন। তারা ধর্মান্তরিত করেন বটে তবে এসব সন্তানকে সব ধরণের শিক্ষাই দিয়েই মানুষ করেন। তাদের মধ্যে জাত-পাতের ভেদাভেদ নেই। মিস মার্থা বাঙালি বলে তাকে এক মিশনারি ভালো করে বাংলা শিখিয়েছেন। পাশাপাশি রামায়ন-মহাভারতও পড়িয়েছিলেন। মিস মার্থাকে বলতে শোনা যায় – 'আমাদের এক মিশনারি মেম সুন্দর বাংলা জানতেন। তিনিই আমাকে বাংলা পড়িয়েছিলেন খুব যত্ন করে। তিনি বলতেন আমি বাঙালির মেয়ে, বাংলাটা আমার ভালো করে শেখা উচিৎ। ... তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ না থাকলে আমার বাঙালিত্ব এতদিনে লোপ পেয়ে যেত। (বনফুল, ২০১২/১: ৪৫২-৪৫৩) উদারপন্থী মিশনারিদের প্রতি লেখক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

মধ্যবিত্ত কথক ডাক্তার চরিত্রটির উপর অন্ত্যজ শ্রেণির অনেক চরিত্রের নির্ভরশীলতার জায়গাটুকু দেখানো হয়েছে। স্টেশনে হাজারও যাত্রীর যে মেলা বসেছে তারা সবাই নিজেদের বিভিন্ন রকম সমস্যার কথা বলার জন্যে কথক ডাক্তারকে আশ্রয় করেছে। কথককে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত সব মানুষের সংস্পর্শে থাকতে যেয়ে তাদের সমব্যথী হতে হয়েছে। কথক নিজ থেকে সবার সাথে মিশছেন এবং তাদের সমস্যা যতটুকু পারা যায় সমাধানের জন্যে চেষ্টা করছেন। স্টেশন-প্লাটফর্মের কোণে একটি পানির কলকে কেন্দ্র করে শুরু হলো জনসমাগমের মানুষের সাথে পরিচয়ের পালা। প্রথমে এক বৃদ্ধের অনুরোধে কল থেকে পানি আনতে যেয়ে এক কাবুলিওয়ালার সাথে সাক্ষাৎ ঘটে কথকের। এক যুবক কাবুলিওয়ালার জিনিস কিনবে বলে তার সাথে বেইমানি করলে তিনি এই কাবুলিওয়ালাকে সাহায্য করেন। কাবুলিওয়ালা চরিত্রটিকে এখানে একজন সৎ চরিত্ররূপে দেখানো হয়েছে। অন্যায়কে সে প্রশ্রয় দেয় না। তার কথাতেই তা স্পষ্ট হয়েছে যখন কথককে উদ্দেশ্য করে সে বলে – 'হুজুর, আপ দেখিয়ে, আপ বালা আদমি, ইনসাফ কর দিজিয়ে।' (পৃ. ৪৪১) সেই বৃদ্ধ তার ডাক্তার ছেলের পাগলা গারদে যাওয়া এবং বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে যেয়ে ফাঁদে পড়ে মেয়ের জীবনটাকে নিরামিষ করে তোলা এবং এর জন্যে সৃষ্ট পরিতাপ হতে রক্ষা পেতে এবং সমাজের গলদের কথাটা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে কথককে বিষয়টি জানিয়েছেন। বৃদ্ধের মতে, বিধবা বিয়ে নিয়ে প্রতারণার খবর কাগজে লেখালেখি করে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া উচিৎ। সমাজ সংস্করণের লক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) বিধবা-বিয়ে সমর্থনের দিকটি লেখক তুলে এনেছেন। স্থানীয় মাড়োয়ারিটি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে কথককে একটি প্রস্তাব করেন, ট্রেনটি আরও চব্বিশ ঘণ্টা এখানে পড়ে থাকে কথক যেন সেই ব্যবস্থা করবেন। তাহলে তার খাবার বিক্রির ব্যবসায় প্রচুর লাভ হবে। বিনিময়ে তিনি কথক, টেলিগ্রাফ-মাস্টার মাখনবাবু এবং স্টেশন-মাস্টারকে পান খেতে কিছু দেবেন। কথক মারোয়াড়ির প্রস্তাবটিও বিবেচনা করবেন বলে তাকে আশ্বস্ত করেন। মাখনবাবু স্টেশনে কথককে দেখা মাত্র তাঁকে বাগিয়ে আনার জন্যে সর্বোক্ষণ চেষ্টা

চালাচ্ছেন। তার অভিপ্রায় নিজের ঘাটের লোক স্টেশনের পয়েন্টসম্যান রামদীনকে যেকোনো উপায়ে বাঁচানো। রামদীনের দোষটা ড্রাইভারের ঘারে চাপানো। প্রমাণ করা ড্রাইভার মাতাল হয়ে ট্রেন চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন। একদিনের পূর্ব পরিচয় এবং আপ্যায়ণের খাতিরে মাখনবাবুর যড়যন্ত্রকেও স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেন কথক। ড্রাইভারকে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করার ফলে

ড্রাইভারের মা-মরা মেয়েটির প্রতি কথকের করুনা দৃষ্টি জাগলেও শেষ পর্যন্ত মাখনবাবুর কথা ভেবে নিজেকে অসহায় মনে হলো তাঁর। পরক্ষণেই মাঠ ধরে হাঁটতে শুরু করলেন এবং নদীর ধারে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসলেন। সেখানকার নির্জন প্রান্তরের অপরূপ শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। একটু বিশ্রামের জন্যে সারাদিনের অবসাদে ক্লান্ত শরীর নিয়ে শুয়ে পড়লেন। বিশ্রাম শেষে ঘুম থেকে জেগে দেখেন পাশে চিতা পোড়ানো হচ্ছে। এতক্ষণ তিনি শ্মশানে শুয়ে ছিলেন। রাত বারোটা বাজে, তাৎক্ষণিকভাবে স্টেশনের দিকে রওনা হলেন। যেয়ে দেখেন স্টেশনে একজনও নেই, চারদিক নিস্তব্ধ –

> আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যাহাদের লইয়া সমস্ত দিন এত উৎসাহে এত আগ্রহে এত সত্যমিথ্যার জাল বুনিতেছিলাম, তাহারা অতর্কিতে এমন করিয়া ফেলিয়া গেল। আর জীবনে দেখা হইবে না। ...আমি একা নির্জন প্লাটফর্মে সিগন্যালটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ওই ট্রেন আসিতেছে। একটু পরেই আমিও আর এখানে থাকিব না। (পৃ. ৪৬২-৪৬৩)

একটি মফঃস্বলের ক্ষুদ্র স্টেশনে বনফুল তাঁর কল্পনা-শক্তির দক্ষ কৌশলে নানা ভাষাভাষী একাধিক অঞ্চলের অধিবাসীদের একত্রিত করেছেন। হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারি, বাঙালি, বিহারি – এদেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি-লোভ, স্বার্থপরতা, হিংসা, পরোপকার, প্রেম, স্নেহ-প্রীতি, মিথ্যার আশ্রয় শিল্পিতরূপে বাঙময় হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত ও অন্ত্যজ মানুষের প্রত্যেকের বিচ্ছিন্ন বা টুকরো ঘটনাগুলো তাদের জীবনের সামগ্রিক চিত্রকেই প্রতিফলিত করেছে।

সময় কাটাতে শিকারে যাওয়া ট্রেনের তিন সাহেব যাত্রীর একজনের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে এক বুড়ির গায়ে লাগে। কথক ডাক্তার পরীক্ষা করে যখন জানালেন হাসপাতালে নিয়ে ভালো চিকিৎসা দিলে বুড়ি ভালো হয়ে যাবে। এ ভরসায় সাহেবরা তাকে কাঁধে করে তিন/চার মাইল দূরবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বনফুল খাঁটি ইউরোপীয়দের মধ্যে জাতি-বর্ণ ভেদে মানবতার দৃষ্টান্তকেই উপস্থাপন করেছেন। নিম্নশ্রেণি এবং উচ্চশ্রেণির মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করিয়েছেন। প্রত্যেকের মুখে তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এখানেই বনফুলের শিল্প-প্রবণতার সাক্ষ্য মেলে।

১.৩

নির্মোক এর সমার্থক শব্দ খোলস, মুখোশ। বনফুলের ষষ্ঠ উপন্যাস *নির্মোক* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০ সালে। এর আগে *প্রবাসী* পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, ১৩৪৬ এর আশ্বিন সংখ্যা থেকে ১৩৪৭ এর আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত। একই বছর বনফুলের *মৃগয়া* নামে আরও একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ডাক্তারি পাশ করার পর বনফুলের প্রথম চাকুরি হয় আজিমগঞ্জে (মুর্শিদাবাদ জেলা)। স্মৃতিকথায় উল্লেখ আছে, আজিমগঞ্জের স্মৃতি বনফুলের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। একবছর ট্রেনিং শেষে ট্রেইনী মাস্টার মশাইয়ের পরামর্শে তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন। মাস্টার মশাইয়ের পরামর্শ ছিল – কোনো মফঃস্বল হাসপাতালে চাকরি নিয়ে এতদিন যা শিখেছে তা প্র্যাকটিস করার জন্যে। ওই হাসপাতালে যেন ইনডোর বেড থাকে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বনফুল এই উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর *পশ্চাৎপট* গ্রন্থে বলেছেন, 'আজিমগঞ্জে যে জীবন আমি যাপন করিয়াছিলাম তাহার প্রতিচ্ছবি আমার *নির্মোক* নামক গ্রন্থে পরে আঁকিয়াছি। *নির্মোক* এ অবশ্য অনেক কাল্পনিক কাহিনি আছে, কিন্তু কাঠামোটা আজিমগঞ্জের পরিবেশ।' (বনফুল, ১৯৯৯: ১৬৫) বনফুলের এ উপন্যাসটিতে একটি উপকাহিনি রয়েছে যে কাহিনিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে দিয়েছেন। একবার বনফুল রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করতে যেয়ে অবসর সময়ে খোয়াই দেখতে যাওয়ার কথা যখন উঠলো তখন রবীন্দ্রনাথও তাঁকে বলেন 'খোয়াই' দেখে আসার কথা। ওটা তাঁর ভালো লাগবে। বনফুল 'খোয়াই' দেখে যখন ফিরে এলেন তখন রবীন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছেন খোয়াই দেখে তিনি গল্পের কোনো প্লট পেয়েছেন কিনা। বনফুল গল্পের কোনো প্লট পাননি জেনে 'রবীন্দ্রনাথ মুচকি হেসে চুপ করে রইলেন ক্ষণকাল। পরে বললেন, 'তোমাকে একটা গল্পের প্লট দেবো। তুমিই ঠিক পারবে। ভেবে দেখলুম আমার পক্ষে ও গল্প লেখা অশোভন হবে। তুমি ওটাকে বাগিয়ে লেখ দিকি, তোমার হাতেই ওটা ওৎরাবে।' (বনফুল, ২০১৩/১৩: ১৪৫) বনফুল জানতে চাইলেন কি রকম প্লট। রবীন্দ্রনাথ বললেন, পরে চিঠিতে তিনি লিখে পাঠাবেন। কয়েকদিন পর 'রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে বনফুলকে গল্পের সেই প্লটটি দিলেন, প্লটটি নিম্নরূপ:

'উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

কল্যাণীয়েষু

সময়টা সেকেলের প্রান্ত ঘেঁষা। মা-ঠাকুরণ বড় ঘরের ঘরণী – স্বামী সহকারে চলেছেন তীর্থ-পরিক্রমে। শেমিজ, জুতোয় লজ্জা, অশ্বযানে সঙ্কোচ, বাল্যাবধি পাল্কি-বাহিনী, আধুনিক পন্থায় স্বামীর তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু যে সনাতনী আচার শ্বশুরকুলের বংশানুগত আভিজাত্য আঁকড়ে ছিল তার কোন **ব্যত্যয়** গৃহিনী সইতে পারতেন না, যদিও পুরুষ মানুষের অনাচারে ধৈর্য রক্ষা করতে অগত্যা অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর ছেলেটি আধুনিক–লোরেটোতে শিক্ষিত মেয়েকে বাপ-মায়ের অগোচরেই বিয়ে করেছিল, মেয়েটির বয়স গৌরীর কাছাকাছি যায়নি বলে' দুঃসহ ক্ষোভ পরিবারে একদা আলোড়িত হয়েছে। অল্প দিনে প্রমাণ হ'ল এমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে হয় না – এমন কি যে সকল আচারে ও পুজার্চনায় তার অভ্যাস ও বিশ্বাস ছিল না, তারও খুঁটিনাটি মেনে চলত। স্বামী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্তেজনায় বৃথা চেষ্টা করত। একটা কথা মেয়েটি বুঝতে পারত না কেন স্বামীসহবাস থেকে

সে বঞ্চিত ছিল। সে সমস্যার সমাধান এই, স্বামীর স্বভাব চরিত্র ভালো, কিন্তু একবার পদস্খলন হয়ে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছে ভয় নেই, কিছুকাল চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ হবে। সেই আশ্বাসে শ্বশুরের একান্ত ব্যস্ততায় ও সুন্দরীর লোভে সে বিয়ে করলে কিন্তু সংক্রামক-সঙ্গ বিপত্তি থেকে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে চললে। রোগ উপশমের বাহ্যলক্ষণ যতই আশ্বাসজনক হোক, তবু ভয় ছিল রোগটা পাছে সন্তান পরম্পরায় সংক্রমিত হয়। এ দিকে স্ত্রীর বিশ্বাস এই সংযম স্বামীর অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক শুচিতার লক্ষণ। তাই জোড় মিলবার চেষ্টায় নিজের প্রবৃত্তিও দমন করে চলত। অবশেষে হঠাৎ একটা অসংযমের উদ্দীপনার মুখে স্বামীকে অপরাধ স্বীকার করতে হোলো। ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া। স্ত্রীর গৃহত্যাগ, অথচ অন্তরের মধ্যে নিরন্তর জ্বলুনি। একবার শাশুড়ির পায়ের ধূলো নেবার প্রলোভনে স্টেশনের নিকটবর্তী গাছ তলায় দুর্যোগের অপরাহ্নে যা ঘটল তার আভাস পেয়েছ। ছেলেটার কলঙ্ক অথচ চরিত্র-মাহাত্মের কথা চিন্তা করে' দেখো। ইতি–৮ চৈত্র, ১৩৪৫

স্নেহাকৃষ্ট
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' (পৃ. ১৪৫-৪৬)

এই প্লটটি উপন্যাসে অমর-বিনোদিনীর উপকাহিনি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। বনফুলের প্রায় বেশির ভাগ উপন্যাসেই একজন ডাক্তার চরিত্র থাকে। বনফুলের পাঠকমাত্রই জানেন যে, সে ডাক্তার বনফুলেরই প্রতিরূপ। ডাক্তার কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন এবং তাকে ঘিরেই অন্ত্যজ এবং মধ্যবিত্ত চরিত্ররা আবর্তিত হয়ে থাকেন। বনফুল তাঁর পরীক্ষাপ্রবণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে একান্ত কাছ থেকে নিবিড়ভাবে এসব চরিত্রদের পর্যবেক্ষণ করেছেন। রোগ নির্ণয়ের মত ব্যক্তির মানসিক অবস্থাটিও যেন তাঁর পরীক্ষায় ধরা পড়ে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিমল ডাক্তারের আত্মজীবনীর মধ্যে দিয়েই বহুবর্ণিল চরিত্ররা বিকশিত হয়েছে। উপন্যাসে অন্ত্যজ, মধ্য এবং ধনী বা উচ্চ শ্রেণির চরিত্র রয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির হাসপাতালে চাকুরি নিয়ে তিনি দেখতে পেলেন গরীবদের জন্যে যে হাসপাতাল সে হাসপাতালের দামি সব ওষুধপথ্য ডাক্তারদের প্রাইভেট রোগীদের ভাগ্যেই জোটে। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন, এখানে গরীব লোকদের ভিতর কালাজ্বর খুব বেশি। কিন্তু হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা করার এতইনজেকশনের ওষুধ প্রচুর নাই। ভবিষ্যতে যে ওষুধের আধিক্য হবে সে সম্ভাবনাও ক্ষীণ। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি তাঁর প্রথম মাসের বেতন দিয়ে কালাজ্বরের ইনজেকশন কিনে আনান। নানা প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে একটি ভগ্ন হাসপাতালকে তিনি নতুন উদ্যমে দাঁড় করান। তাঁর সদয় ব্যবহারের গুণে এবং নিরলস চিকিৎসা সেবায় হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

হাসপাতালের অনেক উন্নয়ন সাধন করায় সবার কাছে অতি অল্প সময়ে একজন জনপ্রিয় ডাক্তার হয়ে উঠেন বিমল। তিনি হাসপাতালের এমন ব্যবস্থাপনা করেছেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতেও রোগীরা সেবা পেতে পারে। তাঁর এই জনপ্রিয়তা হাসপাতালের স্বার্থান্বেষী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। ফলে মিউনিসিপ্যালিটির রাজনৈতিক চক্রান্তের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েন তিনি। শহরের ক্ষমতাবানদের দলাদলি, তাদের হীনতা, নীচতার পাশাপাশি ডাক্তারদের নৈতিকতার অধঃপতন – তৎকালীন সময়ের সব বাস্তব চিত্র লেখক শিল্পীর তুলির আঁচড়ে নিখুঁত করে

ফুটিয়ে তুলেছেন। একসময় বিমলকে হাসপাতাল পরিচালনা কমিটির হর্তাকর্তাদের ব্যক্তিগত কলে সাড়া দিয়ে হাসপাতালের বাইরে থাকতে হয়েছে বেশিরভাগ সময়। তখন তাঁকে ঘিরে নানা অপবাদের কথা উঠে। ডাক্তার এখন আর হাসপাতালে অসহায় রোগীদের দেখছেন না, ব্যক্তিগত কলেই ব্যস্ত থাকছেন; চিকিৎসা না পেয়ে রোগীরা মারা যাচ্ছে – এরকম অপবাদের মুখে পড়েন বিমল ডাক্তার। সঙ্গদোষে লোহা ভাসে। এক পর্যায়ে বিমল নিজেও প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এসময় কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা করতে যেয়ে তাঁর শরীরে কুষ্ঠরোগের মত কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। তাঁর ডারমাল নিশম্যানিয়াসিস নামে দূরারোগ্য ব্যাধি ধরা পড়ে। লোক চক্ষুর অগোচরে তিনি কলকাতা ত্যাগ করে নিজ গ্রামে শম্ভুকাকার কাছে চলে যান। স্ত্রী মণিকেও কিছু জানাননি তিনি। সেখানে তিনি রোগী দেখেন, অবসরে আত্মজীবনী লেখেন আর পৈতৃক জমি চাষ করে দিন অতিবাহিত করেন। গণ্ডগ্রামের মানুষদের সাথে একাত্ম হতে পেরে সুখী হয়েছেন তিনি। কারণ এখানকার মানুষেরা অনেক বেশি মৃত্তিকাসংশ্লিষ্ট সহজ সরল মানসিকতার। এখানে নেই কোনো মুখোশধারী, লেবাসধারী মানুষ –

> ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া সত্যিই সুখী হইয়াছি। ইহারা আমাকে টাকা দিতে পারে না বটে, কিন্তু যাহা দেয় তাহা অমূল্য–সমস্ত প্রাণটাই হাতে তুলিয়া দেয়। তাহাছাড়া গাছের ফল, ঘরের দুধ, উৎসবের মিষ্টান্ন,–যখন যেটুকু পারে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আনিয়া দেয়। সর্বদাই যেন কৃতজ্ঞতায় অবনমিত হইয়া আছে, অথচ আমি ইহাদের কতটুকু করি, কতটুকু করিবার সাধ্য আছে আমার?' অধিকাংশ ওষুখেরই তো ওষুধ জানা নাই। তবে এটা ঠিক ইহাদের অসুখ সহজে সারে, ইহারা অসহায় বলিয়া প্রকৃতিও করুণা করে। আরও একটা কথা, বড়লোকদের এতইহাদের অসুখ অর্থ-জনিত নহে। ইহারা সাদাসিদা সোজা অসুখেই ভোগে এবং অল্প চিকিৎসাতেই সারিয়া ওঠে। কুইনিন, টিঞ্চার,আয়োডিন, ম্যাগসালফ এবং আয়োডিন দিয়াই ইহাদের শতকরা পঞ্চাশ জনের অসুখ সারিয়া যায়। অথচ এইসব অসুখ বড়লোকদের বাড়িতে হইলে কি কাণ্ডটাই না হয়! বড়লোকদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাঁচিয়াছি। (বনফুল, ২০১২/২: ৪৭৫)

বিমলের দূরারোগ্য ব্যাধির কারণে তাঁর শম্ভূকাকাও কি সবার এততাঁকে ত্যাগ করবেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, '–ত্যাগ করব! এ-ধারণা তোমার মাথায় কি করে ঢুকল? নিজের সন্তানকে কেউ কখনও ত্যাগ করে? ... তোমাকে পুজো করা উচিৎ। একটা কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে জেনে শুনে তুমি তোমার জীবন বিপন্ন করেছ। আহত সৈনিককে কেউ কখনও ত্যাগ করে? বলছ কি তুমি।' (পৃ. ৪৭২) অন্ত্যজ মানুষদের সেবা করতে যেয়ে নিজের জীবনের প্রতি বেখেয়াল ছিলেন এ ডাক্তার। তিনি যে কেবল অসহায় মানুষদের চিকিৎসাই করেছেন তা নয়, তিনি এইসব অন্ত্যজ মানুষের অর্থনৈতিক বিষয়ে সহানুভূতিও দেখিয়েছেন, তাদের মনের অবস্থাও বোঝার চেষ্টা করেছেন। বাউরিদের বউ সুনরি। অল্প বয়সী মেয়ে আপিং খেয়েছে আত্মহত্যার উদ্দেশে। বিমল খুব যত্নসহকারে তার পাকস্থলি ওয়াশ করে দিয়েছেন – ব্যাস, এখানেই ডাক্তারের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে বিমল ডাক্তার যা করেছেন তা অসহায় মানুষদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা থেকেই করেছেন। হাসপাতালে সুনরির সাথে আসা বুড়ির

কাছ থেকে বউয়ের আত্মহত্যার কারণ জেনেছেন বিমল। তিনি চিকিৎসা শেষ করে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। আর সুনরির স্বামী দুখীয়াকে ডেকে বলে দেন তাকে একটি শাড়ি কিনে দিতে। বিমলের এমন সব কথা শুনে সুনরি 'ফিক করিয়া হাসিয়া লজ্জায় মাথা নত করিল।' (পৃ. ৩৮৫) যে স্বামী বউয়ের সামান্য টাকাটাও জোড় করে নিয়ে নেয় নেশা করতে সে কখনো কারো কথায় বউকে শাড়ি কিনে দেবে সে কথা বিশ্বাস হয়নি তার। শাড়ি কেনার টাকা বিমলই দুখীয়াকে দিয়েছিল আর বিষয়টি গোপন রাখতে বলেছিল। 'এই গরীব বধুটির তুচ্ছ একটা শাড়ির শখ মিটাইয়া সে যেন মনে মনে বেশ একটা প্রসন্নতা অনুভব করিতেছিল।' (পৃ. ৩৮৫) বিমল সুনরির পাকস্থলি ওয়াশ করে দিয়েছেন – ব্যাস, এখানেই ডাক্তারের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে বিমল ডাক্তার যা করেছেন তা অসহায় মানুষদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা থেকেই করেছেন। আরেকবার এক নাছোড় বান্দা বুড়ি এসে বিমলের পায়ের কাছে মাথা নত করে মাথা ব্যথার অসুখের জন্যে তাকে ইনজেকশন দিতে জোঁকের এতধরলো। তাকে যতই বোঝানো হচ্ছে মাথা ব্যথার কোনো ইনজেকশন নেই বুড়ির কান্না ততই বাড়তে লাগলো। সে বিমলের পিছু নিয়ে তার বাড়ি পর্যন্ত এসে পড়েছে। এতে বিমল ডাক্তার কিন্তু একদমই বিরক্ত হননি বরং একটা উপায় বের করে বুড়িকে শান্ত করলেন। টিউবে পানি ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ইনজেকশন নাম দিয়ে বুড়িকে দিয়ে দিলেন। আর মাইক্রোসকোপের কাজের জন্যে তার কাছে থাকা কিছু মেথিলিন ব্লু'র বড়ি দিলেন খাওয়ার জন্যে। পরবর্তীতে দেখা গেলো বুড়ি এসে বিমলকে আশির্বাদ করছে কারণ তার মাথা ব্যথা চিরতরে সেরে গেছে। সুসংবাদটি শুনে বিমল খুশি এবং অবাকও হলেন। উপন্যাসের শুরুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে বিমল চাকরিতে যোগদান করতে আসার পথে যখন স্টেশনে নামেন তখন আহত একটি বুড়িকে নিজ উদ্যোগে হাসপাতালে আনার ব্যবস্থা করেন। বিমল তার নতুন কর্মস্থল মিউনিসিপ্যালিটির হাসপাতালে বুড়িকে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে দেন। এসব ঘটনায় অন্ত্যজ মানুষের প্রতি বিমলের সমানুভূতির প্রকাশই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। কিন্তু চিকিৎসা করেও যাদের বাঁচাতে পারেননি তাদের মর্মব্যথাও বিমলকে ভাবিয়েছে। হাসপাতালের অন্ধকার কোণে বসে অপেক্ষমান বৃদ্ধ যক্ষা লোকটির অনুনয়, করুণ আর্তি – 'খেতে পাই না বাবু, খেতে পাই না, খিদের জ্বালায় মরে গেলাম।' (পৃ. ৩৮৫) তাকে যেন দুবেলা দুটি খেতে দেওয়া হয় আর একটু ওষুধ। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার দরকার নেই। সে গাছতলায় শুয়ে থাকবে। ডাক্তার হাসপাতালে ভর্তি করে নেন। ঘোষদের বাড়ির মেয়েটি আগুনে পুড়ে মারা গেছে। চেয়ারম্যান নন্দীমশায়ের ছেলে রমেনের নাম মেয়েটার সঙ্গে জড়িয়ে কুৎসা রটানোর কারণে। মারা যাওয়ার আগে মেয়েটি বিমলকে বলেছিল, সে বাঁচতে চায় না, তাকে যেন ডাক্তার বাঁচিয়ে না দেয়। তার এই করুণ কথাগুলি বিমলের কানে বাজে, তার মনটা তিক্ত ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। সে ভাবতে থাকে –

আমরা কোথায় চলিয়াছি। আমাদের এত শিক্ষা-দীক্ষা, বক্তৃতা-আড়ম্বর কোনো কিছুইতো মনের গুহাবাসী পশুটার নখ-দন্তের তীক্ষ্নতা এতটুকু কমাইতে পারিতেছে না। বরং নানা ছুতায় আমরা সেই নখ-দন্তকে শানিততর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। আজকাল এই যে ঘরে ঘরে মেরি স্টোপস, ফ্রয়েড এবং হ্যাভলক এলিস পড়ার ধুম–তাহা কি কেবল নিছক জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য? এই যে আজকাল পথে ঘাটে অশ্লীল গল্প কবিতার ছড়াছড়ি এ কি নিছক সাহিত্যপ্রীতির জন্যই? এই যে দলে দলে লোক সিনেমায় নাচে যায়, এই যে রাশি রাশি অশ্লীল ছবি গোপনে ও প্রকাশ্যে ক্রীত ও বিক্রীত হয় ইহা কি নির্জলা আর্টপ্রীতি ছাড়া আর কিছুই নহে? আমরা নানা উপায়ে পশুটাকে লোলুপ করিয়া তুলিতেছি, অথচ তাহার আহার জুটাইবার সঙ্গতি ভদ্রভাবে সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। ভদ্রভাবে সংগ্রহ না করিতে পারিয়া নিবৃত্ত হইতেছি না,অভদ্রভাবে ও অসুপায়ে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য নান ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ছদ্মবেশটা ধরা পড়িয়া গেলে লজ্জিত হই বটে, কিন্তু সেটা চক্ষু লজ্জাম সামাজিক লজ্জা, আন্তরিক নৈতিক লজ্জা নহে। (পৃ. ৪৫০)

আবার কাঙালি ছেলেটা শুয়ার পশু যার পেট চিঁরে নাড়ীভুড়ি সব বের করে দেয় তার জীবন সংশয় হয়ে উঠার পরও বিমল তার চিকিৎসা করেছে। ভাগ্য ভালো ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠে। এরপর থেকে সে বিমলের কাছে থাকার জন্যে পণ করে। বাকি জীবনটা সে বিমলের সাহায্য বা তার সেবা করে কাটিয়ে দেবে। কারণ বিমলই তাঁর জীবন বাঁচিয়েছে। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্রগুলো এভাবেই জীবন্ত হয়ে উঠে উপন্যাসের কাহিনিকে গতিশীল করেছে।

বিমল ডাক্তারের মফঃস্বল জীবনের ছবি খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে উপন্যাসের পরতে পরতে। উপন্যাসের শুরুতে বিমলের ছাত্র জীবনের যেসব টুকরো ঘটনা রয়েছে সেসব লেখকেরই প্রতিচ্ছবি বলে তাঁর আত্মজীবনীতে ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন – এক পর্যায়ে বিমলের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতাটি বনফুলের প্রতিচ্ছবি নয়। সেটি তৎকালীন সমাজের অনেক ডাক্তারের আদর্শচ্যুতির ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বনফুলকে যে প্লটটি দিয়েছিলেন তার সময়কাল ছিল ইংরেজি ১৯৩৮ সাল। প্লটটি দেয়ার পর ওই বছরই বনফুলের দুটি নাটক *মন্ত্রমুগ্ধ* ও *রূপান্তর* এবং ১৯৩৯ সালে তাঁর দুটি উপন্যাস *দ্বৈরথ* ও *কিছুক্ষণ* প্রকাশিত হয়। এসব নাটক-উপন্যাসে তিনি প্লটটি ব্যবহার করেননি। ১৯৪০ এ প্রকাশিত নির্মোকে তিনি প্লটটি ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ার ব্যাপারটি বনফুলকে ভাবিয়েছে। সম্ভবত এ কারণে তাড়াহুড়ো করে তিনি এ উপন্যাসে প্লটটি ব্যবহার করেছেন। আবার হতে পারে প্লটটির যথাযথ ব্যবহারের উপায় তিনি খুঁজে পাননি। এ দুটি কারণেই প্লটের বিস্তার লক্ষ করা যায় না।

১.৪

বনফুলের *সে ও আমি* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। 'সে' লেখকের অর্থাৎ উত্তমপুরুষ 'আমি'র নারীরূপিনী বিবেক। প্রতি রাতেই 'সে' হানা দেয় লেখকের ঘরে। লেখক যখন তাঁর ব্যর্থ জীবনের কাহিনি লেখতে বসেন ঠিক তখনই 'সে' এর আবির্ভাব ঘটে। 'সে' লেখকের সব কথাই জানে। লেখকের প্রেমের কথা পরিবারের কথা, বিদেশে বসবাসকালীন সবকথা। সময়ে সময়ে সেসব ঘটনা লেখককে শুনিয়ে প্রমাণ দেয় তাঁর বিবেক। পাশাপাশি তাঁর দোষত্রুটির কথা বলতেও ছাড়ে না। আর তার এইসব কর্মকাণ্ডে লেখক অবাক থেকে অবাকতর হন। তাকে চেনার জন্যে লেখক কৌতূহলী হয়ে উঠেন। একপর্যায়ে 'সে' লেখকের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের মধ্যবিত্ত মানসিকতার অস্থিরচিত্তই লেখক প্রেমসিন্ধুর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। প্রেমসিন্ধু চরিত্রটি নানারূপে উপস্থাপিত হয়েছে এ উপন্যাসে। 'সে' কখনও জেলা মেজিস্ট্রেট, কখনও বাতাসীর অবৈধ প্রণয়ী থার্ড মাস্টার, কখনও পলাশী যুদ্ধের মোহনলাল, আবার মালতীর প্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামের যতীনের সহকর্মী, হিংস্র বেদুইন, আবার আনন্দমঠের ভবানন্দ, অর্জুন, ধর্মঘটের নেতা, 'সে' কখনও শ্রমিকবাদ, ধনিকবাদ ও নাৎসিবাদ নিয়ে মাথা ঘামায়। এইসব কিছুই কিন্তু তার সজ্ঞান মনের কর্মকাণ্ড নয়। কারণ কোনো মানুষই সব সময় সবদিক দিয়ে পরিমিতি বজায় রেখে চলতে পারে না। আর তখনই তার অবচেতন মন সক্রিয় হয়ে ওঠে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

বনফুলের সমসাময়িক কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা যখন যৌনক্ষুধাকে সাহিত্যের বিষয় করেছেন তখন বনফুল তাঁদের মত করে এতোটা না আনলেও যুগের প্রতিবিম্ব হিসেবে তাঁর কিছু লেখায় তিনি যৌনতাকে চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই এনেছেন। 'সে' ও 'আমি'র কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। 'আমি' 'সে' কে উদ্দেশ্য করে বলে, সাহিত্যিকেরা নাকি স্বভাবত বিলাসপ্রবণ হয় আর বিলাসের আবেষ্টনীতেই তাদের কল্পনা স্ফূর্ত হয়। তখন 'সে' জানতে চায় তাহলে তার কল্পনা কেনো স্ফূর্ত হলো না। জবাবে আমি বলে তার কল্পনা স্ফূর্ত হয়েছিল কিন্তু একা একজন মানুষের পক্ষে একটি খবরের কাগজ চালানো সম্ভব হয় না। কারণ পাঠক কেবল একজনের লেখা পড়ে তৃপ্ত হন না। ঠিক এসময় 'সে' উচিৎ কথাটি বলতে ছাড়েনি। সে স্পষ্ট করেই বলে যে, তার কাগজে যৌন-পিপাসা ছাড়া আর কোনো পিপাসার খোরাক ছিল না। 'আমি'ও তার এ কথার পিঠে বলেছিলেন যে, তাদের দলে যেসব লেখক জুটেছেন তাদের কলম দিয়ে অন্য আর কিছু বেরুল না, শুধু তাই নয় বেরুনো সম্ভবই ছিল না, 'কারণ সত্যিই ওঁরা সবাই যৌন ক্ষুধায় ছটফট করছিলেন'। (বনফুল, ২০১২/৪: ৮৫) উক্তিটির মধ্য দিয়ে লেখক সমসাময়িক মধ্যবিত্ত যুবকদের মানসিক অবস্থাকেই রূপদান করেছেন। আবার অন্যত্র প্রেমসিন্ধুকে বলতে শোনা যায়:

> আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম বটে, কিন্তু পড়াশোনার দিকে আমার মন ছিল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তীব্রভাবে যে জিনিসটা মনে জাগছিল, তা পাঠস্পৃহা নয়, যৌনক্ষুধা। এই সুস্থ স্বাভাবিক ক্ষুধার আহার সমাজ আমাকে দেয়নি, ক্ষুধাকে দমন করবার কৌশল পিতামাতা, শিক্ষক, বন্ধু কেউ আমাকে শেখায় নি, বাতাসী, টগর, মালতীরা আমাকে নিয়ে যা খুশি করেছে, আমি বাধা দিতে পারিনি, বাধা দিতে চাইনি। কামনার জয়গান শুনেছি সাহিত্যে, কামনার মূর্ত প্রকাশ দেখেছি আর্টে, ক্ষুধার অনলে ইন্ধন যুগিয়ে ক্ষুধিতকে পাগল করে তুলেছে এরা। (পৃ. ৬২)

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'আমি'র মধ্য দিয়ে লেখক সমকালীন মধ্যবিত্ত মানসের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তুলে ধরেছেন। এই প্রধান চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সমকালীন বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত মানসিকতার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। তার বাবা বিখ্যাত ব্যবসায়ী। কিন্তু সে বাবার বাধ্য ছেলে না হওয়ার দরুন তাকে ছন্নছাড়া হয়ে অনেকটা যাযাবরের মতোই জীবন কাটাতে হয়েছে। জীবন কাহিনী লিখতে যেয়েও তার নিজের কাছে জিজ্ঞাসা, কেনো সে তার জীবন কাহিনী লিখছে–

> নিজের জীবন কাহিনি লিখছি কেনো? যদি আর কেউ এ কাহিনি পড়ে শিক্ষা লাভ করে? আমি তো কত লোকের জীবন কাহিনি পড়েছি, কী লাভ হয়েছে তাতে আমার? তবে লিখছি কেন?... লিখতে বসে একটা দিকই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ক্রমশ। সত্যি আমার জীবন সব দিক দিয়েই ব্যর্থ। মনুষ্যকূলে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই আমার পরিচয় মানুষ, কিন্তু আসলে আমি পশু-মানুষ, তার বেশি এক ধাপও উঠতে পারিনি। পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার যে স্বাভাবিক শক্তি অন্যান্য পশুর আছে, তাও আমার নেই, তার জন্যে প্রতি পদে অপরের করুনা ভিক্ষা করতে হয়েছে। ভাবছি এমন কেন হল? এই ব্যর্থতার মূল কারণ কি? আমাদের দেশে সকল ব্যর্থতার মূল কারণ অবশ্য একটি–আমরা পরাধীন জাতি। (পৃ. ৬৭)

প্রধান চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক মধ্যবিত্ত মানসের আদর্শ, তার দেশপ্রেম, যৌন আসক্তি, প্রেমে ব্যর্থতা, উচ্চাভিলাসী, শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, স্যাকুলার মানসিকতা, আত্মপ্রবঞ্চনা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয়সাধন করেছেন। যুগের অস্থিরতা, চিন্তার অগভীরতা, খামখেয়ালি মন সব সময় 'আমি' চরিত্রটিকে অর্থাৎ প্রেমসিন্ধুকে তাড়না করেছে। পড়ালেখা, প্রেম, আদর্শ সে কোনো কিছুই ধরে রাখতে পারে না, তাই কোনো লক্ষেই সে পৌঁছতে পারে না। গোঁড়া হিন্দু বাবার ছেলে হয়েও সে মদ খেয়েছে। মালতীর প্রেম-প্রত্যাখান পত্রের মর্মও সে বুঝতে পারেনি। মালতীর বাবার টাকায় সে বিদেশ যায় আইসিএস হয়ে দেশে ফিরে মালতীকে বিয়ে করবে বলে। কিন্তু সেখানে যেয়ে সে মালতীর বাবার টাকার অপব্যবহার করেছে। মদ খেয়েছে, রিভেয়ারা, মন্টি, কার্লো গিয়েছে; প্রেম কিনেছে ও বিলিয়েছে; দামিস্যুট পরে বিবাগি রাজপুত্র বলে প্রচার করেছে। এ সময় আবার দেশপ্রেমও জেগেছে। ফলে দেশের কল্যাণে সভা-সমিতির আয়োজন করে সাহেবদের ডিনার খাইয়েছে, স্বদেশ-বিদেশের খবরের কাগজে শিরোনাম হতে। শ্রমিকবাদ, ধনিকবাদ, নাৎসিবাদ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। মাতাল হয়ে দেশের জন্যে প্রাণ দিতে

সংকল্পও করেছে। অতি আধুনিকতার লেবেল মেরে সাহিত্য-সমাজ-রাজনীতি সবকিছুকে ব্যঙ্গ করেছে। এমনকি – 'একে ওকে তাকে ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করেছি একটা মোটা মাইনের চাকরির।' (পৃ. ৬৩)

উপন্যাসের শেষে লেখকের বিবেক তাকে ন্যায়সঙ্গত পরামর্শ দিয়ে বলে – 'সংসার করতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে। আমার একটা পেট কোনরকমে চালিয়ে নেব – এ মনোবৃত্তি পশুর, মানুষের নয়। সমাজের দায়িত্ব ঘাড়ে করে সমাজের সুখ দুঃখের অংশ নিয়ে সৎপথে জীবনযাপন করার নামই মনুষ্যত্ব, তাই দেশ সেবা।' (পৃ. ১০০) আর তাই তার জীবনে অলৌকিক রাজ্যে বাস করছে মালতী আর লৌকিক জীবনে তার সঙ্গী হয়েছে মিনতি।

ব্যবসায়ীর সন্তান হয়েও প্রেমসিন্ধু ভবঘুরের জীবন বেছে নিয়েছে। বাবা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছে। সে শিক্ষকতা করে, অবৈধ নারীসঙ্গে লিপ্ত হয়, মাতব্বর হেমন্ত দাশগুপ্তের কাছে ধর্না দেয় সদাগরি অফিসে চাকরি পেতে আবার গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের ম্যানেজার পদটিতে চাকরির জন্যে তার কাছে যায়। একটি পত্রিকাও বের করেন। কিন্তু সেটিও বেশিদিন টিকেনি কারণ পয়সার সংকুলান হচ্ছিলো না, প্রেসে অনেক টাকা দেনা করে বাবার কাছে ফিরে আসা। গৌরীশঙ্করবাবুর মিলের শ্রমিকদের সে ক্ষেপিয়ে তোলে। শ্রমিকদের সাথে মিলে সে ধর্মঘটে অংশ নেয়। কিন্তু এ পথেও সে বেশিদূর হাঁটতে পারেনি। তৎকালীন সমাজের মধ্যবিত্ত চরিত্রের নানামুখীস্বরূপ প্রেমসিন্ধু চরিত্রটির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। দরিদ্র ঠাকুরদাসের ঘরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের প্রসঙ্গটি তুলে ধরে নিম্ন মধ্যবিত্ত চরিত্রের প্রতি লেখকের যে সহানুভূতি জড়িয়ে রয়েছে সে বিষয়টির প্রতি পাঠকের নজর কাড়ে।

বনফুল প্রতিনিয়ত ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান বিষয় ও আঙ্গিকের নব রূপায়নে। এটা তার সহজাত। এই উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে বনফুল নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষা চালিয়েছেন এবং সে আঙ্গিকের মাধ্যমে সফলভাবে উপন্যাসের জগৎটিকে তিনি বিস্তৃত করতে পেরেছেন। উপন্যাসটিকে অনেকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলে আখ্যা দিয়েছেন।

১.৫

জঙ্গম উপন্যাসটির তিন খণ্ড। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সালের অন্তর্বর্তীকালীন অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে বনফুলের *দশভাণ* একাঙ্কিকা ও ছোটগল্প *বিন্দুবিসর্গ* নামে দুটি গ্রন্থ বের হয়। *জঙ্গম* প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে বনফুলের *শ্রীমধুসূদন* ও *বিদ্যাসাগর* নামে দুটি জীবনী নাটক, *রাত্রি* উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তারও আগে বনফুলের বন্ধু শনিবারের চিঠির ও শনি রঞ্জনপ্রেসের কর্মকর্তা সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় বনফুলকে অনুরোধ করেছিলেন শনিবারের চিঠির জন্যে একটি প্রহসন লিখতে। তখন বনফুল *মন্ত্রমুগ্ধ* নাটক লিখতে শুরু করেন। এই সময় তিনি আরো একটি কাজে হাত দেন। পশ্চাৎপটে তিনি উল্লেখ করেছেন:

এই সময় আমি একটি বড় উপন্যাসও আরম্ভ করি। তখনকার জীবনস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যে অসংখ্য চরিত্র আমি দেখিয়াছি বা কল্পনা করিয়াছি, তাহাদের লইয়া আমি 'জঙ্গম' শুরু করিয়া দিলাম। 'জঙ্গম' লিখিয়া শেষ করিতে বেশ সময় লাগিয়াছিল। সজনী মাঝে মাঝে আসিয়া শুনিয়া যাইত এবং আমাকে খুব উৎসাহ দিত। 'জঙ্গম' উপন্যাসে একটি কোনো সুগঠিত প্লট নাই। ইহা একটি লোকের জীবন প্রবাহের চতুর্দিকে নানাবিধ চরিত্রে আবর্তন ও বিবর্তন। বস্তুতঃ, 'জঙ্গম' আমি তদানীন্তন সমাজের বহুমুখী চিত্তবৃত্তিকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। 'জঙ্গম' উপন্যাস শেষ পর্যন্ত একটা বড় আর্ট গ্যালারি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক সমালোচক বইটিকে বহু চরিত্রের মিছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।...এই সময় আমি যেন একটি উন্মাদনার মধ্যে থাকিতাম। সমস্ত দিন ল্যাবরেটরির কাজ এবং রাতে সাহিত্য সাধনা।' (বনফুল, ১৯৯৯: ২০৪)

জঙ্গম শব্দের অর্থ গতিশীল এর বিপরীত শব্দ স্থাবর। *জঙ্গম* প্রকাশিত হবার সাত বছর পর *স্থাবর* নামে বনফুলের একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। বহু আঙ্গিকের স্রষ্টা কেবল বনফুলের পক্ষেই এই সৃজনশীলতার প্রমাণ দেয়া সম্ভব। জঙ্গমের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান যে চরিত্রটির তার নাম শঙ্কর। তৎকালীন বিহারের মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র শঙ্করের জঙ্গম জীবনকে ঘিরে বহু চরিত্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে তার জীবনকে করে তোলে জঙ্গমময়। লেখক তাঁর *পশ্চাৎপট* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'জঙ্গমের অনেক চরিত্রই কলকাতার বহমান জনস্রোতের ভিতরই ভাসিতে ভাসিতে আমার মনে আটকাইয়া গিয়াছে। অনেক পরে কল্পজগতের নতুন পরিবেশে তাহারা নতুন রূপ ধারণ করিয়াছে।' (পৃ. ১৬০) এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্যে বনফুলের মেডিকেল জীবনের এক বন্ধুর চরিত্রের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। আবার বনফুল যখন চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চারুবাবুর অধীন ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিশ করছিলেন ঠিক সেসময় বনফুলের ল্যাবরেটরিতে একজন পুলিশ আসতো হাঁপানি রোগের চিকিৎসা করাতে। পুলিশটি ছিল মনে-প্রাণে স্বদেশী তাই তার সাথে বনফুলের ভাব জন্মায়। ইংরেজদের কথা প্রসঙ্গে একবার বনফুল তাকে বলেছিলেন – 'ইংরেজদের যতই দোষ থাকুক তাহারা দুষ্টের শাসন করে' (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ৭৪) বনফুলের এই কথার জবাবে ভদ্রলোক পুলিশটি বলেছিল – 'ইংরেজ গরীব দুষ্টদের শাসন করে, বড়লোক দুষ্টদের পোষণ করে।' (প্রাগুক্ত) তিনি বনফুলকে তার এই কথার প্রমাণ দেন একটি অবাক করা ঘটনা দেখিয়ে। ঘটনাটি হলো একজন মহারাজার কামোদ্রেক করা তেজোস্বিনী তন্বী মেয়েকে ক্লোরোফর্ম করে বাক্সবন্দি অবস্থায় মহারাজার কাছে পৌঁছে দেয়া। গোপনে পাচার করার অর্ডারটি ছিল উক্ত পুলিশের উপর। মেয়েটিকে মহারাজার কাছে কীভাবে পাচার করে দেওয়া হয়েছে, সেই ঘটনাটিই পুলিশ বনফুলকে সঙ্গে করে নিয়ে দেখিয়েছেন। এই ঘটনাটিকে বনফুল *জঙ্গমে* ব্যবহার করেছেন। বনফুলের ব্যক্তিগত জীবনের এমন অনেক ঘটনা এই উপন্যাসে তিনি স্থান দিয়েছেন।

শঙ্কর বিহারের গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে একটি কলেজে ভর্তি হয়। হোস্টেলে থেকে সে পড়াশোনা করে বিজ্ঞান বিষয়ে। তাকে কেন্দ্র করেই অজস্র ঘটনা ও চরিত্র এ উপন্যাসে শাখা বিস্তার করেছে। শঙ্করকে জীবনের প্রথম দিকে

দেশপ্রেম পরে বিজ্ঞান চর্চা সাহিত্যচর্চা, কখনও টিউশনি, কখনও প্রুফ-রিডার আবার কখনও পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করতে হয়েছে। শঙ্করকে তার বাবার পছন্দের পাত্রীকেই বিয়ে করতে হয়েছে। বাবার দেয়া শর্ত না মেনে বিয়ে করাতে বাবা তাকে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। অনেক পরে সে জানতে পারে যে তার স্ত্রী সুরমার নামে সব সম্পত্তি তার বাবা উইল করে রেখে গিয়েছে। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে ভারতবর্ষের গ্রামীণ উন্নয়নে মনোনিবেশ করে সে। শঙ্করের গ্রামে ফিরে আসার পেছনে একটি ঘটনা ক্রিয়াশীল ছিল। একদিন শঙ্কর মধ্যরাতে বাড়ি ফিরে লেটার বরাবরের এতলেটার বক্স থেকে *মজদুর দর্পণ* নামে একটি মাসিকপত্র উল্টাতেই তাঁর চোখে পড়ে তাঁকে নিয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। ক্লান্ত দেহে প্রবন্ধটি পড়ার এক পর্যায়ে তাঁর সম্পূর্ণ মন ক্ষোভে গ্লানিতে ভরে যায়। তাঁর মানসপটে প্রবন্ধ লেখক নিপুদার মুখখানা ভেসে উঠে। ঠিক এই মুহূর্তে স্ত্রী সুরমা এসে সন্ধ্যার সময় ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনাটি বর্ণনা করে। সন্ধ্যার সময় বাড়িতে চাকর না থাকায় নিতাই ঠাকুরপো মদ খেয়ে হঠাৎ সুরমার পেছন দিক থেকে তাকে জাপটিয়ে ধরে। অনেক ধস্তাধস্তির পর সুরমা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। আর এই সুযোগে নিতাই ড্রয়ার টেনে চাবি নিয়ে আলমিরা থেকে গহনার বাক্স বগলদাবা করে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি শুনে শঙ্কর হতভম্ভ। সহসা সে মনস্থির করে ফেলে সে গ্রামে ফিরে যাবে, পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টাতে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। কলকাতায় আর নয়। সাহিত্যের স্বপ্ন তার ভেঙে যায়। যে ভাবনা সেই কাজ। পরের দিন সকালে বন্ধু উৎপলের বাসায় গিয়ে হাজির। তাকে জানায়, সে তার সাথে গ্রামেই ফিরে যাবে। বন্ধু উৎপল অবশ্য অনেক আগেই শঙ্করকে গ্রামে গিয়ে তার জমিদারি তত্ত্বাবধানের জন্যে প্রস্তাব দিয়েছিল। তখন শঙ্কর সম্মতি দেয়নি। কিন্তু অমিয়াকে ঘিরে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শঙ্করের কলকাতায় থাকার সব ইচ্ছে ফুরিয়ে গেছে। তবে শঙ্করের সাথে গ্রামে ফিরে যাওয়ার তাঁর একটি শর্তও ছিল– বিষয়টি গোপন রাখতে হবে। সে উৎপলের অধীন কাজ করবে কিন্তু নিজের এতকরে স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায় সে। 'তবে আর একটা কথা আছে, সেটাও বলে রাখা ভালো। মাইনে আমি কম নিতে রাজি আছি, কিন্তু আমার কাজে তুমি যখন তখন বাধা দিতে পারবে না। তা হলে কিন্তু বনবে না ভাই' (বনফুল, ২০১২/৩: ৫৯২)। যাবার আগে তাঁর বন্ধু ভণ্টুর সাথে দেখা হয়নি। ভণ্টু বন্ধু শঙ্করকে বিদায় দিতে স্টেশনে আসার উদ্দেশে রওয়ানা করলে পথে সড়ক দুর্ঘটনায় তার পায়ের হাড় ভেঙে যায়। সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। ভণ্টুর ভাইপো শন্টু স্টেশনে এসে শঙ্করকে খবরটি দেয়। খবরটি শোনা মাত্র শঙ্কর স্টেশন থেকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফোন করে ভণ্টুর সাথে কথা বলার আশায়। কিন্তু ভণ্টুকে মর্ফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তার সাথে শঙ্করের আর কথা হয় না। এরই মধ্যে–

কলিকাতা পরিত্যাগের পর দেখিতে দেখিতে চার বৎসর কাটিয়া গেল। যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা অনেকটা সফল হইয়াছে বইকি। দশটি পাঠশালা, একটি বালিকা বিদ্যালয়, গোটা দুই দাতব্য চিকিৎসালয়, দুইটি কো-অপারেটিভ ব্যাংক স্থাপিত হইয়াছে। দরিদ্র চাষিদের জলকষ্ট নিরারণের জন্যে প্রতি গ্রামে গ্রামে ইদারা প্রস্তুত করানো হইয়াছে, পুরাতন কূপগুলির সংস্কার-সাধন করা হইতেছে। ইহা ছাড়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সহজ প্রতিষেধ্য সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ প্রভৃতির জন্যেও চেষ্টার ত্রুটি নাই। (বনফুল, ২০১২/৩: ৫৯৮)

দুই বছরের কন্যার বাবা শঙ্কর নিপুদাকে গ্রামে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও স্যানিটেশনের কাজ দিয়ে তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়। বালিকা বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার দেয়ার বিষয়েও শঙ্কর নানা চিন্তা-ভাবনা করে। কলকাতা থেকে হাসিকে অনেক অনুরোধ করে আনায় সে। তার ওপর বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার দিয়ে নিশ্চিত হয় শঙ্কর। শঙ্করের মতে, 'শিক্ষয়িত্রী হইতে হইলে মনের যে সমতা ও প্রসন্নতা থাকা উচিত, ...মাতৃত্বই নারীত্বের পূর্ণ পরিণতি। তাহা লাভ না করিলে চিত্তের স্বাভাবিক বিকাশ হয় না। তাই হাসিকে সে আনিয়াছে রয়েছে। তাহার নারীমনের অবলম্বনস্বরূপ একটি পুত্রও আছে। (পৃ. ৫৯৯) এদিকে, চাষাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসে শঙ্করের মনে হয়েছে, কত দরিদ্র অথচ কত মহৎ উহারা! উহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া শঙ্কর ইহাই বুঝিয়াছে যে, মানব-চরিত্রে যেসব গুণকে আমরা শ্রদ্ধার চোখে দেখি, তাহা উহাদের চরিত্রেই প্রচুর পরিমাণে আছে। (পৃ. ৫৯৯) তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের চরিত্রে এমন কিছুই নাই যাকে শ্রদ্ধা করা যায়। যা আছে তা কেবল স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল একটা হীন-ধরণের চতুরতা মাত্র। পল্লি-উন্নয়নের এতসব কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেও শঙ্করের মধ্যে সাহিত্য চর্চা অব্যাহত ছিল। তার সাহিত্যিক জীবনটা অনেকটা অনাড়ম্বরভাবেই শুরু হয়েছিল। শঙ্করের সাহিত্যিক জীবন শুরুর পশ্চাতের ঘটনাটি হলো – একদিন শঙ্কর তাঁর বাসায় এসে দেখে ঘরের বাইরে একটি মোটর দাঁড়িয়ে আছে, ঘরের কপাট খোলা। ভিতরে প্রবেশ করে বিস্মিত হয়ে দেখতে পায় সাহেবি পোশাক পরে একজন ভদ্রলোক তার বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কেবল তা-ই নয়। লোকটির শরীর থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। কিছু সময় পর শঙ্কর লোকটির গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দেয়াতে লোকটি উঠে পড়ে এবং শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করে সে কে? শঙ্কর বলে, এটা তার বাসা। উভয়ের কথাবার্তার এক পর্যায়ে সাহেবটি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, তার বাবার সুবাদে অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে তার আলাপ আছে। প্রসঙ্গক্রমেই সাহেবটি শঙ্করকে জিজ্ঞেস করেন, তার ঝোঁক কোন দিকে। শঙ্করের সাহিত্যচর্চার দিকে ঝোঁক রয়েছে জেনে তিনি শঙ্করকে একটি কার্ড দিয়ে এবং কার্ডে সাহিত্য-রসিক একজনের নাম লিখে বলেন, তার সাথে দেখা করতে। কিন্তু কার্ডে ঠিকানা ছিল না। ভাগ্যিস, শঙ্কর লোকটির মুখে শুনেছিল সাহেবটি বিডন স্ট্রিটে থাকেন। সাহেবটির বাড়ি ঠিকই খুঁজে বের করলো শঙ্কর কিন্তু তিনি বাড়িতে না থাকায় তার সঙ্গে শঙ্করের দেখা হলো না। শঙ্কর একটি বইয়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। সেখানে একটি

মাসিকপত্র চোখে পড়ায় সেটা উল্টাতেই পেয়ে যায় সেই সেই সাহিত্যরসিক লোকটির ঠিকানা। মাসিকপত্রের পেছনের দিকে 'একজন দক্ষ প্রুফরিডার' চেয়ে একটি বিজ্ঞাপন রয়েছে। তাতে বলা আছে, যোগেন রায় বরাবর আবেদন করতে এবং নিচে ঠিকানা দেয়া আছে। ঠিকানা পেয়ে অবিলম্বে শঙ্কর রওয়ানা হয়ে যায়। এভাবে শঙ্করের হিরণবাবুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। প্রাথমিক কাজ হিসেবে হিরণবাবু শঙ্করকে *ডাম্বেল মুগুর ও বারবেল* বইয়ের প্রুফ রিডিংয়ের কাজ দেয় দৈনিক একটাকা মজুরিতে। অনাড়ম্বরভাবেই শঙ্করের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়। পরবর্তীতে শঙ্করের সংস্কারক পত্রিকায় চাকরি হয়।

পল্লীর উন্নয়ণমূলক কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলেই শঙ্কর লেখালেখি করে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ মাঝে মাঝে সে লেখে। তাঁর এক সময়ের কর্মস্থল *ক্ষত্রিয়*, *সংস্কারক* পত্রিকায় সেসব লেখা প্রকাশিত হয়। তাঁর *হাতুড়ি* নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বইটি অনেকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায় পত্রযোগে *হাতুড়ি* সম্পর্কে মন্তব্য লিখে পাঠান। শঙ্কর পল্লীর উন্নয়ণমূলক কাজ করেই ক্ষান্ত হয় না গ্রামের অতি সাধারণ মানুষের জন্যে তার সহযোগিতার হাত সক্রিয় থাকে। সাহিত্য সেবার চেয়ে গরিব-দুঃখীদের কীসে ভালো হবে সে-চিন্তাই শঙ্ককরকে ভাবায় বেশি। এমনকি শঙ্করের স্ত্রী অমিয়াও যথাসাধ্য গরিব-দুঃখীদের জন্যে তার সহমর্মীতার হাত বাড়িয়ে দেয়। অনেক পোষ্য প্রতিপালন করে অমিয়া। তাদের মধ্যে একজন ঝুমমর। সে অনেক রকম জানোয়ারের ডাক ডাকতে পারে এবং ভিক্ষা করে জীবনধারণ করে। এক সময় সে সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে কাজ করতো। তার তিনটি ছেলের মধ্যে দুটি নাবালক। একবার ঝুমমর তার প্রভূর জন্যে কাঠ সংগ্রহ করতে গাছে উঠলে পা ফসকে পড়ে যায়। তাকে প্রাণে বাঁচাতে শেষমেষ তার একটি পা কেটে ফেলে দিতে হয়। এ অবস্থায় বেচারিকে স্ত্রীর মারধোরও সহ্য করতে হয়। না পারতে নাবালক দুই ছেলেকে নিয়ে সে পালিয়ে আসে। তার কাশি কিছুতেই সারছে না, গলাটা ভেঙেই আছে। যার দরুন সে জানোয়ারের ডাক ডাকতে না পারায় তার ভিক্ষাবৃত্তিটাও বন্ধ হয়ে আছে। শঙ্কর তাকে নিয়ে হাসপাতালে যায় কিন্তু হাসপাতালে ডাক্তারকে না পেয়ে সে তার বন্ধু উৎপলের বাড়িতে আসে। এসে দেখে এখানে ডাক্তার বসে আছেন। ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে শঙ্কর বলে, ঝুমমরকে সে হাসপাতালে বসিয়ে রেখে এসেছে, তিনি যেন গিয়ে তার চিকিৎসা করেন – এভাবে ফুলশরিয়া, হরিয়া, মণি অসহায়দের পাশে দাঁড়ায় শঙ্কর। উৎপলের স্ত্রী সুরমার শাড়ি-গহনা চুরি করায় উৎপল থানায় খবর দিয়ে ওদের পুলিশে ধরিয়ে দেয়। ফরিদ, কারু,পূরণ, হরিয়ার জামিন হয়ে ওদের ছাড়িয়ে আনে শঙ্কর। উৎপলের জমিদারীর সব প্রজার দেখভাল করে শঙ্কর।

গ্রামের বাইরে কৃষকদের চাষাবাদের জন্যে ইঁদারা তৈরি করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই ইঁদারাগুলো ধসে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী গ্রামের ছেলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসায় শঙ্কর তাকেই ইঁদারা তৈরির কন্ট্রাক্ট দেয়।

বন্ধু উৎপলের কথায় সে বিদেশি কোনো কোম্পানিকে এ কাজের ভার দেয়নি। কিন্তু গ্রামের ছেলে হয়েও ইঁদারা তৈরির কাজে জীবন চক্রবর্তী ফাঁকি দিয়ে পুরো টাকাই আত্মসাৎ করেছে। তার কাজের অসততায় শঙ্করের ভেতরটা জ্বালা করছিল–

> কোনো সাহেবের আপিসে চাকরি করিতে পাইলে এই জীবন উপরওয়ালার চাবুকের ভয়ে অতিশয় দক্ষতার সহিত কাজ করিত, চুরি করিতে সাহস পাইত না। ... চাবুক না মারিলে কাজ করিবে না, ... বাহিরে কি অপরূপ ছদ্মবেশ। বি এ পাশ করিয়াছে, দেশের সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে, রাজনীতির কথায় মুখে খই ফোটে, বর্তমান যুদ্ধের প্রগতি ও পরিণাম বিষয়ে বিজ্ঞের এতবচন বিস্তার করে, লেনিন-স্টালিন-গান্ধি সকলের চরিত্র নখদর্পণে, দেশের বেকার সমস্যা লইয়া ক্ষোভের অন্ত নাই, অথচ নিজে চোর। এই ছোকরাই সেদিন সামান্য লাউ চুরির অপরাধে নিজেদের চাকরটাকে পুলিসে দিয়াছে। হঠাৎ শঙ্করের নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে হইল। দেশের শিক্ষিত যুবকরাই তো দেশের আশা ভরসা, তাহাদের উপর যদি আস্থা স্থাপন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে উপায় কি। ...কেন এমন হয়। ইহারা শিক্ষিত, ইহাদের সমস্ত শিক্ষা এমনভাবে নিষ্ফল হইয়া গেল কেন? (পৃ. ৬৪০)

শেষ পর্যন্ত শঙ্করকে বন্ধু উৎপলের কথায় ইঁদারা নিয়ে মামলা করতে হয়েছে। মামলার কাজে চার বছর পর তাকে কলকাতায় যেতে হয়। ইঁদারা নিয়ে জীবন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মামলা করার তেমন ইচ্ছা শঙ্করের ছিল না। বন্ধু উৎপলের ইচ্ছায় মামলা করতে হলো। কারণ জমিদারি উৎপলের। শঙ্কর মামলা করতে অস্বীকার করলে উৎপল হয়তো সেটা মেনে নিতো। কিন্তু এই হয়তোর উপর আস্থা রাখতে পারে না মধ্যবিত্ত মানসিকতায় লালিত ব্যক্তিরা। যেমন পারেনি শঙ্কর। মধ্যবিত্ত এইরূপ মানসিকতার ব্যক্তিদের মত দ্রুতই পরিবর্তনশীল। উপরের উদ্ধৃতিতেই দেখতে পাওয়া যায়, জীবন চক্রবর্তীকে নিয়ে শঙ্করের যে-ভাবনার উদ্রেক হলো বিশেষ করে তার শিক্ষা নিয়ে শঙ্করের সংশয়, অর্থাৎ জীবন চক্রবর্তীর সারা জীবনের শিক্ষাই যেন নিষ্ফল হয়ে গেলো ইঁদারার টাকা আত্মসাৎ করে খাওয়ায়। কলকাতায় এসে শঙ্করের এমনও মনে হলো – আবারও ইঁদারা করে দিয়ে লাভ কী? মামলা জিতে জীবন চক্রবর্তীর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করে পুনরায় যদি পঁচিশটি ইঁদারা করে দেয়া যায়, তাতে কী চাষীদের দুঃখ মোচন হবে? যে অঞ্চলে জলকষ্ট নাই সেখানকার চাষীরা কি সুখী? তা তো নয়। সবাই দুঃখী, সবাই ঋণগ্রস্ত, সবার টাকার অভাব। সবাই টাকা চায়। টাকা না হলে কোনো কিছুই সম্ভব না। (পৃ. ৬৭৪) শঙ্করের একই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় যখন পল্লী উন্নয়নের কাজে নিবেদিত নিপুদা তাকে বলে – তার পক্ষে দুই নৌকায় পা দিয়ে চলা আর সম্ভব না। নিপুদার মতের সাথে শঙ্কর আর উৎপলের মতের মিল নেই। তাই সে কলকাতায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শঙ্কর নিপুদার কলকাতায় যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে অনেক ভেবেছে। শেষে তার সিদ্ধান্ত নিপু ও নিপুদাদের মত লোকেরা আসলেই বঞ্চিত। পরবর্তীতে নিপুদার সঙ্গে শঙ্করের দেখা হলে শঙ্কর তাকে বলে,

'আমার মত যে ঠিক কি, আমিই তা জানি না। অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছি কেবল। আপনি চলে যাবেন না নিপুদা।' (বনফুল, ২০১২/৩: ৭০২)

ইঁদারাই নয়, গ্রামের স্কুলের শিক্ষক, হাসপাতালের ডাক্তার সবার কাজের খোঁজ-খবর রাখে শঙ্কর। এত কাজের মধ্যেও শঙ্কর পাগলা গারদে তার মায়ের জন্যে টাকা পাঠাতে ভুলে না। গ্রামে দাঙ্গা বাধছে, মহররম উৎসব হচ্ছে, মাঘী পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নান করতে চলছে সবাই। গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড উৎসব। সবকিছুতেই শঙ্কর মিশে আছে একাত্ম হয়ে সাধারণের মাঝে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, গ্রামে গ্রামে কলেরা মহামারির প্রাদূর্ভাব। জীবন বাঁচাতে লোকজন অন্য গ্রামে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। শঙ্কর এসময় দেশ সেবায় নিয়োজিত। সে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কাজ করে। সে মেথর পাড়ায় যায় কলেরা রোগীদের সেবা দেয়ার জন্যে। মেথরের মড়া বয়ে বেড়ায় সে। বিদেশি স্বেচ্ছাসেবকের সাথে কাজ করতে যেয়ে তার মধ্যে অনেক ভাবান্তর ঘটে এবং অবাকও হয় সে। এক বিদেশিকে সাহায্য করতে যেয়ে তার সাথে এক কুঁড়েঘরে গিয়ে শঙ্কর যা দেখে তাতে তার মনে হয়েছে মৃত্যুর স্তব্ধতায় চারদিক যেন সমাচ্ছন্ন। ঘরের ভেতর কলেরা রোগীরা এতবেহাল অবস্থায় ছিল যে, তা দেখে শঙ্করের মুখে কথা সরছিল না। অনেকক্ষণ পর শঙ্কর শুধু বলে উঠলো, 'এ কি? সাহেব মৃদু হাসিয়া বলে উঠলেন, এই আপনার দেশ! Your country lives in huts, not in palace,- lives like this and dies like this-' (পৃ. ৭৭২) মরা পোড়ানোর সময় শঙ্কর সাহায্যের জন্যে লোক খুঁজছিল। সহজে লোক পাওয়া যাচ্ছিলো না, কেউ মেথর পাড়ায় আসতে চায় না। কিন্তু তথাপি শঙ্কর আশা নিয়ে আছে যদি কেউ আসে। শঙ্করের উদ্বিগ্ন আর অসহায় অবস্থা দেখে সাহেব নিশ্চিতভাবে বলে দিলেন, কেউ আসবে না। এ দেশের লোককে তিনি চেনেন। সাহেবের কথা শুনে শঙ্করের যেমন লজ্জা হলো তেমনি রাগ হলো ভীষণ। সাহেবটি যখন মড়া কাঁধে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছেন এবং তখনও কেউ না আসায় এখানকার বাঙালি লোককে 'জানোয়ার' বলে গালি দিয়ে গেলেন। এবার শঙ্কর লোকটির ওপর যতটা না প্রীত হয়েছিল ঠিক ততটাই বিরক্ত হলো। কোনোভাবেই সে 'জানোয়ার' কথাটিকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি। নানারকম ভাবনা চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে আর বারবার শুধু মনে পড়ছে সাহেবের কথাটি। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে একদিন উৎপলের চিঠি পেলো শঙ্কর। চিঠিতে লিখেছে উৎপল মানবসুলভ কৌতুহল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যাচ্ছে। অর্থাৎ 'ইন ব্রিফ কিংগস কমিশন' পেয়ে যুদ্ধে যাচ্ছে উৎপল। জমিদারির সব দায়িত্ব সে শঙ্করকে দিয়ে যায়। আর গ্রামের সাধারণ জনগণের চলমান প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধানের উপায়ও বলে দিয়ে যায় সে। বন্ধু উৎপলের জমিদারির সর্বময় কর্তা হওয়ার পরও সে নিজেকে আর আগের অবস্থানে রাখেনি। নিজের জীবনকে সে কৃষক জীবনের সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। নিজের সাথে নিজের অনেক বোঝাপড়ার পর শঙ্করের অন্তর্যামী মন বলে, বিলাসীতা বর্জন করে

কাজ করে যাওয়ার জন্যে। তাই শঙ্কর বিবেকের আদালতে নির্দোষ থাকার মনস্থির করে। এখন থেকে সে কৃষক জীবনযাপন করবে গ্রামের ফরিদ, কারু ও বিষুণদের সাথে একাত্ম হয়ে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শঙ্কর স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান হয়েও প্রতি মুহূর্তেই টিকে থাকার সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে। সে সংগ্রাম তার যেমন মানসিক তেমনি শারীরিক। প্রধান এই চরিত্রটিতে বনফুল ভালো-খারাপ দুইয়ের মিশ্রণে সৃষ্টি করে অব্যাহত জীবন প্রবাহকে রূপদান করেছেন এই উপন্যাসে। প্রধান চরিত্র বলে তার মধ্যে কেবল নায়কোচিত ভালো গুণেরই সমাবেশ হবে-এমনটি তিনি দেখাননি। তাহলে উপন্যাসের জীবন্ত চরিত্রগুলোর রং ফিকে হয়ে পড়তো। এই উপন্যাসে অজস্র চরিত্র এবং প্রতিটি চরিত্র বাস্তবসম্মত। এখানে ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত চরিত্র, চাকুরি নির্ভর মধ্যবিত্ত চরিত্র, বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত চরিত্র, লোভ-লালসাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত চরিত্র, পরোপকারী ত্যাগী মধ্যবিত্ত চরিত্র, শিক্ষিত হয়েও কুসংস্কারে লালিত মধ্যবিত্ত চরিত্র, অর্থলোলুপ মধ্যবিত্ত চরিত্র, জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার মধ্যবিত্ত চরিত্র-এমন অসংখ্য চরিত্র রয়েছে। আমরা প্রধান প্রধান মধ্যবিত্ত নারী-পুরুষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

কেন্দ্রিয় চরিত্র শঙ্করের মধ্যে রয়েছে মধ্যবিত্তসুলভ অনেক বৈশিষ্ট্য। শঙ্কর এমন একটি চরিত্র যে কিনা জীবন চলার পথের অনেক প্রতিবন্ধকতাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে। কখনও ভেঙে পড়ে জীবনকে স্থবির করে তুলেনি, সাধারণ মানুষরা যেভাবে প্রতিবন্ধকতায় জীবনের গতিকে স্লথ করে দেয়। উপন্যাসে দেখা যায়, শঙ্কর বন্ধুর সাথে স্টেশনে যায় দেখা করতে এবং ফুল নিয়ে যায় বন্ধুপত্নির জন্যে। বাড়িতে ফেরার পথে ঘটনাচক্রে একটি মেয়ের সাথে পরিচয় ঘটে। পরবর্তীতে যখন মেয়েটির সাথে শঙ্করের দেখা হয় তখন শঙ্কর জানতে পারে যে, মেয়েটি দেহ ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে। পতিতা জানা সত্ত্বেও মেয়েটির প্রতি তার আকর্ষণ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এমনকি মেয়েটিকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তার কথামত শঙ্কর তাকে অনেক টাকা যোগাড় করে এনে দেয়। কিন্তু অন্য সবার এতসে টাকা উসুল করে ছাড়েনি। বনফুল শঙ্করকে এখানে তথাকথিত নায়করূপে চিত্রিত করেননি। যদি তা-ই করতেন তাহলে পতিতার প্রতি নায়কের আকর্ষণকে তিনি দেখাতেন না। এরই মধ্যে রিনির প্রতি শঙ্করের ভালো লাগা তৈরি হয়। এই ভালো লাগা থেকে বিয়ে করার চিন্তাও শঙ্করের মধ্যে কাজ করে। এক পর্যায়ে মিষ্টিদিদির কামাকাঙ্ক্ষায় জড়িয়ে পড়ে শঙ্কর। রিনিকে ঘিরে তার চিন্তা তখন অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এসময় বাবার চিঠি পেয়ে শঙ্কর বাড়ি যায়। অমিয়া নামের এক মেয়েকে বিনাপণে বিয়ে করে আসে সে। বিয়েতে শঙ্করের বাবা বেশি টাকা যৌতুক চাওয়ায় দুইপক্ষের মধ্যে দর কষাকষি চলতে থাকলে – ব্যাপারটি শঙ্করকে বিচলিত করে। পাশের ঘর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে সে বাবা ও হবু শ্বশুড়ের সামনে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠে বিয়েতে সে এক পয়সাও নেবে না। কিছুদিন পর শঙ্কর বিয়ে করে বউকে রেখে সে কলকাতায় চলে আসে। কয়েকদিন পরেই বাবার চিঠি পায় সে। বাবা

লিখেছে, বিনা পণে যে বিয়ে করতে পারে সে নিজের খরচ নিজে চালাতে পারবে, তাই শঙ্করকে তিনি আর টাকা না পাঠানোর কথা জানিয়ে দেন। মধ্যবিত্তের যে আত্মসম্মানবোধ, জীবনের বিশেষ মুহূর্তে কথা দিয়ে কথা রাখার প্রত্যয় সেই-বোধের তাড়নায় শঙ্কর জীবিকা উপার্জনের জন্যে উঠেপড়ে লাগে। তার সেই বোধের পরিচয় উপন্যাসের অনেক জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। বন্ধু উৎপলের সুপারিশে পাওয়া চাকরি আত্মসম্মানবোধের কারণে সে ফিরিয়ে দিয়েছে। এমনকি পতিতা মুক্তোর কাছেও তার আত্মসম্মানবোধ ছিল তীব্র। শঙ্কর মুক্তোকে যে পরিমাণ টাকা দিয়েছে সে টাকা সামান্য হওয়ায় মুক্তো তাকে অপমান করতে ছাড়েনি। পরবর্তীতে শঙ্কর অধিক টাকা উপার্জন করে মুক্তোর কাছে আসে কিন্তু টাকা রেখেই সে চলে যায়।

মধ্যবিত্ত মানসিকতার আরও একটি দিক হলো দেশপ্রেম। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর সে ঠিক করেছিল, অবিবাহিত থাকিয়া আজীবন দেশ সেবা করিবে। কংগ্রেসে ভলান্টিয়ারি করে, বন্যা-প্রপীড়িতদের জন্য চাঁদা আদায়, দ্বারে দ্বারে খদ্দর ফেরি এবং ঘরে ঘরে চরকা বিতরণ করে অদ্ভূত একটা উন্মাদনার মধ্যে কিছুসময় তার কেটেছিল। কিন্তু এ উন্মাদনাও তার বেশিদিন ছিল না –

> আইএসসি এবং বিএসসি পড়িতে পড়িতে বিজ্ঞানের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিল। দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, বিজ্ঞানের সেবা করিলেই প্রকৃত দেশসেবা করা হইবে। অবৈজ্ঞানিক রীতিতে দেশসেবা অর্থহীন। এ যুগে চরকা চালাইবার চেষ্টা বাতুলতা। বৈজ্ঞানিক পন্থায় দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান-চেষ্টাই সমীচীন। (পৃ. ৩৮৮)

কলকাতা শহরে শঙ্করকে চাকুরি জীবনের প্রথম অবস্থায় পত্রিকায় কাজ করতে হয়েছে। এই সময়ের মধ্যবিত্তরা শহরকে কেন্দ্র করে জীবিকা অর্জনের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্প্রদায় যেসব পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতো সেসব পেশার মধ্যে পত্রিকায় কাজ করা অন্যতম একটি পেশা ছিল। শঙ্কর প্রথম গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে এসে বসবাস করে। শহরের মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আবার গ্রামে ফিরে যায় সে। কাহিনির শেষের দিকে শঙ্কর দেশ সেবায় নিয়োজিত হয়। সে পল্লী উন্নয়নের কাজের পাশাপাশি দরিদ্রদের বিভিন্ন রকম সহযোগিতা করে।

কলকাতা শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত চরিত্র ভণ্টু, শঙ্করের বন্ধু সে। জীবনের কঠিন অবস্থা থেকে তিলে তিলে নিজের ভাগ্য গড়ার এবং যৌথ পরিবারের সবার প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের প্রয়োজন মেটানোর আপ্রাণ চেষ্টা এ চরিত্রটির মধ্য লক্ষ করা গেছে। শঙ্করের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভণ্টু একটি বাস্তবঘেষা, সংগ্রামী, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পরোপকারী, পরিবারমুখী, অনেকটা কমিডিয়ান-ভাবগোছের শিশুসুলভ চরিত্র। বৌদি, ভাইবোন, ভাগ্নে, বাবা, কাকা মিলে একটি যৌথ পরিবারে সে বাস করে। সবার দেখভালের দায়িত্ব তার উপরেই ন্যাস্ত, তার উপর দাদাকে টাকা পাঠাতে হয়,

বাবাকে বালাপোশ করে দিতে হয়। এই পরিবারে কখনও কখনও নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থাও দেখা গেছে। অভাবের সংসারে অর্থের সংস্থান করতে তাকে তার বাইকের বাতি বিক্রি করতে হয়। টাকার নিদারুন অভাব মেটাতে আর কোনো উপায় না পেয়ে চা-ব্যবসায়ী নিবারণবাবুর কুৎসিত মেয়েকে বিয়ে করবে বলে টাকা ধার করে। ভাগ্যক্রমে তার অফিসের বড় কর্তার মেয়ের সাথে তার বিয়ে হলে ধারের টাকা ফিরিয়ে দেয় সে। লেখক মানসিক চাপে ভারাক্রান্ত এই চরিত্রটির প্রচ্ছন্নে লুকিয়ে থাকা চাপা কষ্টকে প্রকাশ করেছেন এভাবে – একদিন বাচ্চারা খেলতে গিয়ে তেলের ভাঁড়াটি উল্টিয়ে ফেলে দেয়। টানাপোড়েনের সংসারে ভাঁড়ার সব তেল ফেলে দেয়ার বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে না পেরে তাদের বেদম প্রহার করে। পরক্ষণে আঘাতের জায়গায় সে-ই ওষুধ লাগিয়ে দেয়। আর বাইরে এসে চোখের জল মোছে সে। কষ্ট ভুলে থাকতে প্রায়ই শিশুসুলভ আচরণ করে সে। ভণ্টু তার কাছের লোকদের নিজের দেয়া নামে ডাকে, যেমন-বৌদিকে বিড্ডিকার, শঙ্করকে চামগ্যানঢঅ, মৃন্ময়কে মোমবাতি, দশরথকে অরিজিনাল, লক্ষ্মণবাবুকে প্রোটোটাইপ। এভাবে ছদ্ম নামে ডাকা ভণ্টুর চরিত্রেরই একটি বৈশিষ্ট্য বলা যায়। আবার শয়তান লোককে চামলদ, প্রতিকুল পরিবেশ বোঝাতে ভীমজাল, পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বোঝাতে লদ্‌কালদ্‌কি শব্দ ব্যবহার করে সে।

মৃন্ময় চরিত্রটিকে স্ত্রীর ভালোবাসায় কাতর চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। তার প্রথম স্ত্রী বিয়ের এক বছরের মাথায় নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর থেকেই প্রতিটি ক্ষণ মৃন্ময় তার স্ত্রীর অপেক্ষায় প্রহর গুণে। অনেক খোঁজাখুজির পর ব্যর্থ মনোরথ হয়ে এক পর্যায়ে সে পুলিশের মেয়েকে বিয়ে করে কেবল স্ত্রীকে খুঁজে পেতে সহজ হবে এ কারণে। সে সময় পেলেই হারানো স্ত্রীকে মনে করে চিঠি লেখে এবং তা বাক্স বন্দি করে রাখে। দ্বিতীয় স্ত্রী হাসি বিষয়টি জানার পরও মৃন্ময় চিঠি লেখা বন্ধ করে থাকেতে পারেনি। একদিন কষ্টের ফল কেষ্টর সন্ধান পেল সে। 'নারী-খাদক গ্যাং' ধরা পড়ে। সে খবরের কাগজে 'বন্দি নারীর তালিকায়' তার নিখোঁজ স্ত্রী স্বর্ণলতার নাম দেখতে পায় – 'মৃন্ময় বিবর্ণমুখে চাহিয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি বিহ্বল, ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছে।' (পৃ. ৫২৭) মৃন্ময় পরিকল্পনা করে অফিসের টাকা চুরি করে জেলে যায় এবং 'নারী-খাদক গ্যাং' এর অন্যতম সদস্য অচিনবাবুকে হত্যা করে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। লেখক এ চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা পূর্ব ভারত সমাজের নৈতিকতার অবক্ষয়ের দিকটি তুলে এনেছেন।
নাগরিক জীবনের একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গ মানসিকতা জ্যোতিষী করালী চরণ বকসি চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। তার প্রথম শ্রেণির ডিগ্রি, গণিতশাস্ত্রে তার পাণ্ডিত্য শহরের লোকদের অবিদিত নয়। তার এক চোখ পাথরের। হাতে টাকা এলেই পাণীয় পান করে ঘনঘন। টাকার বিনিময়ে সে কুষ্ঠি গণনা করে দেয়। এ কাজে সে একটু বেশি ফি নিয়ে থাকে। সে খাঁচায় দাঁড়কাক পোষে। তার একাকিত্ব জীবনে কাকটি একমাত্র সঙ্গী। মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দেয়া এই ব্যক্তিটির একবার ভীষণ ইচ্ছে হয় নিজের জন্ম পরিচয় জানার। সে ভণ্টুর কাছ থেকে টাকা ধার করে দ্রাবিড় যায়

তার জন্ম তিথি জানতে। দ্রাবিড়ে গিয়ে করকোষ্ঠী হতে জন্ম তারিখ উদ্ধার করে নিশ্চিত হয় যে, তার মা বেশ্যা ছিলেন। এরপর থেকেই করালীর জ্যোতিষশাস্ত্রে অবিশ্বাস জন্মেছে। নিজের পরিচয় সবার কাছ থেকে আড়াল করার জন্যে করালী কলকাতা ত্যাগ করে। কলকাতা ত্যাগ করার আগে করালীর মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা জন্ম লাভ করে। করালী জাত-পাত থোরাই কেয়ার করে। তার এক বেশ্যা প্রতিবেশি যাকে সে একদমই সহ্য করতে পারতো না তার লাশ কাঁধে বয়ে বেড়িয়েছে সে।

মুকুজ্জেমশাই একজন পরোপকারী হিতৈষিণী লোক। যারা বেকার তাদের কর্মসংস্থানের জন্যে তিনি মরিয়া হয়ে উঠে তাদেরকে কাজ পাইয়ে দেন। বাবা-মাহীন সন্তানকে মানুষ করতে তাদের দায়িত্ব নেন। যেমন – এতিম হাসিকে এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় রেখে তার দেখাশোনা করেন তিনি। বড় করে তাকে বিয়ে দেন। চা ব্যবসায়ী নিবারণের মেয়ে প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে গেলে জনশ্রুতি উঠে সে হারিয়ে গেছে। মুকুজ্জে মশাই উদ্ধার তৎপরতার কাজে লেগে পড়ে তাকে উদ্ধার করে আনেন। এবং সামাজিকভাবে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। এমন অনেক কাজের কথা রয়েছে উপন্যাসে তাঁর।

নারী চরিত্রের মধ্যে প্রথমে হাসির কথাই আসে। এই মধ্যবিত্ত চরিত্রটি অনেক সংগ্রামী চরিত্র। উপন্যাসের প্রথমে তাকে পতিভক্ত হিসেবে দেখা যায়। তার স্বামী মৃন্ময় তিনদিন নিখোঁজ থাকাতে তিনদিনই সে অনাহারে থাকে। স্বামীর প্রতি সে অনেক কর্তব্য পালন করে। স্বামী মৃন্ময়কে চিঠি লেখার জন্যে সে লেখাপড়া শেখে। মৃন্ময়ের প্রথম স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতা দেখেও সে তাকে ছেড়ে যায়নি, ভালোবেসেছে। লেখাপড়ায় সে কৃতিত্বের পরিচয় দেয় যা সবার নজর কাড়ে। শঙ্কর তাকে অনেক অনুরোধ করে বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার দিয়ে কলকাতা থেকে গ্রামে আনে। তার 'তুমি' নামের একটি শিশুপুত্র আছে। 'তুমি'র দায়িত্ব সে শঙ্করকে দিয়ে যায়। শঙ্করকে সে চিঠিতে লেখে–

> শ্রীচরণেষু
>
> আমি আর থাকতে পারলাম না, চললাম। কেন বা কোথায়, তা বলব না। বৃহত্তর যে আহ্বানের অপেক্ষা করেছিলাম, তা এসেছে। আমাকে খুঁজে বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। 'তুমি' আপনার কাছে রইল। ওর ভার আপনাকে দিয়ে গেলাম। ... আর একটা কথা। যে দশ হাজার টাকার জন্যে আপনার বন্ধুর জেল হয়েছিল, তা আমার কাছেই ছিল এতদিন। টাকাটা আমাকেই এনে দিয়েছিলেন তিনি, আমার ভবিষ্যৎ ভেবে। সে টাকা আমার ট্রাঙ্কের তলায় আছে। টাকাটা আপনিই নিন, আমি আর কি করব ও টাকা নিয়ে।...আপনাকে প্রণাম করে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না, দূর থেকেই তাই প্রণাম জানাচ্ছি। আমার সম্বন্ধে যাহোক একটা গল্প বানিয়ে প্রচার করে দেবেন। যদি কোনও দিন ফিরি, আবার দেখা হবে। আর যদি না ফিরি তাহলে এই শেষ।
>
> ইতি–
>
> প্রণতা হাসি' (পৃ. ৭৬০-৭৬১)

বনফুল এই শহরিক নারী চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সময়ের নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, নিজের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ও নারী স্বাধীনতার বিষয়টি এনেছেন। পাশাপাশি নিজের ওপর নির্ভরশীল হতে সাংসারিক জীবনে লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হতে শুরু করে ভালো রেজাল্ট করে সুনাম অর্জন করা এবং শিক্ষকতা পেশা বেছে নিয়ে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করার ব্যাপারটিও উঠে এসেছে।

সমাজের চাপে পড়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষারই বিরোধীতা করে – বিষয়টি বনফুল কুন্তলা নামক চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে তুলে এনেছেন। তার স্বামী হরিহর কম শিক্ষিত। কুন্তলা সংস্কৃতিতে প্রথম শ্রেণির এম এ হয়েও ধর্মীয় সব আচার পালন করতো। সে শঙ্করের 'কুসংস্কার' প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা করে। সে রামলালকে কলেজে ভর্তি হতে বারণ করে। বনফুল শঙ্করের ভাবনার মধ্যে দিয়ে কুন্তলা চরিত্রটি সম্পর্কে বলেন – 'কেমন অদ্ভুত যেন মেয়েটি। ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়। সকলকে তাক লাগাইয়া দিয়া উল্টা কথা বলিবার ঝোঁকটা যেন বড় বেশি রকমের উগ্র। কথাবার্তা যেন তীক্ষ্ণ তীরের মতো। কুন্তলার মনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গোল আছে, ইংরেজি ভাষায় যাহাকে 'কমপ্লেক্স' বলে।' (পৃ. ৬৪৭-৬৪৮) তবে পতিভক্তি এই চরিত্রটির সমাপ্তি হয় স্বামীর সাথে সহমরণে গিয়ে।

ভণ্টুর সদা হাস্য-উজ্জ্বল বৌদি – অভাব অনটনের সংসারে কর্তব্য পালনই তার ব্রত। এমনকি জ্বরের সময়ও নিজের পথ্যটুকুও সন্তানদের খাইয়ে দিয়ে নিজে একবেলা খেয়ে থাকেন। কলুর বলদের মত সংসারকে কেবল দিয়েই যায় এবং সবাইকে খুশি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে সে। সংসার থেকে কোনো প্রত্যাশা নেই তার। অনেক সন্তানের জননী এই নারী চরিত্রটিকে ধৈর্য্য ও সহনশীলতার চূড়ান্ত নিদর্শনরূপে চিত্রিত করেছেন বনফুল। এই চরিত্রটিকে ভারতীয় চিরাচরিত ধারার বা টাইপ চরিত্র বলা যায়।

বেলা মল্লিক চরিত্রটি স্বাধীনচেতা, স্বনির্ভরশীল, নারীবাদী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি চরিত্র। দেখতে রূপসী হওয়ায় অনেকেই তার সঙ্গ পেতে চায়। অনেকে পথেঘাটে তাকে বিরক্তও করে। তবে বিয়ে করে সংসারি হওয়া তার ধাতে নেই। বিয়ে করতে বলায় ভাইয়ের সাথে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে বেলা মল্লিক ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তার একটি বিশেষ গুণ ছিল, সে ভালো গাইয়ে। গান শেখানোকে রোজগারের পথ করে নেয় সে। বাসা ভাড়া নিয়ে একা থাকে এবং নতুন করে জীবন-যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু তারপরও সে নিজের এতকরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। কেউ না কেউ তার পিছু লেগেই থাকে। এ অবস্থায় সে সিদ্ধান্ত নেয় এ দেশে আর নয়। সে আশ্রয়দাতা এক বৃদ্ধ লোকের সাথে বিদেশ চলে যায়। অতীব দুঃখের বিষয় সেখানেও তার থাকা হয়ে উঠেনি। যে সমাজে পুরুষের হাত থেকে রেহায় পায়নি সে সমাজে ফিরে এসে বাকি জীবনটা পুরুষের ছদ্মবেশেই কাটিয়ে দেয় সে। উল্লেখ্য,

উপন্যাসের শেষে বেলা মল্লিকের পুরুষের বেশে আবির্ভাব পাঠককে চমকে দিয়েছে। গল্প-উপন্যাসে চমকে দেয়া লেখকের সহজাত প্রবৃত্তি।

১.৬

ডানা উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড ১৯৪৮ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫০ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৯৫২ সালে। প্রতি দুবছর অন্তর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এরই মধ্যে অর্থাৎ ডানা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবার মধ্যবর্তী সময়ে বনফুলের *ভীমপলশ্রী*, *করকমলেষু*, *তন্বী*, *নবদিগন্ত*, *স্থাবর* ও *কষ্টিপাথর* গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয়। *ডানা* উপন্যাসের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে লেখকের দুটি নেশার কথা বলে রাখা প্রয়োজন। একটি নক্ষত্র চেনা আরেকটি পাখি পর্যবেক্ষণের নেশা। বনফুল যখন মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র তখন তাঁর নক্ষত্র দেখার কৌতুহল জাগে। প্রথম বর্ষে তিনি কলেজের মেসে থাকার জায়গা পাননি বিধায় তাঁকে শেওড়াফুলি থেকে ডেলি প্যাসেনজারি করতে হত। একদিন রাতে ফেরার সময় তিনি ওভারব্রিজে উঠে দেখেন একজন ভদ্রলোক বাইনাকুলার দিয়ে দক্ষিণ আকাশে তাকিয়ে আছেন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে – তিনি নক্ষত্র দেখছেন। ভদ্রলোকটি নক্ষত্র চেনেন জেনে বনফুল অবাক হলেন এবং এরপর থেকেই বনফুলের নক্ষত্র চেনার প্রতি আগ্রহ জন্মায়। রাত জাগার শর্তে শুরু হয় বনফুলের আকাশ চর্চা। *পশ্চাৎপট* এ বনফুল বলেছেন, এই বিষয়ে বনফুলের বই লেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সেটি সময়ের অভাবে আর হয়ে উঠেনি। এর অনেক বছর পর তাঁর আরও একটি লেশা জাগে, সেই নেশা পাখি পর্যবেক্ষণের নেশা। তবে এ সময় বনফুল বড় মেয়ে কেয়ার বিয়ের অনেক ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে সময় পার করেছেন। পাখি পর্যবেক্ষণ বিষয়ে *পশ্চাৎপট* এ বনফুল লিখেছেন –

> পক্ষী পর্যবেক্ষণও আমার একটা নেশা ছিল। তাহা লইয়া *ডানা* লিখিয়াছি। পক্ষী-পর্যবেক্ষণের জন্য প্রদ্যোতের কাছে আমি ঋণী। তাহার সহায়তা না পাইলে, আমি পক্ষী বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান আহরণ করিয়াছি ততটুকুও পারিতাম না। নানা রকম পাখি মাঝে মাঝে দেখিতাম। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতাম না। মনে কিন্তু কৌতুহল ছিল। এমন সময় একদিন প্রদ্যোৎ আসিয়া হাজির। দেখিলাম, তাহার গলায় একটি বাইনাকুলার ঝুলিতেছে। শ্রী প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত একজন ইনকাম ট্যাক্সের বড় অফিসার তখন। ... আমার লেখার খুব ভক্ত।... তাহার মোটরে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। এবং সেইদিনই অনেক পাখি চিনিলাম। আমার উৎসাহ দেখিয়া প্রদ্যোতের উৎসাহ বাড়িল। সে আমাকে সালিম আলীর একখানা বই উপহার দিল। তাহার পর ক্রমাগত বই পাঠাইতে লাগিল। তাহার নিকট হইতে বোধ হয় পক্ষীসংক্রান্ত সব রকম বইই পাইলাম। আমার বাবার একজন বন্ধু (আমাদের জ্ঞানবাবু কাকা) তাঁহার দূরবীণটি আমাকে উপহার দিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে দূরবীণটি চুরি হইয়া গেল। আমার উৎসাহ

> কবিতায় শোচনীয় ছন্দপতন হইল। প্রদ্যোৎকে জানাইলাম–ভাই প্রদ্যোৎ, বাইনাকুলারটি চুরি গিয়াছে। একটি বাইনাকুলারের দাম কত এবং কলিকাতায় পাওয়া যাইবে কিনা, অবিলম্বে জানাও। প্রদ্যোৎ একটি বিলাতি বাইনাকুলার কিনিয়া উপহারস্বরূপ সেটি আমাকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দিল। আবার আমার পাখি দেখা শুরু হইয়া গেল। (বনফুল, ১৯৯৯: ২২২)

এই প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপের ছায়াপাত ঘটেছে *ডানা* উপন্যাসের অমরেশ সেনগুপ্ত চরিত্রটির মধ্যে। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা *শনিবারের চিঠিতে*। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ কার্তিক সংখ্যা থেকে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত।

আনন্দমোহন, অমরেশ ও রূপচাঁদ তিন বন্ধু মিলে পাখি পর্যবেক্ষণে বেড়িয়েছে। কবি ও বৈজ্ঞানিক দূরবীন দিয়ে গাছের ডালে বসে থাকা পাখিদের নিবিড়ভাবে অবলোকন করছে। একপর্যায়ে বন্ধু রূপচাঁদকে দেখতে না পেয়ে কিছুক্ষণ খোঁজাখুজির পর তাকে একটি যুবতি মেয়েসহ দেখতে পেলো দুই বন্ধু। এগিয়ে গেলো তার কাছে। জানতে পারলো, মেয়েটি বার্মা থেকে পালিয়ে আসা রেফিউজি, নাম ডানা। জাপান বার্মায় বোমা ফেললে, বর্মীয়রা যে যার এতদেশ ছেড়ে অন্যত্র পালায়। ডানাও তার পরিবারের সাথে পালিয়ে এসেছে। পালানোর সময় পথে আসামের জঙ্গলে ডাকাতের আক্রমণের মুখে পড়ে ডানার পরিবার। তাদের হাতে ডানার বাবা-মা ও তার এক সৎভাই মারা যায়। কোনো উপায়ান্তর দেখতে না পেয়ে ডানা কৌশলে পালিয়ে এদেশে আসে আশ্রয়ের জন্যে। রূপচাঁদের সাথে তার প্রথম দেখা হয়। নারীলোলুপ রূপচাঁদ তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে। রূপচাঁদ ডানার কাছ থেকে জানতে পেরেছে, এক মেমসাহেব তাঁর নাম রেখেছিল ডায়েনা, ডায়েনা থেকে তার নাম পরবর্তীতে ডানা হয়। কবি আনন্দমোহনের মতে, 'এই ডায়েনাই বোধ হয় আমাদের দেশের অনন্ত যৌবনা উর্বশী, মৃত্যুর সমুদ্র থেকে উত্থিত হচ্ছে বারবার প্রাণলক্ষ্মীর মূর্ত প্রতীকরূপে; এই ডায়েনাই বোধ হয় ডানা মেলে উড়ে আসছে অনন্তকাল ধরে মৃত্যু পরিকীর্ণ পৃথিবীর দিকে, সঞ্জীবিত হচ্ছে নবীন প্রাণধারায়, উজ্জীবিত করছে নব নব প্রেরণায়...।' (বনফুল, ২০১২/৫: ১৫৫) শহরের বাইরে গঙ্গা নদীর ধারে সবজি বাগানে অমরেশের একটি পড়ো বাড়িতে তার থাকার বন্দোবস্ত হয়। আসবাবপত্র এবং একজন সেফের ব্যবস্থাও করে দেয় সে। ডানাকে দেখামাত্রই রূপচাঁদের মনে স্বপ্নজাল তৈরি হতে থাকে তাকে ঘিরে। যেকোনো উপায়ে সে তার কব্জাতে ডানাকে আয়ত্ত করতে চায়। কবি আনন্দমোহনেরও ডানাকে ভালো লাগে। তার কাব্য জগতের প্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠে ডানা। সে পাখি দেখে যেমন তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা রচনা করে ফেলে তেমনি ডানার রূপ-সৌন্দর্য্য দেখেও সে কবিতা রচনা করে। পাখিকে বিষয় করে ডানাকে উদ্দেশ্য করে সে কবিতা লেখে এবং সেই কবিতা সে ডানাকে দেখিয়ে আনন্দ পায়। ডানারও কবিতা ভালো লাগে। তার মনোজগতেও ডানা এসে যখন তখন উঁকি মারে। কবিকে নিয়ে যায় কাব্যের জগতে।

কবিও সেই কাব্যের আকাশে ডানাকে নিয়ে বিচরণ করে স্বাধীন মনের খেয়াল মতো। এদিকে ডানা-সর্বস্ব হয়ে উঠা রূপচাঁদ অবসর সময়ের সবটুকু ডানার সান্নিধ্যে থাকতে চায়। রূপচাঁদ প্রায়ই ডানার বাসায় যাতায়াত করে, তার সাথে গল্প করে সময় কাটায়। ডানাকে একান্তে পেতে চায় সে। তার এইরূপ ব্যবহারে ডানা বরাবরই বিরক্ত হয় এবং তাকে এড়িয়ে চলে সব সময়। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে ডানা প্রায়ই তার প্রতিবেশি সন্ন্যাসী বিশ্বপতি ভট্টাচার্যের কাছে এসে গল্প করে এবং তার কাছে থেকে জীবন সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। সন্ন্যাসীর কাছে গেলে ডানার ভালো লাগে। তার মনে হয়, কেবল এই মানুষটির মধ্যে সমাজ বর্হিভূত কোনো রকম কামনা-বাসনা বা লোভ-লালসা নেই। তার কাছে গেলে ডানা কেমন যেন একরকম প্রশান্তিও লাভ করে। 'একমাত্র এই লোকটির কাছে গেলেই শান্তি পাওয়া যায়, মনে হয় অনেকক্ষণ রোদে হেঁটে যেন গাছের ছায়া পাওয়া গেল।' (পৃ. ৩৮৭) তাই যখন প্রয়োজন মনে করে তখনই সে নির্দ্বিধায় সন্ন্যাসীর কাছে এসে আশ্রয় নেয়।

ডানা রূপচাঁদের উপর একটা সময় পর আর নির্ভরশীল থাকতে চায়নি। সে স্বনির্ভর হতে চায়। তাই সে কাজের সন্ধানে কলকাতায় যাওয়ার মনস্থির করে। সে যেন কলকাতায় যেতে না পারে এজন্যে এদেশেই তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায় রূপচাঁদ। অবশেষে রূপচাঁদ ও আনন্দমোহনের অনুরোধে অমরেশ ডানাকে পাখিবিষয়ক কাজে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারি হিসেবে নিয়োগ দেন। অবশ্য এ ব্যাপারে অমরেশের স্ত্রীর সুপারিশও ছিল। নিজের কর্মসংস্থান হওয়ার পরও যেন ডানা স্বস্তি পাচ্ছিলো না। সন্ন্যাসীর কাছে যেয়ে তাকে বলতে শোনা যায়–

> তবু কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না। কেমন যেন একটি অস্বস্তি বোধ করছি সর্বদা। কোথায় একটা ক্ষুধা যেন অতৃপ্ত রয়েছে। মনে হচ্ছে, কি যেন একটা কর্তব্য আছে যা করা হয়নি। সেই ক্ষুধাটা যে কিসের, কর্তব্যটা যে কোথায় তা ঠিক করতে পারছি না। তাই মনে করলাম, আপনার কাছে আসি। কেন যে আপনার কথা মনে হল তা বলতে পারি না কিন্তু মনে হল আপনি হয়তো কিছু উপদেশ দিতে পারবেন। (পৃ. ২৮৪)

ডানার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলেন, উপদেশ দেয়ার এতঅভিজ্ঞতা তার নেই। তবে এইটুকু তিনি বলতে পারেন যে, সবাইকে একদিন না একদিন সচেতন হতে হবে। সন্ন্যাসী বিষয়টি ডানাকে আরও খোলামেলাভাবে বুঝিয়ে বলেন – 'তুমি, আমি এই নিখিল বিশ্ব যাঁর অনন্ত লীলার প্রকাশ, তাকে জানবার আগ্রহ অভিনব ক্ষুধারূপে অনুভব করতে হবে সবাইকে একদিন। অনিত্য মোহের কষ্টিতে ঘষে ঘষে নিত্যকে চেনবার আকুলতাই নিয়ত ব্যক্ত হচ্ছে রূপে রূপে জীবনে মরণে জন্ম-জন্মান্তরে। তুমিও হয়তো সেই ক্ষুধাই অনুভব করছ, কে জানে?' (পৃ. ২৮৪) ডানা তারপরও বুঝতে না পারায় সন্ন্যাসী তাকে গভীরভাবে চিন্তা করতে বলেন, তাহলেই সে বুঝতে পারবে। চিন্তা ব্যতিরেকে সেই ক্ষুধা বোঝা সম্ভব না। সেই ক্ষুধাকে বুঝতে হলে উপলব্ধি দিয়ে বুঝতে হয়।

এটা কেউ কাউকে বোঝাতে পারে না, নিজেকেই বুঝতে হয়। তিনি আরও বলেন, এই উপলব্ধি হবার আগে মানুষকে মোহের পথে ভোগের পথে ঘুরতে হবে কিছুদিন। সেই ঘোরাটারও প্রয়োজন আছে। তারপর আসবে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা। মোহটা সোনা নয় কিন্তু আবার সোনার পরিচয় ওর থেকেই পাওয়া যায়। মোহটা হলো তাঁকে চেনবার কষ্টিপাথর। মানুষ যেকোনো জিনিসেই মুগ্ধ হোক না কেনো তার সেই মুগ্ধতা কিছুদিন পর কেটে যায়। কারণ, মোহটা আসল আলো নয়, এটা নকল আলো। প্রকৃত অর্থে ওটা অন্ধকার। (পৃ. ২৮৫) সন্ন্যাসীর ভিক্ষা করার কারণ জানতে চায় ডানা। উত্তরে সন্ন্যাসী জানায় ভিক্ষা করা তার জীবনযাপনের নিয়মের মধ্যেই পড়ে।

এভাবে বৈজ্ঞানিক, কবি, রূপচাঁদ ও সন্ন্যাসী চার পুরুষকে ঘিরেই ডানার জীবন অতিবাহিত হয়। রূপচাঁদ ব্যতীত বাকি তিন পুরুষকে নিয়ে ডানার কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু রূপচাঁদের প্রতি ডানা রীতিএতবিরক্ত ও অসহ্য হয়ে ওঠে। রূপচাঁদ বিভিন্ন ছুতায় ডানার কাছে আসে, ডানা সব সময় তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। কারণ তাঁর মধ্যে ডানা অনৈতিক আহ্বান দেখতে পায়। রূপচাঁদের অনেক কথা সে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বলে এবং তাঁর কাছে সেসব কথার মানে জানতে চায়। কিন্তু সন্ন্যাসী সরাসরি সেসব কথার জবাব না দিয়ে সে ডানাকে ভাবতে বলে, ভেবে ডানার ভিতর থেকে যে উপলব্ধি আসবে সেটাকেই সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিতে বলেন তিনি। এদিকে, ডানাকে নিয়ে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় রূপচাঁদ। সে ডানার জন্যে কেপনের মাংস রান্না করে নিয়ে আসে। তাকে জন্মদিনের উপহার দেয়। একসময় কবি ও বৈজ্ঞানিকের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে সে। সেই ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে রূপচাঁদ অমরেশের জমিদারির ম্যানেজারের দায়িত্বে থাকা কবিকে মহিলা-খুনের মিথ্যা মামলায় জড়ায়। আবার ডানাকে জড়িয়ে কলঙ্ক দিতে বৈজ্ঞানিকের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়। কোনো ষড়যন্ত্র করেই রূপচাঁদ সফল হতে পারে না। এক সময় রত্নপ্রভার মাধ্যমে সবাই জেনে যায় কবি নির্দোষ, সে মহিলাকে খুন করেনি। অনেক চেষ্টার পরও যখন ডানাকে স্বাভাবিকভাবে আয়ত্বে আনতে অক্ষম হয় রূপচাঁদ, তখন সে ডানার বাড়িতে যেয়ে জোড় করে তাকে পেতে চায়। ডানা অনেক চেষ্টা করে রূপচাঁদের আবেষ্টনী থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে যখন ব্যস্ত ঠিক তখনই নাটকীয়ভাবে আগমন ঘটে রূপচাঁদের স্ত্রী বকুলবালার। হলুদ পাখি দেয়ার জন্যে ডানাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছে বকুলবালা। কিন্তু এসে সে স্বামীর অনৈতিক কাজ দেখে হতভম্ব হয়ে তার মাথায় বল্লম দিয়ে আঘাত করে। এই সুযোগে ডানা বাড়ি থেকে বেড়িয়ে সোজা চলে যায় সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসীকে না পেয়ে ডানা ভাস্কর ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সে যখন পৌঁছে তখন ভোর হয় হয় অবস্থা। এই ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ডানার ঘনিষ্ঠতা ছিল এক সময়। তার সাথেই ডানার বিয়ের কথা ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট ওই সময় ডানাকে কথা দিয়েছিল, ডানার জন্যে সে আজীবন অপেক্ষা করবে, অন্য কাউকে সে বিয়ে করবে না। ম্যাজিস্ট্রেটের এখানে বদলি হওয়ার সুবাদে

রত্নপ্রভা তার সাহায্য নিয়ে কবিকে খুনের মামলা থেকে অব্যহতি দিয়েছে। ডানা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এসে তার অতীত জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে বলে –

> তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না। বর্মা থেকে চলে আসার পর অনেক ঘাটের জল খেতে হয়েছে আমাকে। বর্মা থেকে পালিয়ে এসে আমি মিলিটারিতে যোগ দিয়ে নানা দেশে ঘুরেছি। তারপর বিলেতে পড়াশোনা করেছি। তারপর এই চাকরি। আমি সমর্থ যুবক দৈহিক ক্ষুধার দাবি আছে,সে দাবি মেটাতে আমি ইতস্তত করি নি কখনও–হাটে বাজারে হোটেলে রেস্তোরাঁয় যখন যেখানে যেমন জুটেছে। তবে ওগুলো নিতান্ত দৈহিক, সামাজিক ব্যাপার, মনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। কোন অসুখও আমার হয় নি। (পৃ. ৪৭২)

সব কথা শুনে ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর ঘৃণা হতে লাগলো ডানার। সে মদ্যাসক্ত নারী–ভোগলিপ্সু ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে ডানা আরেক রূপচাঁদকে যেন দেখতে পায়। আর এক দণ্ডও নয়, ডানা ম্যাজিস্টেটের কাছ থেকে চিরতরে চলে আসে। ট্রেনের কামরায় বসে বসে সে ভাবতে থাকে এতদিন সে যা মনে মনে চেয়েছিল তার সবই হলো। রূপচাঁদ শাস্তি পেয়ে তার জীবন থেকে সরে গেছে, কবি এখন আর ডানাকে সামনে রেখে কবিতা লেখেন না, তাঁর কবিতার প্রেরণাদাত্রী এখন আর ডানা নয়, তাঁর কল্পনা স্রোত অন্যখাতে প্রবাহিত হচ্ছে। তার কলেজ-বন্ধু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও ঠাঁই হলো না। এতদিকের এতপরিবর্তন হওয়ার ফলেওতো ডানার জীবনের কোনো সমস্যারই সমাধান হয়নি। এ অবস্থায় ডানার নিজেকে ভীষণ অসহায় ও নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগলো। অকস্মাৎ তার মনে হলো তার জীবনে আর কেউ না থাকুক সন্ন্যাসী ঠাকুর অবশ্যই আছে। ডানা বাড়ি ফিরে এসে জানতে পারে সন্ন্যাসী তার সাথে দেখা করতে এসে তাকে না পেয়ে একটি তোরঙ্গ এবং একটি চিঠি রেখে গেছে। চিঠিতে সন্ন্যাসী লিখেছে, সে ডানাকে তার সব সম্পত্তি উইল করে গেছে সাথে পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া একঘড়া মোহরও দিয়েছে। সন্ন্যাসীর এই ঘটনায় ডানা স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। একসময় ডানা সন্ন্যাসীকে বলেছিল তার অনেক টাকার প্রয়োজন। যাই হোক ডানার পরের কার্যকলাপে পাঠকও অনেকটা অবাক হয়ে যান। কারণ ডানাও সন্ন্যাসীর মতোই সন্ন্যাসীর সব সম্পত্তি বৈজ্ঞানিক, কবি ও রূপচাঁদকে দিয়ে চিরতরে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। 'আপনাদের তিনজনেরই মুখে একাধিকবার শুনেছি যে, টাকা পেলে আপনারা প্রত্যেকেই নিজেদের আকাশে নাকি আরও ভালোভাবে ডানা মেলতে পারবেন। আমারও আগে তাই ধারণা ছিল, এখন আর নেই।'(পৃ. ৪৭৬) তাকে না খুঁজতে অনুরোধ করে যায় সে।

বনফুল মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে স্বতন্ত্র্য দৃষ্টিকোন থেকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই উপন্যাসে প্রধান পাঁচটি চরিত্রের মধ্যে সেই মানসিকতার বিচিত্র অনুষঙ্গ লক্ষণীয়। তিনবন্ধু বৈজ্ঞানিক অমরেশ সেনগুপ্ত, কবি আনন্দমোহন তরফদার ও রূপচাঁদ মৌলিক এবং উপন্যাসের নাম চরিত্র ডানা ও সন্ন্যাসী বিশ্বপতি ভট্টাচার্য। বনফুল এই

চরিত্রগুলোে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। অমরেশ ও আনন্দমোহনের পাখি বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ ও কৌতূহল রয়েছে। অমরেশের রয়েছে পাখি নিয়ে গবেষণা করা ও প্রবন্ধ লেখা আর আনন্দমোহনের পাখি নিয়ে কবিতা লেখার আগ্রহ। আর রূপচাঁদ মৌলিকের উভয় জগতেই গতিবিধি আছে কিছুটা। বৈজ্ঞানিক অমরেশ সেনগুপ্তের জীব-বিদ্যা বিষয়ে বিলাতি বড় ডিগ্রি আছে। তিনি ধনী বাবার একমাত্র ছেলে আর ধনী শ্বশুরের একমাত্র জামাই। লেখকের মতে, অমরেশ চাইলে সহজেই একটি চাকরি যোগাড় করতে পারতেন কিন্তু তিনি জ্ঞান আহরণ করতে চান প্রতিনিয়ত। এই জ্ঞান তৃষ্ণা থেকেই তিনি মফঃস্বলে নিজের জমিদারিতে একটি চিড়িয়াখানা বানাতে পরিকল্পনা করে রেখেছেন। সেখানে জীবিত-মৃত নানা রকম পাখি থাকবে। অমরেশের মতে, অনেক বিদেশি সাহেবরা চাকরির ফাঁকে ফাঁকে পাখি নিয়ে যতটুকু পেরেছেন করে গিয়েছেন, তাদের কাজগুলো নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও গবেষণা কাজের জন্য অগ্রগণ্য। তবে পাখি নিয়ে সম্যক গবেষণা এখনও হয়নি এদেশে। এমন অনেক ছোট পাখি আছে যাদের শ্রেণি নির্ধারণ এখনও হয়নি ঠিকমতো। পাখিদের বার্ষিক গতিবিধি সম্বন্ধে পুরো তথ্য এখনও জানা যায়নি। সে কারণে পাখি নিয়ে তাঁর এত পরিকল্পনা।

কবি আনন্দমোহন ছিলেন অধ্যাপক। সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। শহরে একটি বাড়ি আছে থাকার মতো, আছে কিছু জমি আর পেনশনের টাকা। সব মিলিয়ে ভালোই চলে যায় তার সংসার। তার ছেলেটি থাকে মামার বাড়িতে আর মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন তিনি। অবসরের পর কবিতা লেখাই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। স্ত্রী মন্দাকিনীকে নিয়ে তাঁর কোনো অভিযোগ নেই। পেনশনের পুরো টাকা মন্দাকিনীর হাতে দিয়ে সংসার থেকে দায়মুক্ত হয়ে থাকেন তিনি। কিন্তু তাঁর চরিত্রের বিশেষ একটি দিক রয়েছে সেটি হলো তিনি সৌন্দর্য পিপাসু। এই জন্যেই তিনি কবি, এই জন্যেই তিনি কাব্যচর্চা করেন এবং পাখি নিয়ে মেতেছেন। পাখি নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে অনেক কবিতা লিখেন তিনি। তাঁর সেসব কবিতায় পাখির বৈশিষ্ট্য এবং পাখিকে চেনার লক্ষণ থাকে।

তৃতীয় বন্ধু রূপচাঁদ মল্লিক পুলিশ বিভাগে চাকরি করেন। আপিসের বড়বাবু ও তাঁর স্ত্রী তার হাতের মুঠোয়। নিজের বাড়িতে কোনো প্রতিবেশিকে যেমন আসতে দেন না তেমনি নিজের স্ত্রীকেও কারো বাড়িতে যেতে দেন না। রূপচাঁদ শহরের এমন জায়গায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন যেখানে আশেপাশে বাঙালি প্রতিবেশি কেউ নেই। তিনি গোপনে নিজের পছন্দএতজীবনযাপনও করে থাকেন, যে জীবনে নারীই তার একমাত্র কাঙ্ক্ষিত বস্তু। কলেজ জীবন থেকেই আনন্দমোহন ও রূপচাঁদ পরস্পরের বন্ধু। মাঝে কিছু সময় তাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি। এ সময়টাতে তাদের মধ্যে চিঠির আদান প্রদান হত। ওই সময় স্ত্রী জাতি সম্পর্কে একটি চিঠিতে একদিন রূপচাঁদ বন্ধু আনন্দমোহনকে লিখেছেন যা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে অনেকটা সহায়ক –

দেখ ভাই আনন্দমোহন, স্ত্রীজাতি সম্পর্কে তোমার মনোভাবটা কেমন কুয়াশাচ্ছন্ন বলে মনে হল। আমার মতবাদ (দর্শনও বলতে পার) ও বিষয়ে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। চুনি, পান্না, হীরা, মুক্তা প্রভৃতি মণিমাণিক্যের সঙ্গে নারীর নামও করা উচিৎ। রমনী সত্যিই রত্ন বিশেষ, রত্নশ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাকে নিয়ে নানারকম কবিতা লিখতে পার আপত্তি করব না, কিন্তু একটি কথা ভুলো না যে, রত্নের মতোই তাকে আহরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। এই আহরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের নানা পদ্ধতি মানুষ যুগে যুগে আবিষ্কার করেছে। কখনও তাকে প্রহার করেছে, কখনও তাকে হারেমে পুরেছে,কখনও দাসী বানিয়েছে, কখনও দেবী বলেছে, কখনও তার স্বাধীন সত্তার গুণগান করে স্বাধীনতার নামে শত সহস্র বন্ধনে বেঁধেছে, কখনও ছিনিয়ে এনেছে, কখনও বিবাহ করেছে, কখনও কবিতা লিখেছে – কত রকম করেছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যটি হচ্ছে – আহরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ। প্রেমের কবিতার জন্মও হয়েছিল বোধ হয় ওই একই কারণে। (পৃ. ১৬০)

প্রধান তিন পুরুষ চরিত্র বনফুলের অনুসন্ধানী মনেরই এক একটি প্রয়াস বলা চলে। এখানে প্রধান চরিত্র ডানা যাকে কেন্দ্র করে বাকি সব চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে সেই ডানা যখন বৈজ্ঞানিক, কবি ও রূপচাঁদ তিন পুরুষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে তার পাখা ঝাপটাচ্ছিল তখন ঔপন্যাসিক অধ্যাত্মবাদী ও উদাসীন সন্ন্যাসী নামের আরেকটি চরিত্রের আবির্ভাব ঘটান। প্রধান চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার বা নিজ সত্ত্বাকে অনুসন্ধানের একটি প্রয়াস ডানা উপন্যাসটি। প্রধান চরিত্র ডানাকে উপন্যাসের একটি পর্যায়ে হঠাৎই জ্ঞান হারাতে দেখা যায়। জ্ঞান হারানোর পরবর্তী সময় থেকে সে একটি চরম সত্য উপলব্দি করে পাখির রূপকে। একটু একটু করে অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনের নানারূপ সে বোঝে উঠতে শেখে বিচিত্র প্রেরণায়, বিচিত্র রূপে এবং নতুন অভিব্যক্তিতে তা আত্মপ্রকাশ করে। জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই মূল্যহীন নয়। সব অভিজ্ঞতাই জীবনকে বোঝার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই মানুষ জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে। এই উপলব্ধি জাগ্রত হওয়ার ফলে জীবনকে বোঝার চেষ্টা করতে থাকে ডানা। আর এক্ষেত্রে সন্ন্যাসী ঠাকুরই তার একমাত্র পাথেয়, একমাত্র অবলম্বন। সন্ন্যাসীর প্রত্যেকটি কথা তাকে ভাবায়, তাকে প্রেরণা দেয়। এই ভাবনা থেকেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ডানা ঋদ্ধ হয়। জীবনের নতুন নতুন মানে খুঁজে পায় সে। একবার সে রূপচাদের ভয়ে ঘর থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসীর ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। সন্ন্যাসী তখন তাকে বলে, 'পালিয়ে আসার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব নেই। পালিয়ে এলে তো তার কাছেই নতি-স্বীকার করা হল' (পৃ. ৪২১)। অবশেষে ডানা নতুন জগতের সন্ধান পায়। অমরেশবাবুর বুকশেলফ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ বইটি পড়ে সে। তার মনে হয় –

সন্ন্যাসী তাকে যে জগতের আভাস দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ তাকে সেই জগতেই নিয়ে গেলেন। সে জগতে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে, কিন্তু উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। সকলেই সেখানে স্ব স্ব মর্যাদায় সমান মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সে জগতে রাজায় মেথরে, সন্ন্যাসী গৃহস্থে সম্মানের কোনও তারতম্য নেই। সকলেই সেখানে ভগবানের কাজ করছেন, নিজের নয়। কর্মই সে জগতের একমাত্র অবলম্বন–কর্মফল নয়, আকাঙ্ক্ষা নয়, অহঙ্কারও নয়। ...সে জগতে কর্তব্যই সবচেয়ে বড়

– আত্মসুখ নয়, পরার্থপরতাই সেখানকার মন্ত্র–স্বার্থপরতা নয়, এই নতুন জগতে নীত হয়ে ডানা বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার মনে হল সে কি আদর্শ গৃহস্থ-জীবন যাপন করতে পারবে? এমন পুরুষ কি এদেশে আছে, পরের মঙ্গলের জন্যে যে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেবে? সে রকম পুরুষ না পেলে তো আদর্শ গৃহস্থালী স্থাপন করা যাবে না। সে নিজেও কি পারবে? (পৃ. ৪২৫)।

এভাবেই ডানা গার্হস্থ জীবনের ভাবনা থেকে আধ্যাত্মিক ভাবনায় উপনীত হয়। ডানাকে নিয়ে কবির ভালোলাগা যখন কবিতায় রূপ নেয় ডানা যেন তখন অনেকটা আড়ষ্টতা বোধ করে। ডানা সন্ন্যাসীকে জানায় তার কবিতা ভালো লাগে। আনন্দমোহনের কবিতার প্রেরণার মূল আছে ডানা। কবির কাব্যলক্ষ্মী তরুণী ডানা। কিন্তু কবির মধ্যে ডানাকে ঘিরে কোনো শারীরিক মোহ কাজ করেনি। পুরো উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, কেবল একটি জায়গায় কবি ডানাকে নিয়ে বসন্ত উৎসবে আনন্দ করতে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। কিন্তু সেই ঘটনায় দেখা যায়, কবি ডানার অনুমতি নিয়ে তবেই তাকে রং মাখিয়েছে–এইটুকুই, এর বেশি কিছু নয়। আর বৈজ্ঞানিকের প্রসঙ্গে বলা যায়, সে ডানাকে কাজ দিয়েছে তার নিছক গবেষণার কাজকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে। বৈজ্ঞানিকেরও ডানাকে নিয়ে একটি ঘটনা আছে। ঘটনাটি স্বাভাবিক হলেও ডানা প্রথম দিকে খুব বিস্মিত হয়, পাঠকও অনেকটা বিস্মিত হয়। বৈজ্ঞানিক ডানাকে বলে, তার পীঠে চড়ে পাখির বাসার ভিতর কী আছে তা দেখতে। অনেক পীড়াপীড়ির পর ডানা রাজি হয়। কবি যেমন বসন্ত উৎসবকে উপভোগ্য করে তোলার জন্যে ডানাকে রং মাখায় বৈজ্ঞানিকও তেমনি তার গবেষণার কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে ডানাকে তার পীঠে চড়ে পাখির বাসা দেখায়। তবে এই দুটো ঘটনাই উপন্যাসের প্রথম দিকের ঘটনা। আর প্রথম দিকের ঘটনা হওয়ার কারণেই পাঠক আশা করতে পারেন উপন্যাসের মাঝে বা শেষে হয়তো তাদের দুজনের মধ্যে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন। কিন্তু সেসবের কোনো আভাসই পাঠক আর পান না। কিন্তু ডানার প্রতি রূপচাঁদের আকর্ষণের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তাকে নীলাম্বরী শাড়ি উপহার দেয়া থেকে শুরু করে সাংসারিক সবরকম সহায়তা দিতে বদ্ধ পরিকর থাকে সে। এরপরও তার প্রতি ডানার কোনোরূপ টান লক্ষ্য করা যায়নি। অবশেষে মরিয়া হয়ে সে বৈজ্ঞানিককে অপবাদ দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং কবিকে মহিলা খুনের মামলায় ফাঁসায়। এসব ঘটনার ফলশ্রুতিতে রূপচাঁদের শাস্তিস্বরূপ বদলির অর্ডার হয়। ডানাও এক সময় অনুধাবন করতে পারে কবি ও বৈজ্ঞানিক এই দুজন মানুষ তার জীবনে আশির্বাদস্বরূপ। ডানার সাথে সাথে পাঠকের কাছেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

তিন পুরুষের দৃষ্টিতে ডানা –

বৈজ্ঞানিক –

আমার পীঠের উপর দাঁড়াতে পারবেন? আমি সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছি এই পাথরটায় ভর দিয়ে। আপনি ওই শিকড়টা ধরে ওই খাজটায় পা দিয়ে আমার পীঠের চড়ে দেখুন তো, ঠিক নাগাল পেয়ে যাবেন।'...'তার চেয়ে সোজা ভাষায় বলুন না আমি উঠব না। রত্না থাকলে উঠতো কিন্তু। রত্নার আসবারও কথা আছে এখনই। মিস্ত্রী আর কাঠের বাক্স-টাক্স নিয়ে আসতে বলেছি তাকে'...আপনি যদি না উঠতে চান তাহলে অবশ্য জোর করতে চাই না। ...উঠে দেখলেই পারতেন কিন্তু। প্যাঁচাটা আছে কি না এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হত আপাতত। (পৃ. ২৭৪-৭৫)।

কবি –

কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন তার দিকে। হঠাৎ বললেন, তুমি যদি আমার মেয়ে হতে, বেশ হত তা হলে–ভারি খুশি হতাম। ...অসঙ্কোচে আদর করতে পারতাম। আদর করে যা বলতে পারতাম তা বেমানান হত না। ...কবির হাত থেকে আমটা নিয়ে ডানা নিপুনভাবে কাটতে লাগল। কবি নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন। (পৃ. ৩৭১-৩৭২)।

পুলিশ অফিসার –

ডানা, 'সেদিন সকালে তোমার 'বলাকা' টা দিতে গিয়েছিলাম। ... সেদিন তোমার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে সহসা যে সুরটা বেজে উঠেছিল আমার কণ্ঠে, সেটা সত্যিই আমার মনের সুর এবং একেবারে বিশুদ্ধ সুর... কিন্তু সমাজ নামক এমন একটি আজব জিনিস তৈরি করেছি আমরা যে, প্রকাশ্যে বিশুদ্ধ সুর আলাপ করবার সাহস নেই অনেকেরই। বিশুদ্ধ সুরের কালোয়াতি করতে গিয়ে চার্বাক, স্পাইনোজা প্রভৃতি বড় বড় ঋষিকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে নিষ্পেষিত করে নিশ্চিহ্ন করাটাই এখনও ভদ্র সমাজে সভ্যতা বলে গণ্য হয়। কিন্তু অসাধারণ মানব-মানবী পৃথিবীতে ছিল, আছে, থাকবেও বরাবর। তোমাকে অসাধারণের দলে ফেলেছি বলেই তোমার কাছে এ ধরনের কথা বলতে সাহস পাচ্ছি। আমাকে ভুল বুঝো না। সমর্থ পুরুষের নিতান্ত স্বাভাবিক প্রেরণার সত্য মূল্য তোমার এতনারীই দিতে পারে বলে বিশ্বাস করি। ...তোমার সম্বন্ধে যা আমার মনে হয়েছে, তা ইংরেজি কবিতায় লিখে পাঠাচ্ছি। ভালো যদি না লাগে ছিড়ে ফেলে দিও। ... হৈ চৈ করো না। তা যদি কর তাহলে আমাকেও হয়তো আত্মরক্ষার্থে এমন সব অবাঞ্ছনীয় কাজ করতে হবে, যা আমি এখন করবার কল্পনাও করি না। (পৃ. ২৯২-২৯৩)।

উল্লেখ্য, বনফুল যখন ব্যাঙ্গালোরে ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ড করতে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর স্কটিশ নার্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। নার্সকে উদ্দেশ্য করে লেখা বনফুলের কবিতাটিই রূপচাঁদের জীবনীতে ব্যবহার করেছেন লেখক। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বনফুল স্কটিশ নার্সকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, ডানাকে ঘিরে রূপচাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা রয়েছে। বনফুলের ভালোবাসা ছিল প্লেটোনিক আর রূপচাঁদের ভালোবাসা দেহসর্বস্ব।

তিন পুরুষের বেড়াজাল থেকে ডানা নিজেকে মুক্ত রাখার লড়াইয়ে এগিয়ে যায়। আর এরই মধ্যে দিয়ে কালক্রমে সে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটু একটু করে অভিজ্ঞতা লাভ করে সমৃদ্ধ হতে থাকে। ডানা সন্ন্যাসীকে তার বাসায় নিয়ে

যায়। দুজনের মধ্যে কথোপকথন চলে। ডানা সন্ন্যাসীর কাছ থেকে স্বাধীনতার মানে জানতে চায়। সন্ন্যাসী তাকে স্বাধীনতার মানে বোঝাতে চেষ্টা করে। সন্ন্যাসীর মতে, মানুষ যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে। চাইলে যখন খুশি খেতে পারে আবার খাবার সামনে থাকা সত্ত্বেও উপবাস করতে পারে। যা অন্য প্রাণীরা পারে না। মানুষের সামনে ভগবান অনেক পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সে চাইলে ভালো পথে যেতে পারে, মন্দ পথেও যেতে পারে। যেকোনো জিনিসকে মানুষ নিজের যেমন খুশি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে পারে–এ স্বাধীনতা আর কারো নেই। সন্ন্যাসী তাকে আরো বলে, তীরের কাছে সমুদ্রের জল একহাটু, এটা যেমন সত্য তেমনি আরও একটু দূরে গেলে সেই সমুদ্রই অতলস্পর্শী–এ দুটোই সত্য। সমুদ্র নীল এটা যেমন সত্য আবার সমুদ্র নীল নয় এটা তেমনি সত্য। একটি ঘটিতে তুললে সমুদ্রের জল সাধারণ জলের মতোই দেখায়। সামান্য সমুদ্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধী সত্য যদি নিহিত থাকতে পারে, তা-হলে কোটি কোটি পর্বত, সমুদ্রের যিনি আকর তার মধ্যে সত্যের অনন্তরূপের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া তিনি নিজের অনন্ত রূপ দেখাচ্ছেন বলেই মানুষ দেখতে পাচ্ছে। ডানা সন্ন্যাসীর কথায় বিস্মিত এবং নির্বাক হয়ে যায়। সে ভাবতে থাকে উদাসীন সন্ন্যাসী এই লোকটির মধ্যে কতো ঐশ্বর্য আছে। সন্ন্যাসীর কথা ডানাকে অনেক রকম ভাবনার জগতে নিয়ে যায়। জীবনের মানে খুঁজতে যেয়ে ডানাও সে জগতে মনের আনন্দ ও জিজ্ঞাসু মন নিয়ে বিচরণ করে বেড়ায়। জগতে অনেক প্রশ্নের সমাধান সে পেয়ে যায়, আবার কখনও যদি তার মন খারাপ লাগে, নিজেকে কোনো কারণে ছোট মনে হয়, ঠিক তখনই আবার তার মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সে আবার জ্বলে উঠে নিজ মহিমায়–

আমি নারী আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নারাতে নিদ্রাবিহীন শশী
আমি নইলে মিথ্যে হত আকাশে চাঁদ উঠা
মিথ্যে হত কাননে ফুল ফোটা। (পৃ. ২৪৫)

সন্ন্যাসীর সাহায্যে ডানা ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক জগতের দিকে ধাবিত হয়। এ কারণে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে প্রাপ্ত সব সম্পত্তি সে তিন পুরুষের নামে হস্তান্তর করে যায়। ডানাকে ঘিরে আবর্তিত পাঁচ পুরুষের মধ্যে কেবল সন্ন্যাসী ছাড়া বাকী চারজনের কেউ ডানার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এমনকি উপন্যাসে যখন ভাস্কর বসুর আবির্ভাব ঘটে তখন গতানুগতিক ধারণা থেকে পাঠক ধরে নিতে পারেন – ডানার সঙ্গে তার সম্পর্ক আরো জোরদার হতে চলছে। কারণ ভাস্করের সাথে ডানার গভীর প্রণয়ের কথা হঠাৎই পাঠক জানতে পারে। জাপানিরা বার্মায় বোমা ফেলার কারণে তাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে। তা-না হলে তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক নিয়মে বিয়ে ও সংসার পর্যন্ত গড়াতো। ডানা তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে যখন ভাস্করকে তার জীবনের শেষ অবলম্বন মনে করে রাতের গভীর

অন্ধকারে তার কাছে আশ্রয় পেতে ছুটে যায় তখন তার বিশ্বাস ভেঙে চূরমার হয়। কারণ সেই মুহূর্তে সে জানতে পায় ভাস্কর বহুগামী। এরূপ পরিস্থিতিতে জীবন সম্পর্কে ডানার মধ্যে একটি বিতৃষ্ণা বা নির্মোহের জন্ম নেয়। উপন্যাসের বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়, ডানা জীবনের মানে খোঁজার সাথে সাথে নিজের জীবনের মানেও সে খোঁজে বেড়াতে থাকে। এক এক সময় এক এক রকম সিদ্ধান্তে সে উপনীত হয়। প্রতিনিয়তই তার সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসে। নিত্য দিনের ঘাত-প্রতিঘাতের বিবর্তন ধারায় তার বোধ পরিপক্কতা লাভ করে আধ্যাত্মিক জগতের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে। সবশেষে দেখা যায়, আত্ম-অনুসন্ধানের লক্ষ্যে জীবনের সব মোহ থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে পরিচিত মহলের একেবারে আড়ালে চলে আসে। যাবার সময় চিঠিতে সে লিখে দিয়ে যায়, তাকে খোঁজে সময় যেন নষ্ট না করা হয়। ডানা সন্ন্যাসী জীবন বেছে নেয়। বিশ্বপতি সন্ন্যাসীর মতই যখন যেভাবে যা পাবে তা খেয়েই জীবন ধারণ করবে সে। তাই সন্ন্যাসীর কাছ থেকে পাওয়া সব সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়েই সে বেড়িয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশে – এতদিন পর নিজের আকাশ সে খুঁজে পেয়েছে, সেখানে নিজের এতকরে ডানা মেলে উড়বে সে, সে মুক্ত-বিহঙ্গ, সে স্বাধীন। জীবন সম্পর্কে এবং নিজেকে চেনার যে কৌতূহল – তারই একটি প্রচেষ্টা এ উপন্যাস যা মধ্যবিত্ত মানসিকতার বৈশিষ্ট্যকে প্রতিভাত করে।

তবে উপন্যাসের সার্বিক আলোচনায় আরও কয়েকটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া প্রয়োজন। ডানা বাদে রত্নপ্রভা, মন্দাকিনী ও বকুলবালা নামে আরও তিনটি নারী চরিত্র রয়েছে এই উপন্যাসে। চরিত্রগুলোর আলোচনা মধ্যবিত্ত নারী-চেতনার দিক থেকে প্রাসঙ্গিক। বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী রত্নপ্রভা। গুণে সে রত্ন না হলেও তার স্বামীর কাছে সে রত্নপ্রভাই বলা চলে। লেখক উপন্যাসের শুরুতেই তাকে অসাধারণ মহিলা বলেছেন। কিন্তু এর পরের বাক্যেই পাঠক বড় ধাক্কা খায়–'অত্যন্ত কুৎসিত। কালো রং ... কণ্ঠস্বর ধরা, ভাঙা ভাঙা।... লেখাপড়া জানে না বিশেষ। অমরেশের কার্যকলাপ নির্বাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে সে।' (পৃ. ১৩০) ঘরে-বাইরের সব কাজই সে দেখভাল করে নিপূণভাবে। সারাক্ষণ কাজ করেই তার সময় কাটে। স্বামীর সব কাজের প্রতিও রয়েছে তার সুনজর, খাবার থেকে শুরু করে পাখি পোষা, পাখি তদারকি, পাখি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে সে জড়িত। এমনকি স্বামীর কথাএতবিদেশি তন্বী ডানাকেও সে তার স্বামীর পাখি গবেষণা বিষয়ক কাজের সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। স্বামীর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস থেকেই সে ডানাকে চাকুরি দিয়েছে। রত্নপ্রভা এতোটাই বুদ্ধিমত্তার সাথে সব কাজ করে যে, কখনও কোনো কাজের জন্যে তাকে তার স্বামীর কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়নি। কেবল তাই নয়, অমরেশের পাখি-পর্যটনে সে সঙ্গী হয়েছে।

মন্দাকিনী কবি আনন্দমোহনের স্ত্রী। স্বামীর কবিতা লেখার প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ বা উৎসাহ দেখা যায় না। আনন্দমোহনের কবিতার রাজ্যে তাই মন্দাকিনী নয়, ডানা-ই উড়ে বেড়ায় সবসময়। মন্দাকিনীর কাছে কবিতা লেখা মানে বাজে কাজে সময় নষ্ট করা। কবি অবসর সময়টুকু কবিতা লেখে, সংসারের কাজের প্রতি সে উদাসীন। সংসারের সব কাজ মন্দাকিনীকেই সামলাতে হয়। লেখক তাকে চাঁছা-ছোলা প্রকৃতির নারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। ভূত, প্রেত, তাবিজ কবচ এইসব কুসংস্কারে বিশ্বাসী মন্দাকিনী সাংসারিক কোনো ঝামেলায় স্বামীকে জড়ায়নি।

বকুলবালা পুলিশ কর্মকর্তা রূপচাদের স্ত্রী। সে তার স্বামীর হাতের ক্রীড়নক। স্বামীর কথাই তার কথা। স্বামীকে সে খুব মানে, বলা যায় মানতে বাধ্য। নিঃসন্তান বকুলবালাকে একটি চকলেট দিয়েই ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখা যায়। বনফুল তাকে 'খুকি' সম্বোধন করে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সহজ সরল মনের বকুলবালার কয়েকটি পাখি পোষার কাজ ও চণ্ডিকে নিয়েই তার সময় কাটে। বকুলবালার চারদিকে শাসন ও সোহাগের এক অদৃশ্য দেয়াল তৈরি করে রেখেছেন রূপচাঁদ। সেই অদৃশ্য দেয়াল ভাঙারও কোনো চেষ্টা বকুলবালার নেই। স্বামীকে সে দেবতা জ্ঞান করে আবার স্বামীর অনৈতিক কাজে তাকে প্রহার করতে দ্বিধাবোধ করে না। রূপচাঁদ ডানাকে জোর করে পেতে চাইলে ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে বকুলবালা আগমন ঘটে। দেবতারূপ স্বামীকে এমন অপকর্মে লিপ্ত হতে দেখে তাকে প্রহার করতে বাঁধেনি।

এই তিন নারী চরিত্র তাদের স্বামীদের স্বার্থে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে তারা মনের আকাশে উড়ে বেড়াতে পারেনি, উড়ে বেড়াবার সাধও জাগেনি তাদের। স্বামী-সংসারের চার দেয়ালের মাঝে কেটেছে তাদের জীবন। বনফুলের তিন নারী চরিত্র চিত্রণ অনেকটা ব্যতিক্রমধর্মী বলা যায়। বনফুল নারী চিত্রণের প্রকৃত মনোযোগ দিয়েছেন ডানার চরিত্র নির্মাণে। ব্যক্তিগত জীবনে বনফুল নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী লীলাবতীর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তার স্বাধীন মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তার। বনফুলের এইরূপ মানসিকতারই প্রতিফলন ডানা চরিত্র সৃষ্টিতে লক্ষ্য করা গেছে।

তাছাড়া উপন্যাসের প্রথম পর্বে পাখি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাঠককে পাখির জগতে স্বাভাবিকভাবেই বিচরণ করতে অনুপ্রেরণা দেয়। এ পর্বে পাখির বৈশিষ্ট্য, পৃথিবীতে কত রকম এবং কত হাজার পাখি আছে, এদের মধ্যে কত রকম পাখি ডাকতে পারে, কত রকম পাখি গাইতে পারে; তারা কীভাবে তার সঙ্গিনীকে ডাকে। তাদের ডিমের রং কোন সময় বদলায়, গাইয়ে পাখিদের ডিমের রং ছিটছিট হয় কেনো; গর্তে ডিম পারা পাখিদের ডিমের রং সাদা হয় কেনো; কোন পাখি মাটিতে বাসা বানায় আর কোন পাখি গাছে বাসা বানায়; পাখির বৈজ্ঞানিক নাম, ইংরেজি নাম এবং বাংলা নাম – এইরূপ নানা বিষয়ের কথা আছে। আবার পাখির সাথে কবির সম্পর্ককে নিবিড়ভাবে আবিষ্ট

করে দিয়েছে পাখির বৈশিষ্ট্য নিয়ে কবিতা লেখার মাধ্যমে। অনেক পাখির বৈশিষ্ট্য, তাদের স্বভাব ধর্ম নিয়ে আনন্দমোহন কবিতা লিখেছেন। সেইসব কবিতা থেকে পাখির স্বভাব সম্পর্কে সব তথ্য পেয়ে যান বৈজ্ঞানিক। বনফুল এই উপন্যাসে বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে পাশাপাশি রেখে সামঞ্জস্যতা বিধান করে দেখিয়েছেন। প্রথম পর্বটি ছিল পাখিময় কিন্তু দ্বিতীয় পর্ব থেকে পাখির আনাগোনা কমতে থাকে। উপন্যাসের মেইন ফোকাসটা চলে যায় কেন্দ্রিয় চরিত্র ডানার দিকে। উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে বা পরিচ্ছেদে বৈজ্ঞানিক অমরেশ পাখি নিয়ে অধিক জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে প্রথমে যান সিমলায় পরে তিনি যান কাশ্মীরে। এরপর থেকে পাঠক ধীরে ধীরে পাখির কথা ভুলতে থাকে ঘটনার বেড়াজালে। প্রথম পরিচ্ছেদের শেষবাক্যে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের সার- কথাই বলেছেন-'সবাই নিজের নিজের আকাশে ডানা মেলে উড়তে চায়'। (পৃ. ২০৬) সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যবিত্ত চরিত্র ডানাও তার নিজের আকাশে উড়ে বেড়াবার জন্যে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায় সবার অজান্তে।

১.৭

কষ্টিপাথর (১৯৫১) প্রকাশকালের দিক থেকে বনফুলের একুশতম উপন্যাস। এটি তাঁর পত্র-আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস। স্বাভাবিকভাবে চিঠি পড়তে সবারই ভালোলাগা কাজ করে, অনেকটা কৌতূহল নিয়েই চিঠি পড়ে থাকে সবাই। আর সেই চিঠি যদি হয় নব-দম্পত্তির পরস্পরকে লেখা চিঠি তবে তো কৌতূহলের যেন অন্ত নেই। এ উপন্যাসে চিঠির সংখ্যা তেপ্পান্ন। কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখার সূত্রপাত অর্থাৎ যাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি শুরু তার চিঠি রয়েছে এখানে মাত্র একটি এবং পাঠককে গল্পের রহস্যময় অংশটুকু জানতে কেন্দ্রিয় চরিত্রের চিঠির জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। *পশ্চাৎপটে* আছে, বনফুলের বিয়ের অব্যবহিত পরেই তাঁর স্ত্রী লীলাবতী ও তিনি হোস্টেলে চলে যান। এ সময় নবদম্পত্তি পরস্পর পরস্পরকে চিঠি লিখে তাদের মনোভাবের কথা আদান-প্রদান করতেন। বনফুলের স্ত্রী সেইসব চিঠি বাক্সবন্দি করে রেখে দেন, কাউকেই চিঠিগুলো দেখাননি তিনি। একসময় বনফুলের এই চিঠিগুলো উপন্যাসের অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠে। উপন্যাসটির একটি পূর্বসূত্র রয়েছে। তৎকালীন *সচিত্র ভারত* পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বনফুলকে অনুরোধ করেন তাঁর পত্রিকায় ছাপানোর জন্যে একটি উপন্যাস লিখতে। বনফুল তখন ভাবছিলেন কী লেখা যায়। ভেবে ভেবে যখন কূল পাচ্ছিলেন না, ঠিক তখনই তাঁর স্ত্রী বহুদিন আগের বাক্সবন্দি করা জীবনের চিঠিগুলো এনে দেন। বনফুল উপন্যাস লেখার খোরাক পেয়ে যান। বিচিত্র আঙ্গিকের প্রবর্তক বনফুল তাই পুরান চিঠিগুলো অবলম্বন করে নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস লিখে ফেলেন – যা পত্র-উপন্যাস নামে পরিচিত। বিশ্ব সাহিত্যে এই ধরণের উপন্যাস লক্ষ্য করা যায় বনফুলের পত্র-উপন্যাস লেখারও অনেক আগে। 'আঠার শতকের ইউরোপে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল এই আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস। স্যামুয়েল রিচার্ডসন, রুশো, গ্যেটে, হোলডারলিনসহ আরও অনেক লেখক এই ধরণের

উপন্যাস লিখেছেন।' (ভূমিকা, অপু দাস, ২০১৩/৭: ১১-১২) তবে বাংলা সাহিত্যে বনফুলেরও আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্লট গঠনে চিঠি গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে ছিল। তাদের উপন্যাসে চিঠি কখনো কাহিনিকে জটিল থেকে জটিলতর করে, কখনও কাহিনির জট খুলতে সহায়তা করে, আবার কাহিনির পরিণতি নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে চিঠি।

বিংশ শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তির যুগে যেখানে হাতের মুঠোয় দুনিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ফেসবুক, ম্যাসেনজার, ইনস্ট্রাগ্রাম সেখানে কাগজে লেখা চিঠি পড়ে সময় নষ্ট করার সময় যেন নেই কারো। তথ্য-প্রযুক্তির বিশ্বায়নের যুগে সময়ের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের যোগাযোগের ভাষা ও রীতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। এসবের মাধ্যমে সময়ের দূরত্ব ঘুচিয়ে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে অর্থাৎ ইমোজি ও সিম্বলের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে আসছে মানুষ। তবে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, একেবারেই চিঠির বিলুপ্তি সাধিত হয়েছে। অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে এখনও কিছু কিছু জায়গায় চিঠি লেখার রীতি প্রচলিত আছে। অনেক রকমের চিঠি আছে, আর চিঠি যদি হয় নব-বিবাহিতা স্বামী-স্ত্রীর তাহলে সব যুগেই তা পড়ার কৌতূহল কাজ করবে বলে মনে করা হয়।

কষ্ঠিপাথর উপন্যাসে কোনো নিটোল কাহিনি নেই। এ উপন্যাসে হাসি, অসিত ছাড়াও অসিতের বন্ধু অতুল, মহেন্দ্র, মহেন্দ্রের স্ত্রী চিত্রা ও হাসির বাবা নীলাম্বরের চিঠি রয়েছে। চিঠিগুলো চিঠি-লেখকের রুচি ও ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করেছে। এখানে প্রতিটি চিঠির ভাষার মানদণ্ড প্রায় একই। প্রতি পত্র-লেখক এক একটি চরিত্র। প্রতি পত্র-লেখক তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে যথাযথ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারা প্রাজ্ঞ এবং তাদের লেখা নির্দিষ্ট মানদণ্ড বহন করে। ফলে একজনের চিঠি বুঝতে অন্যজনের সমস্যা হয়নি। উপন্যাসে হাসি নামে যার পরিচয় রয়েছে সে বনফুলের স্ত্রী লীলাবতী আর হাসির স্বামী অসিত স্বয়ং বনফুল নিজে। অসিত আর বনফুলের পেশা এক, দুজনই ডাক্তার। লীলাবতী যেমন বিয়ের পর হোস্টেলে চলে যায় হাসিও হোস্টেলে থাকে। লীলাবতীর টনসিলের সমস্যা ছিল হাসিরও একই সমস্যার কথা রয়েছে উপন্যাসে। তবে উপন্যাসের কাহিনি তৈরিতে বনফুলের ব্যক্তিগত চিঠি কিছুটা পরিবর্তন করে ব্যবহৃত হয়েছে । অসিতের প্রতিটি চিঠিতে হাসির কাছ থেকে চিঠি না পাওয়ার কষ্টের কথা রয়েছে – রয়েছে হাসিকে হারানোর শঙ্কা। হাসিকে লেখা চিঠিতে অসিত এক কাল্পনিক মেয়ের প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে। এর মাধ্যমে অসিত হাসির মধ্যে একটি হিংসাপরায়ণ ভাব জাগাতে চেয়েছে হাসির বেশি মনোযোগ লাভের আশায়। অসিতের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। প্রেমিক হাসিও বার বার জানতে চেয়েছে তার চিঠি পড়তে অসিতের কেমন লাগে। জবাবে হাসি-পাগল অসিত জানায় –

বলেছি তো অনেকবার খুব, খু-উ-ব ভালো লাগে। সত্যি বলছি ভারি মিষ্টি। একেবারে সহজ সুন্দর স্বচ্ছ। তোমার চিঠির ভিতর তোমাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। ভাষার আয়নায় যেন তোমার ছবিখানি। চিঠিতে বাজে কথা লিখবে না তো কি লিখবে আর? বাজে কথা বলেই তো অত সুন্দর লাগে। বুটের ডালের দর কত, কার্পাস তুলোর চাষ কখন করা উচিৎ, লংক্লথ বেশি মজবুত না টুইল বেশি মজবুত – এই ধরণের কাজের কথা তোমোকে লেখতে হবে না। বাজে কথার রঙিন বুদবুদই ফুটিয়ে তোল তুমি অনর্গল। (বনফুল, ২০১৩/৭: ৪৬)।

'পত্র-উপন্যাসে থাকবে দরকারি কথা, কিন্তু আরও বেশি থাকবে বাজে কথা, চিঠির ভেতর চরিত্রগুলি তাদের নানা মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়ে স্পষ্ট ফুটে উঠবে।' (ভূমিকা, অপু দাস, ২০১৩/৭: ১২) উক্ত উদ্ধৃতিতে সেই বিষয়টি তুলে এনেছেন বনফুল। অসিতের অনুরোধে বন্ধু অতুল হাসির টনসিলের চিকিৎসা করাতে তাকে নিয়ে তার ডাক্তার বন্ধুর কাছে যায়। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে অতুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছে – এতদিন হাসির সাথে তার বাবা ভন্ডামি করে এসেছে। এদিকে অসিত হাসির চিঠি না পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। তবে কিছুদিন পরেই অতুলের চিঠির পেয়ে অসিত জানতে পারে হাসি হোস্টেল থেকে উধাও হয়ে গেছে। এর পরের সাতাশ নম্বর পরিচ্ছেদের চিঠিটা মহেন্দ্র লিখেছে অসিতকে। সেই চিঠিতে মহেন্দ্রের স্ত্রী চিত্রা তাকে হাসির বাবার বাল্য বন্ধু সদানন্দবাবুর (মহেন্দ্রের অফিসের বড়বাবু) কাছে যেতে এবং হাসির হোস্টেল থেকে পালানোর ব্যাপারটি তাকে জানাতে – তিনি হয়তো ভালো পরামর্শ দিতে পারবেন। যে কথা সে কাজ। সদানন্দবাবু মহেন্দ্রের মুখে হাসির সব কথা শুনে বলেন, 'এই রকম যে কিছু একটা হবে তা আমি আগেই জানতাম, নীলাম্বর শেষ রক্ষা করতে পারলে না তাহলে।' (বনফুল; ২০১৩/৭: ৬৯) তিনি এক বান্ডিল চিঠি এনে মহেন্দ্রের হাতে দিয়ে বলেন, অসিতের কাছে পৌঁছে দিতে এবং পড়া শেষ হলে সেগুলো যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়।

এর ঠিক পরের উনিশটি চিঠি নীলাম্বর বাবুর, তার বাল্যবন্ধু সদানন্দবাবুকে লেখা। নীলাম্বরের প্রতিটি চিঠি এক এক করে কাহিনির জট খুলতে থাকে। নীলাম্বরের যৌবনকাল থেকে শুরু করে হাসির হোস্টেল ত্যাগের সব ঘটনার বর্ণনা রয়েছে সেসব চিঠিতে। এক কুম্ভ মেলা থেকে লিলি নামের একটি বোবা মেয়েকে গুন্ডাদের কবল থেকে উদ্ধার করে বাসায় নিয়ে আসেন নীলাম্বরবাবু। বন্ধু সদানন্দবাবুর অনেক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নীলাম্বরবাবু লিলিকে তাঁর কাছে রাখেন। ধীরে ধীরে লিলির প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন তিনি। এক পর্যায়ে তাকে বিয়ে করে সংসার জীবন শুরু করে। তাদের সংসারে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়, নাম রাখা হয় হাসি। কিন্তু নীলাম্বরের জীবনে বিধি বাম হলো। একদিন সন্ধ্যায় নীলাম্বর বাসায় এসে দেখেন লিলি নেই। হাসি একা বিছানায় শুয়ে আছে। পরে চাকরের কাছ থেকে জানতে পারেন, এক কাবুলিওয়ালা এসে লিলিকে নিয়ে গেছে। (পরে লিলির রেখে যাওয়া চিঠি পড়ে তিনি লিলির অতীত জানতে পারেন (লিলির স্বামী এক সাহেবকে খুন করে জেলে গেছে। তার স্বামীর ভাই দুরাত্মা

প্রকৃতির লোক হওয়ায় সে লিলিকে এই সুযোগে কুম্ভ মেলায় নিয়ে আসে বিক্রি করে দেয়ার জন্যে)। এইরূপ পরিস্থিতিতে হাসিকে মানুষ করা নিয়ে চিন্তির হয়ে পড়েন নীলাম্বরবাবু। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি তার বন্ধু সদানন্দবাবুর পরিবারের কাছে হাসিকে দেয়ার কথা জানান এবং তার পরিবারের কাছে হাসিকে রেখেও আসেন। কিন্তু কিছুদিন পর নীলাম্বরবাবু হাসির ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে নিয়ে আসেন। বরং তাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলে জীবনের চলার পথ মসৃণ হবে তার। আর যদি কুসংস্কার বিবর্জিত কোনো সৎ লোকের হাতে হাসিকে তুলে দিতে পারেন তাহলে তো ভাগ্য সুপ্রসন্ন। মেয়েকে নিজের কাছে রাখতে এবার সদানন্দের কথাএতপাত্রী সুভাষিনী যাকে নীলাম্বরের বিয়ে করার কথা ছিল তাকে বিয়ে করেন। হাসি এই নতুন সংসারে বেড়ে উঠতে থাকে। সে ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছেসুভাষিনীই তার মা। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, প্রকৃত সত্য বেরিয়ে পড়ে। সত্যের আগুন জ্বলে ওঠে স্বাভাবিক নিয়মে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভালো পরিবারে সুপাত্রস্থ করা হয় হাসিকে। বিয়ের কিছুদিন পরে সে হোস্টেলে চলে যায় পড়ালেখা সম্পন্ন করতে। এদিকে স্বামী অসিতও হোস্টেলে গিয়ে ওঠে। এ সময় পরস্পর পরস্পরের বিরহের জ্বালা মেটাতে চিঠি লিখতে শুরু করে। জমে ওঠে দুজনের মধ্যে প্রেমালাপ। কিন্তু কিছুদিন পরে সহসা হাসি চিঠি লেখা বন্ধ করে দেয় এই বলে যে – একদিন সে অসিতের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাবে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর পূর্বে হোস্টেলের এক শিক্ষিকার মাধ্যমে হাসি তার জন্মের সত্য ঘটনা জানতে পারে। এর পরেই হাসি হোস্টেল থেকে লাপাত্তা হয়ে যায়। হাসির পরিবারের সবার কাছে যেয়ে তার কোনো খোঁজ না পেয়ে অসিত বিরহের সাগরের অতলে নিমজ্জিত হতে থাকে। হাসিকে খুঁজে পেতে অসিত বন্ধুদের দ্বারস্থ হয়। অসিত তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের চিঠি লিখতে থাকে একের পর এক। একপর্যায়ে অসিতের বন্ধু মহেন্দ্র তার অফিসের বড়বাবু সদানন্দবাবুর (নীলাম্বরের বন্ধু) কাছে যায়। উপায়ান্তর না দেখে সদানন্দবাবু তাকে সত্য ঘটনা সব খুলে বলেন। এসময় সদানন্দ তাঁকে লেখা বন্ধু নীলাম্বরের চিঠির একটি বান্ডেল এনে দেন এবং বলেন, বান্ডেলটি না খুলে সরাসরি অসিতের কাছে পৌঁছে দিতে। অসিত চিঠিগুলো পড়ে আবার তার শ্বশুর নীলাম্বরকে ফিরিয়ে দেয়। হাসি যখন জানতে পারে অসিত বান্ডেলের সব চিঠি পড়ে হাসির জন্ম রহস্য এবং হোস্টেল-পালানোর বিষয়টি জেনে গেছে তখন সে বাবা নীলাম্বরকে একটি চিঠি লেখে তার আত্মগোপনের সময়টুকুতে বিস্তারিত কর্মকাণ্ড জানিয়ে। চিঠির সূত্র ধরে নীলাম্বর হন্যে হয়ে হাসির সন্ধান করেন। একদিন তিনি ঠিকই হাসির বাড়ির সন্ধান পেয়ে যান। তিনি হাসিকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে হাসি অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি নিজের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বাড়ি ফিরে না গিয়ে প্রতিদিন হাসির পিছু তার অফিস পর্যন্ত যান। এবং হাসি যতক্ষণ অফিসে কাজ করে তিনি রাস্তায় ঠাই দাঁড়িয়ে ততক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করেন। একদিন হাসি বাবাকে দেখতে না পেয়ে একটি ছাপড়া হোটেলে গিয়ে বাবার সন্ধান করে। সেখানে বাবাকে সে অজ্ঞান অবস্থায়

দেখতে পায়। অনেক চেষ্টা করেও হাসি বাবাকে বাঁচাতে পারেনি। বাবার প্রতি তার অসীম কৃতজ্ঞতা জেগে উঠে। বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং বাবার অভাব বোধ থেকে হাসি বাবার হয়ে অসিতের কাছে ক্ষমা চায় এবং তার কাছে ফিরে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করে –

> তুমি যদি আবার আমাকে ফিরে যেতে বল ফিরে যাব। আমাদের সমাজে যে আর্থিক কারণের জন্য বাধ্য হয়ে স্ত্রীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর কাছে ফিরে যেতে হয় সে কারণ যদিও আমার ক্ষেত্রে নেই, তবু যাব,কারণ তোমার মত লোকের সহধর্মিণী হওয়া সৌভাগ্য বলে মনে করি আমি। আমার স্পর্শে পাছে তুমি কলঙ্কিত হও তাই আমি তোমাকে ছেড়ে চলে এসেছিলাম। তোমাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী নিজেকে বিশুদ্ধও করেছি এতদিন। ডাক্তাররাই আমাকে ছাড়পত্র দিয়ে বলেছে এবার তুমি নির্দোষ, নীরোগ, এবার তুমি সমাজে ফিরে যেতে পারো। তুমি আমাকে ফিরে নেবে কি। তোমার দিক থেকে যদি কোন কুণ্ঠা থাকে তাহলে আমি ফিরতে চাই না। (পৃ. ১০২)

সবশেষের চিঠিটা হাসির উপরিউক্ত চিঠির উত্তর। চিঠিতে রয়েছে, উদার মানসিকতার পরিচায়ক অসিত হাসিকে ফিরিয়ে আনতে রওনা হয়েছে।

এ উপন্যাসে বনফুল চিঠির মাধ্যমে কাহিনির উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসে কেবল গদ্যে লেখা চিঠিই নয়। গদ্যের ভিতর পদ্যও রয়েছে। সাত নং এবং পঁচিশ নং পরিচ্ছেদে দীর্ঘ পদ্যও রয়েছে। সাত নং পরিচ্ছেদ শুরুই হয়েছে কবিতা দিয়ে এবং কবিতার শেষে কয়েকটি লাইন রয়েছে হাসির সুস্থ থাকার বিষয়ে কিছু টিপস। পঁচিশ নং পরিচ্ছেদে রয়েছে একটি গদ্য-কবিতা যা অসিত তার স্ত্রীকে দিয়েছিল। অসিতের বিয়ের অনেক আগে লেখা হয়েছিল কবিতাটি। ওই কবিতাটি অসিতের দৃষ্টিতে একজন আধুনিক নারীর চরিত্র কেমন হবে – সে সম্পর্কে লেখা। বাকি সব পরিচ্ছেদ গদ্যে, পত্র আকারে লেখা। বলতে গেলে উপন্যাসের সবশেষে রয়েছে হাসির পত্র। হাসি তার আত্মগোপনের রহস্য উন্মোচন করে লিখেছে চিঠিটি এবং অসিতের কাছে ফিরে আসার বাসনার কথাও জানিয়েছে সে। হাসির এই চিঠির পরে রয়েছে তিন লাইনে লেখা অসিতের উত্তর। অসিতের এই উত্তরের মাধ্যমে তাদের পুনরায় মিলনের কথা জানতে পেরে পাঠক আশ্বস্ত হন।

প্রধান চরিত্রগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে লেখকের মানস-প্রবণতা বোঝা সহজ হবে। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে নারীর ব্যক্তিত্ব, নারী-স্বাধীনতা, নারীর সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা হাসি চরিত্রটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। 'স্বামীর উপর নির্ভর করে গ্লানিময় জীবন কাটানোর চেয়ে স্বনির্ভর হয়ে সসম্মানে বেঁচে থাকার প্রেরণা তার কাছে অনেক বড়।' (উর্মি নন্দী, ১৯৯৭: ১৮৩) জন্মের নতুন পরিচয়ের বিষয়টি হাসি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি। স্বামী, বাবা কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে হোস্টেল ত্যাগ; বান্ধবীর বাড়ি সম্বলপুরে আশ্রয় নেয়া এবং সেখানে চারদিন অবস্থান শেষে চাকুরি নিয়ে দিল্লীতে আসা; দিল্লীতে বাসা ভাড়া নিয়ে গোপনে চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে ওঠা

এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে স্বামীর কাছে ফিরে আসার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা – প্রকৃত অর্থে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে এসে আধুনিক নারীর আত্মমর্যাদায় আস্থা স্থাপনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আত্মগোপনের রহস্য উন্মোচন করে স্বামী অসিতের কাছে লেখা হাসির চিঠি –

> রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণালের যে সব সুবিধা ছিল আমার সে সব কিছুই নেই। তোমাদের তরফের কোনও নির্যাতন আমাকে ঘর-ছাড়া করে নি। আমি পালিয়ে ছিলাম লজ্জায়! ...তোমার আধুনিকা কবিতার মেয়েটিকে আমার খুব ভালো লাগে নি। ...তবু কিন্তু সেই মেয়েটি উদ্বুদ্ধ করেছিল আমাকে।...আমার দিকে চেয়ে বলল,"ভাবছ কি, বেরিয়ে পড়। প্রমাণ করে দাও যে তোমার শক্তি আছে। অসুখের বিষ যদি তোমার শরীরে কোনও রকমে ঢুকেই থাকে, তার প্রতিকার কর। এটা বিজ্ঞানের যুগ, প্রতিকার মিলবেই। ভেঙে পড়ছ কেন? (পৃ. ৯৮-১০০)

দৃঢ় প্রত্যয়ী, সাহসী এবং উঠে দাঁড়ানো নারীর মানসিক অবস্থা হাসির উক্ত চিঠিতে প্রমাণ মেলে। 'তাই হাসির গৃহত্যাগ কি নোরা বা মৃণালের মত প্রশ্ন তুলে আসেনি। তার আত্মগোপন আসলে আত্মরক্ষারই নামান্তর ছিল। জীবনের অভিজ্ঞতাই ছিল তার কষ্টিপাথর।' (ভূমিকা, বিষ্ণু বসু, ২০০০: ৯)

অসিত কবি, উদারমনস্ক, নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং অনেক বেশি সহিষ্ণু। তার স্ত্রী হাসির আত্মগোপন থাকার বিষয়টি সে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে, কোনো রকম প্রশ্ন তোলেনি। সমাজের চোখে নারীর এরূপ আত্মগোপন অনেক প্রশ্নবোধক হয়। তৎকালীন সমাজে নারীর আত্মগোপনে থাকা এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর স্বামীর কাছে ফিরে আসার ইচ্ছে ব্যক্ত করা, এমনকি নারীর অস্বাভাবিক জন্ম-রহস্য মেনে নেয়ার মানসিকতা অসিত চরিত্রটির মধ্যে রয়েছে। অসিতের এ আধুনিক মানসিকতা পক্ষান্তরে বনফুলের আধুনিকতারই নামান্তর।

উদারমনস্ক, কাব্যপ্রেমী, স্বেচ্ছাচারী, মনের অনুভূতি প্রকাশে সাবলীল, জীবনের উত্থান-পতনকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়ে জীবনকে গতিশীল রাখার প্রতিচ্ছবি মধ্যবিত্ত নীলাম্বর চরিত্রটি। কন্যা হাসির কাছে হাসির প্রকৃত জন্ম পরিচয় গোপন রাখলেও তার বন্ধু সদানন্দকে চিঠিতে তার ব্যক্তিগত জীবনের সব কথা সাবলীলভাবেই বলেন। মেলায় বখাটেদের কবল থেকে বোবা মেয়েকে উদ্ধার এবং তাকে জীবন-সঙ্গী করা, তার স্বেচ্ছাচারী, খামখেয়ালী মনেরই পরিচায়ক। আবার শিশু হাসিকে বিছানায় রেখে এক কাবুলিওয়ালার সাথে স্ত্রীর চলে যাওয়ার ঘটনাটিতে বিচলিত হতে দেখা যায় না তাকে। এ অবস্থায় হাসিকে মানুষ করে গড়ে তুলতে সে দ্বিতীয় বিয়ে করে। পরবর্তীতে হাসির আত্মগোপন অবস্থায় তার ঠিকানা খুঁজে বের করা এবং তাকে ফিরিয়ে আনতে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হাসির বাসার সামনে প্রতিদিন দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা, অবশেষে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করা – একজন সত্যবাদী, স্নেহকাতর পিতার শাশ্বত রূপটি প্রকাশ পায়।

বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত, শহরের হতাশাগ্রস্ত চরিত্র অতুল। অসিতের বন্ধু অতুল গাইতে পারে, ছবি তুলতে পারে, বিদ্যে আছে, লিখতেও পারে। কিন্তু তার জীবনের কোনো সমস্যার সমাধানই করতে পারছে না সে। মাথায় নানাবিধ ইজমের আগুন জ্বলছে আর পেটে খিদে। কথার ঠিক নেই, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য হরদম করে চলছে। সংযম নেই, মাত্রাবোধও নেই। চিঠিতে অতুল সম্পর্কে জানা যায় – 'তাজমহল গড়বার সমস্ত উপকরণ হাতের কাছে আছে, নেই কেবল সিমেন্ট জাতীয় জিনিস যা সমস্ত জিনিসটাকে গড়ে তোলে, ধরে রাখে।' (পৃ. ৩৪) ভারত স্বাধীন হলেও কালোবাজারি, দুর্নীতি, ঘুষের দৌরাত্ম্য যুব সমাজকে বিষিয়ে তুলেছিল। অসিত চরিত্রটি তারই প্রতিরূপ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে।

১.৮

ভুবন সোম (১৯৫৭) কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামেই উপন্যাসটির নামকরণ করা হয়েছে। ভুবন সোমের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে বাবার বন্ধু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের দাদা অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যাঁকে জ্যাঠামশাই ডাকতেন বনফুল, সাহেবগঞ্জে পড়াশোনা করবার সময় যে জ্যাঠামশাই জেঠিমার কাছে মাঝে মধ্যেই যেতেন – তাঁর ছাপ আছে। (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ১০৪) ভুবন সোমের বয়স ষাটের কাছাকাছি কিন্তুতাকে দেখতে এত বয়স বলে মনে হয় না। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে জাহাজে করে শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে যাচ্ছেন তিনি পাখি শিকার করতে। উপন্যাসের পেশাজীবী মধ্যবিত্ত চরিত্র ভুবন সোম একজন সৎ অফিসার। সামান্য কেরানি থেকে যোগ্যতা দিয়ে তিনি এ টি এস হয়েছেন। বছর খানেক পর তিনি অবসরে যাবেন। চাকুরিতে একসটেনশন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তিনি খোশমোদ করতে পারেন না তাই তাঁর ওপর আজকালকার উপরওয়ালারা সন্তুষ্ট নন। কেবল চাকুরি জীবনে নয়, পারিবারিক জীবনেও তিনি ক্রমাগত মার খেয়েছেন। কেউ তার কষ্টের দিকে ফিরে তাকাননি–নিজের পরিবারের বাবা, মা ভাই-বোন স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কেউ না। ষাট বছর বয়সে এসে অতীতের কষ্টের জীবনের কথা ভেবে তিনি শিউরে উঠেন।

ভুবন সোমের একদিনের পাখি শিকারের ঘটনা এ উপন্যাসের কাহিনি। একদিনের শিকারে স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে তাঁর কৈশোর ও যৌবন কালের অনেক ঘটনা। স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, ষোল বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে পাহাড়সম দায়িত্ব ও ঋণের বোঝা টানতে হয়েছে তাঁকে। জীবনের এই কঠিন সময়ে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন কেউ সহযোগিতার হাত বাড়ায়নি। কিন্তু একজন নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে এসেছেন। তিনি ভুবন সোমের বাবার বন্ধু যোগেন হাজরা। ডি টি এস আপিসে চাকরি করতেন তিনি। নিজের উপযুক্ত ছেলেকে চাকুরি না দিয়ে তিনি ভুবন সোমের জন্যে চাকুরির ব্যবস্থা করেন।

যৌথ পরিবারের সদস্যদের দেখভাল করতে যেয়ে ভুবন সোমকে হিমশিম খেতে হয়েছে। তিনি পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে দু-বোনের বিয়ে দেন, বোনের সংসারে চৌদ্দজন সন্তান – তাদের নানারকম আবদার ও মাত্রা-ছাড়া দুষ্টামি তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। শুধু বোনদের সংসারের ঝামেলা নয়, দুইভাইকে নিয়েও তাঁর ভোগান্তির শেষ ছিল না। বদ অভ্যাসের ফলে স্কুল থেকে তাদের নাম কেটে দেয়া হয়। ফলে পড়ালেখার পাট চুকিয়ে এক ভাই ফুটবল খেলায় নাম করে, আরেক ভাইয়ের থিয়েটারের জোরে ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসে চাকরি হয়। সংসারের ঝামেলা থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচার জন্যে বিনোদন খুঁজে বেড়াতেন তিনি। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন নানা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। ছবি একেঁছিলেন কিছুদিন। এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান গার্ড ব্রাউন সাহেব তাঁকে ওয়াটার-কলারে দীক্ষা দিয়েছেন। এরপর নানা রকম আচার, মোরব্বা, জ্যাম জেলি করার রেসিপির বই কেনেন এবং সাথে যাবতীয় সরঞ্জাম। উদ্দেশ্য বিনোদনের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। কিন্তু আমের আচার খেয়ে বাড়ির একজনের পেট খারাপ হলেই বন্ধ হয়ে যায় তাঁর বিনোদনের এ উপায়টি।

তিনি যখন ট্যুরে যেতেন তখন মানুষকে অনুরোধ করে তাঁর বানানো খাবার খেতে দিতেন। তার খাবার খেয়ে কোনো বাঙালিই প্রশংসা দূরে থাক ভদ্রতা করে ধন্যবাদটুকু দেয়নি। বরং দোষ ধরেছিল কেউ কেউ। ভুবন সোমের আফসোস বাঙালিদের এমন ব্যবহারে। তবে একজন ফোরম্যান মিস্টার স্মিথ তার জ্যাম খেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন তাকে। সোম তখন মনে মনে বলে উঠেন, তাদের এ্যাটিকেটের কারণেই তারা দুনিয়াটা দাবড়ে শাসন করে বেড়াচ্ছে। তারা গুণীর সমঝদার, তারা জানে কোথায় কী করতে হয়।

কিছুক্ষণ পর পর তিনি নস্টালজিক হয়ে পড়েন। স্মৃতিচারণ থেকে উঠে আসা আরেকটি ঘটনা – ভুবন সোম তখন সামান্য কেরানি। একবার থার্ড ক্লাসের গাড়িতে করে বারহারোয়া স্টেশনে যাচ্ছিলেন। গাড়িতে প্রচণ্ড ভীর, প্রকাণ্ড পাগড়ি পড়া রোগা ভদ্র গোছের একটি লোক এককোণে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। তার পাশে বসে আছে দাড়িওয়ালা এক বুড়ো। সে গাড়ির মেঝেতে একটু পরপর ঘড় ঘড় করে কফ ফেলছে। এ অবস্থায় পাগড়ি পড়া লোকটি প্রতিবাদ করে উঠলে বুড়ো তার মুখের ওপর কথা বলতে ছাড়েনি। পরবর্তী সময়ে দেখা গেলো, বুড়ো মেঝেতেই কফ ফেলছেন আর পাগড়ি পড়া লোকটি খবরের কাগজ ছিড়ে কফটি তুলে পরিষ্কার করে বাইরে ফেলছেন, মৃদু হাসছেন কিন্তু কিছুই বলছেন না বুড়োকে। এভাবে তিনবার কফ ফেলার পর বুড়ো চতুর্থবার কফটি বাইরে ফেলে। আর এ সময় হো হো করে গাড়িসুদ্ধ লোক হেসে ওঠে। গাড়ির সবাই যেন ফুটবল ম্যাচ দেখছে আর মজা নিচ্ছে। ঘটনাটি দেখে অবাক হলেন ভুবন সোম। গাড়িটি থামলে সোমের আরও বিস্ময় লাগলো। দেখা গেলো রোগা পাগড়ি পড়া লোকটিকে স্টেশনের দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন ভদ্রলোক তাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে

নিচ্ছেন। তখন আসল ব্যাপারটি জানা গেলো, পাগড়ি-পরা লোকটি আফ্রিকা ফেরত ব্যারিস্টার, দিগ্বিজয়ী মিস্টার এম কে গান্ধী। উপন্যাসেও কাহিনির শেষে চমক সৃষ্টি করা বনফুলের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য।

এভাবে একটার পর একটা স্মৃতি রোমন্থন করেই চলছেন ভুবন সোম। মাঝে মাঝে গঙ্গায় চোখ রেখে মাছরাঙা দেখে অভিভুত হন তিনি। আবার কখনও দেখেন রাজ হাঁসের সারি – যে হাঁস তিনি শিকার করতে বেরিয়েছেন। আগে তিনি শিকারে বের হলে সাথে কাউকে নিয়ে যেতেন এবার তিনি একাই বেরিয়েছেন। সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে তিনি পাখী শিকার করতে যান। কিন্তু পাখী মারাটা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। কখনও দুই/একটা পাখি মারতে পারলেও বন্ধুর ছেলে অনিলকেই দিয়ে দেন সেটা। কারণ তাঁর পরিবারের খাবার লোক কেউ নেই।

যেকোনো অবস্থায় কাজকে অগ্রাধিকার দেয়া ভুবন সোম ঘুষ নেয়া এবং ঘুষ দেয়ার চরম বিরোধী। তাই তাঁর জীবনের মোটো – 'ডিউটি ফাস্ট সেলফ লাস্ট'। রেলের টিকেট-কলেক্টর সখীচাঁদ ঘুষ নেয়ায় তার বরুদ্ধে তিনি রিপোর্ট তৈরি করে রেখেছেন, সময়মত তা পাঠাবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই রেল-কর্মচারী সখীচাঁদের নববধূর পিত্রালয়ে এসে হাজির হতে হয় তাঁকে। শুধু তা-ই নয়, দুরন্ত মেয়েটির (নববধূ) বাবার যত্ন, আতিথেয়তা, শিকারে মেয়েটির সহযোগিতা এবং বিয়ে ভেঙে গেলে শ্বশুর বাড়ি যেতে না পারার কষ্টের কথা ভেবে ঘুষখোরের বিরুদ্ধে করা রিপোর্ট না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বাড়ি ফিরে এসে তামাতুলসী গঙ্গাজলে 'আর আমি কখনও ঘুষ নেবো না' (বনফুল; ২০১৩/৮: ৬৪৩) শপথ করিয়ে কর্মচারীটিকে সৎ হওয়ার সুযোগ দিয়ে ছেড়ে দেন তিনি।

অতি সাধারণ ও সরল প্রকৃতির মেয়ে বিদিয়ার সহযোগিতা ভুবন সোমের মধ্যে দারুন প্রভাব ফেলেছে। শিকারের প্রথম দিকে ব্যর্থ হয়ে তিনি গঙ্গার ধারে চুপ করে বসে তাই ভাবছিলেন – জীবনে তিনি কত চড়াই উৎড়াই পার হয়েছেন, আপনজনের মৃত্যুর কত শোক তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন। কখনও তাঁর চোখ থেকে জল পরেনি। আজকে শিকারে ব্যর্থ হয়ে মেয়েটির সামনে কেঁদে ফেলেছেন কেনো? কোনো কাজে ব্যর্থ হলে বয়োজ্যেষ্ঠ যেভাবে কনিষ্ঠকে সফল হতে উৎসাহ দেয় তেমনি বিদিয়া সোমকে আশ্বস্ত করে বলে, 'আপনি বসুন এখানে, আমি ঝাউগাছ নিয়ে আসি। হাঁসেরা আবার এখুনি আসবে। এবার ঠিক মারতে পারবেন।' (বনফুল, ২০১৩/৮: ৬৩৮) বিদিয়া-প্রভাবিত আরেকটি ঘটনা – বিদায় বেলায় শিকার করা চখাটিকে বেঁধে হাতে করে যখন নিয়ে যান তখন উড়ে যাওয়া চখাটি সোমকে অনুসরণ করে তাঁর মাথা বরাবর অবিরত কাঁ আঁ, কাঁ আঁ ডেকে চলে। সোম সেটিকে লক্ষ্য করে ফায়ার করে। তারপরও চখাটির ডাক বন্ধ হয়নি। এ সময় সহসা তাঁর মানসপটে একটি প্রতীকি ছবি ভেসে উঠে। তাঁর মনে হয়, উড়ন্ত চখাটি যেন বিদিয়া আর হাতের চখাটি সখীচাঁদ। সোম তাৎক্ষণিক চখাটির বাধন কেটে দিলে আহত চখাটি উড়ন্ত চখীটির কাছে যেয়ে মিলিত হয়। দুজনই কাঁ আঁ ডেকে উড়ে চলে আর সোম তাদের পানে তাকিয়ে

থাকে যতক্ষণ না পাখি দম্পতি অদৃশ্য হয়। পাখি দম্পতির মিলন করিয়ে এবার বিদিয়া-সখীচাঁদের মিলন ঘটাতে তিনি সখীচাঁদের বাড়িতে এসে তাকে তামা-তুলসি-জল স্পর্শ করিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন জীবনে আর ঘুষ না নেয়ার। উপন্যাসের শেষে বনফুল চমক দেখালেন। শপথ নেয়ার পর বিদিয়াকে লেখা সখীচাঁদের চিঠির গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা – 'দেবী একটা সুসংবাদ আছে। ভুবন সোম আমার নামে রিপোর্ট করে নি। শুনলাম সাহেবগঞ্জ আমাকে বদলি করেছে। ওটা খুব ভালো স্টেশন। অনেক উপরি–' (পৃ. ৬৪৪)

কর্তব্যে, কর্মে কঠিন সোমকে জীবনে ষাটের কাছাকাছি এসে পাখি শিকার করতে ব্যর্থ হয়ে এক কিশোরীর সামনে কাঁদতে হয়েছে। সোম যেন বাজীতে হেরে না যান, সে কথা মাথায় রেখে, বালিকাটি তাঁকে পাখি শিকারে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করে। বনফুল উপন্যাসে ভুবন সোম চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন কর্তব্যে-কর্মে কঠিন মানুষও জীবনের একটা পর্যায়ে মানবিকতার খাতিরে হোক বা কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে হোক তাকে 'মোটো' থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। তাঁর নাতনি তাঁকে গান শুনিয়েছিল–'সবার রঙে রঙ মেশাবে'–এ কাথাও মনে ছিল ভুবন সোমের। উপরন্তু বন্দি পাখিটা ছটফট করছে সোমের কবলে পড়ে – এ বাক্যটির মধ্যে দিয়ে প্রতীকী ভাবনায় যেন ভেসে উঠেছে ঘুষ নেয়ার অপরাধে অপরাধী সখীচাঁদের অবস্থা। একই সাথে ভেসে উঠেছে বিদিয়ার কান্না-জড়িত কণ্ঠ – দয়া করুন, ওকে ছেড়ে দিন, ওর চাকরিটা চলে গেলে তার শশ্বর বাড়ি যাওয়া হবে না। ভুবন সোম শিকারি পাখিটা এবং সখীচাঁদ, দু'জনকেই ছেড়ে দিলেন। আর এখানেই ভুবন সোম চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে।

উপন্যাসটির কাহিনি বাংলার বাইরে বিহারের মানুষ ভুট্টা, ভাগিয়া, ভিখন, চতুর্ভুজ, বিদিয়াদেরকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। কেবল ভুবন সোমই নয়, উপন্যাসের ভদ্রেতর চরিত্রগুলোও যেন বনফুলের পরিচিত জগত থেকেই উঠে এসেছে। এরা সবাই বিহারবাসী গ্রামচরিত্রের প্রতিবিম্ব (উর্মি, ১৯৯৭: ১৮৬)। তাদের ভাষা, তাদের কথা বলার স্টাইল, তাদের জীবন ধারা, খাদ্যাভাস সর্বোপরি তাদের সার্বিক সহযোগিতা ভুবন সোমের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে কাজ করেছে বলা যায়।

বিদিয়া মাংস খায় না, সে নিরামিষভোজী, তাই সে প্রাণী হত্যাকে গর্হিত কাজ মনে করে। সোম তাকে বলে, তুমি তরকারি খাও তাতেও-তো প্রাণী হত্যা হয়, সেটা করো কোনো? এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা স্মরণীয়। প্রাণী-হত্যা বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে বনফুলের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। তা হলো – ১৯৩৫ সালে রাজস্থানের জয়পুর থেকে রামচন্দ্র শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক মন্দিরে জীব হত্যা বন্ধ করতে কালীঘাটের কালীমন্দিরের সামনে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। সে-ই ধর্মঘটে কেউ সাড়া দেয়নি। কেবল রবীন্দ্রনাথ তাকে আশীর্বাদ করে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন। (প্রভাত কুমার, ১৯৬৪/৪: ৩৫) বিষয়টির পক্ষে তখন অনেক বাদ-প্রতিবাদ ছাপা হয়। এ সময়

বনফুলও দোল সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় এ নিয়ে একটি কবিতা লেখেন: রবীন্দ্রনাথ ছাগ-শিশুর প্রতি করুণা প্রকাশ করেছেন কিন্তু ফুলের তোড়া গড়তে যে জীবন্ত ফুল তুলে আনা হয়, তসর গরদের জামা পরতে যে লক্ষ কীট নৃশংসভাবে মেরে ফেলা হয়, আলতা পরার জন্যে যে কত কোটি প্রাণী প্রাণ দেয় তার কথা কবি ভাবেননি কেন (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ৫৫)।

ঘুষখোর কর্মচারীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট তৈরি করে তারই হবু স্ত্রীর আন্তরিকতায় এবং তার সরল ব্যবহারে ভুবন সোমের মধ্যে নতুন অনুভূতির সঞ্চার হওয়া – উপন্যাসের এই ছোট্ট কাহিনিকে কেন্দ্র করে বনফুলের দেখা পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদলে গড়া তাঁর পিতৃবন্ধুর চরিত্রটি সামনে রেখেই ভুবন সোম সার্থক চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছে। ভুবন সোম পাখি শিকারী নন, সখের বশে শিকারে বেড়িয়েছেন। বনফুলের প্রায় অনেক উপন্যাসেই পাখি শিকারের প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিকভাবেই থাকে যা পক্ষান্তরে বনফুলের পাখি শিকারের অনুসন্ধিৎসু মনের বহিঃপ্রকাশ বলা যায়।

বিহারের ভাগলপুরের বাঙালি কথা সাহিত্যিক বনফুলের চিকিৎসক-চরিত্র কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোতে চিকিৎসকের চোখে দেখা জীবনও সমাজ বাস্তবতা উঠে এসেছে। আবার কোনো কোনো উপন্যাসে এর বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসক-চরিত্র বহুবার ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর উপন্যাসে। সেইসব চিকিৎসক তাঁদের ব্যক্তিত্বের অগ্নীশিখায় তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবনকে সুস্থ-সুন্দর ও স্বাভাবিক করতে সহযোগিতা করেছেন আজীবন। বনফুল সে-সব চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কেবল চিকিৎসা জগতকে দেখাতে চাননি, তিনি তুলে ধরেছেন সমাজকে, ব্যক্তিমানুষকে এবং দেশকে। তাঁর এ জাতীয় অন্য উপন্যাসগুলো – *অগ্নীশ্বর*, *হাটেবাজারে*, *উদয়-অস্ত*, *এরাও আছে।*

১.৯

বনফুলের *অগ্নীশ্বর* (১৯৫৯) উপন্যাসটি অগ্রজ কথাশিল্পী শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে (১৮৮১-১৯৬০) উৎসর্গ করেন তিনি। উপন্যাসের নাম চরিত্র অগ্নীশ্বর সম্পর্কে একটু বলে নেয়া যাক। বনফুলের মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ছিলেন ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যিক-ডাক্তার বনবিহারীর ছোটগল্প *নরকের কীট*, *সিরাজীর পেয়ালা* এবং উপন্যাস *দশচক্র* বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য মর্যাদার দাবীদার। *শনিবারের চিঠি* ও *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় তাঁর লেখা ও কার্টুন নিয়মিত ছাপা হত। লেখালেখির জন্যে তিনি বনফুলকে বেশি স্নেহ করতেন। কেবল স্নেহ করতেন না কখনও কখনও প্রশ্রয়ও দিতেন। আর এই একটিমাত্র কারণে বনফুল ভাগলপুর থাকাকালীন তাঁর অনেক লেখা তিনি ডাকযোগে বনবিহারীর কাছে পাঠাতেন। বিনবিহারী সেসব লেখা সংশোধন করে ফেরত পাঠাতেন সাথে একটি বড় আকারের চিঠিও থাকতো। বনফুল সেই চিঠিকে মাস্টারমশায়ের বেত বলে মনে করতেন। বনবিহারী যখন

ভাগলপুরে কিছুদিন ছিলেন বনফুল তাঁর কাছে গিয়ে নিজের লেখা তাঁকে পড়ে শোনাতেন – 'ভালো লাগলে বলতেন – নটমল্লার জমেছে। না জমিলে, মৃদু হাসিয়া বলিতেন–সুর ঠিক বাঁধতে পারনি, বেসুরো ঠেকছে মাঝে মাঝে। আগাগোড়া ঢেলে লেখো।... তাঁহার চরিত্রের আদর্শেই আমি 'অগ্নীশ্বর' লিখিয়াছিলাম।' (বনফুল, ১৯৯৯: ২২৫)। লেখক উপন্যাসের শুরুতেই অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে:

> ত্রিশ বছর পূর্বে তিনি দেখিতে মূর্তিমান অগ্নিশিখার মতোই ছিলেন, যেমন উজ্জ্বল তেমনি প্রখর। কিন্তু অগ্নির সহিত তাহার সাদৃশ্য ওইখানেই শেষ হইয়াছে। ... তিনি যখন কাহার হৃদয় বা মস্তক লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতেন, তখন সে বেচারির মনে রাগ ছাড়া অন্য কোনও ভাবোদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না। তিনি অন্য ভাবোদ্রেক করিতে চাহিতেনও না।...কোনও প্রকার বোকামী, গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, ন্যাকামি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রায়ই বলিতেন – বাইবেলে পড়েছি মানুষের মুখে একটা ডিভাইন লুক আছে, কিন্তু আমি তো বোভাইন লুক ছাড়া কিছু দেখিতে পাই না। তার সঙ্গে পেজোমিরও মিশেল আছে। (বনফুল, ২০১৩/১০: ২৭)

কাহিনির শুরুতেই কথক বলছেন, অগ্নীশ্বরের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় ছাত্রজীবনে। এ সময় অগ্নীশ্বর ছিলেন রেলের মেডিকেল অফিসার। তৎকালীন গভর্নমেন্ট অফিসারই রেলের মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ করতেন। অগ্নীশ্বর তাঁর মেডিকেল কলেজের মাস্টারমশায় অন্নদা ঘোষালের পদে পোস্টিং নিয়ে এসেছেন। এর পেছনের ঘটনাটি হলো–অন্নদা ঘোষাল সবার প্রিয় ডাক্তারই ছিলেন, যে যেভাবে তাকে ডাকতেন তিনি সেভাবেই সাড়া দিতেন। বিনা পয়সায় সবাইকে দেখতেন, বিনা পয়সায় সার্টিফিকেটও দিতেন। আর সবার ভালো চাইতে গিয়ে ফেঁসে গেলেন একদিন। তার নামে ওপরওয়ালার কাছে দরখাস্ত গেলো। ফলে ডাক্তার ঘোষাল বদলি হয়ে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন অগ্নীশ্বর। অগ্নীশ্বর চার্জ বুঝে নেয়ার সময় তার অগ্রজ অন্নদা ঘোষালের চোখে পানি দেখে বিচলিত হয়েছেন। কারণ সার্ভিস রেকর্ডে কলঙ্কের ছাপ নিয়ে ভারাক্রান্ত মনে তাঁর মাস্টারমশায়ের বিদায় নেয়াটাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেননি তিনি। কর্মনৈপূণ্য ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কাজে যোগদানের প্রথম দিনেই সবাইকে অবাক কওে দিলেন। এবং প্রমাণ করে দিলেন, 'শক্তের ভক্ত, নরমের যম' কথাটির। কাজের প্রথমদিন সকালে অফিসে যোগদান করেই দেখেন একটি স্থূলকায় লোক একটি চেয়ারে গদিয়ান হয়ে বসে আছে। লোকটি ডাক্তারকে দেখা মাত্রই নমস্কার করে তার পরিচয় দিলো। পরিচয় পেয়ে অগ্নীশ্বর তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে বললেন – চেরিটেবল হাসপাতালের ওষুধ ভিক্ষে করতে যারা আসে তারা ভিখেরি, তাদের ভেতরে বসার কোনো অধিকার নেই। লোকটির অপমান রেলের কলোনির সবার গায়েই সেদিন লেগেছে। দ্বিতীয় ঘটনাটি ওইদিন রাতের। এক লোক ছেলের জ্বর হওয়ায় হাসপাতালে আসে অগ্নীশ্বরকে নিতে। অগ্নীশ্বর লোকটির কাছে ষোল টাকা ভিজিট অগ্রিম চাইলেন। তিনি বললেন, তিনি অন্নদা ঘোষাল নন, তার নিয়ম কানুন আলাদা। রোগী দেখে বেরিয়ে যাবার সময়

লোকটি ডাক্তারের ফেলে আসা ভিজিট ফিরিয়ে দিতে গেলে জানতে পারেন ভিজিটের টাকাটা ইচ্ছে করেই রোগীর মাথার কাছে রেখে এসেছেন ডাক্তার। অসহায় দরিদ্র রোগীর ভিজিট অগ্নীশ্বর এভাবে বিভিন্ন কৌশলেই ফেরত দেন। অনেক ঘটনার মধ্যে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি হলো – ডিটিএস মিস্টার স্কটের স্ত্রী আসন্ন প্রসবা। অবস্থা বেগতিক হওয়ায় দ্বিতীয়বার ডাক পড়ে ডাক্তারের। এ মর্মে স্কটের বাসা থেকে একটি চিঠি আসে। সেই চিঠিতে কোনো অনুরোধ বাক্য না থাকায় ডাক্তার রোগী দেখতে যাননি। পরে একটি মিটিংয়ে স্কট অগ্নীশ্বরকে শাসালেন এবং তাঁর ক্ষমতার জানান দিলেন। সাতদিন পরেই তিনি ক্ষমতার বড়াইয়ের প্রতিফল পেলেন। এই ঘটনায় সবাই অগ্নীশ্বরকে আরও ভালো করে চিনে নিলো। সেটি হলো – ওই দিন জংশন হতে একটি গাড়িও ছেড়ে যায়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, রেলের সব ড্রাইভার অসুস্থ। আরো জানা গেলো, ডাক্তার অগ্নীশ্বর সব ড্রাইভারকে সিক সার্টিফিকেট দিয়েছেন। অগ্নীশ্বরের কাছে এইরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ জানতে চাইলেন স্কট সাহেব। সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে হর্তাকর্তা আইজিকে টেলিগ্রাম করেন বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ও অগ্নীশ্বরকে শায়েস্তা করতে। কিন্তু স্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হলো। দেখা গেলো সেই হর্তা-কর্তা স্বয়ং অগ্নীশ্বরেরই মেডিকেল কলেজের মাস্টারমশায়। তিনি সব কথা শুনে অগ্নিশ্বরের পক্ষেই রায় দিলেন। স্কট সাহেবকে ডেকে অন্য সবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'অগ্নি খাঁটি ইস্পাতের তৈরি শানিত তরবারি। উহাকে যদি ঠিকমত ব্যবহার করিতে পার অনেক উপকার পাইবে। বোকার মত নাড়াচাড়া করিলে কিন্তু রক্তারক্তি হইবার সম্ভাবনা।' (বনফুল, ২০১৩/১০: ৩৪) উপরিউক্ত ঘটনা গুলোর মাধ্যমে ডাক্তার অগ্নীশ্বরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে পাঠক অবগত হন।

কথকের অগ্নীশ্বরের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয় যখন তার বয়স ষোলো। তখনই ডাক্তারকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন। ওই সময় তাদের বাড়িতে দূর সম্পর্কের বোন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে এলে কথক অগ্নীশ্বরকে ডেকে আনেন তিনি। কিছুদিন পর বোনের মাসীর নাম ভাঙিয়ে মানি-অর্ডার করে পঞ্চাশ টাকা ফি ফেরত দেন অগ্নীশ্বর। কয়েক বছর পর ছাত্রজীবনে দ্বিতীয়বারের মত অগ্নীশ্বরের সাথে দেখা হয় কথকের। কথকের কলেজ জীবনের বন্ধু সুবিমল যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র তখন অগ্নীশ্বর সেই মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। আর কথক আইএসসি পাশ করে বিএসসি ক্লাসে ভর্তি হন। বন্ধু সুবিমলের সুবাদেই কথকের দেখা হয় অগ্নীশ্বরের সাথে। সুবিমল ছাত্রজীবনেই লেখালেখি করে সাহিত্যিক সুনাম অর্জন করেন। তখনই অগ্নীশ্বরের নজরে পড়েন তিনি। অগ্নীশ্বর মেডিকেল কলেজ হতে অন্যত্র চলে যান এবং সুবিমল বার কয়েক ডাক্তারি ফেল করে অবশেষে সাহিত্যকে পেশারূপে বেছে নেন। তখনও তাঁর সাহিত্যের প্রতি সমান আকর্ষণ ছিল অগ্নীশ্বরের। এ অবস্থায় তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হতে থাকে চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে। সুবিমলকে লেখা অগ্নীশ্বরের অনেক চিঠি কথক পড়েছেন। চিঠিগুলো পড়ে তাঁর মনে হয়েছে, চিঠিগুলোর মধ্যে অগ্নীশ্বরের ব্যক্তিত্বের ও মনের যে পরিচয় রয়েছে তা বাইরের

লোক না পড়ে কখনও জানতে পারবে না। এসব চিঠি পড়ে তার মধ্যে অগ্নীশ্বরের ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়ে। সুবিমল সাহিত্যকে পেশারূপে গ্রহণ করায় অগ্নীশ্বর তাকে বলেছিলেন – 'দেখ আর পাঁচজনের মত গালে-ঠোঁটে রং মেখে, রাংতার গয়না পরে, ফিনফিনে রঙিন শাড়ির বাহার দিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়াতে যেও না। সত্যিকার রসিকের জন্য লেখ, তারই আশাপথ চেয়ে থাক, তপস্যা কর।' (বনফুল; ২০১৩/১০: ৩৭) ডাক্তার অগ্নীশ্বরর একজন লেখক ও সমালোচক। সুবিমলের লেখার কড়া সমালোচনা করতেন তিনি। বাংলা ও ইংরেজি দুই সাহিত্যই তাঁর ভালো পঠিত। সুবিমলকে লেখা চিঠিতে তিনি তাঁর নিজের লেখা সম্পর্কে বলেছেন – 'আমার লেখা সম্বন্ধে আমি unconcerned থাকতে চাই। কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর যে সম্বন্ধ, আমার লেখার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকটা সেইরকম। ভবিষ্যদ্বংশীয়দের google eyes এবং sinema screen এ দুয়ের মাঝখানে আমার এই ভাগ্যহত অপত্যকে দাঁড় করবার মত বুকের পাটা আমার নেই।' (পৃ. ৩৮)

এবার পুলিশ-কথকের দৃষ্টিতে অগ্নীশ্বরের ব্যক্তিত্ব, তাঁর জীবন-দর্শন নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই পুলিশ অফিসার জীবনের অপরাহ্নে বসে বিগত জীবনের স্মৃতিচারণ করছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, জীবনের এত এত ঘটনার মধ্যে এত এত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে একজনের ব্যক্তিত্ব কেবল তার কাছে ছিল অনড়। এই চির-অনড় ব্যক্তি অগ্নীশ্বর যিনি একবার কথক-পুলিশ অফিসারের জীবন রক্ষা করেছিলেন। তাই তিনি জীবনের শেষ বেলায় ঋণ শোধের মানসিকতা থেকে পরম পুজনীয় অগ্নীশ্বরের জীবন কাহিনি লিখতে বসেছেন। তার সেই জীবন কাহিনিতে অগ্নীশ্বরকে তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে – অগ্নীশ্বরের ছিল নিরানন্দ জীবন। সারাজীবন একটি আলেয়ার পিছনে ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি। সে আলেয়াটা কখনও ডাক্তারি, কখনও সাহিত্য কখনও নাস্তিকতা, কখনও শাস্ত্রবিচার, কখনও দেশভক্তি, কখনও স্বদেশবাসীর প্রতি নিদারুন ঘৃণা – এইরূপ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাকে পথে বিপথে নিয়ে গেছে। এই আলেয়ার মধ্যে উনি আসলে কী পেতে চেয়েছেন? সত্য, আনন্দ? জনপ্রিয়তা? অর্থ? জীবনী লেখকের দৃষ্টিতে অগ্নীশ্বর এসবের একটিও চাননি। অগ্নীশ্বরের সত্যের আদর্শ তার নিজের মধ্যে ছিল, তাঁর সেই সত্য আর পাঁচজনের সত্য নয়, সেই সত্য না ধর্মের, না আইনের, না শাস্ত্রের, সেই সত্য তাঁর নিজের সত্য এবং সে সত্যের প্রধান গুণ তা সুন্দর।

সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন অগ্নীশ্বর। সমাজের বিধান না মেনে তিনি বিধবা বোনের বিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে সমাজ তাঁকে কিছুদিন একঘরে করে রেখেছিল। সেই সমাজের লোকদের অগ্নীশ্বর বলেছিলেন – 'দেখুন তামাক খাবার যদি ইচ্ছে হয়, নিজের হুঁকো কেনবার পয়সা আমার আছে। আর শাল পাতায় বসে আপনাদের ওই ছ্যাঁচড়া চচ্চড়ি-বোঁদে দই মাখামাখি পঙক্তি ভোজনে বসবার প্রবৃত্তি আমার কোনও কালে নেই।

আমার বক্তব্যটা ডি এল রায় নামক লেখক আরও ভালো করে বলেছেন।' (পৃ. ৪৩) কোনোরকম বাছবিচার ব্যতীত কেবল পাত্রীর বাবার মুখের কথার উপর ভরসা করে বিয়ে করেন অগ্নীশ্বর। বিয়ের আগেই হবু শশুরকে নিজের উঠা-বসা, চালচলনের ব্যাপারে অবহিত করেছেন তিনি। দাম্পত্য জীবন নিয়ে তাঁর কোনো অভিযোগ ছিল না কিন্তু এক পত্রে তিনি বন্ধুকে লিখেছিলেন – তাদের স্বামী-স্ত্রীর রাজযোটক মিল হয়েছিল। তিনি সেখানে নিজেকে সজারু আর বউকে তুলতুলে খরগোশের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি যখন আইনস্টাইনের বই বা রূপার্ট ব্রুকের সনেট নিয়ে ব্যস্ত, তখন আমার অর্ধাঙ্গিনী ব্যস্ত থাকত সিনেমা স্টারদের নিয়ে।

জাত-পাতের উর্ধ্বে ছিলেন অগ্নীশ্বর। যৌতুক-প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর ছেলে ভিন্ন জাতের মেয়েকে বিয়ে করায় তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না কিন্তু ছেলে যৌতুক নেয়াতে ভীষণ আপত্তি ছিল তাঁর। তাই ছেলের বিয়েতে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। যৌতুক ফিরিয়ে দেয়ার পর তিনি নববধুকে বরণ করেছেন। ঘর-সংসার তাঁকে টানেনি বেশি দিন। স্বাধীন জীবন-যাপনের নেশাই তাঁকে পেয়ে বসেছে। তাই একটি চিঠি লিখে রেখে একদিন তথাকথিত সংসার থেকে চির বিদায় নেন তিনি। তাঁর বোহেমিয়ান জীবনের প্রতি আকর্ষণকে আলেয়া বলে উল্লেখ করেছেন পুলিশ-কথক।

স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবীদের প্রতি বনফুলের শ্রদ্ধার কথা জানা যায়। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, ভাগলপুরের মতো শহরেও বিয়াল্লিশের স্বতঃস্ফূর্ত জনজাগরণের ঢেউ উঠেছিল। অন্যান্য জায়গার মতো সেখানেও রেললাইন উপড়ে ফেলে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল, টেলিগ্রাফের তারও কেটে দেয়া হয়েছিল। ফলে বহির্বিশ্বের সাথে ভাগলপুর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। মালগুদাম দেদারসে লুট হয়েছিল। এ সময় লুটেরা স্বদেশি আন্দোলনকারীদের অনেককেই বনফুল তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তখন তিনি বাংলায় বা ইংরেজিতে ইস্তেহারে কল্পিত খবর তাদের লিখে দিতেন রাত জেগে। সেইসব কল্পিত খবর, হিন্দিতে অনুবাদ করে বিপ্লবীরা তা দেয়ালে দেয়ালে টানিয়ে দিত। কারণ চিঠি, কাগজ কিছুই ছিল না, ব্রিটিশ সরকার রেডিও পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল। বনফুল লিখেছেন –

> আগস্ট আন্দোলনের সময় আমরা পটলবাবুর বড় বাড়িতেই ছিলাম। ...সন্ধ্যার পর সেখানে বসিয়া লিখিতাম। এই সময় আমি *রাত্রি* লিখিয়াছি, *বিদ্যাসাগর* লিখিয়াছি, *আহবণীয়* বলিয়া কয়েকটিও এই সময় লিখিয়াছিলাম দেশের যুবকদের উদ্দেশে। 'শনিবারের চিঠি'তে এই সময় ভূয়োদর্শনও লিখিতেছিলাম প্রতি মাসে। (বনফুল, ১৯৯৯: ২০৯)

তাই এ কথা বলা অসঙ্গত নয় যে, অগ্নীশ্বরের স্বদেশপ্রীতি পক্ষান্তরে বনফুলেরই স্বদেশপ্রীতির মনোভাব। একবার স্বদেশি আন্দোলনের নিবেদিতকর্মীরা জেলখানা থেকে লোডেড রিভলবার (দলের সদস্যদের সরবরাহকৃত) নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন স্বদেশি। অগ্নীশ্বর তাকে চিনতে পেরে

ঝুঁকি নিয়ে অনেক কৌশল করে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তী সময় এ স্বদেশি বড় পুলিশ অফিসার হন। আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, অগ্নীশ্বরের অনেক আগের এক মহিলা রোগী সিফিলিসে আক্রান্ত হয়ে তাঁর কাছে আসেন, চিকিৎসা করাতে নয়, একটি বাক্স খগেন নামের এক যুবককে হস্তান্তর করার অনুরোধ নিয়ে। দুই বছর আগে উক্ত স্ত্রীলোকটি (অবিবাহিত) সন্তানের দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে অগ্নীশ্বরের কাছে আসে প্রসব করাতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার মৃত সন্তান হয়। যাই হোক, ছয়মাস পর স্বদেশি আন্দোলনের কর্মী খগেন এলে তার কাছে বাক্সটি হস্তান্তর করেন তিনি। কৌতূহলবশত বাক্সটি তিনি খুলে দেখেছিলেন, তার ভেতর দুটি রিভলবার রয়েছে। গভর্নমেন্ট অফিসার হয়েও তিনি বিষয়টি গোপন রেখেছেন। খগেন এলে তার কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, মহিলাটি দেশের জন্যে দেহ বিক্রি করে অর্থ রোজগার করে এবং সেই টাকা দিয়ে চোরাবাজার থেকে অস্ত্র কিনে তা স্বদেশিদের সরবরাহ করতেন। স্বদেশিদের সাহায্য করে, দেশকে ভালোবেসে এভাবেই অগ্নীশ্বর সাহেবি আমলে চাকরি করে সাহেবদের চাবুক কষাতে পেরেছেন। ছাত্রের উদ্দেশে অগ্নীশ্বরকে তাই বলতে শোনা যায়, 'আমি বাঙালি and I am proud of it.' (পৃ. ৭০)

এবার ছাত্রের চোখে অগ্নীশ্বর কেমন ছিলেন তা দেখা যাক। সমাজের অবহেলিত, নিগৃহীত মেয়েদের প্রতি অগ্নীশ্বরের সহমর্মিতা ছিল গভীর। 'বাংলার মেয়েদের অসহায়তা স্মরণ করে তিনি বেদনাবোধ করেছেন।' (পরিমল; ১৯৬০: ১৩৬) তাঁর ডাক্তারি জীবনে দেখা অসহায় পাঁচ কন্যাদের তিনি পুরানের পঞ্চকন্যার সাথে তুলনা করেছেন। পুরানের পঞ্চকন্যারাতো বহুগামী ছিলেন, তাদের পবিত্র ভেবে প্রতিদিন স্মরণ করা হয় কেনো? তাঁর এক ছাত্রের এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, আর্যরা motive থেকে পাপ পূণ্যের বিচার করতো, তা-ই পুরানের পঞ্চকন্যারা পুজনীয়। তাঁর মতে, তাঁর দেখা আধুনিক পাঁচ-কন্যা – সুছন্দা, পদ্মাবতী, সরমা, রৌশন আরা ও সরস্বতীদের যদি তাদের কাজের মোটিভ থেকে তাদের পাপ পূণ্যের বিচার করা হয় তা-হলে তারাও পুরানের পঞ্চকন্যাদের সমকক্ষ ও পুজনীয়। সেই দৃষ্টিকোন থেকেই তাঁর দেখা পাঁচ কন্যাকে তিনি আধুনিক যুগের অহল্যা, মন্দোদরী, তারা, দ্রৌপদী ও কুন্তী বলে উল্লেখ করেছেন। অগ্নীশ্বরের মতে, পুরানের মতো এরকম পঞ্চকন্যা এযুগেও আছে তাদের সংখ্যা কেবল পাঁচ নয়, এরা পাঁচ হাজারও আছে। সব যুগেই তারা থাকে। মনে রাখতে হবে, মহিষাসুর বধ করতে হবে এবং তার জন্যে মেয়েদের শক্তির সাহায্য অপরিহার্য। 'অগ্নীশ্বরের স্বতন্ত্র ভাবনায় নারীজাতির অসহায়ত্ব নয়, মহত্ত্বই উজ্জ্বল প্রতিফলিত হয়েছে 'আধুনিক পঞ্চকন্যা'য়।' (উর্মি নন্দী, ১৯৯৭: ১৯১)

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অগ্নীশ্বর বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতার নানা মনস্তাত্ত্বিক দিককে ইঙ্গিত করে। এই চরিত্রটির মধ্যে নিঃস্বার্থ মানবসেবা, দেশ-প্রেম, ব্যক্তি-স্বাধীনতার অন্বেষণ, পরোপকারী, ব্যক্তি-পছন্দের প্রতি

শ্রদ্ধাশীল, প্রচার-বিমুখ থাকা, ছদ্ম নামের অন্তরালে শ্রেণি-পেশা-বর্ণহীন মানুষের সাথে বসবাস করা, ভদ্র সমাজ থেকে আত্মগোপন করা – এইরূপ বিভিন্ন মানসিকতার সমন্বয় ঘটেছে। চরিত্রটির মধ্যে পাঠক একরকম বোহেমিয়ান জীবনেরই পরিচয় পান এবং সেটা বনবিহারীর চরিত্রের প্রতিরূপ বলেই মেনে নেয়া যায়। বনবিহারী শেষ জীবনে আন্দামানে আত্মগোপন করেছিলেন। তার আগে তিনি এক রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাস অবলম্বন করে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। এমন কথাও শোনা যায় যে, তিনি যৌবনকাল থেকেই তার মধ্যে যাযাবর মানসিকতা লক্ষ্য করা গেছে। পরিমল গোস্বামী যিনি বনবিহারীর শেষ জীবনের সান্নিধ্যে ছিলেন তিনি তাঁর স্মৃতিচিত্রণ গ্রন্থ *আমি যাঁদের দেখেছি* তে বনবিহারীকে "স্কলার জিপসি" বলে উল্লেখ করেছেন (পৃ. ১৩২)। মূলত ভদ্র সমাজ হতে আত্মরক্ষার জন্যেই খা খা নামের আড়ালে অজ্ঞাত বাস করছিলেন অগ্নীশ্বর। বিধবা বোনের বিয়ে দিয়ে কিছুদিন সমাজ থেকে একঘরে হয়ে থাকা, নিজের ছেলের বিয়েতে উপস্থিত না থাকা, রবীন্দ্রনাথের বই পড়ে হতাশ হওয়ার দরুন ভালো বই চাইলে তার পরিবর্তে পঞ্জিকা পাঠানো, বাংলা-সাহিত্য-প্রীতি – এ সবই বনবিহারীর জীবনের ঘটনা যা অগ্নীশ্বরে প্রতিফলিত হয়েছে। অগ্নীশ্বর চরিত্রটিকে বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত করা হয়েছে। তবে বক্তা-লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনিটি এখানে কাল্পনিক। সবার চোখে এই অগ্নীশ্বর তার নামের মতোই সত্য, সুন্দর ও সার্থক একটি চরিত্র।

বনফুলের ছোট ভাই অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় যার ডাক নাম ছিল টুলু তিনি উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়ন করেছেন। সেখানে অগ্নীশ্বর চরিত্রের দুটি সত্তার উপর জোর দিয়েছেন তিনি – একটি নিঃস্বার্থ চিকিৎসা-সেবা অন্যটি দেশপ্রেম। উপন্যাসেও তা-ই রয়েছে।

কথক-পুলিশ চরিত্রটি একজন দেশপ্রেমিকের চরিত্র। তরুন বয়সে ইংরেজ রাজত্বের সময় তিনি বোমার দলে যোগ দেন। দলের উদ্দেশ্য ছিল, নানা স্থানে স্বদেশি ডাকাতি করা এবং ডাকাতির টাকা দিয়ে বিদেশি অস্ত্রশস্ত্র কেনা। ডাকাতির ফাঁকে ফাঁকে সাহেব বা গোয়েন্দা মারার চেষ্টাও চলতো। এক পর্যায়ে দলের এক সদস্যের মিরজাফরি কাজের জন্যে দলের সবাইকে জেলে যেতে হয়েছিল। কথক-পুলিশ জেলখানা থেকে পালানোর সময় আহত হয়ে ধরা পড়ে হাসপাতালে এলে অগ্নীশ্বরের সহায়তায় সেখান থেকেও পালিয়ে যান তিনি। নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত, ছদ্মবেশ ধারণ এবং কর্ম দক্ষতা দিয়ে তার স্বপ্ন সফল করেন কথক-পুলিশ। উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসার হন তিনি। ইতোমধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। পুলিশ-কথক বাংলাদেশে ফিরে এক বেদের দলকে ধরতে যেয়ে অগ্নীশ্বরকে খুঁজে বের করেন।

বনফুল তাঁর প্রায় অনেক লেখায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখার বিশেষ কোনো লাইন বা তাঁর মুখ অবয়ব বা বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত যেকোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। আর বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১)

সাহিত্যের উল্লেখ ব্যতিরেকে তাঁর কোনো লেখাই পাওয়া যাবে না বললে অত্যুক্তি হবে না। তাছাড়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৫২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), ডি এল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) প্রমুখ অগ্রজদের তাঁর লেখায় স্মরণ করেছেন তিনি। *ভুবন সোম* উপন্যাসে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে এবং এক লোকের দাড়ির সাথে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দাড়ির মিলের কথা আছে। বিদ্যাসাগর যেমন শেষ জীবনে স্বজনচ্যূত হয়ে প্রায় নির্জনবাস করেছিলেন, অগ্নীশ্বরের শেষ জীবনও তেমনিভাবে কেটেছে। বিদ্যাসাগর নিজের ছেলেকে বিধবার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। আর অগ্নীশ্বর সমাজের বিধি-নিষেধ অমান্য করে তাঁর বিধবা বোনের বিয়ে দেন।

বনফুল ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর বহু উপন্যাসে এরূপ মনোভাবের পরিচয় মেলে। এ উপন্যাসে কন্যাদায়গ্রস্ত হিন্দু-মা সমাজে আর দশ জনের সাথে মিলে থাকতে তার মেয়েকে বিবাহিত (একাধিকবার) মুসলমান পুরুষকে বিয়ে করার কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। মায়ের মতে, ধর্মান্তরিত হতেও বাধা নেই। কারণ যে হিন্দু সমাজ তাদের অপমান করেছে, তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেই হিন্দু সমাজকে সে ধিক্কার জানিয়ে মেয়েকে বলেছে – 'তোমাকে শেষকালে যে নষ্ট করলে সে-ও হিন্দু। ঝাঁটা মারি এমন হিন্দু সমাজের মুখে।' (পৃ. ১০৫)

১.১০

উদয়-অস্ত উপন্যাসেও (১৯৫৯, ১৯৭৪) মানব-দরদি, মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রতীক সত্যসুন্দরের ব্যক্তিত্ব তুলে ধরেছেন বনফুল। *উদয়-অস্ত* প্রথম খণ্ড প্রকাশের দীর্ঘ ১৫ বছর পরে দ্বিতীয় খণ্ড বের হলেও ভাব, ভাষা এবং আবেগের প্রবহমানতা বজায় ছিল। বর্তমান সময়ের টেলিভিশনের ধারাবাহিক নাটক বা উপন্যাস দেখানোর শুরুর আগে যেমন পূর্বসূত্র বা আগের ঘটনা বা পূর্বকাহিনি নামে আগের কাহিনিটা দেখানো হয় ঠিক তেমনি বনফুলও দ্বিতীয় খণ্ড শুরুর আগে প্রথম খণ্ডের কাহিনি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে চুয়াল্লিশটি পরিচ্ছেদ। উপন্যাসটি আলোচনা করার আগে এর প্রেক্ষাপট জেনে নেয়া যাক।

বনফুলের মা মারা যাবার পর তাঁর বাবা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় বিহারে থেকেই প্র্যাকটিস করতেন। লোকজন, অতিথি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুমহল এবং গোলাপ বাগান নিয়ে বনফুল তখন ভাগলপুরে সুখেই দিন পার করছিলেন। এককালের কর্মব্যস্ত ডাক্তার সত্যচরণ বৃদ্ধ এবং অসুস্থ হয়ে পড়ায় অনেক বুঝিয়ে তাঁকে প্র্যাকটিস থেকে বিরত রাখেন বনফুল। কিন্তু বনফুল লক্ষ করলেন, প্র্যাকটিস বন্ধ করার পর থেকে তাঁর বাবা বড় একা হয়ে পড়েছেন,

কথা বলার সঙ্গীর অভাব বোধ করছেন। গল্প করার জন্য মানুষ পাচ্ছেন না। বই পড়া, রেডিও শোনা – এসব কাজই বা কতক্ষণ করা যায়! ছেলের বাড়িতে এসেও তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। এই অবস্থায় বনফুল তাঁকে কলম আর খাতা এনে দিয়ে অনুরোধ করেন, তাঁর শৈশব ও কৈশোরের জীবনটা লিখতে। আগে থেকেই বাবার চরিত্র নিয়ে বই লিখার পরিকল্পনা ছিল বনফুলের। সত্যচরণ এই কথা শুনে প্রথমদিকে বলেছিলেন – তাঁর মত সামান্য একজন লোকের জীবনী আসলে লিখিবার যোগ্য কিনা। পরে অবশ্য তিনি ছেলের অনুরোধ রেখেছিলেন। বাবার জীবনী নিয়ে তিনি বাবার মৃত্যুর পরে *উদয়-অস্ত* উপন্যাস লিখেন। *পশ্চাৎপটে* বনফুল এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন – 'তাঁহার লেখা সে খাতাটি এখনও আমার নিকট আছে। বাবার চরিত্রটি অবলম্বন করিয়া পরে আমি *উদয়-অস্ত* বইটি লিখিয়াছি। ওই বইটিতে অধিকাংশ চরিত্রই কাল্পনিক। কিন্তু সূর্যসুন্দরের চরিত্রটি আমার বাবারই চরিত্র।' (বনফুল, ১৯৯৯: ২২৯-৩০) উপন্যাস পাঠে পাঠক বুঝতে পারেন যে, কেবল বনফুলের বাবা নয়, সূর্যসুন্দরের পিতারূপে বনফুলের পিতামহ কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিচ্ছবিও রয়েছে।

প্রথম খণ্ডের কাহিনিতে রয়েছে, সবার কৃতজ্ঞতাভাজন ও ভালোবাসার মানুষ ডাক্তার সূর্যসুন্দর বিরাশি বৎসর বয়সে হঠাৎ পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হন। তার চার ছেলে–বৃহস্পতি মুখোপাধ্যায়, (স্ত্রী পুরসুন্দরী); উশনা, পৃথ্বীশ ও ছোট ছেলে কুমার; তিন মেয়ে – বড় মেয়ে কিরণ, স্বামী কৃষ্ণকান্ত, ফরেস্ট অফিসার; মেজ মেয়ে উষা, স্বামী সদানন্দ, জমিদার; ছোট মেয়ে সন্ধ্যা, স্বামী রঙ্গনাথ, ধনীব্যক্তি, শৌখিন ও বিদ্বান। ছোট মেয়ে সন্ধ্যা নিঃসন্তান, প্রগতিশীল নারী। বড় ছেলে বৃহস্পতির পালিতা কন্যা পার্বতী তাছাড়া তার নিজের দুই ছেলে – গগন ও দিগন্ত এবং দুই মেয়ে – বড় মেয়ে স্বাতী, তার স্বামী সোমনাথ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; ছোট মেয়ে চিত্রা, তার স্বামী সুব্রত, এসপি। গগনের স্ত্রী আসন্নপ্রসবা, তার দেখাশোনার জন্যে মিস অনুপমা বসু ও একজন মিডওয়াইফ – সবাই এসেছে সূর্যসুন্দরকে দেখতে। কুমার সবাইকে অসুস্থতার খবর দিয়েছে। কুমারের স্ত্রী ঊর্মিলা শশুরের শিয়রের কাছে বসে থেকে তার সেবাযত্ন করে যাচ্ছে। সূর্যসুন্দর মাঝে মধ্যে আট বছর নিরুদ্দেশ হয়ে থাকা তাঁর সেজ ছেলের আসার কথা ভাবে। তবে মেজ ছেলে উশনার আসার কথা রয়েছে। সূর্যসুন্দরের যৌবনকালের সঙ্গী সুরসিক পেট-পচা কবিরাজ, সুবাতলী তহসিলদার, জমিদারি সেরেস্তার গোমস্তা প্রবীণ রমেশবাবু, জমিদার গোবিন্দ মণ্ডল, তার প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার চমকলাল সিংহ, স্থানীয় জমিদারের ম্যানেজার নিখিলবাবু – এঁরা কেউ না কেউ প্রতিদিন আসছেন। সূর্যসুন্দরের ছোট ভাই চন্দ্রসুন্দরও এসেছেন, তিনি একটু রক্ষণশীল প্রকৃতির। তিনি একদিন সূর্যসুন্দরকে গীতা পাঠ করে শুনিয়েছেন। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সূর্যসুন্দরের অসুখের খবর পেয়ে দলে দলে লোক প্রতিদিন আসছে। জায়গার সংকুলান না হওয়ায় সূর্যসুন্দরের চালায় কয়েকটি ঘর করার প্রস্তুতি চলছে।

কুমার তার বাবার একটি ডায়েরি পেয়েছে। সে ডায়েরিতে সূর্যসুন্দরের জীবন কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেই ডায়েরিটি কুমার সময় পেলেই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে – পাছে কেউ কেড়ে নেয়, সেই আশঙ্কায়। এদিকে অসুস্থ সূর্যসুন্দর প্রায়ই তাঁর মৃত বাবা-মা ও স্ত্রীকে দেখতে পায় মানসচক্ষে। তিনি আরও দেখতে পান, অফুরন্ত দিগন্ত বিস্তৃত একটি পথ – 'সে পথে তিনি একক যাত্রী। সে পথের একক প্রান্ত হইতে কে যেন আগাইয়া আসিতেছে। তাহাকে চেনা যায় না। মনে হইতেছে ওই কি মৃত্যু।' (বনফুল, ২০১৩/৯: ৪১৬) একটু সুস্থতা বোধ করলে সূর্যসুন্দর সবার সাথে বসে আহারও করেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের এগারো পরিচ্ছেদ থেকে আবার ডায়েরির পড়া শুরু করেন কুমার। এই খণ্ডে সূর্যসুন্দরের ভাই চন্দ্রসুন্দরের বয়স যখন ছয় মাস, তার অন্নপ্রাশনের সময় থেকে আরম্ভ করে সুর্যসুন্দরের মনিহারীতে তাঁর পারিবারিক জীবন শুরু পর্যন্ত অর্থাৎ বিয়াল্লিশ পরিচ্ছেদে এসে ডায়েরির কাহিনি শেষ হয়েছে। এ উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে সূর্যসুন্দরের জীবনবৃত্তান্তটি একটি উপকাহিনি হয়ে মূলকাহিনির সাথে সামঞ্জস্যতা বিধান করেছে। তিনটি ধারায় বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসের কাহিনি – কথকের বয়ান, ডায়েরির কথা এবং শয্যাগত সূর্যসুন্দরের ভাষ্য। এক থেকে বারো পরিচ্ছেদগুলোতে সূর্যসুন্দরের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি, শুভাকাঙ্ক্ষিদের আগমন এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ এবং অনেকের সাথে সূর্যসুন্দরের বাক্যালাপ ও আহার গ্রহণের কথা জানতে পারেন পাঠক। এগারো থেকে বিয়াল্লিশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত মোট একত্রিশটি পরিচ্ছেদে মামার বাড়িতে সূর্যসুন্দরের স্কুলজীবন, কলেজ জীবন, ডাক্তারি পড়া, ডাক্তারি পড়তে যেয়ে অর্থসংকটে পড়া, বাবা, মামা ও দিদিমার সহায়তায় পড়া চালিয়ে যাওয়া, বই কিনতে না পারার দরুন সহপাঠীর বই পড়া (যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে), মেডিকেলে কলেজে ভর্তি হওয়ার পরপরই মামার পছন্দে বিয়ে করা, বিয়ের কিছুদিন পরে বউ এর মৃত্যু – অনেক চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে নিজের পছন্দে দ্বিতীয় বিয়ে করে পারিবারিক জীবন শুরু করা এবং সূর্যসুন্দরের সম্পত্তি তাঁর ভাই চন্দ্রসুন্দর ও সন্তানদের মাঝে ভাগ-বাটোয়ারার বিষয়ে কথা এবং সূর্যসুন্দরের মহাপ্রয়াণের খবর – এই সবকিছু জানা যায়। তেতাল্লিশ পরিচ্ছেদে রয়েছে সূর্যসুন্দরের চিতার আয়োজন। চিতার আয়োজন সম্পন্ন করতে গণমানুষের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া এবং সবশেষ চুয়াল্লিশ পরিচ্ছেদে শবদাহ এবং বংশের নতুন প্রদীপের প্রজ্জ্বলনের কথা রয়েছে। অর্থাৎ কুমারের সদ্য ভূমিষ্ঠ ছেলে শিশুটি যেন সূর্যসুন্দরের বেবি সংস্করণ।

উপন্যাসটিতে বনফুলের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার অনেক কথাও মিশে আছে। যেমন, নক্ষত্র বিষয়ক কথা, পাখি শিকারবিষয়ক কথা, স্কুল জীবনের জগগু মাঝির কথা, বনফুলের দুধ-মা চামরুর বউয়ের কাহিনিটি সূর্যসুন্দরের সেজ ছেলে পৃথ্বীশের মায়ের দুধ না খাওয়ার কাহিনি – এমন অনেক কথা পাঠক জানতে পারেন লেখকের ব্যক্তিগত

জীবন অভিজ্ঞতা থেকে। বহু মানুষের ভালোবাসার রঙে রঞ্জিত সূর্যসুন্দরের শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের কথাই বনফুল তুলে আনেননি, তাঁর চারপাশের সাধারণ মানুষরা যারা তাঁর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়েছেন, যারা বিভিন্ন গ্রাম থেকে, দূর-দূরান্ত থেকে এসে একই সামিয়ানার নিচে সমবেত হয়েছেন তাঁকে শেষ বারের মত দেখার জন্যে, তাদের স্মৃতিও মৃত্যু শয্যায় শায়িত সূর্যসুন্দরের কল্পনা জগতে ভেসে উঠে। 'সূর্যসুন্দর মনে মনে একটা ছবি দেখিতেছিলেন, একটা বিরাট মেলার মাঝখানে তিনি যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, সকলেই তাঁহার চেনা, সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া হাসিমুখে নমস্কার করিতেছে...'।(পৃ. ৬৬১)

মানবদরদী সূর্যসুন্দরের মতোই তাঁর বংশধরেরাও অসহায় মানুষদের কান্না, দুঃখে ব্যথিত হন। *নার্স-সুপর্ণ সিংহ* ঘটনাটি তার প্রমাণ। গগনের আসন্ন প্রসবা স্ত্রী চম্পার দেখাশোনার জন্যে যে নার্সটি তার সাথে এসেছিল, তার কান্নার রহস্যের সমাধান করতে তৎপর হয়ে উঠে গগন। সে নার্সের ছেলে বাবুলের বাবা অর্থাৎ নার্সের প্রেমিকা সুপর্ণ সিংহকে খুঁজে এনে পুলিশ ডেকে, ভয় দেখিয়ে জোর করে বিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করে। তার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাবুল যেন বাবার পরিচয় নিয়ে বড় হতে পারে। পরবর্তী সময়ে সুপর্ণসিংহ স্বেচ্ছায় বাবুলের পিতৃ-পরিচয় সম্বলিত কাগজে স্বাক্ষর করে। মৃত্যু পথযাত্রী সূর্যসুন্দরকে ঘিরে এত মানুষের আনাগোনা এক উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই বিরাট উৎসবের মধ্যে *নার্স-সুপর্ণ সিংহ* বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ করে সুপর্ণকে। তাই সে গগনের কাছে যখন জানতে চায়, পুলিশ ডেকে জোর করে এত হাঙ্গামা কেনো তারা করতে গেলেন। তখন গগন তাকে জানায় –

> আমি কখনও অন্যায় সহ্য করতে পারি না। অনুপমার কাহিনিটা আমি জানতাম। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রায়ই নাকি সে কাঁদে এ খবরও পেলাম। আমাদের সংসার সুখের সংসার। আমার দাদুর অসুখ সত্ত্বেও রোজ এখানে আনন্দ উথলে পড়ছে চারিদিকে। এর মধ্যে অনুপমাকে কেমন যেন বেমানান মনে হত।...ওর মনে অশান্তির আসল কারণটা ছিল বাবুলকে নিয়ে। আপনি আজ সে কাঁটাটা তুলে দিলেন। (পৃ. ৬৬৫)

একইভাবে অন্ত্যজশ্রেণির মানুষদের মাঝেও সূর্যসুন্দরের অসুস্থতা নিয়ে উদ্বিগ্নতা দেখা গেছে। তাদের প্রিয় মানুষটিকে কখন হারাতে হয় সেই দুশ্চিন্তা থেকে প্রতিদিন তাকে এক নজর দেখতে আসা। কেউ বা তাঁকে স্বপ্নে দেখে ঘুম থেকে উঠেই ছুটে চলে আসে। তাদের মাথার উপর ছায়াটি যেকোনো মুহূর্তে সরে যেতে পারে, তাই তাদের মাঝে একটি শুন্যতা, হাহাকার সর্বদাই যেন বিরাজ করে। গঙ্গা যখন ঠাকুর সা'কে গামছায় করে চিড়া, গুড় নিয়ে যেতে দেখে, তাকে বসে থেকে খেয়ে যেতে বলে, তখনই ঠাকুর সা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জবাব দেয় –

> আজ ভোরে স্বপ্ন দেখিলাম যেন সুরুজ (সূর্য) অস্ত যাইতেছে। ডাক্তারবাবু আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাই আজ উঠিয়া ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া আসিয়াছি। ডাক্তারবাবু আমার দিলি দোস্ত (অকৃত্রিম বন্ধু) তোমার বাবা আমাকে চিনিত। তুমি চেন না। তাই এ কথা বলিবার মতো সাহস তোমার হইয়াছে। আমার ঘরে চিঁড়া, মুড়ি, ধান, চাল ছাতুর অভাব নাই। কিন্তু ডাক্তারবাবুর

বাড়ির অন্ন আমার কাছে অমৃততুল্য। তাই বহিয়া লইয়া যাইতেছি। এ সুরুজ (সূর্য) অস্ত গেলে আর উঠিবে না। তাই যতক্ষণ আছে একবার করিয়া খবর লইয়া যাই। (পৃ. ৭৬৭-৭৬৮)

এ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসের মূল সুর। অনেক চরিত্র লেখকের বাস্তব জগৎ থেকে উঠে এসেছে, যেমন জগগু মাঝি, চামরুর বউ, কেশবমশাই, সুরাতলি, তহশীলদার। 'বস্তুতঃ অভিজ্ঞতাভিত্তিক চরিত্র নির্মাণকলায় শিল্পীর স্বভাবজাত দক্ষতা আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে উদয়-অস্ত উপন্যাসে।' (উর্মিনন্দী; ১৯৯৭: ১৯৪)

১.১১

বনফুলের চরিত্র-নির্ভর উপন্যাসগুলোতে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের আলোচিত উপন্যাসগুলোতে আমরা লক্ষ করেছি সেখানে নেপথ্যে লেখকের নিজের জীবনদর্শন, তাঁর চিন্তাচেতনা এবং ব্যক্তিরুচির স্বাক্ষর রয়েছে। আবার অনেক উপন্যাস আছে যেখানে মধ্যবিত্ত ডাক্তার চরিত্র মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে সেখানে কখনও লেখক স্বয়ং কথা বলছে চরিত্রের আড়ালে, কখনও লেখকের শিক্ষক, কখনও লেখকের পিতৃবন্ধুর চরিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে। যাদের হাত ধরে উঠে এসেছে অসহায়, দরিদ্র, অন্ত্যজ সমাজের জীবনকথা। *হাটে-বাজারে* (১৯৬১)র ডাক্তার সদাশিব সমাজের নিচুতলার মানুষের সংশ্রবে এসে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে তাদের প্রাণ রক্ষার্থে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন।

অধিক জনপ্রিয় *হাটে বাজারে* উপন্যাসটির জন্যে ১৯৬২ সালে বনফুল 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' পান। *অগ্নীশ্বর* প্রকাশিত হওয়ার চার বছর পর তাঁর *হাটে বাজারে* (১৯৬১) প্রকাশিত হয়। চার বছরের ব্যবধান থাকলেও অগ্নীশ্বর ও সদাশিব চরিত্র দুটি একটি আরেকটির পরিপূরক। বিহারের অন্ত্যজ সমাজের পটভূমিকায় অবসরপ্রাপ্ত মানব-দরদি ডাক্তারের জীবন কাহিনি উপন্যাসটির বিষয়। বনফুল জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন এসব অন্তজ মানুষের চিকিৎসা করে। চিকিৎসাসূত্রে তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়েছেন তিনি। তিনি বিহারের বিভিন্ন জায়গায় বসবাসসূত্রে অন্ত্যজ মানুষের একান্ত সান্নিধ্যে এসেছেন। ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের নেপথ্যেই বনফুলকে দেখতে পান পাঠক। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে মধ্যম পুরুষের জবানিতে এবং তা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত চলেছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে উত্তম পুরুষের ভাষ্যে সদাশিবের অতীত জীবনের সাতচল্লিশটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। ঘটনাগুলো কালের পরম্পরা বজায় রেখে বর্ণনা করা হয়নি কিন্তু তারপরেও ঘটনাগুলো যেন একই সূত্রে গাঁথা। বিহারের অন্ত্যজ সমাজের মানুষদের ঘিরে ডাক্তার সদাশিবের পারিবারিক, সামাজিক জীবনের পাশাপাশি

রাজনীতিক, বন্ধুমহল, ভৃত্যমহলের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদে সদাশিবের অবসর জীবন কাটানোর পরিকল্পনার কথা রয়েছে –

> আমার প্লান ঠিক করে ফেলেছি। খুব বড় একটা 'স্টেশন ওয়াগন' কিনলাম। তাতে শোবার জায়গা, রাধঁবার জায়গা, এমনকী ছোটখাটো একটা ড্রইংরুমের মতোও আছে। শতকরা আশিটা ওষুধ যেসব সাধারণ ওষুধ দিয়ে সারে সেগুলোও অনায়াসে রাখা যাবে ওতে। প্রচুর জায়গা আছে গাড়িতে। ভ্রাম্যমাণ ডাক্তার হব ঠিক করেছি। গ্রামে গ্রামে হাটবাজারে ঘুরব। চিকিৎসা করব সাধারণ লোকদের। চিকিৎসা করব পয়সা রোজগার করার জন্য নয়, নিজের তাগিদে। কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা না করলে হতাশার কবলে পড়তে হবে না। (বনফুল, ২০১৩/১০: ৫৪০)

তৃতীয় পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলো সিনেমার ভাষায় ফ্ল্যাশব্যাকের কাহিনি। চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে আবারও মধ্যম পুরুষের জবানিতে উপন্যাস এগিয়ে উনিশ পরিচ্ছেদে এসে শেষ হয়েছে। তবে ঘটনার বর্তমান সময়েও সদাশিবের ডায়েরি লেখা অব্যাহত থাকে।

প্রকাণ্ড হাট হাজিপুরের রাস্তার পাশে বড় একটি গাছের ছায়াতে ফোল্ডিং টেবিল আর চেয়ার পেতে রোগী দেখেন সদাশিব। স্টেশন ওয়াগনে থাকে চিকিৎসার সব সরঞ্জাম। মাঝে মাঝে তিনি হবিগঞ্জের হাটেও যান রোগী দেখতে। হাট-বাজারে ঘুরে ঘুরে তিনি অন্ত্যজ মানুষদের সাথে মেশেন, তাদের সুখ-দুঃখের একান্ত সঙ্গী হন তিনি। হাটে যাদের সাথে দেখা হয় না তাদের অসুখের খবরও তিনি অন্যের কাছ থেকে নেন – এভাবে অসহায় মানুষের পেছনেই কাটে তাঁর সবটুকু সময়। কখনও কখনও রাত জেগেও থাকতে হয় তাকে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে কোনো সময় নেই তাঁর। সদাশিব অন্ত্যজ মানুষদের কেবল চিকিৎসা করেন তা নয়, তাদের পারিবারিক সমস্যারও সমাধান করেন তিনি। গ্রামের মোড়ল ছবিলালের বাড়িতে চুরি হলে কেবলির স্বামী নারায়ণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কংগ্রেসী নেতা ছবিলাল। ফলে দারোগা সিংহেশ্বর সিং তাকে ধরে নিয়ে থানায় আটকে রাখে। কেবলির কান্নায় ব্যথিত হৃদয় সদাশিব থানায় যায় নারায়ণকে ছাড়িয়ে আনতে। কিন্তু দারোগা সদাশিবকে শর্ত দেয়, কংগ্রেসী নেতা ছবিলালের কাছে যেয়ে নারায়ণকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে কথা বলতে। দারোগার কথার মধ্যে দিয়ে বনফুল তৎকালীন সমাজের দেশভক্ত কংগ্রেসী নেতার দৌরাত্ম্যের বিষয়টি তুলে এনেছেন –

> আলাপ করে রাখুন, আখেরে কাজ হবে। উনি কংগ্রেসীদের পাণ্ডা, তারপর হরিজন, ওঁর একটা বাজে মার্কা ছেলে কেবল শিডিউলড কাস্ট বলে ভালো চাকরি পেয়েছে। ওই চাকরি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ভালো ভালো ছেলেরা পায় নি। ওদেরই এখন প্রতাপ খুব – আলাপ করুন ওর সঙ্গে। (পৃ. ৫৪৪)

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে হরিজন ও শিডিউলড কাস্টের লোকেরা দাপট দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের তারা নিষ্পিষ্ট করে মারছে। দেশের রক্ষকরাই ভক্ষক হয়ে উঠেছে। অকর্মণ্য ও অসাধুদের হাতে দেশের শাসন ভার অর্পিত হওয়ায় দেশের সত্যিকার কোনো উন্নতি হয়নি। স্কুল কলেজে ছেলেদের শিক্ষা হয় না । তারা শিক্ষকদের মারে, ভদ্র লোকদের হুমকি দেয়, রাস্তায় প্রকাশ্যে মেয়েদের অপমান করে, বিনা টিকিটে ট্রেনে-বাসে চড়ে। পুলিশ তাদের কিছু বললে উল্টো পুলিশের সাজা হয়। কর্তৃপক্ষ তাদের তোয়াজ করেন। কারণ ইলেকশনের সময় এদের উপরই ভরসা তাদের। 'জোর যার মুলুক তার' রাষ্ট্রে যুব সমাজের অধঃপতন এবং দেশের শোচনীয় অবস্থায় উদ্বিগ্ন সদাশিব (পৃ. ৫৪৫)। প্রকৃত অর্থে এ উদ্বিগ্নতা লেখকের। তাই পনেরো বছর পূর্বে প্রকাশিত *গোপালদেবের স্বপ্ন* (১৯৪৬) তে দেশের একই দূরাবস্থায় ব্যথিত হয়েছেন তিনি।

সদাশিব সিভিল সার্জন থাকা অবস্থায় বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের নাতনীর চিকিৎসা করেছিলেন, অনেক চেষ্টার পর অবশেষে প্রাণে বেঁচে যায় মেয়েটি। একবার স্টোভ জ্বালাতে গিয়ে মুখটা পুড়ে গিয়েছিল তার। বাঁচার আশা ছিল না একদম। সেই বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বাড়িতে বেগুন চিংড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছেন সদাশিব। কারণ নাতনী ভালো বেগুন-চিংড়ি রাঁধে। কিন্তু আয়োজন করা হয়েছে অনেক পদের – সবজি থেকে মাংস পর্যন্ত। এত পদের খাবার দেখে সদাশিব বলে ওঠেন –

> 'করছেন কি! এত কি খেতে পারব?'
>
> আপনি পারবেন না তো পারবে কে! আপনি তো খাইয়ে লোক–' (পৃ. ৫৯৫)

একবার বনফুল রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সপরিবারে গিয়েছিলেন। বনফুল সামনে অনেক পদের খাবার দেখে বলে উঠেন, এতো তিনি খেতে পারবেন না। তখন রবীন্দ্রনাথ বনফুলকেও ঠিক এভাবেই 'খাইয়ে লোক' বলেছিলেন। এই অংশটুকু বনফুলের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নেয়া।

বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বাড়ির বাইরের ও ভিতরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বাঁড়ুয্যের নাতনীর পোড়া বীভৎস মুখ, তার উপর সদাশিবের জন্যে সাধ্যের বাইরে যেয়ে ব্যাপক আয়োজন – এসব দেখে তাঁর খুব অস্বস্তি লাগা শুরু হয়। অসহায় দরিদ্র পরিবারটির জন্যে তাঁর মন ধুকরে কেঁদে ওঠে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ঠিক কিন্তু এদের অবস্থা যেন আরও করুন হয়েছে। এমনটিই ভাবছিলেন তিনি। তাঁর এ ভাবনাতেই উপন্যাসের তাৎপর্য নিহিত –

> নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালির গৃহস্থের নগ্নরূপটা তাকে পীড়া দিচ্ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল এদের দশা কি হবে? এরা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? কে বাঁচাবে এদের? ভারত স্বাধীন হয়ে এরাই তো সবচেয়ে বেশি বিপন্ন হয়েছে। উদ্বাস্তুদের কথা মনে পড়ল, তারা নাকি

আরও বিপন্ন। শিয়ালদহ স্টেশনে তাদের যে চেহারা একবার দেখেছেন তা মর্মন্তুদ। মানুষ নয়, যেন পশুর দল। তিন-চারজন নেতা মিলে দেশটাকে ভাগ করে দিলে ক্ষমতার লোভে। (পৃ. ৫৯৪)

বাজারে যেয়ে মেথর বাবুলালের সাথে দেখা হলে তার সংসারের খোঁজখবর নেন। আবার শাকসবজির বাজারে যেয়ে নধর চেহারার কুমড়ো অনেক বেশি টাকা দিয়ে কিনে কুমড়ো-বিক্রেতা বুড়িকে পরোক্ষভাবে আর্থিক সহায়তা করেন। বুড়ি কুমড়োর বেশি দাম নিতে না চাইলে সদাশিব বলেন, বাড়তি টাকা তিনি তার বিধাব মেয়ে রৌশনকে দিয়েছেন। বাজারে রৌশনকে দেখতে না পেয়ে তার খোঁজ নেন সদাশিব এবং জানতে পারেন বুড়ি তার বিধবা মেয়ে রৌশনকে আবার বিয়ে দিয়েছেন। বিধবা মেয়ের বিয়ে দেয়ায় সদাশিব ভারি খুশি হলেন, ফলে বুড়িও নিশ্চিত হলেন – তাদের অভিভাবক যেন সদাশিব। বাজারে আসা মানুষদেরও তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। একদিন তিনি বাজারে এক অপরিচিত লোককে দেখতে পেলেন, লোকটি প্রতি মাছ বিক্রেতার কাছে যেয়ে একটি করে মাছ তুলে দাম জিজ্ঞেস করে, কেউ তার কাছে একটি মাছ বিক্রি করে আবার কেউ তাকে ভর্ৎসনা করে – ব্যাপারটি অসম্মানজনক হওয়ায় সদাশিব লোকটির সাথে কথা বলে জানতে পারেন তার তিনকুলে কেউ নেই, একা থাকেন, ডায়াবেটিস এবং বাতের সমস্যায় ভুগছেন। ভাত, রুটির পরিবর্তে ডাক্তার তাকে ছানা ও ছোট মাছ খেতে বলেছেন। লোকটির অসহায়ত্বের কথা শুনে তার প্রতি সদাশিবের দরদ জাগে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে লোকটির জন্যে প্রতিদিন চার/পাঁচটি টাটকা মাছের ব্যবস্থা করে দেন। আবার হাসিমুখী তরুণী মেছুনিটির মাসিকের যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পেতে তার জন্যে ওষুধও এনে রাখেন গাড়িতে। অনেকদিন চোখ নিচু করে, ঘাড় ফিরিয়ে অনেক লজ্জা নিয়ে তরুণীটি তার যন্ত্রণার কথা ডাক্তার বাবুকে জানিয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে ছিপলির জন্যেও তিনি ওষুধ নিয়ে আসেন। মানব-দরদি সদাশিবকে তাই বলতে শোনা যায়, ডাক্তারি ব্যবসা করব না এখন থেকে ডাক্তারি করব। তাই সবাইকে তিনি ফ্রি-তে সেবা দেয়া শুরু করেন। যারা 'ফি' ছাড়া ডাক্তার দেখাতে চান না, তাঁদের জন্যে একটি বাক্সের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তারা তাদের খুশি মত সেখানে টাকা রাখে। জেলে জগদম্বার খোঁজ-খবর রাখেন সদাশিব সব লাভ পাইকার আর গুদামওলা সব লাভ নিয়ে নেয়। তার মাছের ব্যবসা পোষায় না, তাই সে এখন চা বিক্রি করে। ডাক্তারের মোটরের কাছে অনেক রোগী দাঁড়িয়ে থাকে, যারা বাজারে ঝাঁকা-মুটের কাজ করে তারাও সদাশিবের মোটরের কাছে এসে দাঁড়ায়, তাদের গায়ের জামা-কাপড় ফরসা, মাথার চুল আঁচড়ানো। ঝাঁকা-মুটেরা সাধারণত এরকম হয় না–তাদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার পেছনে রয়েছে সদাশিবের সাজিমাটির অবদান। আরও আছে মোটর কারখানার মালিক কমলবাবু, কারখানার শ্রমিক ফালতু ওরফে তমিজুদ্দিন যাকে মাস দুয়েক আগে একটা হাফপ্যান্ট কিনে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু। মোটর কারখানায় সদাশিবের সাথে দেখা হলো বড় গভর্নমেন্ট অফিসার মিস্টার পরসাদের সঙ্গে তার স্ট্রাংগুলেটেড হার্নিয়ার চিকিৎসা করে ভালো করে দিয়েছিলে ডাক্তার বাবু। দেখা হওয়াতে মিস্টার

পরসাদ আবারও কৃতজ্ঞতা জানান সদাশিবকে। সকালের পর রাত আবার সকাল–এভাবে কালের প্রবাহ বয়ে চলে অবিরাম গতিতে। এভাবে এখানে সদাশিবের পাঁচ বছর কেটে গেছে মাছ ব্যবসায়ী আব্দুল, আলী, কেবলি, ছিপলি, ফালতু, রহমান, কমল, জগদম্বা, সুখিয়াসহ আরও অনেক অবহেলিত মানুষ, যারা ডাক্তার সদাশিবের আত্মীয় হয়ে উঠেছে – 'ওদের সুখদুঃখের সঙ্গে আমি জড়িত, তাই আমাকে ওরা আপন লোক মনে করে। আমি পরম সুখে আছি।' (পৃ. ৫৫৫)

নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শ্বশুর বাড়ি থেকে গীতা পালিয়ে এসেছে। সে ডাক্তারের কাছে তার পারিবারিক সমস্যার সমাধান করতে এসেছে। ডাক্তারবাবু ছাড়া কেউ তাকে নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। সে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে যাবে না। ডাক্তার বাবুর কাছে সে কাজের বিনিময়ে থেকে যেতে চায়। শুধু শ্বশুর বাড়ির নির্যাতনই না, তার স্বামী যার জমি চাষ করে সেই মালিকের বাড়িতেও বেগার খাটতে হয় তাকে। ওই জমি থেকে যে ফসল হয় তা থেকে জমির মালিক বাভন তাদের সংসারে দেয় খাবার মত করে। এই একই কাহিনি সদাশিব আরও অনেকের মুখে ইতোমধ্যে শুনেছেন। ঘরে-বাইরে গীতাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের কথা শুনে ডাক্তার সদাশিবের গভীর উপলব্ধি হয় – 'দাসত্ব প্রথা এখনও লোপ পায় নি। কেবল তার বাইরের রূপটা বদলেছে মাত্র। দাস দাসী বিক্রয়ের আলাদা হাট বাজারে নেই আজকাল। সমাজের বুকের উপরই ঘরে ঘরে সে হাট বসেছে। ধূর্ত ধনীর কাছে অসহায় দুর্বলরা স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয় করছে। না করে উপায় নেই তাদের।' (পৃ. ৫৫৭)

শুধু এদের প্রতি সদাশিবের সদয়দৃষ্টি ছিল তা-না, পরিবারের প্রতিও ছিল সেই দৃষ্টি সমানভাবে। এমনকি তার পরিবারে আশ্রিতাদের ভালো রাখার ভালো থাকার কথাও তিনি ভাবেন। তাই ভাইপো চিরঞ্জীবের বউ মালতি যখন বলে, কাকার সংসারের ঘানি টানতে টানতে জীবন তার দুর্বীসহ হয়ে উঠেছে, সে আর পারছে না, প্রায়ই তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। সদাশিবের কানে এই কথা পৌঁছামাত্রই তিনি তাদের অবসর জীবন-যাপনের জন্যে ভাইপো ও তার বউকে ঘুরে আসতে কাশ্মীর পাঠিয়ে দেন অনেকটা জোর করেই এবং সাথে টাকা-পয়সাও দিয়ে দেন। দীর্ঘদিনের বাবুর্চি আজবলাল বাড়ি যেতে চাইলে তাকেও পাঠিয়ে যেতে দেন তিনি। ফলে বাড়িতে রান্না বান্নার কাজও বন্ধ হয়ে যায়। ড্রাইভার আলী বাইরে রান্না করে এবং সেখানেই খাওয়ার কাজ সেরে নেন তিনি। সদাশিবের রোগীরা তার আশেপাশেই থাকে। যেখানেই রান্নার কাজ শুরু হোক না কেনো তারা এসে আলীকে সাহায্য করে। একবার জগদীশের বউ ছেলে-মেয়েরা এসে কেউ মসলা বেটে, কেউ জল তুলে, কেউ বা তরকারি কুটে দিয়ে রান্নার কাজে হাত লাগিয়ে সবাই এক সাথে খেয়েছে। যাযাবরের এমন জীবনটাকেও উপভোগ করেছেন সদাশিব। এভাবে সদাশিবের জীবনের রং বারবার বদলাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ সেই রঙিন জীবনের যবনিকাপাত ঘটে সমাজের তথাকথিত

ঘুনে পোকাদের কবলে পড়ে। ঘটনাটি হলো – এক স্থানীয় ডাক্তারের ছেলে, কংগ্রেস-নেতা গ্রামের মোড়ল ছবিলালের বখাটে গুণ্ডা ছেলে আর একজন অপরিচিত ছেলে–এরা তিনজন সুযোগ পেলেই ছিপলিকে উত্ত্যক্ত করতো আর সদাশিব ছিপলিকে যথাসম্ভব নিরাপত্তা দিয়ে রাখতেন। একবার হাটের সদাশিব-ভক্ত স্থানীয় জনতা তিন গুণ্ডাকে পিটিয়ে শায়েস্তা করে ছেড়ে দেয়। গুণ্ডারা এর প্রতিশোধ নিতে ছিপলির বাড়িতে ডাকাতি করে এবং তাকে বলাৎকার করে। খবর পেয়ে সদাশিব একাই ঘটনাস্থলে হাজির হলে ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের কোনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লোক তাঁর মাথায় লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করে। মাঠিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। সদাশিবের চোখের ভিতর হেমারেজ হলে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তাঁর পরিবারের লোকদের খবর দেয়া সম্ভব না হওয়ায় ছিপলিই তাঁর মুখাগ্নি করে।

হাটে বাজারে উপন্যাসটিতে প্রধান চরিত্র সদাশিবকে ঘিরে যেসব অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ রয়েছে তাদের বাস্তব জীবন কাহিনি বনফুল চিত্রিত করেছেন শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায়। বনফুল অন্ত্যজ মানুষদের কেবল সেবাই করেননি তাদের সুখ দুঃখের সাথে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটেছে চিকিৎসাসূত্রে। তাদের মধ্যে সদাশিবের ড্রাইভার আলী চরিত্রটি বনফুলের ব্যক্তিগত ড্রাইভার আলী চরিত্রের প্রতিফলন। বনফুল পশ্চাৎপটে আলী সম্পর্কে লিখেছেন –

> অনেক রকম ড্রাইভার আমাকে রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু আলীই আমার মনে দাগ রাখিয়া গিয়াছে। আলীর চরিত্রে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এ চরিত্রটি আমি আমার *হাটে বাজারে* গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছি। তাহার চরিত্রে বিলাতি বাটলার গোছের একটা ছাপ ছিল। সে কখনই প্রভুর কথার উপর কথা বলিত না। তাহার মধ্যে একটা হৃদয়গ্রাহী মুসলমানী আদবকায়দাও আমাকে মুগ্ধ করিত। (পৃ. ২৪২)

ছোট বেলায় বনফুল ভৃত্যমহলে তাদের অনুশাসনে বড় হয়েছেন, বলা যায় অনেকটা রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলার মতো। বড় বেলায়ও তাদের ঘিরেই কেটেছে তার জীবনের অনেকটা সময়। বনফুলের চিন্তা-চেতনায় তারা আপনজনের মতোই জায়গা করে নিয়েছে তাঁর প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্তে। (এমনকি তিনি যখন কলকাতায় গিয়ে বসবাস করছেন তখনও তারা তাঁর খোঁজ খবর নিয়েছেন)। বনফুলের ব্যক্তিগত জীবনের বিরজু, ধরাসন, মৈথিল, কারু, সিতাবী এবং উপন্যাসের আব্দুল, আলী, কেবলি, ছিপলি, ফালতু, রহমান, কমল, জগদম্বা, সুখিয়া–এরাই বনফুলের জীবনে বৈচিত্র্য এনেছে, জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করেছে। তাদের সম্পর্কে বনফুল পশ্চাৎপটে বলেছেন – 'ইহারা শিক্ষিত নয়, কিন্তু ইহাদের হৃদয়ের আলো শিক্ষিত লোকদের তথাকথিত enlightment অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নাই।' (বনফুল, ১৯৯৯: ২৪২)

১.১২

বনফুলের বয়স যখন ৬৬ অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে তাঁর *তীর্থের কাক* ও *মানসপুর* উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হয়। এসময় তাঁর গল্প সংকলন ছিটমহলও বের হয়। ***মানসপুর*** উপন্যাসটি প্রকাশ করেছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি। বনফুল এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন তাঁর গর্বিত ডাক্তার বন্ধু পার্বতীচরণ সেনকে। উৎসর্গ পত্রে তিনি লেখেন:

ভাই পার্বতী,

তুমি সারা জীবন কুষ্ঠ রোগী রোগীনীদের সেবা করেছ। এখনও করে যাচ্ছ। তাদের ব্যথা বেদনা হতাশা তোমার মনে নিরন্তর যে সাড়া জাগাচ্ছে তা দুর্লভ মহত্ত্বের পরিচায়ক। তুমি আমার বহু কালের বন্ধু। তোমার বন্ধুত্বগর্বে আমি গৌরবান্বিত। সেই গৌরববোধের সামান্য চিহ্নস্বরূপ এই কাহিনীটি তোমার নামে উৎসর্গ করে কৃতার্থ হলাম। ইতি

৪/৫/৬৫ তোমার বন্ধু

ভাগলপুর বলাই (বনফুল , ২০১৩/১২: ৭৮৩)

এই উপন্যাসের নায়ক বিশ্বদীপ। তাঁর দুটি জগৎ, একটি বাস্তব জগৎ আরেকটি অবাস্তব জগৎ বা মানসপুর। তাঁর বাস্তব জগতে যা অসম্ভব তাকেই মানসপুরে সম্ভব করে তোলেন তিনি। বাস্তব জগতে তিনি যখন হাঁপিয়ে উঠেন তখন মানসপুর মূর্ত হয়ে উঠে তাঁর কল্পনায়। তিনি আপন মনে বিচরণ করে বেড়ান সেই জগতে। আবার মানসপুর থেকেও তিনি ফিরে আসেন বাস্তব জগতে। মানসপুরে প্রকৃতিই তাঁর বড় বন্ধু, প্রকৃতির সাথেই তিনি একাত্ব হয়ে যান। মানসপুরে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে আছে–পাহাড়, পর্বত, সাগর, নদীনালা, গাছপালা, আকাশ, মেঘ, শ্বেতপদ্ম পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, প্রজাপতি, ফড়িং, ব্যাঙ, পাখি, মাছ, কলমীলতা, পাঁচজন অপ্সরী (তুফানী, তুহিনা, তরলা, হাওয়া ও হিল্লোলা), পাহাড় থেকে নেমে আসা তিনজন পাহাড়ি লোক, (বিশ্বদীপ এদের তিনজনের নাম দিয়েছেন, অসাধ্যসাধন শর্মা, শ্রীমন্ত প্রতিম ও সাগর সঙ্গম), আরও আছে মুরুব্বী যে মানসপুরে বিশ্বদীপের বড় সহায়, আছে রুদলবাবু, যার হুকুম অমান্য করা যায় না এবং কুষ্ঠরোগী সিংহ। সিংহ গাছতলায় সংসার পেতেছে। এক জায়গায় সে বেশিদিন থাকে না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, মানুষের সংস্রব বাঁচিয়ে চলতে চায় সর্বক্ষণ। সিংহ বলে, এক জায়গায় বেশি দিন থাকলে মায়া বসে যায়। তাতে শুরু হয় কষ্ট। মানসপুরে কেউ কারও চাকর নয়। এখানে সবাই খুশি মত আসে, খুশি মত কাজ করে, কোনো কাজ পড়ে থাকে না এখানে। এখানকার সবাই প্রকৃতির

ইঙ্গিত-ইশারা মেনে চলে। তারা মনে করে, প্রবল বর্ষায় প্রকৃতিই চায় না তারা কাজ করুক। ঠিক তেমনি প্রচণ্ড রোদ বা প্রবল ঝড়েও তারা এই ইঙ্গিত পায় প্রকৃতির কাছ থেকে।

বাস্তব জগতে আছে বিশ্বদীপের বাবা-মা, তাঁর প্রেয়সী বিদুলা, তাদের সাবান তৈরির কারখানা, সেখানকার শ্রমিক, শ্রমিক নেত্রী এবং বিশ্বদীপের আশ্রিতা মহুয়া, বিশ্বদীপের বাবার বন্ধু পাঠকজি, বিশ্বদীপের তিন বন্ধু শ্যামল বোস, অনন্ত ও অনঙ্গ, টমসন সাহেব যার সাথে বিশ্বদীপ বেড়ে উঠেছেন, বিশ্বদীপের চিকিৎসক ডাক্তার ঘোষাল, গ্রামের বাড়ির তাদের সম্পত্তি দেখভাল করার লোকজনসহ অনেকে। বিশ্বদীপকে ঘিরে এত মানুষের আনাগোনা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি এখানে একা। কেউ তাঁর আপন নয়। একাকিত্ব যখন তাকে প্রবল বেগে পেয়ে বসে তখন তিনি চলে যান মানসপুরে। এই মানসপুরই তাঁর স্বস্তির একমাত্র জায়গা। বাস্তব জগত ও মানসপুর বিশ্বদীপের এই দুই ভুবনেই রয়েছে কুষ্ঠরোগী। মানসপুরে সিংহ আর বাস্তব জগতে বিশ্বদীপ নিজে।

বিশ্বদীপের বাবা মা দুজনেরই কুষ্ঠ হয়েছিল। তাঁর বাবা অম্বরের স্কুল জীবন থেকেই কুষ্ঠরোগের লক্ষণ ছিল। তখন তাঁর উরুর একটা জায়গা অসাড় ছিল সেটা থেকেই কুষ্ঠরোগ ধরা পড়ে। আর ওই সময়টায়ই অম্বর বিয়ে করেন। তিনি যখন বিলেত পড়তে গেলেন তখন তার স্ত্রীকে নিতে চাননি কিন্তু তাঁর স্ত্রী জোর করেই যান তাঁর সাথে। সেখানে তিনি সন্তান সম্ভবা হলে অম্বরের স্কুল জীবনের বন্ধু পাঠকজিকে তিনি বিলেত আসতে বলেন। পাঠকজি বিলেত যেয়ে দেখেন অম্বরের সারা শরীর কুষ্ঠরোগে ছেয়ে গেছে। এরইমধ্যে অম্বর ফিজিকসে ডিএসসি পেয়েছে। একটি ল্যাবরেটরীতে কাজ করে। তাঁর একজন সাহেব বন্ধু আছে সে তাঁর সাথে থাকে সবসময়। অম্বরের সাহেব বন্ধুটির আফ্রিকায় হীরের ব্যবসা আছে। তিনি অম্বরকে আফ্রিকায় নিয়ে যেতে চাইছেন সেখানকার তাদের বড় ল্যাবরেটরীতে কাজ করার প্রস্তাব দিয়ে। সেই কাজ ঘরে বসে করা যাবে। এরইমধ্যে অম্বর দুবার আত্মহত্যার চেষ্টাও চালিয়েছে। অম্বর পাঠকজিকে বলেন, তাদের সন্তানের দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। তাদের সংস্পর্শে সন্তানকে তারা রাখবে না। সেই থেকে পাঠকজি বিশ্বদীপের সাথে আছেন। পাঠকজি তোতলা তাই সহজে কথা বলেন না। বেশির ভাগ লিখেই মনের ভাব প্রকাশ করেন। অম্বর যখন আফ্রিকার জঙ্গলে ছিলেন তাঁর নাক মুখ সব গলে গলে পড়ছিল তখন স্বপ্নে কুষ্ঠরোগের একটি দৈব ওষুধ তৈরির ফরমুলা পেয়েছিলেন তিনি। সেটি তিনি খাতায় টুকে রাখতে বলেছেন পাঠকজিকে। আরও বলেছেন, দেশে ফিরে গিয়ে সাবান তৈরি করে সেগুলো বিলানোর জন্যে। কিন্তু পাঠকজি মনে করলেন, এভাবে ফ্রি-তে বিলালে কুবেরের ঐশ্বর্যও শেষ হয়ে যায়। তাই তিনি সামান্য লাভ রেখে ব্যবসা শুরু করেন। সাবান তৈরির কারখানা তিনি লাউপুরে না করে শহরেই করেন কারণ গ্রামে যেয়ে বসবাস করা বিলেত ফেরত বিশ্বদীপের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সাবান তৈরির ফ্যাকটারিতে স্ট্রাইক শুরু হয়েছে। শ্রমিকদের

একদল দ্বিগুণ বেতন চায় আরেক দল তিনগুণ। পাঠকজি ও বিশ্বদীপ তাদের দাবি মেনে নেননি, বিশ্বদীপ তাদের ব্যবসার অংশীদার করতে চাচ্ছেন আর পাঠকজির মতে যারা বিনা শর্তে কাজ করবে তাদেরই তিনি রাখবেন বাকিরা অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে চলে যেতে পারে। এদিকে লাউপুরে সংগঠিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা থানা পর্যন্ত গড়িয়েছে। একই সাথে ফ্যাকটারির স্ট্রাইক, বিশ্বদীপের গ্রাম লাউপুরের হাঙ্গামা, বিশ্বদীপের কুষ্টরোগের লক্ষণ নির্মূলের আপ্রাণ চেষ্টা, প্রেয়সি বিদুলার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ না করতে পারার যন্ত্রণা নিয়ে বাস্তব ও প্রকৃতির রাজ্য মানসপুরে বিশ্বদীপ তাঁর জীবন-তরী বেয়ে চলেন। বিলেতের টমসন সাহেবের পরিবারেই বিশ্বদীপ বড় হয়েছেন। অবিবাহিত পাঠকজি বিশ্বদীপকে নিজের কাছে না রেখে টমসনের পরিবারের কাছেই রেখে আসেন। নিঃসন্তান দম্পতি টমসন ও লিসি লাউপুরের সমস্যা নিরসনে বিশ্বদীপকে সাহায্য করার লক্ষ্যে সেখানে যান। সেখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করার পরিকল্পনা করেন তারা। লাউপুরের জমিদারির ম্যানেজার আদুবাবুর (অর্থকষ্টে পাগল প্রায়) আইবুড়ো সাতটি জোয়ান মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা স্টেট থেকে দেয়ার কথা জানান বিশ্বদীপ। আর টমসন সাহেবকে লাউপুরের মালিক হতে প্রস্তাব দেন। উরুতে বোদা ভাবটা ক্রমশ বাড়তে থাকায় ওষুধ ও ডাক্তার পরিবর্তন করেও কোনো ফল না হওয়ায় এবং বিদুলার কাছে ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়ানোর চিন্তা মাথায় আসে বিশ্বদীপের। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। বিশ্বদীপ অনেক জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছেন, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্নৌ, দিল্লী, চণ্ডীগড়, অমৃতসার ও কাশ্মীর। এভাবে ঘুরে ঘুরে বেশ কয়েক মাস তিনি কাটিয়ে দেন। দিল্লীতে দুইদিন থাকার পর তিনি কাশীতে যান। কারণ বিশ্বেশ্বরের কাছে কয়েকদিন থাকার মনোবাসনা হয় তাঁর। সেখানে তিনি ছোটছোট ছেলেমেয়েদের খেলনা বিতরণ করেন এবং ভিখারিদের পয়সা দিয়ে তৃপ্তি লাভ করেন। একদিন খেয়াল করেন, সবাই যেন বিশেষভাবে চাইছে তাঁর দিকে। হোটেলে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন, ডান গালের কিছু অংশ এবং নাকের ডান পাশটা লাল হয়ে উঠেছে। লেপ্রসির প্যাচ। সেইদিন সময় হলো বিদুলাকে সব কথা জানানোর। তাকে চিঠি লিখলেন তিনি।

বিদুলা,

তোমার কথা প্রতি মুহূর্তে ভেবেছি।...তোমাকে এড়াবার জন্যে আমাকে পালিয়ে আসতে হল। তোমাকে সত্য কথাটা বলবার সাহস আমার ছিল না। আজ সকালে দেখলাম মুখের উপর বেশ বড় একটা লাল প্যাচ হয়েছে। আমি কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত কিন্তু বিশ্বাস কর আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে সর্বান্তকরণ দিয়ে চাই। এসব শোনার পরও তুমি যদি আমাকে গ্রহণ করতে চাও তাহলে আমার বাসার ঠিকানায় সেটা জানিয়ে দিও। আমি দিন পনেরো পরে ফিরব। আমার ভালোবাসা জেনো।

ইতি –

বিশ্বদীপ (পৃ. ৪২৭)

বাড়ি ফিরে জানতে পারেন বিদুলা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। মনোকষ্ট নিয়ে পরের দিন খুব ভোরে বাড়ি ছেড়ে আফ্রিকার জঙ্গলের একটি ছোট বাড়িতে আশ্রয় নেন বিশ্বদীপ। তার সাথে ফ্যাকটারির শ্রমিক নেত্রী মহুয়া যায় জেদ করে, যাকে উপন্যাসের মাঝামাঝিতে বিশ্বদীপের আশ্রিতা হিসেবে দেখতে পান পাঠক। এই আফ্রিকার জঙ্গলেও এসে হাজির পাঠকজি। তিনি জীবনের বাকি সময়টাও বিশ্বদীপের সাথেই কাটাতে চান।

উপন্যাসটিতে বনফুল বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন। প্রথমত, মানসপুরের রুদেলবাবু কুষ্ঠরোগী সিংহকে তাঁর বন্ধু করেছেন। সিংহের নিরব চাহনি থেকে রুদেলবাবু সব বুঝে নেন। সেই নিরব চাহনির ভাষা তিনি বিশ্বদীপকে বলেন –

> ওর ওই একটি চাহনি থেকেই সব বুঝে গেলাম আমি। কিন্তু একটা জিনিস তখন বুঝতে পারি নি যে, কুষ্ঠ কেবল ওর দেহেই নিবদ্ধ, আশ্চর্যরকম সুস্থ ওর মন, আশ্চর্যরকম সুন্দর ওর চরিত্র। যা কয়লার খনি বলে মনে হয়েছিল তার মধ্যে যে কয়লা নেই, হীরে আছে, এটা আবিষ্কার করতে একটু সময় লেগেছিল। (পৃ. ২৯০)

সিংহ চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে লেখক তৎকালীন সমাজের ওইসব মানুষের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন, যাদের কুষ্ঠ মনে শরীরে নয়। দ্বিতীয়ত, কুষ্ঠরোগীদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে চায় সবাই, এমনকি প্রেয়সিও। সবাই বাহ্যিক সৌন্দর্যকেই বেশি ভালোবাসে, মনের সৌন্দর্যকে নয়। মানসপুরে রুদেলবাবুকে উদ্দেশ্য করে সিংহকে বলতে শোনা যায় – 'মানুষরাই তো কুষ্ঠরোগীদের ভয় পায়।...আমি যেসব গাছতলায় বসেছি, তারা ছায়া দিয়েছে ফলও দিয়েছে, ভয় পায় নি, ঘৃণাও করে নি। যে মাটিতে বসেছি সে বলে নি সরে বস। যাদের তোমরা পশু বলো তারাও ভালো ব্যবহার করেছে বরাবর।' (পৃ. ২৯১) উপন্যাসের বাস্তবে জগতে কেন্দ্রীয় চরিত্র বিশ্বদীপকে সবাই এড়িয়ে চলছে বলেই তাঁর মনে হয়েছে সর্বক্ষণ। তিনি সবসময় নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছেন। বিশ্বদীপ যখন অনন্তের বউকে অনুরোধ রক্ষার্থে বিজ্ঞাপন সর্টিংয়ের কাজ দিয়েছেন তখন অনন্ত তাঁকে বলেছিল, বিজ্ঞাপনের কাজের চেয়ে রান্নাবান্নার কাজে যদি মন দিতে বলতেন তাহলে একটু সুবিধে হত। এর উত্তরে বিশ্বদীপ বলেন –

> আমার সুবিধার জন্য কেউ কিছু করুক যখনই এই প্রত্যাশা করেছি তখনই ঠকেছি। তাই আর সে প্রত্যাশা করি না। জানেন, পৃথিবীতে আমার সত্যিকারের আপন লোক কেউ নেই। যারা আমার আশে পাশে ঘোরে তারা একটা না একটা স্বার্থের জন্যই ঘোরে। আমি একা। তাই নিত্য নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করবার আমার এত আগ্রহ। যদি অসম্ভব সম্ভব হয়, যদি সত্যিকার বন্ধু পেয়ে যাই একজন। (পৃ. ৪১৩)

রূপ-যৌবন-অর্থ-শিক্ষা-সুনাম সব থাকা সত্ত্বেও বিশ্বদীপ নিঃসঙ্গ। ডাক্তার ঘোষাল বিশ্বদীপের চিকিৎসা করেন, আর তাঁকে ধৈর্য্য ধারণ করতে বলে সব ঠিক হয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেন। বিশ্বদীপের আপনজন এই ডাক্তার ঘোষাল,

তাকে তিনি ভালোবাসেন, কিন্তু তাকেও তো সব কথা বলতে পারেননি, এমন কি বিদুলাকেও না। বিদুলাকে সব বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন তিনি। বিশ্বদীপ বিদুলার বাড়িতে গেলেন। বিশ্বদীপকে দেখে মানসপুরের রংবাহারী বলে উঠে, সে প্রতিদিন বিদুলার কাছে আসে, তার জানালার উপর চুপটি করে বসে থাকে।। ওইদিন বিশ্বদীপ রংবাহারীর কথামত সন্তর্পণে বিদুলার ঘরে উকি দিয়ে দেখতে পান টেবিলের উপর মাথা রেখে বিদুলা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। টেবিলের উপর খাতায় গোটা গোটা অক্ষরে যা লেখা রয়েছ তার মর্মকথা হলো, বিশ্বদীপ সুন্দর, আকাশের মত, আলোর মত ও কুসুমের মত সুন্দর সে, তাই বিদুলা তাঁকে ভালোবাসে। প্রচুর ধনসম্পদ বা ভালো-মন্দ দোষ-গুণ বিচার করার সময় বিদুলার নেই। বিশ্বদীপের রূপের সাগরে সে ঝাঁপ দিয়েছে। এই লেখা দেখার পর থেকেই খবরটি বিশ্বদীপের অন্তরে শূলের মত বিঁধেছিল। বিশ্বদীপের এই যন্ত্রণাদায়ক পরম সুখকে লেখক মদিরার তীব্র অবস্থার সাথে তুলনা করেছেন। সিংহের কথাই বারবার মনে পড়ছে বিশ্বদীপের, সিংহ বলেছিল, শেষ পর্যন্ত তিনি কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারবেন না। আসলেই কি তা-ই ঘটবে।

রূপে, গুণে, সুনাম, ঐশ্বর্যে টগবগে যুবক বিশ্বদীপের কোনো কিছুরই অভাব নেই শুধু উরুর লাল দাগটাই (লেপ্রসি) তাঁকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝে মানসিক যন্ত্রণা ভুলে থাকার দরুন মানসপুরে পালিয়ে বেড়ান তিনি। সেখানে বধুসরা নদীর জলে ফোটা পাঁচটি শ্বেতপদ্মের মধ্যে পাঁচজন অপ্সরী–তুফানী, তুহিনা, তরলা, হাওয়া ও হিল্লোলকে দেখতে পান। সেখানে মুরুব্বী আছেন, যাকে ছাড়া চলবার উপায় নেই কারোর। মুরুব্বী বহুরূপী লোক, কখনও তিনি কিশোর, কখনও যুবক আবার কখনও তিনি বৃদ্ধ। তিনি পোশাকও পড়েন নানারকম। সেই মুরুব্বী একটি কাঁচের বাক্সের মধ্যে করে রাতের প্রজাপতি এনে দিলেন বিশ্বদীপকে। তিনি প্রজাপতিকে মানুষের ভাষা শিখিয়েছেন যেন বিশ্বদীপের সাথে কথা বলতে পারে। প্রজাপতিটির নাম রংবাহারী দিলেন বিশ্বদীপ। এখানে সবুজ ফুটকি, লাল ফুটকি পোকা, টুনটুনি, শারিকা (মানসপুরের শালিক পাখি), কাশফুল, বুলবুলি, শিয়ালকাঁটা জঙ্গলের সোনাহলুদ পাখি, দিনের প্রজাপতি নওরঙ্গী, সোনাব্যাং লম্ফসিং, ধানগাছ, বধূসরা নদী সবাই কথা বলে তাঁর সাথে। এখানে কেউ ছদ্মবেশ ধারণ করে না, খোলস বদলায় না, তারা ভগবানের দেয়া পোশাক পড়ে থাকে। মাঝেমধ্যে ভগবানই তাদের পোশাক ছাড়িয়ে দেন। কুষ্ঠরোগী সিংহকে বলতে শোনা যায়, জামা গায়ে দিয়ে অসুখ ঢাকবার চেষ্টা সে আর করে না। মানুষই মনের কুষ্ঠরোগ ঢাকবার জন্যে অসংখ্য খোলস পরে। নিজেরাই খোলস তৈরি করছে আর পরছে–ভগবান তাদের কাছে হার মেনেছে, কটা খোলস ছাড়াবেন তিনি। এদিকে, কংগ্রেস পার্টির লোক শশধর বাবু চাঁদা তুলে বেড়ান। জাতীয় পতাকা উৎসব করবে বলে সে বিশ্বদীপের কাছে চাঁদা চাইতে আসে। কিছুই করে না সে। কিন্তু নিউ আলীপুরে বাড়ি করেছে বেকার এই শশধর। এতটাকা সে পাচ্ছে কোথা থেকে? বনফুল সমসাময়িক সমাজের মানুষদের স্বভাব-চরিত্র লক্ষ্য করেছেন। সেসব

মানুষদের আদর্শচ্যুতির বিষয়টি তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়নি। তাই মানসিক রোগক্রান্ত সেইসব চরিত্রকেই তাঁর উপন্যাসে তিনি রূপদান করেছেন, যাদের কুষ্ঠ মনে, দেহে না।

বিশ্বদীপ প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক হলেও সাম্যবাদ চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর চরিত্রে। তিনি তাঁর ফ্যাকটারির শ্রমিক অসন্তোষ মিটাতে তাদের ব্যবসার অংশীদার করতে চেয়েছেন। শ্রমিকদের কাতার থেকে তাদের মালিকের কাতারে বসাতে চান তিনি। বিশ্বদীপ শ্রমিকদের উদ্দেশে বলেন –

> প্রথমেই তোমাদের বলে দিচ্ছি যে, যদিও আমি দামি পোশাক পরি, মোটরে চড়ি এবং আর নানারকম বিলাসিতা করি, কিন্তু আমি তোমাদেরই মত একজন মজুর মাত্র। জন্ম থেকেই যে আওতায় আমাকে মানুষ হতে হয়েছে সেই আওতার প্রভাব আমি অতিক্রম করতে পারি নি। বিলেতে জন্মেছি, বিলিতি স্কুল কলেজে লেখাপড়া করেছি, বিলাতি ধরনে মানুষ হয়েছি, তাই আমার চালচলন হয়তো একটু বিলেতি গোছের হয়ে গেছে। ...আমি তোমাদের মত হতে চেষ্টা করছি, হয়তো একদিন তাই হব, কিন্তু একটু দেরি লাগবে। (পৃ, ৩৩১)

সমান অংশীদারিত্বে বিশ্বাসী বিশ্বদীপের মধ্যে সাম্যবাদ চেতনার প্রতিফলন পক্ষান্তরে লেখকেরই মনোভাবনা। কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার পর সবার অগোচরে চলে যেতে ঘর থেকে বেরিয়ে যান তিনি। কিন্তু তাঁর সাবান কারখানার শ্রমিকদের স্ট্রাইকের কথা ভুলে যাননি বিশ্বদীপ। তাদের কথা মাথায় রেখেই তিনি পাটনায় নেমে স্টেশনের রেস্টরুমে বসে পাঠকজিকে চিঠি লিখেন। চিঠিতে মালিক শ্রমিকের সমান অংশীদারিত্বের কথা বলেছেন তিনি –

> শ্রীচরণেষু,
>
> আমার ভালো লাগছিল না বলে আমি,বেড়াতে বেরিয়েছি। ফ্যাকটারির দেখাশোনা আপনি করবেন। যে মজুররা বেশি মজুরির লোভে অন্য জায়গায় যেতে চাইছেন তাদের যেতে বলেছি। মহুয়া বলেছে, সে মজুর জোগার করে আনবে। তাকে বলেছি মজুরদের আমি ব্যবসার অংশীদার করে নেব। আমার এই ইচ্ছেটা আপনি পালন করবেন আশা করি। মহুয়া মেয়েটি ভালো, তার উপরই সব ভার দিয়ে দেবেন। ইতি–
>
> প্রণত বিশ্বদীপ (পৃ. ৪২৫)

বিশ্বদীপ মধ্যবিত্ত মানসিকতার বলেই বিদুলার কাছ থেকে তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিত্বকে ধরে রাখার জন্যে এত বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়া সত্ত্বেও বিদুলাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করার ভাবনা তাঁর মধ্যে আসেনি। বিয়ে করা উচিৎ কিনা–এই বিষয়ে বিশ্বদীপের প্রশ্নের জবাবে ডাক্তার ঘোষাল বলেছিলেন, ডাক্তারি মতে বিশ্বদীপের বিয়ে করা উচিৎ না। কিন্তু যদি মানুষ হিসেবে বলতে হয় তাহলে, সব জেনেশুনে কেউ বিয়ে করতে

চাইলে অবশ্যই বিয়ে করা উচিৎ, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। বিশ্বদীপ উচ্চবিত্ত মানসিকতার হলে ডাক্তার ঘোষালের দ্বিতীয় মতকে মেনে নিয়ে ক্ষণিকের জীবনকে উপভোগ করতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি।

বনফুল উপন্যাসটিতে মানসপুর নামে যে প্রকৃতি জগতের বর্ণনা দিয়েছেন, তার পেছনে লেখকের প্রকৃতি-প্রীতি কাজ করেছে যা তাঁর শৈশব জীবন থেকেই তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁর অনেক উপন্যাসেই এই প্রকৃতি জগত অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। বিশ্বদীপের যখন বাস্তব জগত অসহনীয় হয়ে উঠে তখনই তিনি প্রকৃতির রাজ্যে বিচরণ করেন। মাঝে মাঝে সেখানেও নিজেকে অসহায় মনে করেন তিনি। তার একবার মনে হয়েছে, মানসপুরের বৃষ্টিও বুঝি তার প্রতি ভদ্রতা করছে, তাকে আপন ভাবতে পারছে না। বিশ্বদীপের মন চেতন আর অবচেতন এই দুইভাবে ক্রিয়াশীল ছিল উপন্যাসে। তিনি কখনও চেতন মনে আবার কখনও অবচেতন মনে মানসপুরে চলে যান। এই চরিত্রটির মধ্যে চেতনা প্রবাহরীতি কাজ করেছে। যেমন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'নয়নচারা' গল্পের প্রধান চরিত্র 'আমু'র মধ্যে এই চেতনা প্রবাহরীতি কাজ করেছে। তবে দুই চরিত্রের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে সেটি হলো সময়ের পার্থক্য। আমু ছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত চরিত্র, আর বিশ্বদীপের কোনো অভাব ছিল না, তার সবই ছিল। তবে মিলের দিকটি হলো – একজন শারীরিক ক্ষুধার যন্ত্রণায় ভুগেছে আরেকজন মানসিক ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে। যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে দুটি চরিত্রই তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে থাকার লড়াই করে গেছে নিরন্তর।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্রকে ঘিরে যেসব প্রয়োজনীয় চরিত্র এসেছে সেসব চরিত্রগুলোর মধ্যে কেবল বিদুলা চরিত্রে মানবিকতার বেশ অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশ্বদীপের মধ্যে মানবিকতার অনেক নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। নিজের জীবন যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করে সবার উপকার তিনি করে গেছেন। কেউ তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে এসে ফিরে যায়নি। যখন, যেভাবে, যে অবস্থায় তাঁর কাছে কেউ সাহায্যের জন্যে এসেছে সবাইকে তিনি সাহায্য করেছেন, কখনও টাকা দিয়ে কখনও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। বিদুলা কেবল সুন্দরের পুজারী ছিল, বিশ্বদীপের সৌন্দর্যের আগুনে সে পুঁড়েছে, পুঁড়ে অঙ্গার হয়েছে। তার মধ্যে বাহ্যিক সৌন্দর্যই প্রধান ছিল। সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ীর একমাত্র উত্তরাধিকারী বিদুলার বিশ্বদীপের প্রতি ভালোবাসায় খাঁদ ছিল বলা যায়। ঘোষাল চরিত্রটি অনেকটা খামখেয়ালী গোছের তবে প্রাণবন্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্র। সময় সময় আনন্দ করতে ঘোষাল জীবনে বিচিত্রতা খোঁজে বেড়িয়েছেন। জীবনের একঘেয়েমী থেকে বাঁচার জন্যে তিনি দেশ ভ্রমণ করেন।

আদুবাবু বিশ্বদীপের গ্রামের জমিদারির ম্যানেজার। একপর্যায়ে উপন্যাসে তাকে পাগল বলা হয়েছে কারণ তার ঘরে সাতটি আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে। টাকার অভাবে একটি মেয়েকেও বিয়ে দিতে না পারায় মানসিক ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারছে না। টমসন, তার স্ত্রী লিসি এবং পাঠকজিকে দেখে হাত-পা বাঁধা রক্তচক্ষু আদুবাবু বলে উঠে –

দেখুন আমি কেবল নৌকা বাইছি। সংসার তরণী। বিরাট তুফান। তবু থামি নি। হেঁইও হেঁইও। হুঁশিয়ার, খবরদার। হেঁইও হেঁইও। সাতটি জোয়ান মেয়ে আইবুড়ো হয়ে বসে আছে...। বড়টাকে কাঁধে নিয়ে ফেরিওয়ালার মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোথাও পাত্তা পাচ্ছি না। মহৎ বাঙালি সমাজ, উচ্চ শিক্ষিত বাঙালি সমাজ, অগ্রণী বাঙালি সমাজ, কিন্তু কলকেটি কেউ দেয় না। মিনিমাম পাঁচ হাজার। তাই দাঙ্গাহাঙ্গামা, ফৌজদারি ইত্যাদি ইত্যাদি। হেঁইও হেঁইও, মারো জোয়ান হেঁইও –। (পৃ. ৩৮৩)

কন্যাদায়গ্রস্ত বাবার হৃদয় যন্ত্রণার নিখুঁত ছবি আদুবাবু চরিত্রটি। তৎকালিন উচ্চ শিক্ষিত, মহৎ বাঙালি সমাজ যারা অসহায়দের প্রতি কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারের প্রতি উদাসীন তাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে নিজের অসহায়তার অবস্থাটি তুলে ধরেছেন। সমাজের শ্রেণি-বৈষম্যের শিকার আদুবাবু তিলে তিলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগলপ্রায় অবস্থায় উপনীত হয়েছে। কন্যাদায়গ্রস্ত বাবার এরূপ হৃদয় যন্ত্রণার ছবি বিংশ শতাব্দীতে প্রাসঙ্গিক বলা যায়। পাঠকজি চরিত্রটি আরেকটি বাস্তবঘনিষ্ঠ সহানুভূতিশীল মহৎ চরিত্র। এই চরিত্রটি পরের উপকার করেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। যৌবনকালের মোক্ষম সময়টা বিশ্বদীপের কুষ্ঠরোগী বাবার সেবা করে কাটালেন। আর বাকি জীবনটা কুষ্ঠরোগী বিশ্বদীপের সেবায় নিয়োজিত করেন।

বিশ্বদীপ যখন আফ্রিকার জঙ্গলে ছোট একটি বাড়িতে বসবাস করছেন তখন পাঠক ধরেই নেন যে, তাঁরও তাঁর বাবার মতই পরিণতি হবে। কিন্তু না, বনফুল মুহূর্তের মধ্যে পাঠকজি ও মানসপুরের রুদেলবাবুর উপস্থিতি নিশ্চিত করে পাঠককে একটি আশার বাণী শুনিয়েছেন। বর্তমান যুগে অনেক ভালো ভালো ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে, কুষ্ঠরোগ এখন আর দুরুহ কিছু নয়, সেরে যাবে এ রোগ। বিশ্বদীপের নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন জাগিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি টানা হয়েছে। বনফুলের উপন্যাসে নায়কদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে দেখা যায়।

১.১৩

প্রচ্ছন্ন মহিমা (১৯৬৭)-য় বনফুল অতিসাধারণ, অবহেলিত, নির্যাতিত, পথহারা মানুষদের চরিত্রের প্রচ্ছন্ন মহিমাকেই উদ্ভাবন করেছেন। সময়ের প্রয়োজনে তারা কেউ চোর, কেউ ডাকাত, কেউ ছিনতাকারী, কেউ বা এমন কিছু। কিন্তু তাদের ভিতর প্রচ্ছন্ন রয়েছে ভালো কাজের মহিমা। অনুপ্রেরণা ও সুযোগ পেলে যা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্র বুজু তার কবি বন্ধুকে এ যুগের রাবন বধ করার পরিকল্পনা জানিয়ে চিঠিতে লিখেছে – 'তুমি যদি আস হয়তো আমাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু দেখতে পাবে তাদের প্রচ্ছন্ন মহিমা যাদের তোমরা এতদিন ঘৃণা করে এসেছ।' (বনফুল, ২০১৩/১২: ৭৭৯) একই সাথে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে কালোবাজারিরাই দেশের হর্তা-কর্তা, তাদের দুশ্চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন এবং তাদের পরিণতি কী হয়, সেই দিকটির প্রতিও আলোকপাত করেছেন লেখক। উপন্যাসে তিনি কালোবাজারিকে 'রাবন' নামে আখ্যা দিয়েছেন, যাদের সীতার মত পরের স্ত্রীর

প্রতি লোভ। এই রাবনকে বধ করতে সাধারণ মানুষরা উচ্চ শিক্ষিত ছদ্মবেশি মানুষদের সাথে এক কাতারে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপন্যাসের শেষে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাবন বধ করতে সফল হতে দেখা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে কালোবাজারিদের দেশের শীর্ষে অবস্থান, সুদখোরদের দৌরাত্ম্য, অন্যায়, অবিচার মাত্রাহীনভাবে ছড়িয়ে পড়া, আদর্শের নামে মেকি আদর্শের ছদ্মবেশ বনফুলকে ভিতরে ভিতরে পীড়া দিচ্ছিলো। সেই অন্তর্জ্বালা নিবারণার্থে বনফুলের এইরূপ উপন্যাসের সৃষ্টি। উপন্যাসটির কাহিনি উত্তম পুরুষের জবানীতে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রধান দুই চরিত্র কবি স্বয়ং এবং তাঁর বন্ধু বুজু ওরফে ব্রজেন্দ্র। কথক (কবি) তাঁর বাল্যবন্ধু বুজুর চরিত্র সম্পর্কে লিখেছেন –

> বুজু আমার বাল্যবন্ধু। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। অনেক দুঃখ-কষ্ট, অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, অনেক নিগ্রহ-নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহাকে। কিন্তু তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ছিল বুজু। কোন পরীক্ষায় কখনও দ্বিতীয় হয় নাই। কিন্তু হায় চরিত্রহীন ছিল সে। হেন কু-কাজ নাই যাহা সে করে নাই। নিত্য নতুন মেয়ে তাহার পিছু পিছু ঘুরিত। নেশার রাজা ছিল। বড় বড় চাকরি পাইয়াও রাখিতে পারে নাই। ঘুষ খাওয়ার অপরাধে, তহবিল ভাঙার দায়ে, জনৈক বড়লোকের পত্নীকে প্রকাশ্য সভায় অশ্লীল ভাষায় অপমান করিয়াছিল বলিয়া দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহাকে। হঠাৎ সে একদিন অন্তর্ধান করিল। না করিলে তাহার জেল হইয়া যাইত। (পৃ. ৭৭৯)

দশ বছর পর কবি তার বন্ধুর খোঁজ পেলেন। একজন পাইলট একটি প্যাকেট হাতে করে এনে কবিকে দিয়ে বলেন, বুজু বাবু তাঁকে এই প্যাকেটটি দিয়েছেন। অনেক প্রশ্ন করেও কবি বুজুর ঠিকানা নিতে পারেননি। প্যাকেটের ভিতর একটি চিঠি ও একটি পাণ্ডুলিপি ছিল। চিঠিটা অনেক বড়। এতবড় চিঠি বাংলা সাহিত্যে বিরল। এটি গতানুগতিক চিঠি নয়। বুজুর পলাতক জীবনের বর্ণনা এবং সেই সময় যেসব মানুষ তার সংস্পর্শে এসেছে তাদের কথাও রয়েছে সেই চিঠিজুড়ে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চিঠির সব কথা রয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেতে কবির পরিবার সম্পর্কে বলা আছে। কবি সাহেবের অফিসে ভালো মাইনেতে চাকরি করতো। সাহেবরা এদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার ফলে অর্থাৎ তাদের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার দরুণ তাকে স্বদেশি লোকের অফিসে কাজ করতে হয়। কিন্তু সেখানে কম বেতন ও ভদ্র ব্যবহারের অভাবে বেশিদিন কাজ করা হয়ে উঠেনি। তাই কবি সাহিত্য সেবায় মন দিয়েছেন। নিজেকে তিনি সাহিত্যের একজন কেরানি বলেই মনে করেন। বিপত্নীক কবির দুই সন্তান হোস্টেলে থাকে। তাদের দেখাশুনা করে তার বোন কুশলা। কুশলা একটি কলেজে অধ্যাপনা করে। তার একান্তে নিজের একটি ভুবন রয়েছে। কবির ধারণা সম্ভবত সে বুজুকে এখনও ভালোবাসে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে রয়েছে পাণ্ডুলিপির কথা। কবিকে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছেন বই আকারে প্রকাশ করার জন্যে। সব শেষ পরিচ্ছেদে কবিকে লেখা বুজুর জীবনের শেষ চিঠি রয়েছে। কবির পলাতক বন্ধু বুজুর সাথে আর দেখা হয়নি।

চিঠিতে বুজু লিখেছে, বুজু আসলে আমেরিকাতে প্রফেসারি করে না। আর পাইলট বলে যাকে কবির কাছে পাঠানো হয়েছে, সে-ও পাইলট নয়। সবকিছুই সাজানো নাটক। বুজু ব্যক্তিগত জীবনে নাটক করাকে বেশ পছন্দ করতো। সেই অভ্যাসটাই তার রয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত। নাটক করে করেই তার জীবনের ইতি টেনেছে সে। একটি নাটক দেখতে যেয়ে কবির সাথে তার দেখা। সে কবির পাশে বসেই নাটক দেখেছে। তার পরিবর্তিত বেশভুষা দেখে দশ বছর আগের বুজুকে কবি চিনতে পারেননি। কিন্তু বুজু ঠিকই কবিকে চিনতে পেরেছে।

বুজু কলকাতাতেই পলাতক ছিল ছদ্মবেশ ধারণ করে। অতীত জীবনে বুজু অনেক নারীর সংস্পর্শে এসেছে, মদ খেয়েছে, অনেক কু-কাজ সে করেছে। কিন্তু চিঠি লেখার সময়ের বুজু আর আগের বুজুর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। চিঠির বুজু অনেক বেশি মানবদরদী। অবহেলিত মানুষরাই এখন তার আপনজন, আত্মার আত্মীয়, তাদেরকে নিয়েই তার বসবাস। এখন সে কুঁজোর ঠাণ্ডা জল খেতে চায়, খাঁটি দুধ খেতে চায়। তার বন্ধু কবিকে তার 'খাঁটি দুধ' মনে হয়, তাই সে তার কাছে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে।

চিঠিতে সে লিখেছে প্রকৃত প্রেমের নানা সামাজিক রূপ, যেমন: মা-ছেলে, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, প্রণয়-প্রণয়ী, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধবী; আসলে সব প্রেমই এক যদি সেটা খাঁটি হয়। 'অনেকটা খাঁটি সোনার মতো, গয়নার চেহারা যা-ই হোক।' (পৃ. ৬৮৯) বউদির প্রশংসা করে বলেন, 'এই বউদিরা আমাদের সমাজের এক একটি বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠান, নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন যদিও, ... ভিতরে কিন্তু খাঁটি সোনা।...ওরাই মধ্যবিত্ত সমাজের ধারক, বাহক, রক্ষক – যে সমাজ থেকে বাংলাদেশের প্রতিভাদ্যুতি সারা জগতে বিকীর্ণ হয়েছে সেই সমাজ ওদেরই স্তন্যসূধা পান করে বেঁচে আছে এখনও।' (পৃ. ৬৯২) বুজু ও কুশলার মেলামেশাকে বউদি ভালো চোখে দেখেনি, বউদি তাকে ডেকে বলেছে, কুশলার সাথে তার বিয়ে কোনো দিনও সম্ভব নয়। অমিলার বিষয়ে লিখেছে, তাকে অনেক ভালোবাসতো অমিলা, যে কি-না এখনও গোপনে তার খবর রাখে। বাবার বিষয়ে বলেছে – তার বাবার কাছ থেকে স্নেহ পায়নি সে, মানুষ যেভাবে কুকুর পোষে তার বাবাও তাকে সেভাবে পুষেছে মাত্র। তাই ভরণ-পোষণসহ সব খরচ হিসেব করে দশ হাজার টাকা সে বাবাকে দিয়ে দিয়েছে। সেই দশ হাজার টাকা জোগাড় করেছিল – পরীক্ষক থাকাকালীন এক ধনীর ছেলেকে প্রশ্নপত্র বলে দিয়ে, আর কিছু অযোগ্য ছেলেকে ভালো নম্বর দিয়ে এবং রোজগার করে। কলেজের দশ হাজার টাকা চুরি করেছে। অমিলার স্বামী কলেজের এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রভাবশালী সদস্য হোমরা-চোমরা লোক তাকে রক্ষা করতে পারতো কিন্তু করেনি কারণ এক সাংস্কৃতিক জলসায় অমিলাকে কটুক্তি করে সবার সামনে তাকে চরম অপমাণিত করেছে বুজু। তাই তিনি পুলিশে খবর দেন। এদিকে আবার অমিলাই তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে তাকে আত্মগোপন করে থাকতে বলে। বুজু কড়া ভাষায় একটি রেজিগনেশন লেটার অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে আত্মগোপন করে একটা হোটেলে আড্ডা গাড়ে দিন কয়েকের জন্যে। এখানে এসে বুজু তার

স্বভাববশত একটি নাটক করে, পঞ্চাশটি পোস্ট কার্ড পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত পঞ্চাশ জনকে পাঠিয়ে দেয়। কার্ডে সে লিখেছে, আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে দেশ ছেড়ে যাচ্ছে সে।

এদিকে নিজ দেশে ছদ্মবেশে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় হোটেলে তার বক্তৃতা শুনে এক ছেলে তার ভক্ত হয়ে যায়, নাম জীবন পতিতুণ্ডি। ছেলেটির ক্ষেন্তি নামে একটি বোন আছে, সে খোঁড়া। গলির ভিতরে ভাঙাচোরা একতলা বাড়ি, একটা নোংরা বস্তির মধ্যে থাকে দুই ভাই-বোন। বুজু তার আত্মগোপন থাকার পুরো ঘটনা তাদের বিস্তারিত বলে এবং তাদের বাড়িতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার সম্মতি পায়। এদিকে জীবন পতিতুণ্ডিরা পূর্ববঙ্গে থাকাকালীন রায়টের সময় জীবন বাঁচাতে রাম দা নিয়ে ক্ষেন্তি বিপক্ষের সাথে লড়েছিল। রক্তারক্তি অবস্থার একটা পর্যায়ে ক্ষেন্তি অজ্ঞান হয়ে পড়লে ভাই পতিতুণ্ডি বোনকে কাঁধে করে একটি জঙ্গলের ভিতর পালিয়ে থাকে। ক্ষেন্তির গায়ের গহনা বেঁচে তার চিকিৎসা করে পতিতুণ্ডি। হাঁটুতে প্রচণ্ড আঘাত লাগায় তখন থেকে ক্ষেন্তি ন্যাংচে ন্যাংচে হাঁটে। তাদের বাবা অসহযোগ আন্দোলনের সময় পুলিশের লাঠির আঘাতে মারা যায়। মায়ের জেল হয়। অবর্ণনীয় কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছে তারা। সেই কথাই পতিতুণ্ডি বলে বুজুকে –

> আমরা দেশের জন্য গৃহহারা নিঃস্ব হয়ে গেলাম। ... তেল দিতে পারি না বলে একটা চাকরি জোটে নি – অথচ যারা দেশের জন্য কিছুই ত্যাগ স্বীকার করেন নি তাঁরাই আজ লাট-বেলাট। ভি আই পি হিসেবে আজ যাদের নাম খবরের কাগজওয়ালারা ছাপতে পেলে নিজেদের ধন্য মনে করে, স্বদেশি আন্দোলনের সময় তাদের নাম পর্যন্ত শোনা যায়নি। শুনতে পাই, অনেকে নাকি জেল খেটেছে। আমাদের যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তার তুলনায় প্রথম শ্রেণির বন্দি হয়ে জেল খাটা স্বর্গবাসের তুল্য। তবে ওসবের জন্য আমার ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। খানিকটা স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, তাকে ভালো করে আমরাই আবার দেশের মঙ্গলের জন্য তৈরি করে নেব। আমাদের কষ্টের জন্য আমরাই দায়ী। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন–এ আমার এ তোমার পাপ। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হবে। করছিও –। (পৃ. ৭১৩-১৪)

উপরিউক্ত বর্ণনায় স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের প্রকৃত অবস্থাই উঠে এসেছে। এর জন্যে ভারতবাসী নিজেদের দায়ী করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার অনুশোচনার কথা বলেছেন।

পতিতুণ্ডি বিজ্ঞানের ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তদবিরের জোরে চাকরি না জোটায় কুলিগিরি করে। পাশাপাশি দেশের কথা মানুষের কথা ভেবে একটি আখড়া গড়ে তুলে সে। সেই আখড়ায় তার সহকর্মী কুলি-মজুর ফেরিওয়ালা জাতীয় লোক। এ জাতীয় লোকদের সে বিজ্ঞানের নানা রকম গল্প শোনায়। গ্রেগরি সাহেবের ডিসকভারি বইটা থেকে অনেক গল্প শুনিয়েছে সে। তারাও অকৃত্রিম কৌতূহল নিয়ে শোনে। তাদের জন্য আরও অনেক কিছু করার ইচ্ছে আছে তাঁর। প্রাইভেট টিউশনি করে বুজু, পতিতুণ্ডি করে কুলিগিরি, ক্ষেন্তিও দু'জায়গায় কাজ করে, এভাবে আয় রোজগার করে ভাই-বোনের পরিবারে বুজু একজন সদস্য হয়ে উঠে – তারা এক নীতিতে চলে। পাড়ার বাউল সাঁইবাবা

পতিতুণ্ডির তৈরি বোমা 'বেল' নামে বস্তির গলিতে গলিতে গোপনে ছাত্রদের বিলি করে, দশরথ, ভরথা, মিনুবাবু, রোখোন মিশির, ভোজুয়ার মা – সবার সাথে পরিচয় হয় বুজুর। অমিলা সম্পর্কে লিখেছে, সে তার স্বামীকে ছেড়ে দিয়েছে, তার যে একটি আলাদা সত্ত্বা আছে সেটা তার স্বামী বুঝতে চায় না, মানতে চায় না। অমিলা বুজুর কাছ থেকেও দূরত্ব বজায় রেখে চলছে। বুজুকে সে একটি চেক বইয়ের প্রতি পাতায় সই করে পাঠিয়ে দিয়েছে পাইলট মুখার্জির (জীবন পতিতুণ্ডির ছদ্ম নাম) হাত দিয়ে, তার একাউন্টে ৪৫ হাজার টাকা আছে। বুজু যেন অর্থ কষ্টে না থাকে তাই অমিলা তার সব টাকার সত্ত্বাধিকার দিয়ে দেয় তাকে।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে পাণ্ডুলিপির কাহিনি। বুজু পাণ্ডুলিপিতে তাদের কথা লিখেছে যারা সর্বক্ষণ তাকে ঘিরে রেখেছে। তাদের এত রং, এত রূপ, এত বৈচিত্র্য, তাদের চরিত্রের এত দিক সবকিছু মিলিয়ে এসব মানুষের ভিতরের প্রচ্ছন্ন মহিমাকেই সে উদ্ভাসন করার চেষ্টা চালিয়েছে। বুজুর মতে, তাদের সাথে না মিশলে তাদের পুরোপুরি বোঝা সম্ভব হবে না। পান্ডুলিপির শেষে 'দ্বিতীয় চিঠি' পাঠাবার কথা বলা আছে, সেই চিঠিতে কবিকে নিমন্ত্রণ করা হবে। কবি যদি আসেন তাহলে বুজুর সাথে দেখা হবে না ঠিক, কিন্তু উপর তলার মানুষ এতোদিন যাদের ঘৃণা করে এসেছে তাদের মহিমা দেখতে পাবে।

কবির টেবিলে উপর রাখা চিঠি আর পাণ্ডুলিপিটা না থাকায় নেই। খোঁজাখুঁজির পর বোন কুশলার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। এদিকে বুজুর চিঠি পড়ে সব জেনে যায় কুশলা, অগ্নিমূর্তি ধারণ করে সে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে কবিকে লেখা বুজুর দ্বিতীয় চিঠি। বুজু ও তার সাঙ্গপাঙ্গ মিলে বর্তমানের (তৎকালীন) রাবন অর্থাৎ কালোবাজারিকে শেষ করার পরিকল্পনার ম্যাপও দেয়া আছে ওই চিঠিতে। দ্বিতীয় চিঠিটি কবির পড়ার আগেই কুশলা পড়ে রাবন-বধ মঞ্চে যেয়ে হাজির হয়। কবিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখেন, সব ঘটে গেছে, রাস্তায় অনেক লাশ পড়ে রয়েছে। কুশলার মৃতদেহটি একটি জীর্ণ-শীর্ণ-গোঁফ দাড়িওয়ালা মরা লোক অর্থাৎ বুজুর পাশে পড়ে রয়েছে – এই বুজুকে রাস্তার মানুষেরা মহাপুরুষ নাম দিয়েছে। অজ-মুণ্ড রাবণটা তখনও ল্যাম্পপোস্টে ঝুলছে। পরের দিন খবরের কাগজে বেরিয়েছে, দোষী ধরা পড়েছে। অমিলা চৌধুরী পুলিশ কমিশনারের কাছে যেয়ে আত্মসমর্পণ করেছে – রাবণ-নাশের মূল হোতা সে।

বনফুল চিকিৎসাসূত্রে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের যে প্রচ্ছন্ন মহিমা অবলোকন করেছেন তাদের তিনি সাহিত্যে রূপদান করেছেন। বনফুলের বেশ কয়েকটি উপন্যাসে কালোবাজারিদের কথা বলা হয়েছে, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য কোনো অবদান রাখেনি বরং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশটাকে তারা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। এই রাবণরূপী কালোবাজারিদের রাহুর গ্রাস থেকে দেশের প্রাণ ফিরিয়ে আনতে হবে, এইসব রাবণের পরিণতির প্রতিও ইঙ্গিত দিয়ছেন ঔপন্যাসিক। বুজু লিখেছে–'এ যুগে কালোবাজারিই রাবণ। তার সঞ্চিত বিপুল ঐশ্বর্যের প্রতাপে রাষ্ট্র,

সমাজ, ব্যক্তি, ব্যাষ্টি, রাজনীতি, সাহিত্য বস্তুত মানব সভ্যতার সব কিছু ভীত, অভিভূত। সে টাকা দিয়ে সব কিছু কিনতে পারে, সব কিছু কিনতে চায়। তার কামনা অসতী রমণীকে ভোগ করেই তৃপ্ত নয়, সতী রমনীকে সে ধর্ষণ করতে চায়।' (পৃ. ৭৭৯)

এ উপন্যাসে যেসব অন্ত্যজ মানুষের চরিত্রগুলো উঠে এসেছে তারা চোর, পকেটমার বোমারু হলেও তাদের ভিতর প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ভালো কাজের সদ্বিচ্ছা। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা প্রত্যেকেই স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। তারা কেউ পকেটমার, কেউ রাস্তা থেকে কুড়িয়ে খাওয়া মানুষ, কেউ চোর, কেউ বাউল, কেউ উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু ভাগ্যদোষে বস্তির বোমারু কিন্তু প্রতিটি চরিত্র সৎ মহিমায় উদ্ভাসিত। সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ তাদের লাঞ্ছিত করে আসছে সব সময়। চরিত্র আলোচনায় বিষয়টি স্পষ্ট হবে আশা করা যায়। শুরুতে প্রধান চরিত্র বুজুর কথায় আসা যাক। সে উচ্চ-শিক্ষিত, চারিত্রিক স্খলন কাটিয়ে হঠাৎ সে ভালো পথে আসে। এ লক্ষ্যে সে বস্তিতে এসে আস্তানা গারে। চরিত্রটি মধ্যবিত্ত ও অন্ত্যজ – দু'শ্রেণির বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বুজু বস্তিবাসীদের সবরকম সহায়তা করে, তারাও তাকে মানে, তাকে ভালোবাসে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, পয়সাওয়ালা, রাস্তার লোক, ধান্দাবাজ অর্থাৎ যারাই তার সংস্পর্শে এসেছে তাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়ে তাদের প্রচ্ছন্ন মহিমাকেই সে আবিষ্কার কওে চলেছে।

সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় টিউশনি করে সংসার চালায় এবং কিছু অর্থ সে দরিদ্র মানুষদের জন্যে স্কুল করার কাজে জমা রাখে। রাস্তার লোক শীতল। রাস্তা থেকে কাচের টুকরো, ভাঙা খেলনা, সুন্দর ছুরির বাট, টিনের কৌটা, আয়নার টুকরো, রঙিন ফিতে, বাঁশি এসব কুড়িয়ে এনে সে বস্তির ছেলেমেয়েদের দেয়। বস্তির ছেলেমেয়েরাও তাকে ভালোবাসে। মাঝে মাঝে সে সামনে চলার স্লোগান দিয়ে তাদের নিয়ে মিছিল করে – উদ্দেশ্য কিছুটা সময় আনন্দে কাটানো। আরেকটি কাজ সে করে, রাজলক্ষ্মী ঠাকরুনের গোদ-ওলা পায়ে তেল মালিশ করে দেয়, বিনিময়ে তার বাড়ির বারান্দাটায় ঘুমাতে পারে। রাস্তা থেকে পয়সা পেলে তা বুজুকে দেয়, স্কুল ফান্ডের জন্যে। বুজু বুঝতে পারে শীতল 'সব পেয়েছি' দেশের লোক। বর্তমান যেমনই হোক, বর্তমানকে নিয়েই সে সন্তুষ্ট। পকেটমার ভর্থা পকেট মেরে পাওয়া একটি রঙিন পার্স গুরুজি বুজুকে দিয়ে বলে স্কুল ফান্ডের জন্য সে চাঁদা এনেছে। ভর্থার টাকার বিষয়ে তেমন আগ্রহ নেই, সে জানে না পার্সে আসলে কত টাকা ছিল। বুজুকে টাকার হিসাব দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে সে বলে – 'জুয়া খেলি, সিনেমা দেখি। ... আর আমাদের ওস্তাদ রোখোন মিশিরকেও দিতে হয় রোজ দু'টাকা করে। ধরা পড়লে ওই আমাদের বাঁচায়। ও নাকি পুলিশকে ঘুষ খাওয়ায়। পুলিশরা নাকি আবার তাদের উপরওয়ালাদের খাওয়ায়। আমাদের পকেট-মারার টাকা সবাই ভাগাভাগি করে নেয়। আমরা চোর আর সবাই সাধুপুরুষ।' (পৃ. ৭৩৯)। বুজুর কাছ থেকে গল্প শুনে মুগ্ধ হয়ে সে গুরু মেনেছে তাকে। ডাইভার জগজিৎ, বুজুর ব্যাঙ্কার। স্কুল ফান্ডের সব টাকাই তার কাছে জমা রাখতো বুজু। একদিন জানা গেলো জগজিৎ ব্যাঙ্কে টাকা

জমা না রেখে এক কালোবাজারির কাছে জমা রাখতো। কালোবাজারি ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যে সব টাকা মাটিতে পুঁতে রাখতো। বেশি সুদের আশায় জগজিৎ তার কাছে টাকা রেখেছিল। একদিন মাটির নিচের সব টাকা চুরি হয়ে যায়। ঘটনাটি জগজিৎ বিশ্বাস করেনি, তথাপি বুজুকে সে খবরটি জানায় এবং তাকে আশ্বস্ত করে, যেমন করেই হোক তার সব টাকা সে ফেরত দেবে। ওইদিন বিকালে জগজিৎ তার স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে তিন হাজার টাকা এনে বুজুকে দিয়ে বলে এর বদলা সে নেবে। জগজিৎ ঘটনার মারপ্যাঁচে পড়ে গেছে। কিন্তু সে কর্তব্য-কর্মে সৎ, তাই সে স্কুল ফান্ডের টাকা ম্যানেজ করে এনে দেয়। টাকা উদ্ধারের সূত্র ধরে বেরিয়ে আসে কালোবাজারির এজেন্ট রোখোন মিশিরের নাম, বুজু তার কাছে যায়, তাকে বোঝায় এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে আসতে আহ্বান করে। এদিকে, ফেরিওয়ালা রোখোন কালোবাজারি সম্পর্কে সব তথ্য দিয়ে বুজুর দলে নাম লেখায়। এতোদিনের ভুল শুধরে নিয়ে সে বুজুকে বলে–'মাস্টারমশাই, আমি পাপী হতে পারি মূর্খ হতে পারি, কিন্তু আলোকে আলো বলে চিনতে আমার ভুল হয় না কখনও। আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার সাহস পাই নি, কিন্তু আপনি যে পূণ্যাত্মা মহাপুরুষ এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।... আপনার পূণ্যের চুম্বক আমার পাপের লোহাকে টেনে বার করে নিলে।' (পৃ. ৭৫৯) রোখোনের দলের আরেকজন ছিল মিনুবাবু যে কালোবাজারিকে নারী সরবরাহ করে। বুজুর সাথে কথা বলে প্রভাবিত হয়ে সে-ও রোখোনের মত নরক থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। কথাবার্তার এক পর্যায়ে সে বুজুকে বলে–'আমার তো আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। পেটের জন্যে এই নরকে ঘুরে বেড়াতে হয় আমাকে। অথচ আমি কত বড় বংশের ছেলে। বাবা অধ্যাপক ছিলেন, ঠাকুরদাদা ছিলেন একজন সিদ্ধ যোগী–' (পৃ. ৭৭৩) তিন পেগ খেয়ে টালমাতাল অবস্থায় মিনুবাবু কালোবাজারি রাবনের ঠিকানাটা বলে দেয়। সোনা তেজোদীপ্ত আঁটসাঁট যৌবনা সব সময় সাথে একটি ছোরা রাখে। বাড়িতে বাড়িতে ঝি-গিরি করতে তার আর ভালো লাগে না। লেখাপড়া শিখে বাইরের বড় আকাশে উড়ে বেড়াতে চেয়েছিল সোনা। সে পথেই সে হাঁটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। বাইরের আকাশের শকুনিরা তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে, সেও প্রাণ দিয়ে তাদের প্রতিহত করেছে। এক ভদ্রলোকের বাড়িতে এক নারী-খাদককে ছোরা মেরে খুন করে সোনা। বুজুর বস্তির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যও তাই – এ যুগের বারণকে যেকোনো মূল্যে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করতে হবে। জীবনকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায় তার বাড়িতে তল্লাশী চালায়। জীবনের বোন ক্ষেন্তি পুলিশের কাঁধে বঁটি'র কোপ বসিয়ে দেয়। তাকেও থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জীবনের ঘরের সামনে ভিড় জমে যায়। সেই ভিড় ঠেলে বস্তির বাড়িওয়ালি রাজলক্ষ্মী এসে বুজুকে উদ্দেশ্য করে বলে–'আমরা প্রাণ দিয়েও এর জবাব দেব। আপনি আমাদের আগ বাড়িয়ে নিয়ে চলুন। সোনাকে আমরা সবাই ভালোবাসতুম।' (পৃ. ৭৭৭) ভর্থা, ভুতুম, দশরথ, রোখোন মিশির, ভজুয়ার মা, নবুর মা, রিকশাওয়ালার দল, ময়না, দর্জি নাপিত, মুচি, রমজান, কিকনি আরও বহুলোকের ভিড় – সবার চোখে

জ্বলন্ত দৃষ্টি। অন্যায়কে তারা কোনোভাবেই মেনে নেবে না। তারা প্রাণ দিয়ে রাবণরূপী কালোবাজারিদের প্রতিহত করবে, যেমন করেছিল সোনা। আর এখানেই কাহিনির মোদ্দা কথা নিহিত রয়েছে।

১.১৪

বনফুলের জীবনের শেষ দিকের রচনা *অধিকলাল* (১৯৬৯) উপন্যাসটি। বনফুলের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি, দেখার ভিন্নতা, তাঁর রুচির বিচিত্রতা, তাঁর গল্প উপন্যাসে লক্ষণীয়। যেমন বিষয় তেমনি রচনা কৌশলের আলাদা বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে তিনি সতত পরীক্ষা-প্রবণ শিল্পী। তাঁর লেখার এই বিশেষ গুণটির জন্যে তিনি গল্প, উপন্যাস, নাটকে অনন্যতায় আসীন হয়েছেন। সংখ্যা এবং গুণগতমান উভয় দিক থেকেই স্মরণী-বরণীয় সাহিত্যিক তিনি। চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য সৃষ্টির কাজে অনেকটা সময় ব্যাপৃত ছিলেন। চিকিৎসা সেবা এবং সাহিত্য সৃষ্টি–দুটো বিষয়ই অভিজ্ঞতাপ্রসূত, সময় ও স্থানসাপেক্ষ। তাই কল্লোল যুগের লেখক হয়েও সেযুগের লেখকদের বৈশিষ্ট্যের কাতার থেকে কিছুটা সরে দাঁড়িয়ে স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন বনফুল। এ সম্পর্কে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার ড. অসীম কুমার মুখোপাধ্যায় বনফুল সম্পর্কে বলেছেন – 'সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক। তাঁর হাটা চলা কাজ কর্ম আচার ব্যবহারে এমন একটা ঋজুতা ছিল যা যে কোন লোককে অবাক করে দিত।' (অসীম কুমার, ২০১১: ৩৫)। বনফুলের *অধিকলাল* উপন্যাসটির বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবিদার।

নাম-পুরুষে রচিত *অধিকলাল* উপন্যাসটি বিহারের নিম্নশ্রেণির অচ্ছ্যুত দোসাদ জাতের একটি পরিবারের কাহিনি। উপন্যাসে উক্ত পরিবারের জীবন সংগ্রাম, মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, সৎ পথে অর্থোপার্জন, অন্যায়কে মেনে না নেয়া, পরিবারের বন্ধন অটুট রাখার চেষ্টা, অন্যের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া, শ্রমের বিনিময়ে সুবিধা ভোগ, স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্বত্র অসাধুতা, মূল্যহীনতা,স্বার্থপরতার রাজ্যে সততাকে ধরে রাখতে সরকারি চাকরিতে জবাব দিয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তন এবং ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে ভালো মানুষ করে গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে নতুন করে পথচলা – এই বিষয়গুলো উঠে এসেছে। পাশাপাশি উঠে এসেছে নিবেদিত ডাক্তার পরিবারের অবদান, আরও আছে বাস্তবের কষাঘাতে জর্জরিত চাকরের অসদুপায় অবলম্বন করে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার কাহিনি। যেহেতু বিহারের কাহিনি এবং সেখানকার ভাষা হিন্দি তাই উপন্যাসেও দুরকম ভাষা বাংলা ও হিন্দি ব্যবহৃত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় চরিত্র অধিকলাল দোসাদের ছেলে, বাবা-মা দিনমজুর। দুই ভাই. দুই বোন, চার ভাই-বোনের মধ্যে অধিকলাল সবার বড়। বাবা তার বন্ধু রামগোবিন পাড়ের চাকরি করে। রামগোবিন রাতের বেলায় স্টেশনের

'সাইডিং' এ রাখা মালগাড়ির বস্তাগুলো ফুটা করে প্রতি বস্তা থেকে ধান, গম, আটা, ময়দা চার/পাঁচ সের করে সরিয়ে রেখে বস্তার ফুটা সেলাই করে রাখে – এটাই তার ডিউটি। চোরাই মাল সে সমুন্দরির কুঁড়ে ঘরে রাখে। নিজের ঘর না থাকায় সমুন্দরির স্বামী সমুন্দরির ঘরে থাকতো, তাই সে চোরাই মাল রাখার বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করতে সাহস করতো না, তার ওপর সমুন্দরি ছিল প্রচণ্ড জেদি প্রকৃতির। কিন্তু তাদের বড় ছেলে অধিকলাল এই বিষয়টিকে মোটেও ভালো চোখে দেখতো না। ছোট বেলা থেকেই মনে মনে এই কাজটিকে সে ঘৃণা করে আসছে। কিন্তু বাবা-মার মুখের উপর কিছু বলতে তার ইচ্ছে করেনি। বাবা রামগোবিনের চাকরি করে। রামগোবিন অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করে আশপাশের অনেক জায়গা কিনে নতুন করে ব্যবসা শুরু করে। রামগোবিনের ভাগ্যদেবতা তার উপর প্রসন্ন ছিল। সে যে-কাজেই হাত দেয় তাতেই সফলকাম হয়। সে স্টেশনে বড় বড় কন্ট্রাক্ট নিতে শুরু করে ঘুষ দিয়ে। জমির উপর জমি কিনতে থাকে। অসহায়দের ঋণ দেয় কিন্তু ঋণ শোধের তাগাদা দেয় না মাঝে মাঝে টাকা কেটে রাখে – এইটুকুই। অনেক লোকের কর্মসংস্থানও হয় তার অধীনে। এসব সুযোগ-সুবিধার কারণে কেউ তাকে ছেড়ে যেতে চায় না। প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে উঠে সে। একটি পাকা বাড়িও তৈরি করে জমির উপর। সে বাড়িতে তার স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে বসবাস শুরু করে সে। ওই বাড়ির বারান্দার একধারে বসে অধিকলাল পড়ালেখা করতো। রামগোবিনের ছেলে তাদের বাড়িতে নোকরের ছেলের পড়ালেখার ব্যাপারটি মেনে নিতে পারেনি। তাকে তিরস্কার করায় তাৎক্ষণিকভাবে সে সেখান থেকে উঠে এসে একটি গাছতলায় বসে পড়ালেখার কাজ করে। ঠিক এসময় গ্রামের খ্যাতিমান ডাক্তার তপনকান্তি ঘোষের ছেলে-মেয়ের সাথে দেখা হয় তার। পরে তারা বুঝিয়ে অধিকলালকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে। ডাক্তার বাবু এবং তার স্ত্রী ভগবতী অধিকলালকে সানন্দে গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকলাল কাজের বিনিময়ে থাকার শর্ত আরোপ করে। ফলে ডাক্তার তাকে তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরি দেখাশোনার কাজ দেয়। অধিকলাল এ কাজ পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়। সে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে থাকে পুরোদমে আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার একজন ভক্ত পাঠক হয়ে উঠে। ভালোবেসে সবাই তাকে খুদরু বলে ডাকে। যেকোনো সমস্যা বা কোন চিন্তায় পড়ে গেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন স্মরণ করে প্রশান্তি লাভ করে খুদরু। প্রতিদিন ডাক্তারের কথামত সে তার বাবা-মাকে যেয়ে প্রণাম করে আসে। এভাবে একদিন অধিকলাল মাইনার পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং মাসিক চার টাকা করে বৃত্তি পায়। ডাক্তারবাবু তাকে সাহেবগঞ্জের স্কুলে আর সেখানকার বোর্ডিংয়ে ভর্তি হতে বলেন। টাকা না থাকার দরুন সে প্রথম দিকে বোর্ডিয়ে ভর্তি হতে চায়নি। তাছাড়া সে অন্যের পয়সা পড়ালেখা করতে আগ্রহী নয়। তার এমন জেদ দেখে তার মা তার সব গহনা এনে ডাক্তার বাবুর কাছে বন্ধক রাখে। যাই হোক অধিকলাল বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হয়। কিন্তু সেখানে প্রথম দিনেই খেতে বসে জাতপাতের সমস্যায় পড়তে হয় তাকে। অধিকলাল দোসাদের ছেলে বলে তার সাথে বসে খেতে

আপত্তি জানায় এক ছাত্র। অধিকলাল বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নিলেও বোর্ডিয়ের চাকর রণছোড় এর প্রতিবাদ করে। ফলে সেই ছাত্রটিকে বোর্ডিং থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় আবার অধিকলালেরই অনুরোধে তাকে বহাল রাখা হয়। এবং অধিকলাল প্রতিদিন সবার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে আহার সম্পন্ন করে। এখানে উল্লেখ্য, অধিকলালের বোর্ডিংয়ের মাস্টারমশায়দের মধ্যে বনফুলের বোর্ডিংয়ের মাস্টারমশায়ের প্রতিফলন লক্ষা করা যায়। অধিকলাল সব বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে সোনার মেডেল পায়।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার পর অধিকলালের বিয়ে হয় বার তেরো বছরের ফুলেশ্বরীর সাথে। ফুলেশ্বরীর চোখ ট্যারা সত্ত্বেও তাকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করে অধিকলাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থান অধিকার করে অধিকলাল কুড়ি টাকা বৃত্তি লাভ করে। দুটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে আবারও মেডেল পায় সে। সে মির্জাপুর স্ট্রিটের একটি মেসে উঠে। সেখানে তার বোর্ডিংয়ের বন্ধু জ্ঞান বসাক ছিল। কিন্তু আনন্দের বিষয় হলো, বোর্ডিংয়ের আরেক বন্ধু যোগেনের মেস এটি। যে যোগেনকে টাকা চুরির অপরাধে বোর্ডিংয়ে এসে তার বাবা সবার সামনে পিটিয়েছিল। কিন্তু অধিকলাল চুরির অপবাদ নিজের স্কন্ধে নিয়ে তাকে সেদিন সম্মানে বাঁচিয়েছিল। এরা ছাড়াও অধিকলালের প্রকৃত বন্ধু ছিল দুজন – একজন বাংলাদেশের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আরেকজন আমেরিকার আব্রাহাম লিংকন। যখনই সে কোনো বিপদে পড়তো তখনই ভাবতো এই রকম বিপদে পড়লে বিদ্যাসাগর বা আব্রাহাম লিংকন কী করতেন। আর ভক্তি করতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তার সকালটা শুরু হত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। লক্ষণীয়, রোজ সকালে বরীন্দ্রনাথের একটি কবিতা পাঠ করে সে পড়াশোনা আরম্ভ করতো। তার পছন্দের এবং প্রতিদিন সকালে পড়া একটি কবিতার চারটি লাইন –

হে মোর চিত্ত পূণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে। (পৃ. ৩৮২)

টাকার সংকুলান না হওয়ায় সে মেসের খাওয়া ছেড়ে দেয়। প্রাইভেট টিউশনি করে ভাই আজবলালকে পড়ালেখার টাকা পাঠায় সে। অধিকলালের মাতৃভাষা হিন্দি হলেও বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় তার দখল ছিল। একবার সে বাংলায় একটি কবিতা লিখে। কবিতাটি অনেক প্রশংসা কুড়ায়। বন্ধু যোগেনের অনেক অনুরোধে সে কবিতাটি পত্রিকাতে ছাপাতে রাজি হয়। কবিতাটি যোগেনকে দিয়ে সে অনেক রঙিন কল্পনায় ভেসে বেড়ায়। যোগেন কবিতাটি একজন সম্পাদকের কাছে দিয়ে আসে। কিন্তু অধিকলালের রঙিন স্বপ্ন সাদাকালো হয়ে যায়। তার কবিতাটি একজন চুরি করে নিজের নামে ছাপিয়ে দেয়। এরপর থেকে অধিকলালের সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন ভেঙে

যায়। কবিতা লেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে সে। তার মধ্যে ধারণা জন্মে, সাহিত্যের জগতেও চোর, বাটপার, পকেটমার আছে। সেখানেও অসাধুদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়। অধিকলালের সাহিত্য-প্রীতির বিষয়টির মাধ্যমে বনফুল তৎকালীন সাহিত্যের অবস্থাকে তুলে ধরেছেন।

অধিকলাল সসম্মানে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর কিছুদিন পরেই তার বাবা পরলোকগত হয়। বাবার মৃত্যুর সংবাদ শুনে অধিকলাল বাড়িতে এলে রামগোবিন তাকে মাস্টারি করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু মা সমুন্দরি তাতে সায় দেয় না। মায়ের ইচ্ছে ছেলে হাকিম হবে। এদিকে অধিকলালের ছোট ভাই আজবলাল লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে রামগোবিনের শিষ্য হয়ে রাজনীতির দলে নাম লেখায়। আজবলাল আর রামগোবিন মিলে দুর্নীতি করে পুরোদমে। অধিকলাল আই এ এস পরীক্ষায় উচ্চস্থান নিয়ে পাস করে। পরবর্তী সময়ে দিল্লীতে ট্রেনিং নিয়ে দু'বছর পর সে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে পূর্ণিয়া জেলাতে আসে। ডাক্তার তপনকান্তি ঘোষের ইচ্ছে ছিল অধিকলাল পূর্ণিয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলে গ্রামে একটি সভা করে তাকে অভিনন্দন জানাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তার বাবুর সাথে তার দেখা হয় না। এদিকে আজবলাল নির্বাচনে দাঁড়িয়ে দুর্নীতি করে মন্ত্রিত্ব পায়। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতের রন্দ্রে রন্দ্রে দুর্নীতি, মূল্যহীনতা, স্বার্থপরতা, চাকরিতে যোগ্যদের অবমূল্যায়ন – এই বিষয়গুলো সৎ, নিষ্ঠাবান অধিকলালকে খুব পীড়া দিয়েছিল। চাকরিক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি দেখে অধিকলাল বুঝতে পারে এই দুর্নীতির রাজ্যে তার মত লোকের বসবাস সঙ্গীন নয়। তাই সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে গরীব ছেলেমেয়েদের মানুষ করে গড়ার লক্ষ্যে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে।

বনফুলের বেশিরভাগ উপন্যাসের সমাপ্তি হয় আশার আলো ছড়িয়ে। *অধিকলাল*, *মানসপুর*, *ভুবনসোম*, *অগ্নিশ্বর*, *অধিকলাল* এ দেখা যায়, ক্ষুদ্রতর স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে মানব কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা। তাই অধিকলাল ডাক্তার বাবুর ছেলে নক্ষত্রকান্তি ঘোষ ওরফে নখুকে লেখা চিঠিতে লিখে –

> আমাদের দেশ পূণ্যভূমি। আমাদের দেশে অনেক ভালো ছেলেমেয়ে আছে, তাদের মানুষ করতে হবে। এখন শিক্ষার দোষে তারা জানোয়ার হয়ে যাচ্ছে। সেটা আমাদেরই লজ্জা, আমাদেরই অক্ষমতা। আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, ভালোবাসা, মহৎ প্রেরণা দিয়ে তাদের গড়তে হবে। তাদের জন্য সব দিতে হবে, নিঃস্বার্থভাবে আত্মত্যাগ করতে হবে, তবেই তারা মানুষ হবে।...আমি সব দিতে প্রস্তুত আছি ভাই। (পৃ. ৪১০)

বনফুল কেবল বিষয় বা রচনাকৌশলেই নবনব পরীক্ষায় সফল হননি তিনি চরিত্র সৃষ্টিতেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর চরিত্রগুলো তাঁর নিবিড় পর্যবেক্ষণের ফসল। তাই তাঁর উপন্যাসের অসংখ্য চরিত্র নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। দোসাদ জাতের চরিত্রসৃষ্টিতে অসাধারণ নিপূণতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও কৃতজ্ঞতা অধিকলালের মধ্যে আট বছর বয়স থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। তাকে যখন ডাক্তার বাবুর

ছেলেমেয়েরা তাদের বাসায় তার পড়ালেখার জন্যে ব্যবস্থা করে দেয় তখন সে ডাক্তার বাবুর কাছে যেয়ে কাজ চায়। অনেকটা জোর করেই সে ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়। তাছাড়াও সে বাড়ির অন্যান্য কাজ করে দিয়েও আনন্দ পায়। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ পড়ালেখায় সে অনেক ভালো ছিল এবং শিক্ষাকে সে অন্তরে গ্রহণ করেছে। ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, কৃতজ্ঞতাবোধ নিজের মধ্যে জাগাতে পেরেছে এবং সে অনুযায়ী সে পথ চলেছে। কিছুটা শিক্ষা সে তার সৎ বাবা রংলালের কাছ থেকেও পেয়েছে বলা যায়। অনেক ধৈর্য্য এবং সহ্যশক্তির সমন্বয়ে অধিকলাল চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন লেখক।

বনফুলের নারী চরিত্রগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বাধীন-চেতা, শিক্ষিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে থাকে। অধিকলালের স্ত্রী ফুলেশ্বরী চরিত্রটি গো-মূর্খ চরিত্র। এটি লেখকের ব্যতিক্রমধর্মী নারী চরিত্র সৃষ্টি। ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী হওয়ায় তার চালচলন ছিল মেমসাহেবের মতো। অধিকলাল স্ত্রীর বেপরোয়া ধাচের পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি। এসব কারণে ভিতরে ভিতরে সে অনেক কষ্ট পুষে রেখেছে। সে স্ত্রীকে বলেছিল – 'তুমি তো মেমসাহেব নও। এ সব করিতেছো কেন? তুমি বিহারি, তুমি তোমার স্বাভাবিক পোশাকে থাক, মাতৃভাষায় কথা বল, তাহা হইলে তোমাকে আর ভালো দেখাইবে।' (প্, ৩৯০) ফুলেশ্বরী সে কথা মোটেও কর্ণপাত করেনি। এমনকি তার অবিবাহিত সহকর্মী এস পি যোগিন্দর সিংয়ের মোটর নিয়ে ফুলেশ্বরী প্রায় ঘুরতে যেতো, তার কাছ থেকে শাড়ি উপহার নেয়। এমনকি যোগিন্দর তাকে রিভলবার ছোঁড়া শেখায় এবং একটি ভালো রিভলবার উপহারও দেয় ফুলেশ্বরীকে। শুধু তা-ই নয়, অধিকলালের অনুপস্থিতিতে বাড়িতে তার প্রবেশ ছিল অবাধ। ফুলেশ্বরী চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে – লোভ থেকে পাপ আর পাপ থেকে মৃত্যু–এই বিষয়টি উঠে এসেছে।

ডাকাতির মাল রাখার অপরাধে রামগোবিন ধরা পড়ে। অধিকলালদের বন্দকি জমির হ্যান্ডনোটটি খামে করে ম্যানেজার (মুনিমজি) তাকে ফেরত দিয়ে রামগোবিনের জামিন চায়। যে রামগোবিনের চাকরি করে অধিকলালের বাবা রংলাল এবং মা সমুন্দরিও সেই রামগোবিনের তদবিরও গ্রহণ করেনি, বিনয়ী ও সৎ চরিত্রের অধিকারী অধিকলাল। সে ন্যায়ের পথেই অটল থাকে। অধিকলাল দুবছরের জেল দেয় রামগোবিনকে। ঘুষ দিয়ে ছয় মাস পরেই সে জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু অধিকলালের কোনো ক্ষতি সে করে না। অধিকলাল যখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে এসে গরীব ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাঠশালা খোলে তখনও রামগোবিন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। সে অধিকলালকে বলে –'তুমি যে মহাত্মা লোক তাহা আমি অনেকদিন আগেই বুঝিয়াছিলাম। এখন বল কীভাবে তোমাকে সাহায্য করিতে পারি? পাঠশালার জন্য একটা পাকা ঘর বানাইয়া দিব।' (বনফুল, ২০১৩/১৩: ৪০৯) রামগোবিন চরিত্রটিও বাস্তবের নিরীখে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

স্বাধীন ভারতের পরিস্থিতি নিয়ে যে উৎকণ্ঠা ও উদ্বিগ্নতা লেখকের মনকে সর্বদা ভারাক্রান্ত করে রাখতো সে বিষয়টি অধিকলালের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে সে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনি। ঘুষের কাছে মাথা নত করতে হয়েছে। এক যোগ্য প্রার্থীকে চাকরি দিতে উপরওয়ালা মিনিস্টারকে রেকমেন্ড করে অধিকলাল। কিন্তু ঘুষ দিতে না পারায় তার চাকরিটি হয় না প্রথম শ্রেণির এম এ হওয়া সত্ত্বেও। সে পরে অধিকলালের কাছে এসে দুঃখ প্রকাশ করে বলে, 'আমি গরীব, ঘুষ দেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার। থাকলেও দিতাম না, অন প্রিন্সিপাল দিতাম না। কিন্তু মুশকিল হয়েছে–এখন কি করি। আমাদের স্বাধীন গভর্নমেন্টেও যদি সুবিচার না হয়, তাহলে বাঁচব কি করে আমরা।' (বনফুল, ২০১৩/১৩: ৩৯৬) প্রাসঙ্গিক আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য – একবার অধিকলাল একটি ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের কামরায় দাঁড়িয়ে ছিল, টিকেটার উঁকি মেরে চলে গেলো টিকেট চাইলো না কারো কাছে। টিকেট না চাওয়ার বিষয়টি অধিকলালকে ভাবিয়েছে। তদন্ত করে অধিকলাল জানতে পাওে যে, স্কুল কলেজের ছেলেদের কাছে টিকেট চাইলে তারা টিকিট কালেকটারের প্রাণ সংশয় করে। এমনকি কোনো সমস্যা হলে পুলিশ ও কিছু বলে না তাদের, কেবল মজা দেখে তারা। পরে স্কুল শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ করে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তার কাছে। দেশের অবস্থা ও পরিস্থিতি নিয়ে ছাত্রদের মাঝে ভীষণ ক্ষোভ বিরাজ করছে। এক ছাত্র তাকে বলেই বসে – বাজারে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য, কালোবাজারিদের একচ্ছত্র আধিপত্য সেখানে, কলেজে প্রতি মাসে বেতন নেয়া হয় কিন্তু পড়ানো হয় না। শিক্ষকরা ঘুষ নিয়ে খারাপ ছেলেদের বেশি নম্বর দেয়, যার টাকা আছে, লাঠির জোর আছে, তারই জয়জয়কার। ছাত্ররা আরও জানায়, দেশকে টুকরা টুকরা করে যে স্বাধীনতা আনা হয়েছে তাতে কোনো লাভ হয়নি। উদ্বাস্তুতে দেশ ছেয়ে গেছে, সবাই লুটেরা হয়েছে, তাই তারাও লুটেরা হয়েছে, বিনা টিকেটেই তারা যাতায়াত করবে। আরেকবার স্টেশনের ওয়েটিং রুমে এক ভিক্ষুকের কাছ থেকে দেশ সম্পর্কে হতাশাব্যঞ্জক কথা শুনে অধিকলাল বিমর্ষ হয়ে পড়েন। ভিক্ষা করতে লজ্জা করে কিনা–অধিকলালের এমন প্রশ্নের জবাবে ভিক্ষুক বলে, তার লজ্জা করে না কারণ দেশের বড় বড় লোকই তো ভিক্ষুক। দেশের সব লোকই হয় ভিক্ষুক না হয় চোর। গভর্নমেন্টই তো ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বনফুলের *গোপালদেবের স্বপ্ন*, ভুবনসোম, অগ্নীশ্বরসহ অনেক উপন্যাসে স্বাধীনতা উত্তর ভারতের এরূপ দূরাবস্থার কথা রয়েছে। দেশের প্রতি দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও দরদবোধ থেকেই তাঁর মন বারবার ধুকরে কেঁদে ওঠে। তাই তাঁর লেখায় ঘুরে ফিওে ভারতের দুর্দশার চিত্র উঠে এসেছে।

বনফুলের সাহেবগঞ্জের স্কুলের থার্ড মাস্টার মশায় এবং ফোর্থ মাস্টার মশাইয়ের প্রতিচ্ছবিও দেখতে পাওয়া যায় অধিকলালের শিক্ষকদের মাঝে। অধিকলালের ফোর্থ মাস্টার মশায়ের কার্যকলাপ বনফুলের ফোর্থ মাস্টার মশায় রামতারণ নসিপুরীর স্বভাব ও কার্জকলাপ একই ধরণের। বনফুলের সাথে তার মাস্টার মশায় যা-যা করেছিল

অধিকলালের এই মাস্টার মশায়ও তা-তা করে। বনফুলকে যে বইগুলো নিতে বলেছিল এবং যেভাবে পড়তে বলেছিল অধিকলালের ফোর্থ মাস্টারমশায়ও তাকে তা-ই বলেছেন। আবার বনফুলের থার্ড মাস্টার মশায়ের মধ্যে অধিকলালের জ্যামিতির হাবুল বোসের প্রতিরূপ দেখতে পাওয়া যায়। পড়ানোর ধরণও একই।

রংলাল চরিত্রটি যেনো সহজ সরল মাটির মানুষের প্রতিরূপ। সে সৎ, সততায় সে আত্মতৃপ্তি লাভ করে এবং তাতে সে আনন্দ খুঁজে পায়। সে সাদাসিদে ভদ্র গোছের লোক, কারও আগে পিছে সে থাকে না। রংলাল তার স্ত্রী সমুন্দরির বাড়িতে থাকে। তার চেয়ে তার স্ত্রীর রোজগারও বেশি। তাই সমুন্দরি কুঁড়ে ঘরে রামগোবিনের চোরাইমাল রেখে যে ভাড়া আদায় করে – তার প্রতিবাদ সে করতে পারে না। সে স্ত্রীর আদেশে বাধ্য হয়ে চোরাইমাল হাটে বিক্রি করে। আর রামগোবিনের সাথে পথে দেখা হলে মনের দুঃখে তাকে বলে 'ভাইয়া, ই সব কাম ছোড় দে।' (পৃ. ৩২৭) মেয়েদের বিয়ে দিতে সে অধিক টাকা উপার্জনের আশায় রামগোবিনের চাকরি ছেড়ে অন্যত্র কাটিহারে একটি মিলে চাকরি নেয়। মিলের চাকায় কাপড় আটকে গিয়ে তার মৃত্যু হয়।

সমুন্দরি প্রচণ্ড পরিশ্রমি নারী। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মাথায় বোঝা বয়ে বেড়ায় সে। কর্মরত অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। সে স্বাধীনচেতা নারী, পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে এবং নিজের মত করে থাকতে ভালোবাসে। ম্যাজিস্ট্রেট ছেলের বাসায় ম্যাজিস্ট্রেট মায়ের মত করে থাকতে পারবে না বলে সে ওই বাসা ছেড়ে পুনরায় গ্রামে ফিরে আসে এবং আগের মত করে কাজে লেগে পড়ে। বিধবা, একাকিনি মাকে নিজের সরকারি বাসায় ফিরিয়ে নিতে ছেলে যখন গ্রামে আসে তখন মা সমুন্দরি বলে –

> না, বেটা আমি মজুরনি। হাকিমের বাড়িতে আমি থাকিতে পারিব না। যে কয়দিন বাঁচিব 'দুখধান্দা' (দুঃখকষ্ট) করিয়া কাটাইয়া দিব। আমার তেমন দুঃখও নাই কষ্টও নাই, গতর খাটাইয়া খাই, কাহারও দুয়ারে হাতও পাতি না, কাহারও তোয়াক্কাও করি না। আমি কোথাও যাইব না, যেমন আছি তেমনই থাকিব। আমি ভালোই আছি। (পৃ. ৪০৫)

ছেলেকে প্রথম লেখাপড়া শেখানোর বিষয়ে ঘোর বিরোধীতা করেছিল কিন্তু যখন বুঝেছে ছেলে নাছোড়বান্দা লেখাপড়া সে শিখবেই এবং সে যখন সব পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করছে, বৃত্তি পাচ্ছে, শিক্ষকরা তাকে ভালোবাসছে, তার লেখাপড়া চালিয়ে নিতে সহযোগিতা করছে, তখন সমুন্দরিও লেখাপড়া করাতে আগ্রহী হয়ে উঠে। ভালোভাবে ছেলে যেন তার পড়ালেখা করতে পারে সে জন্যে সে নিজের সব গহনা মাস্টারবাবুর কাছে বন্ধক রাখে। ছেলে পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়ার জন্যে সে মানত করে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শ্বাশত মায়ের রূপটি সমুন্দরির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। একবার তিনি রংলালকে নিয়ে ছেলের বোর্ডিংয়ে যায় – উদ্দেশ্য বোর্ডিয়ের ছাত্রদের 'ছট পরব' এর প্রসাদ খাওয়ানো। কিন্তু এখানকার ছাত্ররা নীচ জাত দোসাদের প্রসাদ খাবে না, ব্যাপারটি জানতে পেরে সমুন্দরি

রেগে গিয়ে ছেলেকে বলে – 'দেবতার প্রসাদ লইয়া যাহারা জাত-বিচার করে তাহারা মানুষ নয়। দেবতার কাছে আবার উঁচা জাত নীচা জাত কি। সব জাতই সমান।' (পৃ. ৩৭৫) গঙ্গাজল ছিটিয়ে প্রসাদ শুদ্ধ করতে চাইলে তাতেও সে আপত্তি জানায়। যারা শ্রমকেই পুঁজি করে পথ চলে অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীল মানুষেরা সাধারণত অন্যের মত করে চলতে চায় না। তাই ছেলে অধিকলালের কথাও রাখেনি সমুন্দরি। নিজের মত করেই সে চলাফেরা করেছে, তার বেশভূষা বরাবরই ছিল চাকরদের মতো। এমনকি অধিকলালের বাড়িতে আসা কমিশনার সাহেবের এক প্রশ্নের উত্তরে সে বলে – তার খুশি মত সে চলে। আজীবন সমুন্দরি নিজের ইচ্ছে মতোই চলেছিল।

আজবলালের চরিত্রটিকেও বাস্তবের রঙে রাঙিয়েছেন লেখক। আজবলাল রবিন হুড টাইপের গুন্ডা। সে মদ খায়, লম্পট চরিত্রহীন কিন্তু গরীবদের মা-বাপ সে। সে ধনীদের সম্পদ লুট করে। তবে লূটের টাকা নিজে সবটা আত্মসাৎ করে না। গরীব দুঃখীদের মাঝেও বিলি করে। এই কারণে তার সুনাম আছে গ্রামে। রামগোবিনের একমাত্র ছেলে যোগীনাথ এক পতিতার বাড়িতে ছুরিকাঘাতে মারা যাওয়ার পর থেকেই আজবলাল যোগীনাথের শূন্যস্থানটা পূরণ করে। রামগোবিনের দক্ষিণ হাত হয়ে উঠে সে। আজবলাল এবং তার অনুচরদের সহায়তায় চোরাই মাল রামগোবিন বড় বড় শহরে পাচার করে। কোনো রাজনৈতিক দলকে যদি নিজের হাতে রাখা যায় তাহলে অনেক সুবিধা আছে। এই লক্ষ্যে আজবলাল একটি রাজনৈতিক দলে নাম লেখায় এবং মন্ত্রি হয়ে যায় সে। আজবলাল এবং রামগোবিন দুর্নীতিবাজ চরিত্র দুটির মধ্যেও অন্য রকম ব্যতিক্রমধর্মী সততার আলো রয়েছে।

১.১৫

বনফুল ভাগলপুরে ল্যাবরেটরি স্থাপন করে দিনে চিকিৎসা রাতে সাহিত্য-চর্চা করেন। তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় কেছেটে ভাগলপুরে অন্ত্যজ মানুষদের হাসি-কান্নায় শরীক হয়ে। এখানকার নির্জন ও নিরিবিলি পরিবেশ তার লেখার কাজকে সহায়তা করেছে। তাঁর ল্যাবরেটরিতে নিম্নবর্গের গরীব, অসহায় মানুষদের যাতায়াত ছিল বেশি। তাদের প্রতি বনফুলের ছিল অপরিসীম দরদ, ভালোবাসা ও সহমর্মিতা। *এরাও আছে* (১৯৭২) উপন্যাসের কাহিনি সরলসোজা টাইপের। এর কাহিনি – অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তারবাবু রোগী দেখে পয়সা নেন না। প্র্যাকটিসও ছেড়ে দিয়েছেন। প্রয়োজন নেই। তার বাবা যা বিষয়-আশয় রেখে গিয়েছেন আর ডাক্তার নিজে যা রোজগার করেছেন তাতেই তার বাকি জীবন চলে যাবে। তার জীবনে দুজন প্রিয় লোক, তাঁর ড্রাইভার লোচন আর মোটর মিস্ত্রী বিষুণ। তিনি হুজুগ নিয়েই মেতে থাকতে ভালোবাসেন। কখনও মোটর কারখানার মালিক হবিবের জামাই মেয়েকে নিমন্ত্রণ করে ঘটা করে খাওয়ান। কখনও পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পান্না ঝিলে গিয়ে পিকনিক করে আনন্দ পান। পিকনিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে পুরস্কার বিতরণ করেন। আবার গাজীপুরের কুমোর পাড়ায় গিয়ে সরস্বতী পুজো করে একশ কুমোরকে খাওয়ান। তাদের সবাইকে বাসন্তী রঙের চাদর উপহার দিয়ে সুখ পেয়েছিলেন

তিনি। এই ধরণের হুজুগ নিয়েই তার দিন অতিবাহিত হয়। মানুষকে ভালোবাসেন তিনি, তাদের খাওয়াতে উপহার দিতেও পছন্দ করেন। মাঝে মাঝে মাছ ধরতে বিভিন্ন জায়গায় বিলে, খালে, গঙ্গায়, পুকুরে চলে যান মোটর নিয়ে। তার সাথে থাকে ক্ষেন্তির মা, ড্রাইভার লোচন আর নটবর। আরও থাকে রান্নার জিনিসপত্র, বাসনকোসন, স্টোভ, কয়লার তোলা উনুন। যেখানে যান সেখানেই একটা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানকার আশপাশের মানুষদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। অনেক রাখাল বালকও মাঝে মধ্যে তার খাবারের সঙ্গী হয়। কারো টাকা দরকার হলে তাকে টাকা দেন, কারো কাজ প্রয়োজন হলে তাকে কাজ দেন। তবে সবই করেন ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে। অনুমান করকে থানা থেকে ডাক্তার নিজে জামিন হয়ে ছাড়িয়ে এনে পুনরায় তাকে কাজে বহাল দিলে বিষুণ সংশয় প্রকাশ করে বলেন যে, অনুমার করকে বাগানো সহজ কাজ নয়, নানারকম খেলা দেখাবে সে ডাক্তারকে। ডাক্তার আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন – 'দেখাই যাক না তোমার ভাগনা কি খেলা খেলে। দেখ দুষ্টু ছেলেদেরই আমি ভালোবাসি। ভালোবাসার জোরই তারা কাবু হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। তোমার ভাগনেও হবে।' (পৃ. ৮০২) ভালোবাসার জোরই ডাক্তারের একমাত্র ভরসা মানুষকে কাছে টানতে।

ডাক্তারবাবু মাঝে মাঝে অমিতা রায়কে চিঠি লিখতেন। অমিতা বহু আগে এই শহরে (যেখানে ডাক্তার, শশধর, বীণা, মানতি মাসিরা বসবাস করে) যখন হেডমিস্ট্রেস ছিলেন তখন ডাক্তারবাবুর প্রতি তার দুর্বলতা তৈরি হয়। শহর ছেড়ে যাবার সময় সে ডাক্তারবাবুকে প্রতিশ্রুতি দেয় চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যোগাযোগ অব্যহত থাকার। মাঝে কিছু সময় চিঠি আদান প্রদান বন্ধ ছিল। অনেকদিন পর আবার ডাক্তার অমিতা রায়ের চিঠি পেলেন। চিঠিতে অমিতা রায় নিজের বর্তমান ঠিকানা দিয়ে তার অবস্থার কথা জানান। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। যে কোনো সময় চোখের আলো নিভে যেতে পারে – এমন সংশয় প্রকাশ করেছে অমিতা। এবং ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করেছে তাকে আর টাকা পাঠিয়ে যেন বিব্রত না করেন। ডাক্তার হিরন্ময় অমিতা রায়কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে চিঠির উত্তর পাঠিয়েছেন। দিন দশেক পর ডাক্তার এলাহাবাদ যেয়ে অমিতা রায়কে বিয়ে করে নিয়ে আসেন নিজ বাড়িতে। উচ্চ মধ্যবিত্ত ডাক্তার চরিত্রটি ধনী-দরিদ্র সব রকম চরিত্রকে এভাবেই ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে ফেলেন।

ডাক্তার চরিত্রটিকে ঘিরে নিম্ন শ্রেণির যত চরিত্রের আগমন ঘটেছে যেমন, শশধর, বীণা, বিষুণবাবু, মানতি মাসি, বিকাশ, অনুমান কর সব চরিত্রের মধ্যে সহমর্মিতা, ভালোবাসা, অন্যের জন্যে কিছু করা, অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেয়া, সত্যের পথে অনড় থাকা, লোভের বশবর্তী না হওয়া, মোদ্দা কথা – মানবিক মূল্যবোধকেই উচ্চে স্থান দিয়েছেন লেখক। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে বিরাজমান স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্ব গতির সময়ে মানবিক মূল্যবোধের বেশি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন তিনি। ফেরিওয়ালা শশধর, তার স্ত্রী বীণা। বাড়ি বাড়ি টো টো করে ঘুরে ফেরি

করতে ভালোবাসে সে। ঘুরতে ঘুরতে একটি বাড়িতে সে একদিন দেখা পায় বীণার। বেণি দোলানো বীণার সাথে সেই সময় তার কথা হয়। বীণা রোজ ঘুগনি কিনতো তার কাছ থেকে। এভাবে প্রণয়, প্রণয় থেকে বিয়ে। তবে বিয়ে করতে তাদের অনেক কাঠখোর পোড়াতে হয়েছে। দুজনের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবধান ছিল বিস্তর। বিয়ের পরও পারিবারিক জীবনে দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল ভালো। ধনী ব্যবসায়ী রামসদয় বাবু যখন তাদের বাড়ির সামনে দোকান খুলে সেখানে চেয়ার পেতে বীণার জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে বীণাকে এক নজর দেখতে। এমন কি শেষ দিকে রামসদয় বীণার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে বীণার খালি বাড়িতে যেয়ে উপস্থিত হয় আলুকাবলি খাওয়ার নাম করে। এমন ঘটনায় শশধরের মধ্যে কোনো রকম সন্দেহ দানা বাধেনি। বীণার বেলায় যত দোষ নন্দঘোষ –এই প্রবাদটি খাটেনি। আবার বীণা রামসদয়ের কুনজর থেকে বাঁচতে রামসদয়বাবুকে বাবা সম্বোধন করে তাকে চিঠি দিয়েছে সেই বিষয়েও শশধর কোনো প্রশ্ন করেনি। পুরুষ চরিত্রের যে শাশ্বত রূপ ডোমিনেট করা সেটি শশধরের মধ্যে অনুপস্থিত।

বীণা চরত্রটি সহমর্মিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মানতি মাসির কাছ থেকে বীণা উলবোনা শিখেছিল। সেই মাসি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন বীণা তাকে সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে সারিয়ে তোলে। বীণা রাত জেগেছে, ওষুধ খাইয়েছে, তার মলমূত্র পর্যন্ত পরিষ্কার করেছে। মাসির জন্যে ওষুধ আনতে ডাক্তারের বাড়িতে বার বার গিয়েছে। বাড়ি থেকে পথ্য তৈরি করে মাসিকে নিয়ে খাইয়েছে এবং বাড়ি থেকে হর্লিকসের বৈয়ামও নিয়ে তাকে খেতে দিয়েছে। বার বার তার খোঁজ নিয়েছে, তার ওষুধ পরিবর্তন করে এনেছে। বলতে গেলে, আপনজনের চেয়ে বেশিই করেছে বীণা মানতি মাসির জন্যে। মাসির রোগমুক্তির জন্যে সে মানত পর্যন্ত করেছে। তাছাড়া প্রতিবেশি সাত বছরের মেয়ে ঝুমরি তার বাড়িতে টুকটাক ফাইফরমাশ শুনতে আসে বিনিময়ে তার ভাগ্যে পান্তা জোটে কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে যদি বিরিয়ানি থাকে তাহলে বিরিয়ানিই বীণা তাকে খেতে দেয়।

মানতি মাসি চরিত্রটিতে ভালোবাসার প্রতিদান দিতে দেখা যায়। মাসি বীণাকে বিভিন্ন প্যাটার্নের উলবোনা শিখিয়েছে। দুজনের মধ্যে পরিচয়ের সীমা এইটুকুই। স্বল্প পরিচয়ের মধ্যে দুজনের প্রতি দুজনের আন্তরিকতার কমতি নেই। মাসি সুস্থ হয়ে মেরুন রংয়ের একটি উলের ব্লাউজ বীণাকে উপহার দেয়ার কথা ভাবে। পোস্টঅফিসে তার জমানো একশ টাকা দিয়ে সে উপহার কিনবে। সর্বোপরী সে বীণার কথামতোই চলতে পছন্দ করে।

পিতৃমাতৃহীন আতরি চরিত্রটি প্রবল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। বাগদিনি দাইমার বাড়িতে আতরি বড় হয়েছে। বাগদি মায়ের দুটি বড় বড় ছেলে ছিল তারা আতরিকে বোনের মতোই দেখেছে। আতরি ভাইয়ের সম্মতিতে শ্রীনাথ উকিলের বাড়িতে কাজ নেয়। সে নিজের সম্ভ্রম বজায় রেখেই কাজ করছিল। কিন্তু একদিন শ্রীনাথ উকিল তার সাথে অশোভন আচরণ করলে সাথে সাথে সে তার প্রতিবাদ করে এবং হুমকি দিয়ে বলে –'আজ যা করেছেন অন্য দিন

যদি এরকম বেয়াদবি করেন আমি চাকরি ছেড়ে চলে যাব আর ঢাক পিটিয়ে রাষ্ট্র করে দেব সব।' (পৃ. ৮৪৬) ধনী ব্যবসায়ী রামসদয়বাবু এবং উকিল শ্রীনাথ দুজনে মিলে যখন ডাক্তারবাবুকে বিব্রত পরিস্থিতিতে ফেলার পরিকল্পনা আটে এবং মোকদ্দমার পয়েন্টগুলো কাগজে জটডাউন করে। এই অন্যায় পরিকল্পনার কথা শুনতে পেরে আতরি প্রতিবাদী হয়ে উঠে। সুবিধামত সে কাগজটি করায়াত্ব করে বিষুণকে এনে দেয়। ফলশ্রুতিতে ডাক্তারবাবু রামসদয় ও শ্রীনাথের কাছে যেয়ে সমঝোতার প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবটি তারা গ্রহণ করে।

মোটরকার মিস্ত্রী বিষুণ চরিত্রটির মধ্যে সততা, ন্যায়পরায়নতা, সহানুভূতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। সে ছোটবেলায় বাড়ি থেকে অভিমান করে বেড়িয়ে আসে। বাবা-মার কোনো খোঁজ খবর সে রাখে না। অনেকদিন পরে জানতে পারে তার বাবা-মা দুর্ভিক্ষের সময় অনাহারে রাস্তায় পড়ে মৃত্যুবরণ করে। সে তখন দুমকায় একটা কারখানায় চাকরি করতো। এরপর থেকেই তার মধ্যে এক ধরণের পাপবোধ কাজ করে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সে যথাসাধ্য সবার উপকার করে বেড়ায়। সেই উদ্দেশ্যে সে মহাসমারোহে কাঙালিভোজের আয়োজন করে। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করে। ভালো মানুষদের সেবা করে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। তাই ডাক্তারবাবুর মোটর সারাতে সে কখনও টাকা নেয় না। জোর করে দিলেও সে নিতে চায় না। একবার ডাক্তারবাবু তাকে উপহার দিতে চাইলে সেটিও সে নেয়নি।

অনুমার কর, বিষুণ যার মামা। সে নিজেকে একজন দেশ-সেবক মনে করে। সে অল ইন্ডিয়া ইউথস লীগ পার্টির জন্যে ক্যানভাস করে বেড়ায়। তার ধারণা দেশ ডুবে যাচ্ছে, দেশের সেবক হয়ে চিরকাল সে দেশসেবা করবে। তার এই ধরণের কথা শুনে ডাক্তারবাবু তাকে বলেন–'দেশের সেবা করার জন্যে কোন পার্টি গড়বার প্রয়োজন নেই। তোমার আশেপাশেই অনেক দুঃস্থ লোক পাবে তাদের সেবা করলেই দেশ সেবা করা হবে।' (বনফুল, ১৯৬০/১: ১০) ডাক্তারবাবুর এই কথাটির মধ্যে দিয়ে বনফুলের মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। একপর্যায়ে সে ডাক্তারবাবুর সততা ও ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ডাক্তারের সব ফাইফরমাশ সে পালন করে, বিনিময়ে পার্টি থেকে সে যত টাকা পেত তার চেয়ে বেশিই পায়।

বিকাশ সততা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী একটি চরিত্র। সে পণ্ডিত দামোদর ভট্টাচার্য্যের ছেলে এবং বীণার স্বামী শশধরের বন্ধু। রামসদয় বাবু শশধরের অনুপস্থিতিতে বীণার বাড়িতে ঢুকেছিল এবং বীণার দিকে কুনজর দিয়েছিল – বিষয়টি শোনামাত্র বিকাশ তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিবাদস্বরূপ রামসদয়ের চাকরি ছেড়ে দেয়। এতে প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করে এবং ক্ষেপে যায় রামসদয়বাবু। তিনি ডাক্তারবাবুর বাসায় বিকাশকে দেখতে পেলে তাকে চোর

অপবাদ দেয়। বিকাশ অপমান সইতে না পেরে কেঁদে ফেলে এবং ডাক্তারবাবুর সাহায্য প্রার্থনা করে। ডাক্তারবাবু বিকাশের হয়ে লড়েন।

উপন্যাসটির উৎসর্গ পত্রে বনফুল লিখেছেন –'এরাও আছে। এরাই সংখ্যায় বেশি। সমাজের এরাই সুদৃঢ় ভিত্তি, এরাই আদর্শবাদী। এরাই নমস্য।' (বনফুল, ২০১৩/১৩: ৮৬৯) নিম্নশ্রেণির এইসব নমস্য, আদর্শবাদী সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনে তাদের দরদ, আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার মধ্যেই বনফুল প্রকৃত অর্থে মানবিকতাই দেখতে পেয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের শোচনীয় অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র হাতিয়ার মানবিকতা–এটাই বনফুলের *এরাও আছে* উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়।

বনফুলের সমসাময়িক লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ধরা যাক। তাঁর উপন্যাস অন্ত্যজ শ্রেণি বা ব্রাত্যজনদের হাসি-কান্নার কাহিনি। সেসব কাহিনির কেন্দ্রে আছে ব্যক্তি বিশেষের প্রেম। এই প্রেমকে কেন্দ্র করে তারা জীবনের মানে খুঁজে বেড়ায় এবং অভিজ্ঞতার আলোকে জীবন সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছায়। তারাশঙ্করের বহুল পঠিত ও কালজয়ী উপন্যাস 'কবি'র কথাই ধরা যাক। উপন্যাসটি অন্ত্যজ মানুষদের ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনি। আর বনফুলের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত চরিত্রকে ঘিরে থাকে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য পূর্ণিয়া জেলার লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীর কথা। তাঁর কথা-সাহিত্য মূলত বিহারের অন্ত্যজ মানুষ এবং এর ভূ-প্রকৃতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। তাঁর *ঢোঁড়াই চরিত মানস* অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনগাথা। ঢোঁড়াই চরিত্রের মধ্যে রাজনীতির অভিজ্ঞতার প্রতিফলনই দেখতে পাওয়া যায়। রাজনীতির ঢেউ কীভাবে অন্ত্যজ মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টে দেয় সেই বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। আর বনফুলের উপন্যাসে ডাক্তার জীবনের অভিজ্ঞতায় বিহারের মধ্যবিত্ত ও অন্ত্যজ মানুষদের সুখ-দুঃখের জীবন-কথা এবং অন্ত্যজ মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করার মানসিকতা গড়ে তোলার আহ্বান রয়েছে। তাঁর *সে ও আমি* উপন্যাসে মধ্যবিত্ত চরিত্র প্রেমসিন্ধু কারখানার শ্রমিক-নেতা, সে শ্রমিকদের অধিকার সচেতন করে তোলার আন্দোলন করে। কারণ শ্রমিকদের না জাগালে দেশের মুক্তি হবে না। শ্রমিকরাই একটি দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। ঠিক একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় *জঙ্গম* এর সাম্যবাদী চরিত্র নিপুর প্রতিবাদী কণ্ঠে। সে গ্রামে কৃষকদের অধিকার সচেতন করে তুলতে এবং তাদের মধ্যে শ্রেণিবোধ জাগাতে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। বনফুল পতিত জীবনের মর্যাদা ও তাদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছেন। *এরাও আছে* উপন্যাসে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং অধিকার সচেতন চরিত্র আতরি এবং *প্রচ্ছন্ন মহিমায়* ক্ষেন্তি চরিত্র।

'মধ্যশ্রেণির জীবন বৈচিত্র্য ও অন্ত্যজ সমাজের কথকতা' আলোচনান্তে বলা যায় যে, মানুষই বনফুলের কাছে বড়। আর মানুষকে ভালোবেছেন বলেই চাকরি ছেড়ে ভাগলপুর শহরে ল্যাবরেটরি স্থাপন করে নানা শ্রেণি ও নানা পেশার মানুষদের নিরলসভাবে সেবা দিয়ে গেছেন প্রায় চল্লিশ বছর ধরে। তাঁর উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে মধ্যবিত্ত ও অন্ত্যজ মানুষের জীবন কথা। মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলো আলোচনায় দেখা গেছে, তাদের মধ্যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশা, জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রেম, মানবতাবাদ, বন্ধু বিশ্বাসে ফাটল, অসহায়দের প্রতি দরদবোধ, কাজের প্রতি সততা, জীবনের ধাক্কা সামলে নিয়ে এগিয়ে চলা, নিম্নশ্রেণির মানুষদের সম-মর্যাদা দেয়ার মানসিকতা, কৃষক-শ্রেণির সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া, জীবনের মানে খুঁজতে যেয়ে জগত সম্পর্কে নির্মোহ হয়ে বোহেমিয়ান জীবনযাপন করা, জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে নারীর স্বাধীন জীবন-যাপন, বিবাহিত জীবনে শিক্ষা লাভের অদম্য ইচ্ছে থেকে ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন এবং বৃহৎ কল্যাণের আহ্বানে সাড়া দেয়া, শেষ বয়সে নিজের মোটো থেকে সরে এসে সবার রঙে রঙ মেলানোর ইচ্ছে পোষণ – এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। চিকিৎসা সূত্রে বনফুল অন্ত্যজ মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং তাদের জীবনকে অবলোকন করেছেন অনেক কাছ থেকে। তিনি উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবনের চিত্র যথেষ্ট মননশীলতার সাথে এবং বাস্তবতার সাথে তুলে ধরেছেন। এ সব অন্ত্যজ মানুষের চারিত্রিক সততা ও মহানুভবের পরিচয়ও পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাসে। তবে তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসে অন্ত্যজ চরিত্রগুলো প্রতিবাদী চরিত্রের মর্যাদা লাভ করেনি এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও তারা সচেতন ছিল না। তবে শেষ দিকের কিছু কিছু উপন্যাসে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, *মানসপুর* এ কারখানার শ্রমিক নেত্রী মহুয়া, *প্রচ্ছন্ন মহিমা* ক্ষেন্তি চরিত্রটি। অন্ত্যজ সমাজের মানুষেরা যেন তাদের অধিকার নিয়ে মর্যাদাপূর্ণভাবে সমাজে বসবাস করতে পারে – সে দিকের প্রতি লেখক দৃষ্টি দিয়েছেন। *পশ্চাৎপটে* বনফুল উল্লেখ করেছেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে নানা রং। আর এসব রঙের রহস্যভেদই তাঁর সাহিত্য জীবনের মূল লক্ষ্য বলে আমাদের মনে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনীতি-অবলম্বী জীবনের চালচিত্র

রাজনীতি কী

রাজনীতি শব্দটি সাধারণ অর্থে বোঝায় রাজ্য পরিচালনার নীতি। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে রাজ-পরিবারে সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো নীতি গ্রহণ করাই হলো রাজনীতি। পরবর্তীকালে আধুনিক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পথ ধরে এটি রাষ্ট্র-পরিচালনার নীতি হয়ে ওঠে। প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র, তাদের চিন্তা-চেতনাও স্বতন্ত্র। তাই একাধিক মানুষের মধ্যে নানা ক্ষেত্রে, নানা কারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে হলে একটি নীতির মাধ্যমে সহমত পোষণ করতে হয়। আর তখনই রাজনীতির প্রয়োজন দেখা দেয়। অর্থাৎ রাজনীতি হলো এক প্রকার সামাজিক প্রক্রিয়া বা কর্মকাণ্ড। আবার রাজনীতিকে এক ধরনের কর্মতৎপরতাও বলা যায়। সব সমাজেই এ কর্মতৎপরতা সর্বজনীন। রাজনীতিক কর্মতৎপরতা শুধু রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী কিংবা শ্রমিকসংঘের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় – এর ব্যাপ্তি আরও বিস্তৃত। পরিবার, স্কুল-কলেজ, সংঘ-সংগঠন, পৌরপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন, ক্রীড়া সংগঠন, বহুজাতিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংগঠন – সব ক্ষেত্রেই রাজনীতির ক্রিয়াকলাপ পরিলক্ষিত হয়।

রাজনীতি সম্পর্কে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'মানুষ স্বভাবতই রাজনৈতিক প্রাণী।'(Hague and Harrop, 2004: 04) অ্যান্ড্রু হেউড তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Politics* এ রাজনীতি সম্পর্কে বলেছেন, "politics may be treated as an 'essentially contested' concept, in the sense that the term has a number of acceptable or legitimate meanings. On the other hand, these different views may simply consist of contrasting conceptions of the same, if necessarily vague, concept." (Heywood, 2002: 4-5) রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হেরল্ড ডি লাসওয়েল রাজনীতি বিষয়ে বলেছেন, "Politics is the study of who gets what, when, and how " (Lasswell; 1936: 223) উক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, রাজনীতির অর্থ ও প্রকৃতি বহুমাত্রিক। নির্দিষ্ট কোনো দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা নির্ণয় সম্ভব নয়। মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত। কারণ রাজনীতি সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অংশ।

বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ পরিলক্ষিত হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯৯৪) *আনন্দমঠ* (১৮৮২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) *ঘরে বাইরে* (১৯১৬),

চার অধ্যায় (১৯৩৪), *গোরা* (১৯৩৮), কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০), *কুহেলিকা*(১৯৩১), *আনন্দময়ীর আগমনে* (১৯২২), শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪), *পথের দাবী* (১৯২৬), সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) *জাগরী* (১৯৪৬), সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) *যুগ যুগ জীয়ে* (১৯৯৫) প্রভৃতি রচনায় রাজনীতি-প্রসঙ্গ এসেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুন তাঁর নাইট উপাধি বর্জন করেছেন। আবার ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী কাজী নজরুল ইসলামের কারাবন্দি জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তার-বার্তার মাধ্যমে অনশন ভঙ্গের আহ্বান জানানো এবং তাঁকে *বসন্ত* গীতিনাট্য উৎসর্গ করার ব্যাপারটি রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের নামান্তর। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চলাকালে নেতারা যখন স্বরাজের দাবি জানান, তখন নজরুল ইসলাম 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানান, তিনি সেখানে লিখেছেন, স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।

সাহিত্য ও রাজনীতি পরস্পর সম্পর্কিত। ব্রিটিশবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করেছিল আবার যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের পরোক্ষ সমর্থন ছিল। ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিপ্লবী চেতনাসমৃদ্ধ সাহিত্য, স্বাধীকার চেতনাবিষয়ক সাহিত্য যা ব্যক্তি মানুষের চেতনা জগতে আজও ক্রিয়াশীল।

বনফুলের রাজনীতি-ভাবনা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন বিহারের বিভিন্ন স্থানে। শেষ জীবনে তিনি ছিলেন কলকাতার দমদমের লেকটাউনে। কলকাতায় বসবাসকালীন সময়েও বারবার তিনি স্মৃতি রোমন্থন করে ভাগলপুরে ফিরে যেতেন। বিহারের দীর্ঘ জীবনবাসে তিনি বছরে দুই-তিনবার কলকাতায় আসতেন প্রকাশনার কাজে, সাহিত্যিকদের সাথে আড্ডা দিতে। সাহিত্যিক মানেই সমাজ-সচেতন ও রাজনীতি-সচেতন, বনফুল এর ব্যতিক্রম নন। তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না কিন্তু দেশের রাজনীতির কার্যকলাপ তাঁকে ভাবিয়েছে অনেক বেশি। শহর থেকে দূরে ভাগলপুরে ডাক্তারি করেও সাহিত্য-রচনার পাশাপাশি তিনি দেশের রাজনীতি নিয়ে ভাবতেন। বিশুদ্ধ রাজনীতির অভাবের দরুন দুঃখবোধ করতেন তিনি। রাজনীতিক নেতাদের স্বার্থপরতার ফলে সৃষ্ট দুঃখবোধের কথা তাঁর অনেক উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন। কারণ রাজনীতি বিষয়টি রাষ্ট্র, সমাজ এবং ব্যক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সচেতন মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এই রাজনীতি। সুস্থ রাজনীতি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিংশ শতাব্দীর সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পুরো বিশ্ববাসীকে নাড়া দিয়েছে। ভারতবর্ষ রাজনীতির প্রভাবমুক্ত ছিল না। ভারতকে ব্রিটিশমুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছে ভারতের আপামর জনতাকে। যেমন, বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন (১৯১১), সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, (১৯১১) গান্ধীজি পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২), আইন-অমান্য অভিযান (১৯৩০), ভারত ছাড় আন্দোলন (১৯৪২)। তাছাড়া এ শতাব্দীর মন্বন্তর, দেশ-বিভাগ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভেঙে পড়েছে দেশের মেরুদণ্ড। এসব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালির সমাজ-জীবন হয়েছে জর্জরিত। ফলে জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন। সাহিত্য যেহেতু সমাজের প্রতিবিম্ব তাই এ সময়ের সাহিত্যিকদের রচনাতেও এ গভীর পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে রাজনীতিক চেতনাসমৃদ্ধ বিশেষভাবে তিনজন সাহিত্যিকের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) এবং সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)।

বনফুলের সমসাময়িক লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৭১) এবং সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) দুজনই সক্রিয় রাজনীতিকর্মী ছিলেন। পূর্ণিয়া জেলায় সতীনাথ ভাদুড়ী প্রথম জীবনে জেলা-কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি সমাজতন্ত্রী কর্মী হিসেবে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর *ঢোঁড়াই চরিত মানস*-এ ঢোঁড়াই চরিত্রের মধ্যে রাজনীতির অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। *জাগরী* উপন্যাসের কাহিনিপট ১৯৪০-এর দশকের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বনফুল প্রকাশ্যভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তথাপি রাজনীতির খবরাখবর তাঁর মনকে বিচলিত করত। রাজনীতির প্রভাবে তাঁর মন আচ্ছন্ন থাকত। এ প্রসঙ্গে আত্মজীবনী *পশ্চাৎপটে* (১৯৭৮) তিনি লিখেছেন –

> মহাত্মা গান্ধীর উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল, তবু সে সময় খুব বড় আঘাত পাইয়াছিলাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইলেন। তখন, কেমন যেন আবছাভাবে মনে হইল, মহাত্মা গান্ধী একটি অবাঙালি দলের নেতা এবং সে দলে বাঙালিদের প্রভুত্ব চলিবে না। গান্ধীজির এই দলটিই পরে ভারতকে দুই ভাগ করিয়া পরে ইংরেজদের নিকট হইতে স্বাধীনতা ভিক্ষা লইয়াছিলেন। এই দলই পরে গদিতে বসিয়া সীতারাম পট্টভিকে দিয়া যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখাইয়াছেন, তাহাতে বাঙালি শহীদদের সম্মানের স্থান নাই।... দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় তখন মনটা আচ্ছন্ন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নেতাজির প্রতি কংগ্রেসের এই দুর্ব্যবহারে মনটা প্রসন্নও ছিল না। (বনফুল, ১৯৯৯ : ২০৭)

বনফুলকে রবীন্দ্রনাথ একবার প্রশ্ন করেছিলেন বনফুল রাজনীতি করেন কি না। জবাবে বনফুল বলেছিলেন, "না, পলিটিকসে ঢুকি নাই। কিন্তু তবু পলিটিকাল খবর মনকে বিচলিত করিত।" (বনফুল, ১৯৯৯ : ২০৭) রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন, "পলিটিকসে ঢুকো না। ওর ভেতর সাহিত্যিক টিকতে পারে না। আমি কিছুদিন ছিলাম। তখনই আমার শিক্ষা হয়ে গেছে।" (বনফুল, ১৯৯৯ : ২০৭) বনফুল গান্ধীজি ও কংগ্রেস-দলের সমর্থক ছিলেন। দল

হিসেবে কংগ্রেসের কোনো বিকল্প ছিল না তখন। তৎকালীন অধিকাংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির রাজনৈতিক মতাদর্শও ছিল তাই। বিপ্লবীদের প্রতি সমর্থন, আত্মত্যাগী অসহযোগীদের প্রতি শ্রদ্ধা, গান্ধী-ভক্তি এবং সমালোচনা, সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়কের গৌরবদান – এসব কিছুর মধ্যে আদর্শবাদী মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বাঙালির মূল্যবোধের বিপর্যয়, লোভ ও হৃদয়হীনতা বনফুলকে মর্মাহত করেছে। স্বাধীনতার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে দেশ-বিভাগ, রাজনীতিকদের মিথ্যাচার, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির কঠোর সমালোচনা করেছেন (পবিত্র সরকার, ১৯৯৯ : ১৬৭)।

কোনো বড় লেখকই তাঁর চেতনাজগৎ থেকে রাজনীতি-ভাবনাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বনফুলের বিভিন্ন লেখায়ও রাজনীতি উঠে এসেছে সচেতনভাবে। বনফুলের লেখায় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ঘটনা যেমন উঠে এসেছে, তেমনি '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাও তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তাঁর রাজনীতি-অবলম্বী জীবনের চালচিত্রবিষয়ক উপন্যাসগুলো হলো: *সপ্তর্ষি* (১৯৪৫), *অগ্নি* (১৯৪৬), *স্বপ্নসম্ভব* (১৯৪৬), *পঞ্চপর্ব* (১৯৫৪), *ত্রিবর্ণ* (১৯৬৩)। বনফুলের রাজনীতি অবলম্বী/বিষয়ক আলোচ্য উপন্যাসগুলোর মোট সময়কাল প্রায় বিশ বছর – *সপ্তর্ষির* প্রকাশকাল থেকে *ত্রিবর্ণ*-এর প্রকাশকাল পর্যন্ত। ভারতের স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর সময়কালে রাজনীতি উপন্যাসের ব্যক্তিজীবনকে কতটা প্রভাবিত করেছে এবং এর পরিণতি কী হয়েছে, পরবর্তী অংশে লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে তা তুলে ধরা হবে। উল্লেখ্য, উক্ত সময়ের মধ্যে লেখকের ত্রিশটি উপন্যাস (ছায়া অবলম্বনে রচিত উপন্যাসসহ), পাঁচটি গল্পগ্রন্থ (ছোটদের গল্পসহ) এবং ছয়টি নাটক প্রকাশিত হয়।

২. বনফুলের উপন্যাসে কীভাবে রাজনীতি পরিচালিত হয়েছে

২.১

বনফুলের রাজনীতি অবলম্বী/বিষয়ক প্রথম উপন্যাস *সপ্তর্ষি* প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। একই বছর তাঁর *জঙ্গম* উপন্যাসের শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসে যে সময়ের ইতিহাসকে তিনি বিষয়বস্তু করেছেন, তাঁর বিস্তৃতিকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত। উপন্যাসে সাধারণত কাহিনি বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কোনো কাহিনি এতে নেই। এটি চরিত্র-প্রধান উপন্যাস। তৎকালীন রাজনীতির বিভিন্ন ধারা সাতটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। বনফুল উপন্যাসের ভূমিকায় এমনই লিখেছেন: 'এদেশে ইংরেজ আসার পর যে সাত রকমের মানুষ আমাদের সমাজে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদেরই চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছি এই উপন্যাসে।' (বনফুল, ২০১২/৪: ১৮) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাসকে এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লেখক।

তিন প্রজন্মের সাতটি চরিত্র ঘিরে সাত পরিচ্ছেদে একটি গল্প গড়ে উঠেছে। এটি শুভ্র পরিবারের গল্প। শিব-শুভ্রের দুই ছেলে হংস শুভ্র ও সোম শুভ্র। তাদের মানসিক গঠন ও শিক্ষা-দীক্ষা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গড়ে উঠেছে। হংস শুভ্রের পাঁচ ছেলে – শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক, সিতাংশু, হিমাংশু ও সুধাংশু এবং দুই মেয়ে কুন্দ ও ইন্দু। হংস শুভ্রের সন্তানদের লেখাপড়া বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যে। উপন্যাসে তার প্রথম দুই ছেলে শশাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক চরিত্র দুটি আছে, আর বাকি তিন ছেলে অকালমৃত। মেয়ে কুন্দ শুভ্রা তার মুসলমান সংগীত-শিক্ষকের হাত ধরে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। ইন্দু শুভ্রা সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সক্রিয়-কর্মী।

দুই ভাই হংস ও সোম, হংসের দুই ছেলে শশাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক এবং শশাঙ্কের তিন ছেলে শঙ্ক, রজত ও হীরক – এ সাত ব্যক্তিত্বের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে নিজের পরিমণ্ডল-বৃত্ত, দেশ-কাল, সমাজ-রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। এ সাতজনের জীবননির্যাস থেকে একটি যুগের নির্মাণই ঔপন্যাসিকের প্রয়াস এবং সে প্রয়াসের লক্ষ্য হলো উল্লিখিত সময়-পর্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের গতি, স্পন্দন ও পরিমণ্ডলকে ফুটিয়ে তোলা। (ভূমিকা, সুমিতা চক্রবর্তী, বনফুল, ২০০০/৪: ৬)

প্রথম জীবনে হংস শুভ্র গোঁড়া ইংরেজ-ভক্ত ছিলেন। তৎকালীন ইয়ংবেঙ্গলদের রাজনীতিচর্চাই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল তাঁকে। "তখনকার কৃষ্ণদাস পাল, আনন্দমোহন বসু, সুরেন বাঁড়ুজ্জেরা যে রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রভাব হংস শুভ্র এড়াতে পারেননি।"(বনফুল, ২০১২৪: ৩৫৪) মারকুইস অব সলসবেরির অব্যবহিত পরেই লর্ড লিটন ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এবং আর্মস অ্যাক্ট নিয়ে আসে। প্রেস অ্যাক্ট উঠে যায়, কিন্তু আর্মস অ্যাক্ট থাকাতে মনঃক্ষুণ্ন হন হংস শুভ্র। পুলিশ সবার হাত থেকে হাতিয়ার কেড়ে নেয়। হংস শুভ্রের বাড়িতে যত বন্দুক, সড়কি, বল্লম ছিল সব বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও হংস শুভ্রের মনে ইংরেজপ্রীতিই ছিল। লর্ড রিপনের আমলে লোকাল সেলফ-গভর্নমেন্ট হলে গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে ডিস্ট্রিক্টবোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি গড়বার হিড়িক পড়ে যায়। হংস শুভ্রও কিছুদিন মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্ব পালন করেন। মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্দ্র করে যে দেশের মানুষের স্বার্থপরতা, দলাদলি, নীচতা, শঠতা, অসাধুতা চরমরূপ ধারণ করলে তাতে হংস শুভ্রের ইংরেজভক্তি আরও বেড়ে যায়। নেটিভদের অযোগ্যতাকেই তিনি দেখতে পান প্রতি পদে পদে। ফলে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্ব ছেড়ে দেন। ইন্ডিয়ান-ন্যাশনাল-কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। কংগ্রেসের মডারেটর দলে তার নাম ছিল। কংগ্রেসের প্রথম কয়েক বছর তিনি নিষ্ঠাভরে দেশের বড় বড় নেতাদেরর সাথে কাজ করেন। লর্ড কার্জনের আগমন, ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট এবং বেঙ্গল পার্টিশনের ঘটনায় হংস শুভ্রের স্বপ্ন হঠাৎ ভেঙে

যেতে থাকে। পরবর্তী নেতাদের কার্যকলাপে তিনি আরও হতাশ হন। তিনি আবিষ্কার করেন যে, দেশের সমসাময়িক নেতারা গভর্নমেন্টের বড় বড় পদ পেতেই বেশি আগ্রহী, দেশপ্রীতি তাদের নেই। মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে নিরীহ দুই মেমসাহেব নিহত হলে স্তম্ভিত হন হংস শুভ্র এবং কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। পারিবারিক পরিমণ্ডলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। এ সময় ওয়েডারবার্নের লেখা *হিউমের জীবনী*, ডব্লিউ সি ব্যানার্জির *ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান পলিটিকস*, লায়ালের *লর্ড ডাফরিনের জীবন চরিত* বইগুলো পড়ে তিনি বুঝতে পারেন, 'ভারতকে উদ্ধার করার জন্যে নয়, দেশের উদীয়মান স্বাধীনতা-স্পৃহাকে একটা ভদ্র গণ্ডিতে শৃঙ্খলিত করে রাখবার জন্যে হিউম সাহেব লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে পরামর্শ করে কংগ্রেস সৃষ্টি করেছিলেন।' (পৃ. ৩৬০) শেষ বয়সে তিনি ইংরেজ এবং স্বদেশবাসী উভয়ের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এবং সনাতন হিন্দুধর্মকে আঁকড়ে ধরেন। রাজনীতি থেকে এভাবেই তিনি সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন।

একই পরিবেশ ও আবহাওয়ায় বড় হয়েও সোম শুভ্রের মত ও পথ ছিল ভিন্ন। তিনি ব্রাহ্ম হয়েছেন। তৎকালীন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে যে দুর্ভোগ ছিল তার সবই তাঁকে পোহাতে হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে তাঁকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়েছিল। বড় ভাই হংস শুভ্র যখন ইংরেজ-ভক্ত, তখন সোম শুভ্রের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগে। এ আকাঙ্ক্ষা তাঁর দেশ, দেশের মানুষ, সংস্কার, ধর্ম– সবকিছুর স্বাধীনতা। সোম শুভ্র দৈনন্দিন জীবনে সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃপ্রেমের মর্যাদা দেয়ার বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, সভায় সভায় সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে কোনো লাভ নেই। তিনি ছিলেন সবরকম সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। সোম হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্মের কুসংস্কারও তিনি মেনে নেননি। তাই ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যেও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিতে পারেননি। কারো সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে তিনি বাংলা ছেড়ে বেহারের দেহাতে গিয়ে প্রাচীন হিন্দুধর্মে বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়ার জন্য মনস্থির করেন।

শশাঙ্ক শুভ্র যৌবনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হয়ে বোমার দলে যোগ দেন। এ সময় রবীন্দ্রনাথের গান, সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা, কানাইলালের ফাঁসি সবকিছুই তাঁকে আন্দোলিত করত। বাবার ইচ্ছায় তিনি বিলেত যান। বিলেত ফেরত শশাঙ্ক যোগ দেন তিলকের হোম-রুল লীগে। তিলক-ভক্ত শশাঙ্কের দেশের স্বার্থে কিছু একটা করতে প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। এ সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালির ছেলেকে ব্যবসা করার জন্য ডাক দেন। 'তোমরা ব্যবসা কর; স্বাধীন ব্যবসা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করাটাই দেশসেবা করা। কথাটা বড় ভালো লাগল। যুদ্ধ বেঁধেছে, এই সময় দেশি 'ইন্ডাস্ট্রি'গুলোকে সচেতন করে তোলা যেতে পারে।' (বনফুল, ২০১২/৪: ৩৯২-৯৩)

ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নিতে শশাঙ্ক শুভ্রের মাথায় আর তিনটি বিষয় আসে– প্রথমত, দেশসেবা; দ্বিতীয়ত, ইংরেজরা বণিক; আঁতে ঘা দিলেই ওরা টলবে এবং তৃতীয়ত, বন্ধু সনৎ কুমারের সাথে বরাবরের মতো এবারও পাল্লা দেয়ার মানসিকতা। দেশ সেবার নামে ব্যবসা করতে নেমে তিনি ঋণজালে জর্জরিত হয়ে পড়েন। ফলে স্বদেশিদের ওপর আস্থা হারিয়ে অসহায় বোধ করতে থাকেন। এ অবস্থায় কাকা সোম শুভ্রের কাছ থেকে টাকা এনে তিনি একটি বাড়ি কেনেন। স্ত্রীর অলংকার বন্ধক রাখা টাকা ব্যবসায় খাটান। ব্যবসায় লাভ হলে অলংকার উদ্ধার করে শহরে আরেকটি বাড়ি কেনেন। পরের বছর পাটের ব্যবসা করতে গিয়ে আবার বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হন। শেষ জীবনে তার কেবল ঋণের ভার। প্রকৃত অর্থে কাজের প্রতি একাগ্রতার অভাবের দরুন জীবন বিপন্ন হয়েছে তার।

চিকিৎসক মৃগাঙ্ক শুভ্র যৌবনে বিবেকানন্দের আদর্শে ব্রহ্মচর্য পালন করাকেই জীবনের লক্ষ্য বলে মেনে নেন। প্রথম দিকে গান্ধীর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে আস্থা ছিল না তাঁর। কিন্তু আদর্শবাদী শিক্ষিত লোকের সামনে তখন বিকল্প কোনো পথ না থাকায় পরবর্তী সময়ে তিনি গান্ধীপন্থি হন। খিলাফতের অজুহাতে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে চারদিক থেকে যখন বিলেতি পোশাক বর্জন চলছে এবং দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিরা ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশের কাজে, ঘরে ঘরে চরকা চলে, গ্রামে গ্রামে তাঁত বসে, তখন মৃগাঙ্ক শুভ্রও দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মদের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে জেলে যান। জেলে বসে তাঁর উপলব্ধি হয়, দেশের অশিক্ষিত হুজুগে জনতার পক্ষে একনিষ্ঠভাবে অহিংস হয়ে থাকা সম্ভব নয়। তাই যদি হয় তাহলে এসব অসম্ভব আন্দোলন চালাবার কোনো মানে নেই। কয়েক মাস পর জেল থেকে বেরিয়ে তিনি উত্তরবঙ্গে বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। সেখান থেকে ফিরে স্বরাজ্য-পার্টিতে যোগ দেন। তারপর মহাত্মাজির সত্যাগ্রহ-আন্দোলন করে আবারও জেলে যান তিনি। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। দেশের লোককে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে গ্রামে গিয়ে বিনা পয়সায় ওষুধ এবং চরকা বিলিয়ে, তাঁত বসিয়ে, নাইট স্কুল করে দিন কাটাতে থাকেন তিনি। ১৯৩০-এ লবণ-আইন অমান্য-আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতায় উদ্দীপ্ত হয়ে আন্দোলন করেন এবং দীর্ঘ সময় কারাবরণ করেন। বারবার কারাবরণ করেও আদর্শের প্রতি দৃঢ়তার অভাবের দরুন শেষ জীবনে তাঁকে রাজনীতির পথ পরিত্যাগ করতে হয়।

শশাঙ্কের বড় ছেলে শঙ্খ শুভ্র। প্রথম জীবন থেকেই অন্যের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে চলতে হয়েছে তাঁকে। দাদুর ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাতে মাথা কামিয়ে টিকি রেখে হিন্দুত্ব পালন করতে টোলে গিয়ে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর ভালোলাগা তৈরি হয়। কিন্তু মায়ের অনুরোধে আবার টোল ছেড়ে আসেন। গান্ধীভক্ত কাকার ইচ্ছেমতো কিছুদিন চরকাও কাটেন। একসময় চরকা কাটা বন্ধ করে দেন কিন্তু মাকে সন্তুষ্ট রাখতে আবার মাঝেমধ্যে চরকা কাটেন।

ছোট ভাইয়ের অনুরোধে প্রবন্ধ লেখেন। শঙ্খ শুভ্র দেশকে ভালোবাসে, তার স্বপ্নও তিনি দেখেন। কিন্তু সে স্বপ্নের সুনির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই। পত্রান্তরালচারিণী, সুরস্বরূপিণী নাইটিংগেলের প্রতি কিটসের যে মনোভাব. স্বাধীনতার সম্বন্ধে শঙ্খ-শুভ্রের অনেকটা সেই মনোভাব (বনফুল, ২০১২৪: ৪৩৮)। তাঁর ইচ্ছে ছিল, সারা জীবন সাহিত্য সাধনা এবং অধ্যাপনা করেই কাটাবেন। তাঁর মনের আকাশে ওড়বার আগেই নাটাই টেনে ধরেন বাবা শশাঙ্ক। তিনি ছেলেকে চাকরি না করে ব্যবসা করতে বলেন। নিজের ইচ্ছেকে কখনো বাস্তবায়িত করতে পারেননি শঙ্খ। তার কারণ "শঙ্খ শুভ্র আজীবন নিজের মশারিটি পরকে দিয়ে মুখে বিনীত হাসিটি ফুটিয়ে নীরবে মশার কামড় ভোগ করেছে।"(বনফুল, ২০১২/৪: ৪৩১)

রজত অনেকটা শঙ্খের বিপরীত। রজত নিজের ইচ্ছেকেই সবসময় প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন। শিল্পীমন নিয়ে তিনি যেমন বেড়ে উঠেছেন, তেমনি ছিলেন প্রচণ্ড রকমের গোঁয়ার স্বভাবের। ইংরেজ মেকলে সাহেবের লেখা 'বাঙালি-বর্ণনা' লেখাটা পড়বার পর ইংরেজদের ওপর রাগ করে সেদিনই স্বদেশি হয়ে যান তিনি। মদ ছাড়েন, কলেজ ছাড়েন, খদ্দর ধরেন। সুবিধে পেলেই সাহেব ঠেঙান। রাজনীতিতে সুভাষ বোসকে আদর্শ পুরুষ মেনে নিয়ে দেশের যুবক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে পরিচিত হন তিনি। কারণ এরাই দেশের একমাত্র আশা-ভরসা। এসময় তাঁর গভীর উপলব্ধি হয়, স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে বাহুবলে, রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে। এ উপলব্ধি থেকে তিনি আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনদেও থেকে আড়ালে থেকে বিপ্লবীদের জন্য রসদ সংগ্রহের কাজ নেন। জাহাজের দেশি বিদেশি খালাসিদের সাথে মিশেন কারণ তারাই বিভিন্ন দেশ থেকে রিভলবার কিনে আনেন এবং সেগুলো বিক্রি করেন। এ কাজের জন্যে তাঁকে চোর-ডাকাত-বাটপারদের সাথে মিশতে হয়েছে। চোর-বাটপারদের সাথে মেলামেশা, তাদের তোয়াজ করে চলা, পুলিশ দেখলে সশঙ্ক হয়ে পড়া – সব সময় একটা ছদ্মবেশ ধারণ করে মিথ্যের মুখোশ পড়ে থাকা তাঁর আর ভালো লাগছিল না। একসময় 'রুটের পার্ট প্লে' করতে তাঁর মন আর সায় দেয়নি, তখন তিনি ভাবেন রাজনীতির মধ্যে যদি থাকতেই হয় তাহলে তিনি ফ্লাওয়ার হয়ে থাকবেন। কিন্তু দলপতির কড়া আদেশ "You must play the part of the root to feed the flowers… ।" (বনফুল, ২০১২/৪: ৪৫৬) ফলে রাজনীতি করতে তাঁর আর ভালো লঅগে না। রাজনীতির প্রথম জীবনে তিনি ইংরেজ দেখলে ঠেঙাতেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের সুন্দর মুখশ্রী দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। রাজনীতি থেকে সরে তিনি শিল্পের ভুবনে ফিরে আসেন। আবার ছবি আঁকাতে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে রাজনীতির আগুনে জ্বলতে থাকেন তিনি। তাই তার ক্যানভাসে মূর্ত হয়ে ওঠে হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ করা বিশাল এক ছোরা।

উপন্যাসের সপ্তম খণ্ডে রয়েছে হীরক শুভ্রের জেলে বসে দাদা রজত শুভ্রকে রাজনীতি-জীবন নিয়ে লেখা চিঠি। তিনি রজতকে কমিউনিজমের মূল কথা নিয়ে লিখেছেন। মীরাট মামলার পর কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি হলে গোপনে পার্টির কাজে ধরা পড়ে জেলে যান হীরক। গরিবদের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি ছোটবেলা থেকেই ছিল তাঁর মধ্যে। গরিব-দুখী, কিষান-মজুর এবং অসহায়দের শিক্ষিত করা, তাদের স্বাস্থ্যোন্নতি করা এবং তাদের স্বার্থ-রক্ষা করার চেষ্টা করাই তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে ওঠে। যারা হিংস্র পথ অবলম্বন করে লাট-বড়লাট মারে, তাদের কাজে কোনো মহত্ত্ব দেখেননি হীরক। তাঁর কাছে অশিক্ষিত, অসহায় নগ্ন, ক্ষুধার্ত, জন-মজুর-চাষি – এরাই দেশ। এদের ম্লানমুখে শত শতাব্দীর করুণ কাহিনি লেখা আছে। এদের সবল হতে হবে, শিক্ষিত হতে হবে এবং এদের অধিকার-রক্ষা সম্পর্কে জাগিয়ে তুলতে হবে – এটাই হীরক মনে প্রাণে চান (বনফুল, ২০১২/৪: ৪৮৪)। তাঁর মতে, সাম্যই মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দেয় এবং স্বাধীনতা মানে মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা। তাই অসহায় মানুষের কল্যাণে হীরক নাইট স্কুল খোলেন। হীরক তাঁর পাড়ার 'মিলে' কুলি-স্ট্রাইক করিয়েছিলেন একমাস এবং ব্যক্তিগতভাবে তাদের জন্য তিনি অর্থ সংকুলান করেন ওই সময়। হীরক জনপ্রিয়তা চাননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল তাঁর আদর্শ। সে আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হওয়ায় কষ্ট পেয়েছেন তিনি। তবে সব শেষে তিনি বুদ্ধ-চৈতন্যের সাম্যের বাণী ভারতবর্ষে মানুষের মুক্তি আনবে – এ আশাবাদ ব্যক্ত করে লেখা শেষ করেন।

রাজনীতির প্রতিক্রিয়ায় হংস শুভ্র হলেন সনাতনপন্থি, সোম ব্রাহ্ম, শশাঙ্ক ইংরেজ-অনুসারী হয়ে পরবর্তীকালে দেশীয় ব্যবসা করে দিশাহীন হয়ে পড়েন, মৃগাঙ্ক প্রথম দিকে কংগ্রেসি হলেও পরবর্তীকালে দলের কার্যকলাপে বীতস্পৃহ, শঙ্খ শুভ্রের পথ খুঁজতেই ব্যস্ত থাকা, রজত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আর হীরক শুভ্র কমিউনিস্ট।

লেখক এ উপন্যাসে সাত চরিত্রের কেবল রাজনৈতিক মতাদর্শই প্রতিফলিত করেননি, রাজনীতিকে প্রধান করে সাত চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁদের পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবন, প্রেম-ভালোবাসা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সবই তুলে এনেছেন। রাজনীতি এবং স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে ভারতবাসীর নানা প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফলন কীভাবে ধরা পড়েছে, তার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসটির মুখবন্ধ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় –

> এই গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র কাল্পনিক, জীবন্ত রূপ দেয়ার জন্যে সমসাময়িক ইতিহাসের পরিবেশে সন্নিবিষ্ট করেছি। এদের মুখ দিয়ে যে সব নৈতিক বা রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত হয়েছে তাও এদের নিজের, আমার নয়। সমসাময়িক ইতিহাস প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে, সে সবের যাথার্থ্য যাচাই করবার যোগ্যতা

আমার নেই, প্রয়োজনও বোধ করিনি। কারও যদি কোনও বিষয়ে সন্দেহ হয়, আমাকে জানালে আমি গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের নাম তাঁকে জানিয়ে দেব। (বনফুল, ২০১২/৪: ৭৮৩)

১.২

সপ্তর্ষির কাহিনি শেষ হয়েছে আগস্ট-আন্দোলনের আগ পর্যন্ত। তাই বনফুল সচেতনভাবেই ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত *অগ্নি* উপন্যাসে আগস্ট-আন্দোলনকে পটভূমি করেছেন। *পশ্চাৎপটে* বনফুল লিখেছেন:

কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইবার পরই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া গভর্নমেন্ট তাঁহাকে বন্দি করিয়া রাখিলেন। ইহারই কাছাকাছি সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে, সুভাষচন্দ্র পুলিশের চোখে ধুলা দিয়া অন্তর্ধান করেন এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।... সমস্ত দিন কোনও কাজ করিতে পারিলাম না। সমস্ত রাত্রি ঘুম হইলো না।... ইহার ঠিক পরেই যে বৃহৎ ঘটনাটি আমার চিত্তকে বিচলিত করিয়াছিল– সেটি বিয়াল্লিশের আন্দোলন; যাহার ইংরেজি নাম August disturbance। Quit India প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পরই ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকলকে জেলে পুরিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হইলো তাহা বিস্ময়কর। লোকেরা বহু জায়গায় রেল লাইন উপড়াইয়া ফেলিল। টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের তার কাটিয়া দিল। অনেক জায়গায় থানা আক্রমণ করিয়া তাহার উপর জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দিল। অনেক রেলওয়ে গুদামে লুটপাট শুরু হইল। গভর্নমেন্টের সম্পত্তি নষ্ট করিয়া গভর্নমেন্টকে অচল করিয়া দেওয়াই লক্ষ্য হইল এই আন্দোলনকারীদের। সাধারণ লোকদের উপর কেহ কিন্তু কোনোরকম অত্যাচার করে নাই। গভর্নমেন্ট কিন্তু বেশিদিন নিষ্ক্রিয় রহিল না। রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুলিশ অবতরণ করিল। সে সময় গ্রামে গ্রামে যে অত্যাচার হইল তাহা অকথ্য। আমার *অগ্নি* বইটিতে সে অত্যাচারের কিছু বর্ণনা আছে। (বনফুল, ১৯৯৯: ২০৭-২০৮)

উপন্যাসের নায়ক স্বদেশি বিদ্রোহী অংশুমানকে জেলে বসে 'ইলেকট্রিসিটির ইতিহাস' বিষয়ক একটি বই পড়ার অনুমতি দিয়েছে কারা-কর্তৃপক্ষ। কারাগারের অসহনীয় নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ পেতে বইটি তার অনেক অভিনব কল্পনার খোরাক জুগিয়েছে। বইটি নিয়ে সে এক কল্পজগৎ তৈরি করেছে কারাগারের নির্জন কক্ষে। তার সে কল্পজগতে অনেক বিজ্ঞানীর আগমন ঘটে, যারা তাদের সব আবিষ্কারের উৎসরূপে ব্যবহার করেছেন বিদ্যুতের শক্তিকে। গ্যালভানি, অ্যালপিয়র, অরস্টেড, আরোগা, মাইকেল ফ্যারাডে, ওয়াটসন, সালভা, স্টিনহিল, মর্স, আলভা এডিসন, ম্যাকসওয়েল, জগদীশচন্দ্র, লিন্ডসে, হাইটন, সোমেরিং, বেকেরেল, রন্টগ্যেন, গ্রেহাম বেল – বিজ্ঞানীরা তাদের জীবনের সফলতার কথা শুনিয়ে অংশুমানের মগ্ন-চেতনাকে উদ্দীপিত করেছে।

কারাগারের বন্দিজীবনে সে দেশ আর অন্তরাকে নিয়ে ভাবে। তার মনে প্রশ্ন জাগে, সে কি দেশকে ভালোবাসে না অন্তরাকে? বিভিন্ন সময়ে তার অন্তরাকে মনে পড়ে। কখনো কখনো সে লজ্জিত হয় কারণ অন্তরা ব্রিটিশ সরকারের চাকুরের স্ত্রী। তার এ লজ্জা ভাঙতে জৈব-বিদ্যুতের উদ্যোক্তা ও বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী লুইগি গ্যালভানি তাকে

বলেছেন, ভালোবাসাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। এতে কোনো লজ্জা নেই। তিনি ভালোবেসেছিলেন বলে এত বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে পেরেছেন। আসেন বড় বৈজ্ঞানিক অরস্টেড। তাঁর উত্তরসূরি আরেকজন এসে অংশুমানকে বলেন, "দেশই তোমার বরাবর লক্ষ্য, প্রণয়িনীটা উপলক্ষ মাত্র। প্রণয়িনীই যদি তোমার লক্ষ্য হত, তা হলে তুমি পাঁচিল টপকাতে, ডেপুটি পোড়াতে যেতে না।" (বনফুল, ২০১২/৪: ৫০৫) হেনরি ও ফ্যারাডের মতে, ইলেকট্রিসিটি ও ম্যাগনেটিজম একই জিনিসের এপিট-ওপিঠ। বিদ্যুৎপ্রবাহ লোহার তারকে যেমন চুম্বকে পরিণত করে তেমনি চুম্বকও লোহার তারকে বিদ্যুতায়িত করতে পারে। আসলে একই শক্তির বহুরূপ। বিদ্যুৎ, চুম্বক, আলো, একই শক্তির বিভিন্ন খেলা। অংশুমানের প্রেমও তাই। দেশ বা অন্তরা যাকেই সে ভালোবাসে, জিনিসটা এক। বেশি তার জড়ালে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটের শক্তি যেমন বাড়ে তেমনি দেশের বেশি লোককে ভালোবাসলে দেশপ্রেমও বাড়বে (বনফুল, ২০১২/৪: ৫০৮)। বনফুল এখানে বিদ্যুতের শক্তিকে বিপ্লবের শক্তির সাথে সমন্বয় করেছেন। বিদ্যুতের শক্তি যেমন সর্বব্যাপী, তেমনি বিদ্রোহের আগুনও সর্বব্যাপী বিরাজমান হোক – এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন লেখক। বনফুল বৈচিত্র্য-সন্ধানী লেখক, উপন্যাসটিতে তাঁর মনের বিচিত্রতা দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটিতে 'আর্ট' এবং বিজ্ঞানের চমৎকার মেলবন্ধন করেছেন লেখক। নারীপ্রেম, দেশপ্রেম এবং বিজ্ঞান ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলির মধ্যে চমৎকারভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে।

জার্মান বিজ্ঞানী হারৎজ অংশুমানের সব কষ্ট ও আঘাতকে আনন্দে রূপান্তরিত করতে পরামর্শ দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা যেমন নতুন কিছু আবিষ্কারের লক্ষ্যে সবরকম বাধাবিঘ্নকে উপেক্ষা করে তাঁদের উদ্দেশ্যের প্রতি একনিষ্ঠ থাকে, তিনি তেমনি থাকতে বলেছেন অংশুমানকে। আঘাতে কাবু হয়ে পড়লে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় নাা। পথ চলার প্রধান পাথেয় হলো আনন্দ। শত্রুর আঘাতকে যেকোনো মূল্যে আনন্দে রূপান্তরিত করে জয় সুনিশ্চিত করতে হবে। অনুভূতির বিশেষ একটা রূপকে আঁকড়ে ধরে কষ্ট পাওয়ার মধ্যে কোনো অর্থ নেই। কষ্টকে আনন্দে রূপান্তরিত করতে হবে অনুভূতির তরঙ্গগুলোকে বিশেষ একটা পরকলার ভেতর দিয়ে চালিত করে। পরকলা কেবল কাচেরই হয় না, মানসিকতারও হতে পারে। একটা বিশেষ মনস্তত্ত্বের ভেতর দিয়ে গেলে যন্ত্রণাও আনন্দদায়ক হতে পারে তার প্রমাণ স্যাডিজমে (বনফুল, ২০১২/৪: ৫৪৯) বিজ্ঞানীর এমন কথায় পুলিশি নির্যাতনে আহত অংশুমান নিজের উদ্দেশ্যের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে অবশেষে ফাঁসিকে আনন্দে বরণ করে নেয় –

> সেদিন পূর্ণিমা শেষ রাত্রি। সামনেই ফাঁসির মঞ্চ। অন্তরা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। অংশুমান মৃত্যুর কথা ভাবছিল না। মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়েছিল সে। অনাবিল জ্যোৎস্নায় মহাকাশ পরিপ্লাবিত। পৃথিবীর ধূলিতে লেগেছে আকাশের স্পর্শ, জেগেছে অনাগতলোকের স্বপ্ন। রূপসাগরের কানায় কানায় অপরূপ সৌন্দর্যসুধা যেন টলমল করছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উড়ে যেতে চাইছে যেন পৃথিবীর দৃষ্টির ওপারে চক্রবাল রেখা ছাড়িয়ে। ওটা মেঘ নয় – নৌকোর পাল – ভারতের স্বর্গীয় অমরবৃন্দ বোধ হয় যাত্রা করেছেন আজ

> মর্ত্যের দিকে – ক্ষুদিরাম-কানাইলালের দল ওটা তাদেরই পালতোলা নৌকো – পালে লেগেছে পারিজাতগন্ধী হাওয়া – দুলছে তাতে নন্দরবনের মন্দারমঞ্জরী। (বনফুল, ২০১২/৪: ৫২১)

তৎকালীন স্বার্থপর দেশ নেতাদের মতিবিভ্রম ঘটায় তাঁরা দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকেই বড় করে দেখেছেন। তাঁদের কাছে দেশের স্বাধীনতা নয়, নিজেদের প্রতিষ্ঠালাভই তাঁদের রাজনীতির লক্ষ্য ছিল। ফলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। বনফুল এরূপ নেতাদের প্রতি ছিলেন বিরূপ মনোভাবাপন্ন। মানবদরদি লেখক বনফুল দেশের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা থেকে তাঁর লেখনী ধারণ করেছেন। আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্বদেশিদের প্রতি বনফুলের বরাবরই শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা ছিল। এ উপন্যাসে অংশুমানের বিদ্রোহী সত্তায় বনফুলের বিপ্লবী মনের পরিচয় পান পাঠক। বনফুল প্রত্যক্ষভাবে পলিটিকস করেননি কিন্তু আগস্ট আন্দোলনে পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। *পশ্চাৎপটে* বনফুল বলেছেন –

> আমি কোনও রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত ছিলাম না। কিন্তু অনেক স্বদেশি বিহারী যুবক আমাকে শ্রদ্ধা করিত। তাহাদের মুখেই সব খবর পাইতাম। তাহারা রোজ রাত্রে আমার নিকট আসিয়া সব খবর দিয়া যাইত। সে সময় বাহিরের পৃথিবী হইতে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। চিঠি নাই, কাগজ নাই। একমাত্র যোগাযোগ ছিল রেডিওর মাধ্যমে।... সুভাষবাবুর বক্তৃতা শুনিব বলিয়া কিছুদিন আগে আমি একটি রেডিও কিনিয়াছিলাম। (বনফুল, ১৯৯৯: ২০৭-২০৮)

উপন্যাসের নায়িকা অন্তরা কমিউনিস্ট অংশুমানের রাজনীতিক বন্ধু। তৎকালীন সমাজের একটি বাস্তব চরিত্র অন্তরার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্তরা তার কমরেড বন্ধু মীনা দত্তকে চিঠিতে চল্লিশের দশকের ভারতীয় কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ, তাঁদের আদর্শ নিয়ে বিস্তৃত লিখেছে। তার মতে, কমিউনিস্ট আদর্শের অনুসারী অনেকেই আদর্শের খোলস পরে থাকে। প্রকৃত অর্থে তারা ভণ্ড। নীহার সেনকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছে, তার মুখে কমিউনিজমের বুলি শুনে মুগ্ধ হয়ে। কিন্তু সাংসারিক জীবনে নীহার সেন ব্রিটিশ সরকারে চাকরি নিয়ে দেশদ্রোহী হওয়াতে অন্তরা তাকে ছেড়ে আসে নিজের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে। আগস্ট আন্দোলনের সময় অন্তরা অংশুমানের বিদ্রোহী মনের পরিচয় পায় এবং তার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথানত হয়ে আসে। অন্তরাও অংশুমানের মতো বিদ্রোহের আগুনে জ্বলেছিল। অন্তরা অংশুমানকে তার গহনা দিয়ে স্বদেশিদের সাহায্য করে। গহনার সূত্র ধরে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে যাচ্ছে বুঝতে পেরে সে পুলিশ অফিসারকে ট্রেন থেকে টেনে ফেলে দিয়ে হত্যা করে। তারও ফাঁসির রায় হয় অংশুমানের ফাঁসির একই দিনে।

বনফুল এই উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্র অংশুমান এবং অন্তরার চরিত্র নির্মাণে জটিল সময়কে রূপদান করেছেন, যুগযন্ত্রণাকে ধরার চেষ্টা করেছেন। 'Quit India' স্লোগানে দেশব্যাপী যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হয়েছিল তাতে যোগ দিয়েছিলেন যেসব বীর মানুষরা তাঁদের প্রতি ছিল বনফুলের অশেষ শ্রদ্ধা। অন্যপক্ষে সোভিয়েত রাশিয়ার মিত্রপক্ষে যোগ দেয়ার সূত্রে কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানো এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকারীদের বাধা দেয়ার কারণে এ দল সম্পর্কে বনফুলের মনে এক মানসিক বাধার সৃষ্টি হয়। বনফুলের পরবর্তী সময়ের গল্প-উপন্যাসে তাঁর এরূপ মনোভাব পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ৮৬)।

১.৩

ভারতবর্ষের রাজনীতির কঠিন সময়কে বনফুল তাঁর *স্বপ্নসম্ভব* উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। *অগ্নি* প্রকাশিত হওয়ার বছরেই তাঁর *স্বপ্নসম্ভব* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতকে স্বাধীনতা দেবেন, কোন দলকে দেবেন – এ নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক জনমুখে। বনফুল তাঁর *পশ্চাৎপটে স্বপ্নসম্ভব* উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট নিয়ে বলেছেন:

> ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট পার্লামেন্টে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবেন। কাহাকে দিবেন, কংগ্রেসকে না মুসলিম লীগকে – ইহা লইয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনা, আলাপ-আলোচনা, সভা-মিছিল প্রভৃতি হইতেছিল। জিননাহ দাবী করিতেছিলেন যে, তাঁহারা একটি আলাদা 'নেশন', সুতরাং, তাঁহারা আলাদা রাজত্ব চান। হিন্দু নেতারা বই লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া প্রতিবাদ করিতেছিল তাহার। জওহরলাল নেহরু, গান্ধীজী বলিলেন– হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া নাই, ইংরেজ আছে বলিয়াই এ ঝগড়া। ইহার পরই নোয়াখালীতে ভীষণ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিল, তাহার পর বিহারে, তাহার পর অন্যান্য নানা জায়গায়। কলিকাতায় তখন মুসলিম লীগ গভর্নমেন্ট। সেখানে নিদারুণ ক্যালকাটা কিলিং হইয়া গেল।... সারা দেশ ব্যাপিয়া হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার একটা ঝড় বহিতে লাগিল।... এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তখন *স্বপ্নসম্ভব* নামে একটি বই লিখিয়াছিলাম আমি। (পৃ. ২১৮)

বিষ্ণু বসু *'বনফুল উপন্যাস সমগ্র'* এর চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায় উক্ত উদ্ধৃতির ঘটনাক্রমে সংশোধন এনেছেন যা যুক্তিসংগত। মুসলিম লীগের ঘোষিত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পরিণতি পায় কলকাতা দাঙ্গায় যা ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারই প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালী, তারপর বিহারে ও অন্যান্য জায়গায় দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

এ উপন্যাসের পটভূমি ছেচল্লিশের দাঙ্গাবিধ্বস্ত ভারতবর্ষ। উপন্যাসের নায়ক যতীন ঘরে বসে খবরের কাগজে প্রতিদিনের দাঙ্গার ঘটনা পড়ে। দাঙ্গার বীভৎসতার খবর পাঠ করে সে বিমর্ষ, উদভ্রান্ত ও বিষণ্ন বোধ করে। পূর্ববর্তী উপন্যাস *অগ্নির* নায়ক অংশুমানের কল্পজগতে যেমন অনেক বিজ্ঞানীর আগমন ঘটে এবং তারা অংশুমানের বাস্তবজগতের অনেক প্রশ্নের সমাধান করে দেয়, তেমনি যতীনের জগৎও বাস্তব ও কল্পজগতের সমন্বয়ে গড়ে

উঠেছে। যতীনের কল্পজগতে টিকটিকি, ভোমরা, প্রাণস্পন্দিত পাথরের মূর্তি রয়েছে, আর রয়েছে বাস্তবের মানুষরা এবং তাদের ছায়া শরীর। বাস্তবের মানুষরা অশরীরী হয়ে তার কল্পজগতে আসা যাওয়া করে – এভাবে বাস্তব আর কল্পজগতের সমন্বয় ঘটেছে তাঁর জীবনে। প্রায় বিশ বছর পরে প্রকাশিত *মানসপুর*-এর নায়ক বিশ্বম্ভরের জগৎও বাস্তব ও কল্পজগৎ নিয়ে গড়ে উঠেছে। সাধারণত কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্য দিয়েই লেখকের জীবন দর্শন বা তার মনোভাবনার প্রকাশ ঘটে থাকে। যতীনের ভাষার মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান নিয়ে লেখকের ভাবনার কথা জানতে পারে পাঠক। বনফুল জীবন চলার পথে যেমন হিন্দু পরিবারের সংস্পর্শে এসেছেন, ঠিক তেমনি অনেক মুসলমান পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। বিহারের মুসলমান ভদ্রলোকদের দেখেছেন খুব কাছ থেকে। মানুষ হিসেবে, ভারতীয় হিসেবে নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার পূর্ণ অধিকার মুসলমানদের রয়েছে – এ কথা মানতেন বনফুল। তবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শর্ত হিসেবে মুসলিম লীগ থেকে আলাদা ইসলাম ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রস্তাব করা হলে তখন তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি তিনি। পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল বলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বিরূপ ছিলেন তিনি। পাকিস্তান প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ শাসক দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে রাজনীতিক শক্তি হিসেবে মুসলমানদের প্রতি, তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রস্তাবের প্রতি বনফুল প্রসন্ন হতে পারেননি। বলা যায়, ইতিহাসের একটি সাময়িক ঘটনাবর্ত থেকে তাঁর মনেরও ওই সাময়িক বিরূপতার সৃষ্টি। তবে যেখানে ইতিহাসবোধ মানবতাবোধেরই উৎস – সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো ভেদরেখা ছিল না। *স্বপ্নসম্ভব* উপন্যাসে বনফুলের এরূপ মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ করা যায় (পবিত্র, ১৯৯৯: ৩১৬)।

যতীনের চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়েই আমরা বনফুলের মানসজগতের পরিচয় পাই। বনফুল যে আদর্শ সমাজের কল্পনা করতেন তা যতীনের কথার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। পাড়ার কথাকথিত কমিউনিস্ট শৈলেনের মতে, সামাজিক বৈষম্য দূর করাই কি আমাদের সর্বপ্রধান কাজ হওয়া উচিত? সাম্য না হলে স্বরাজের কোনো মানে হয়? প্রতি উত্তরে যতীন বলেছে –

বৈষম্য কোনও দিন দূর হবে বলে মনে করি না। তবে যে স্বরাজ আমি কামনা করি, তাতে সাম্য না থাকলেও প্রতিটি লোকের স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে। খাওয়া, পরা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের অভাবে কেউ কষ্ট পাবে না, সকলেই সমান সুযোগ পাবে বড় হওয়ার। আর সবচেয়ে বেশি কি চাই জানেন – প্রত্যেকটি ভারতবাসী ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবে। লোভে লালায়িত হবে না, হিংসায় জর্জরিত হবে না। ঐশ্বর্য নয়, শান্তিই হবে তার কাম্য।" (বনফুল, ২০১২/৪: ৭১২)

বনফুলের অনেক প্রবন্ধে সমাজচেতনার ভাবনার কথা রয়েছে। বনফুলের প্রবন্ধের সমষ্টি *ভাষণ*-এর একটি রচনায় তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট। তাঁর মতে, মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা তখনই সম্ভবপর হবে যখন আমাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার বদলে আসবে একতাবোধ ও দৃঢ় চরিত্রবল। একতাবোধ থাকলে আমরা সবাই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে জিনিস কিনব না, মূল্য ন্যায্য না হওয়া পর্যন্ত এবং কালোবাজারির প্রশ্রয় দেব না। তখনই মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য প্রতিবাদ সফল হবে। (পবিত্র, ১৯৯৯: ২১৮)

বনফুল যে সমাজ বা রাষ্ট্র কামনা করেছেন তা অবশ্যই কমিউনিস্ট রাষ্ট্র নয়, তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যেখানে সবার ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্র, প্রত্যেকের মেধার বিকাশের ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকবে রাষ্ট্র থেকে।

শৈলেন-যতীনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে চল্লিশের দশকের ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী বাঙালি ও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বাঙালির মতপার্থক্য উঠে এসেছে। যতীন শৈলেনকে বলেছে, সনাতন হিন্দু ধর্মের কোনো গণ্ডি নেই, কোনো বেড়া নেই, অসীম উদারতাই এর বিশেষত্ব। মুসলমানদের ভয়টা অমূলক, অখণ্ড ভারতে ওরা আনন্দেই থাকবে। হিন্দু ধর্মের এ উদারতার কথায় শৈলেনের বক্তব্য, পাড়াগাঁয়ের পুকুরঘাটে গেলে হিন্দু ধর্মের উদারতার নজির দেখতে পাওয়া যাবে। কারণ হিন্দুর ঘাট থেকে মুসলমান জল নিতে পারে না, হিন্দুর গ্রামে মুসলমানের কোরবানি করবার উপায় নেই। এমনকি হিন্দু ধর্মের উদারতার ঠেলায় শিডিউলড কাস্ট নামে আর একটা নতুন জাতই তৈরি হয়ে উঠেছে। যতীনের মতে, এটা আসলে হিন্দু ধর্মের দোষ নয়, এটা অশিক্ষার দোষ। ভারতের সনাতন ধর্ম অস্পৃশ্যতাকে ঘৃণা করেনি, প্রমাণ হিসেবে সে কবীর, নানক, দাদু, রজ্জবের নাম উল্লেখ করে। স্বাধীন ভারতে অস্পৃশ্যতা বলে কিছু থাকবে না, সেখানে ভারতধর্মই প্রতিষ্ঠিত হবে। তা দূর করার চেষ্টা অব্যাহত আছে এবং তা সফলকাম হবে। এজন্য ভারতকে টুকরো টুকরো করার প্রয়োজন হবে না, অখণ্ড ভারতই তাদের কাম্য।

যতীনের মেজদা কমিউনিস্ট শৈলেনকে চড় মেরে অপমান করেছে। তার চড় মারার পেছনে যুক্তি হলো – সে কোথাও এতটুকু ভালো দেখতে পায়নি। সে ধার্মিকের মধ্যে ভণ্ডকে, স্বদেশবাসীর মধ্যে স্বার্থপরকে, সাহিত্যিকের মধ্যে যশাকাঙ্ক্ষীকে, উপকারীর মধ্যে মতলববাজকে, পত্নীপ্রেমে যৌন-লালসাকে দেখেছে। সে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় গুণ্ডাদের প্রতিরোধ করতে যাচ্ছে, সেটা তার বড়দাকে ভয় করে সে কারণে। তবে যতীন অনেক কিছুর মধ্যেই ভালো দেখতে পায়। তার কথা হলো, ত্যাগের আদর্শকে যদি শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে সবাই মেনে নেয় তাহলে অনেকে ভদ্রলোক হবে, সমাজে শান্তি আসবে। আদর্শ ক্ষত্রিয় সমাজ গড়ে তুলতে হবে। তারা যুদ্ধ করবে দেশকে রক্ষা করবার জন্য। অন্য দেশ লুট করার জন্য নয়। এ স্বপ্ন সফল করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনতে

হবে। এর আগে অবশ্যই দেশের স্বাধীনতা দরকার। প্রয়োজনে সহিংস অহিংস আন্দোলন করে স্বাধীনতা আনতে হবে। শৈলেনের সঙ্গে মতের মিল না হলেও সে সারা জীবন দেশের কাজই করে গেছে, তাই তাকে আলিঙ্গন করে যতীন।

মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন দাস, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম ভারতবর্ষের অসাম্প্রদায়িক চেতনার সাহিত্যিক ও নেতারা যতীনের কল্পনায় এসে দেখা দিয়েছেন। যারা প্রচার করেছিলেন একতার বাণী, মিলনের বাণী। দাঙ্গার সময় বিপদাপন্ন হয়ে যতীনের ঘরে তার বাল্যবন্ধু মহীউদ্দিন আশ্রয় চাইতে আসে। যতীন তাকে নির্ভয়ে থাকতে দিয়েছে। প্রথম দিকে তার বিশ্বাস হয়নি সে যতীনের কাছে আশ্রয় পাবে। বনফুল মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিমুখ ছিলেন না কখনো। জীবন চলার পথে অনেক মুসলমান পরিবারের সাথে তার জানাশোনা হয়েছে। তিনি বিহারি মুসলমান ভদ্রলোকদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন। লেখকের অসাম্প্রদায়িক চেতনাই মূলত যতীন-মহীউদ্দিনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বপ্নসম্ভব লেখার পেছনে লেখকের একটি গল্প রয়েছে। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার সময় বনফুল খবরের কাগজের মাধ্যমে জানতে পারেন, নোয়াখালীর দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় শান্তি স্থাপনের জন্য চারজন স্বেচ্ছাসেবক যুবক সেখানে গিয়েছেন। তাদেরই একজন সৌরেন বসু। বনফুলের চেতনাজগৎকে এ ঘটনাটি নাড়া দিয়েছিল। তাই বনফুল তাকে *স্বপ্নসম্ভব* গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। উপন্যাসে যতীনের বোন রুমির প্রণয়ী সমর নোয়াখালীতে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে গিয়ে খুন হয়েছে। রুমি যতীনের বাকি কাজ সম্পন্ন করতে ঘর ছেড়ে সেখানে যায়। এ সমরকে সৌরেন বসু ধরে নেয়া যেতে পারে, পার্থক্য কেবল সমর খুন হয়েছে, সৌরেন কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছে।

১.৪

পঞ্চপর্ব (১৯৫৪) উপন্যাসটিকে লেখক পাঁচটি পর্যায়ে বিভাজন করেছেন। *পঞ্চপর্ব*তে ভারতবর্ষের রাজনীতির শেষ পর্যায়ে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার খণ্ড খণ্ড চিত্র উঠে এসেছে। এর পটভূমিতে দেশ-বিভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে কালোবাজারিদের প্রকৃত অবস্থার কথা রয়েছে। এ উপন্যাসটিকে কেউ কেউ ডিটেকটিভ জাতীয় উপন্যাস বলে আখ্যা দিয়েছেন। এখানে প্রধান কাহিনির সাথে অনেক উপকাহিনি রয়েছে, সেসব উপকাহিনির একটি হলো ওসি কুণ্ডর ডিটেকটিভ কর্মকাণ্ড। কিন্তু ওসি কুণ্ডের ডিটেকটিভ কাজটিও পূর্ণতা পায়নি। কারণ উপন্যাসের শেষে তাকে পাগল বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে ডিটেকটিভ উপন্যাস বলা কতটা সমীচীন তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। উপন্যাসের কাহিনি-উপকাহিনি সব জায়গাতেই প্রায় সমানভাবে সদ্য-

স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সমস্যাগুলো স্থান পেয়েছে। প্রধান চরিত্র শ্রী বিধুভূষণ মল্লিকের দেশনেতার ছদ্ম-পরিচয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং বিপ্লবীদের কারাগারের বিদ্রোহসহ অনেক ঘটনা উপকাহিনির সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র বিপ্লবী বরেন এবং তার দলের কাজ হলো রিফিউজিদের ধনীর কবল থেকে রক্ষা করা। বিধুভূষণের চালচলন তার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে। কেন বিশাখাকে বিধুভূষণ আটকে রেখেছেন, কেন বিশাখার স্যুটকেস তাকে ফেরত দিচ্ছেন না। নানা ভাবনা-চিন্তা থেকে তাঁর মনে হয়েছে এখানে থাকলে অচিরেই তাঁকে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হবে। তাই রিফিউজি বিশাখাকে বরেন একা রেখে যাননি। '... মেয়েটিকে এমনভাবে ফেলিয়া যাওয়া কি উচিত? ইহাদের রক্ষা করাই তো তাঁহাদের সমিতির উদ্দেশ্য।' (বনফুল, ২০১৩/৭: ৬৮১)

লাইটহাউসে সিনেমা দেখতে গিয়ে প্রতিপক্ষের সাথে বরেনদের গোলাগুলির ঘটনায় বিশাখা অবাক হয়েছে। বিশাখা বরেনকে ভালো মানুষ মনে করছে না। তাই বিশাখা বিধুভূষণের বাড়িতে ফিরে যেতে চাইলে বরেন তাকে যেতে দিতে চাইছে না। কারণ সামান্য গোলাগুলির ঘটনা থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কারো উপর থেকে বিশ্বাস হারানো উচিৎ না। বরেনদের দলের প্রত্যেকে শিক্ষিত, তাদের মধ্যে একটি আদর্শ আছে। যে ভণ্ডামি, যে জুয়াচুরি দেশকে অধঃপাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধেই তাঁর দল বিদ্রোহ করছে। বিদ্রোহ করে তারা ফাঁসিকে বরণ করে নেবে। তবু তারা থামবে না। বরেন তাঁর দলের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশাখাকে বলেন –

> দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ। সেই আদর্শ-ই অনুসরণ করছি আমরা, বাক্যে নয় কাজে। অনেক নিপীড়িত রেফিউজিদের আমরা সাহায্য করেছি, অনেক কালোবাজারিকে শায়েস্তা করেছি, অনেক অসাধু, চরিত্রহীন গভর্নমেন্ট অফিসারকে আমরা শাস্তি দিয়েছি। আপনি যদি চান আপনাকেও যথাসাধ্য সাহায্য করব। সমস্ত প্রদেশেই আমাদের লোক আছে। হিন্দু, মুসলমান, বাঙালি, বেহারি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, সিন্ধি, গুজরাটি সবরকম লোকই আছে আমাদের দলে। (পৃ. ৬৮৪)

দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন – এ মানসিকতা থেকে বরেন ও শিবাজী কলেজ জীবন শেষ করেছে। বরেনদের দলে আছে ভার্গব, আন্নাকালী, মলয়কুমার। বর্তমানে তারা কালোবাজারিদের ধন-সম্পদ লুট করে দুস্থ বাস্তুহারাদের কল্যাণে অর্থ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত। এদের মধ্যে শিবাজির কাজ হচ্ছে দেশের পটেনশিয়াল তরুণ-তরুণীদের জোর করে ধরে এনে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আটক করে রাখে। দলের সবাই আটক ব্যক্তিদের নিঃস্বার্থভাবে দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে বোঝায়। এক পর্যায়ে আটক ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় দেশের স্বার্থে তাদের দলে যোগদান করে। দলে যোগদান করে তারা ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং প্রত্যেকে তাদের নাম বদলে ফেলে। ফলে আন্নাকালী হয়ে যায় মনিকা, মলয়কুমার পরিণত হয় গোপীনাথে।

চরিত্রের স্বতন্ত্রতা উপন্যাসটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। প্রত্যেকটি চরিত্রকে লেখক সমান গুরুত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। স্বাধীনতার পর দেশের কালোবাজারিদের ব্যবসার রমরমা অবস্থা উদ্বাস্তু বিষ্ণুচরণের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। বিষ্ণুচরণের বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া এবং অপমানের প্রতিশোধ নিতে 'মাসাজ অ্যান্ড বাথ' খোলার পরিকল্পনা করে। যে মেয়েকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল সেই মেয়েটি ও তার বাবা কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে ভারতে পালিয়ে এসেছে। তাদের বিষয়-সব পাকিস্তানে আটকে পড়ে আছে। নিঃস্ব ও নিরুপায় হয়ে পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে মেয়েটিকে 'মাসাজ অ্যান্ড বাথ'-এ কাজ করতে হয়। মেয়েটিকে বিয়ে করে জীবনে শান্তি ফিরে পাবার জন্যে বিষ্ণুচরণ পরিকল্পনা করে। এক ভদ্রলোকের কাছে 'মাসাজ অ্যান্ড বাথ' সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে ভদ্রলোক তাকে বুঝিয়ে বলেন–

> পাকিস্তান থেকে যেসব বেওয়ারিশ মাল এসে জমেছে তাদের একটি গতি হওয়া চাই তো! সব রকম অগতির গতি এই কলকাতা শহর। গতি এখানে প্রগতি হয়। আমরা হু হু করে সভ্য হচ্ছি, বুঝলেন না। এখানকার অনেক ভদ্রলোকও মোটা টাকার লোভে ওখানে মেয়ে পাঠাচ্ছে এ খবরও শুনেছি। (বনফুল, ২০১৩/৭: ৬৫৩)

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে দাঙ্গার সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন, উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি-বিনিময়, রিফিউজিদের নতুন পরিবেশ ও সংস্কৃতির সাথে খাপ খাওয়ানো, মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগা – এসব কিছুই উপন্যাসটিতে অত্যন্ত বাস্তবভাবে লেখক তুলে ধরেছেন। বিশাখার বাবা নবেন্দু বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ ওরফে জমিরউদ্দিন, দুটি বাস্তবঘেঁষা চরিত্রের মধ্য দিয়ে দুই সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বিনিময়ের জটিলতা উঠে এসেছে। বিষ্ণুচরণ বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়। তার কলকাতার তিনটি বাড়ি পাঞ্জাব-প্রবাসী নবেন্দু বিশ্বাসের পূর্ববঙ্গের বিশাল বিষয় এবং প্রকাণ্ড বাড়ির সাথে বিনিময় করে। নবেন্দু বিশ্বাস তার সম্পত্তি বিষ্ণুকে দলিল করে দেন আর বিষ্ণুচরণ সম্পত্তি দলিল করার আগেই (সেকেন্ড রায়টের সময়) হঠাৎ নবেন্দু বিশ্বাস মারা যান। ফলে বিষ্ণু তার সম্পত্তি দলিল না করার কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়। বিশাখা তার বাবা নবেন্দুকে দেখেনি কখনো। মা মারা যাওয়ার পর বিশাখা বাবার সন্ধানে বের হয়। অনেক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় চেপে শেষে সে বাবার সম্পত্তি ফিরে পায়।

উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই অসৎ, জটিল ও স্বার্থপর। তাদের বিবেক বলে কিছুই নেই। এমনকি লেখক প্রধান চরিত্রটিকেও সৎ ও সরল করে গড়েননি। কেন্দ্রীয় চরিত্র বিধুভূষণের বাবার পরিচয় না থাকায় ছোটবেলা থেকেই তাকে অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সইতে হয়েছে। জারজ সন্তান হওয়ায় কেউ তাকে ভালোবাসেনি। সবার চক্ষুঃশূল হয়ে তাকে সমাজে চলতে হয়েছে। সবাই তাকে রীতিমতো ঘৃণার চোখে দেখেছে। তার যখন বোঝার বয়স হয়েছে তখন

থেকেই তিনি মানুষের অপমান সয়ে সয়ে শিখেছেন, জীবনে বড় হতে হলে, সম্মান পেতে হলে দুটো জিনিস আয়ত্তে আনতে হবে। প্রথমত, ধনী হওয়া এবং দ্বিতীয়ত, সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করা। কালের পঙ্কিলতায় পড়ে, অনেক চড়াই-উতরাই পথ পেরিয়ে জীবনের আলোর পথে আসার জন্য মন স্থির করেছেন। ছেলেবেলার বন্ধুর শালীর মেয়ে সুলোচনাকে বিয়ে করতে সম্মতি হন তিনি। আর তখনই তিনি জানতে পারেন সুলোচনা বহন করছে বিয়েবহির্ভূত সন্তান। এ কথা জানার পরও তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেননি। বরং বলেছেন–

> তা হোক। আমার মা-ও কুমারী অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। কুন্তীও হয়েছিল। আমি ছেলেবেলায় বড় কষ্ট পেয়েছি ভাই। আমাকে কেউ ছুঁতো না, পাঁঠা বলে ডাকত সবাই। সুলোচনার সন্তান দুঃখ পাবে না আমার কাছে। ছেলেবেলায় ভালোবাসা না পাওয়ার যে কি দুঃখ তা মর্মে মর্মে আমি জানি। সুলোচনার ছেলেকে বুকে করে মানুষ করব আমি– আমাকে তুমি বিশ্বাস কর– (বনফুল, ২০১৩/৭: ৭৪৫)

এ উপন্যাসের স্বার্থপর, জটিল ও সুবিধাবাদী চরিত্রগুলো সম্পর্কে লেখক কিন্তু নির্মম নন। তাই তিনি তাদের শাস্তির বিধান দিতে চাননি। তিনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অদ্ভুত এক ধরনের অসহায়তা অনুভব করেন। আর এ কারণেই কখনো কখনো এসব চরিত্রের মধ্যে অনুশোচনা এবং কৃতকর্মের প্রতিবিধান করার ইচ্ছে জাগিয়ে তোলেন। বিধুভূষণের মতো কুৎসিত, জটিল ও খুনি চরিত্রের মধ্যে জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে। লেখকের মনস্তত্ত্বের এ গতিপ্রকৃতি প্রশংসনীয় (ভূমিকা, সুমিতা, বনফুল; ২০০০: ১২)।

১.৫

বনফুলের উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের জীবন যত অন্ধকার ও যত পঙ্কিল হোক না কেনো, সবকিছুকে ছাপিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই তাদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠে। সমসাময়িক অনেকের মতো বনফুলও দেশ-বিভাগ সমর্থন করতে পারেননি। তবে বাস্তবকে স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। দেশ-ভাগের ফলে বাঙালিকে যে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল, যে অত্যাচার সইতে হয়েছিল তার জন্য দীর্ঘদিন ধরে বনফুলের অন্তরে ক্রোধ ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত ছিল। কারণ স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বনফুলের মনে অনেক প্রত্যাশা ছিল। স্বাধীনতা-লাভের পর যুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দেশ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত ছিল। তার চেয়ে বড় কথা ছিল মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, যা বনফুলকে অনেক বেশি পীড়া দিয়েছিল। এ মনঃকষ্ট থেকে রচিত হয়েছে তার *ত্রিবর্ণ* (১৯৬৩) উপন্যাসটি, যেখানে উদ্বাস্তু সমস্যা বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তুলে ধরেছেন। *ত্রিবর্ণ* লেখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বনফুল *পশ্চাৎপটে* উল্লেখ করেছেন –

স্বাধীন ভারতে বাঙালীর গৌরবের স্থান কোথাও রহিল না। স্বাধীনতার পরই দেশে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গেল। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ হিন্দু-মুসলমানের রক্তে ভিজিয়া গেল। পাঞ্জাব হইতে দলে দলে লোক এদেশে আসিতে লাগিল। এ দেশ হইতে অনেক মুসলমান পাঞ্জাবী পশ্চিম পাঞ্জাবে চলিয়া গেল। মহাত্মা গান্ধী নিহত হইলেন।...মনে হইল আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষটি চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় বসিয়া লিখিতেছিলাম, এমন সময় আমার বড় ছেলে অসীম ছুটিয়া আসিয়া খবরটা দিল। গুজব রটিয়া গেল একজন মুসলমান তাঁহাকে মারিয়াছে।... একটু পরেই রেডিওতে পণ্ডিত জওহরলাল ঘোষণা করিলেন, ঘাতক মুসলমান নয়, একজন হিন্দু, নাম নাথুরাম গড্‌সে। পর দিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একটি শোক সভা হইল। সেই সভায় আমি স্বরচিত– 'হে মহা পথিক, হে মহা পথ– ' কবিতাটি পাঠ করি।... সে সময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়া বড় গোলমেলে।... আমার মনে হয়, আমার ত্রিবর্ণ নামক গ্রন্থের মাল-মসলা তখনই আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইতেছিল। (বনফুল, ১৯৯৯: ২১৯-২০)

দেশ-বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং পশ্চিমবাংলা ও বিহারের শরণার্থীদের অনেক সমস্যার কথা উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক পূর্ব বাংলায় তাদের বাসস্থান ফেলে রেখে পশ্চিম বাংলায় যাওয়ার পথে মা আর বোনকে হারিয়ে ফেলে। সে একজন ডাক্তারের পরিবারে আশ্রয় নেয়। সব শেষে জানা যায়, ওই ডাক্তারের স্ত্রী নায়কের হারানো বোন। প্রধান তিনটি চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে উদ্বাস্তু সমস্যা তিনটি রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে– সবুজ, সাদা আর লাল। স্কুলমাস্টার গণেশ হালদারের রঙ সবুজ, তিনি চির নবীন, চির সুন্দর। চির নবীন এ যুবক আইনসম্মত উপায়ে উদ্বাস্তুদের প্রতি অবিচারের প্রতিকার করার চেষ্টা করেছেন এবং বলা যায় সফলও হয়েছেন তিনি। বিলেতি ডিগ্রিধারী ডাক্তার সুঠাম মুখার্জির রঙ সাদা। তিনি উদারপন্থি, সবকিছুর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা তার স্বভাব। লাল রঙের অধিকারী একটি মেয়ে নাম ঝিনুক। যাদের উগ্রপন্থীরূপে উপন্যাসে বর্ণনা করা হয়েছে। এরা ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে যেনতেনভাবে তাদের সমস্যার সমাধান করে থাকে। মিথ্যা, জুয়াচুরি, জবরদস্তি, খোশামদ, খুন-জখম সবকিছুই তাদের কার্যকলাপের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ তারা উগ্ররকমের বেপরোয়া, তাই তাদের রঙ লাল। এ লাল দলে আছে ঝিনুক, ডাক্তার ঘোষাল, স্টেশন মাস্টার সুবেদার খাঁ, মি. সেন, সেনের মেয়ে তনিমা, ঝিনুকের বোন শামুক। উল্লেখ্য, লাল বলতে এখানে কমিউনিস্টদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের অস্থির পরিবেশ ও অরাজকতা দেখে বনফুলের মন ভারাক্রান্ত থাকত তাঁর প্রমাণ তার অনেক লেখায় মেলে। *অধিকলাল* উপন্যাসে অধিকলালকে ঘুষখোর এবং কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্যে টিকতে না পেরে সরকারি চাকরি ছেড়ে গ্রামে এসে ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠদানে তাদের প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে সর্বস্ব নিয়োগ করতে দেখা গেছে। তেমনি অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট হয়েও গণেশ হালদার কোথাও কাজ পাননি স্বাধীন

ভারতের সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার জন্য; এবং অন্যদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দু হওয়াতে চাকরির সম্ভাবনাও কমে গেছে। শেষে তাকে একটি স্কুলে সামান্য বেতনে কাজ নিতে হয়েছে। তিনি সবাইকে উদারতার মন্ত্রে ও আইনসম্মত পথে সংবিধান সংশোধন করার দাবিতে একাত্ম করতে চান। তিনি প্রাদেশিকতা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন, যেখানে তৎকালীন গভর্নমেন্টকে নিয়ে অনেক সমালোচনা করেন। গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লেখা গণেশ হালদারের প্রবন্ধটি রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে ফেরত আসে। মুখার্জি নিজ উদ্যোগে প্রবন্ধটি ছাপানোর উদ্যোগ নেন। ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার আশায় গণেশ মাস্টারের স্কুলসহ বেশ কয়েক জায়গায় প্রবন্ধটি পাঠানো হয়েছে। কেবল একটি জায়গা থেকে কড়া সমালোচনা এসেছে, সেটি মাস্টারের স্কুল থেকে। তাকে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এরকম প্রবন্ধ লেখার কারণে লিখিতভাবে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখার সাহস যিনি রাখেন তিনি নিশ্চয়ই কোনো কারণেই ক্ষমা চাইতে পারেন না। তাই নতি স্বীকার না করে চাকরি ছেড়ে দিলেন তিনি। তৎকালীন রাজনীতির প্রকৃত চেহারাটি তুলে এনেছেন লেখক গণেশ মাস্টারের প্রবন্ধের মাধ্যমে।

দেশ গড়ার লক্ষ্যে ডাক্তার মুখার্জির পরামর্শে তিনি বাড়ির সামনের মাঠের বিরাট বটগাছের নিচে 'বনস্পতি' নাম দিয়ে স্কুল শুরু করে দেন। পড়ালেখার পাশাপাশি নিজ অধিকার সম্পর্কে দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যান তিনি। অকারণে জনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলার মিথ্যে অপরাধ মাস্টারের স্কন্ধে দিয়ে ছদ্মবেশী পুলিশ অফিসার তাঁকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে বক্তৃতা দেয়ার অধিকার আছে – এ যুক্তিতে মুখার্জি তাকে ছাড়িয়ে আনেন।

গণেশ হালদার উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে ডায়েরিতে তাঁর যে মতামত লেখেন, ঝিনুকের মতও একই। ঝিনুক মনে করে, ইতিহাসে এমন কথা বা ঘটনা বিরল না, এক দেশ থেকে উন্মূলিত হয়ে দলে দলে মানুষ অন্য দেশে গেছে। কিন্তু তাদের বেলায় একটু নতুন ধরনের ব্যাপার হয়েছে। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের তদারকে এক্সচেঞ্জ অব পপুলেশন হলো, পাকিস্তানের হিন্দুরা তাদের বিষয়-সম্পত্তির মূল্যও পেল, কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় সেটা হলো না। এ কারণে বাংলাদেশের উদ্বাস্তুরা জলে-স্থলে অনলে-অনিলে ছড়িয়ে পড়ল অসহায় ভেড়ার মতো। তার আরও মনে হলো – 'এই ব্যাপারটার সঙ্গে আমি নিজে জড়িত তাই আমার কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমাদের মর্মের ওপর দিয়ে এই যে তপ্ত লোহার রোলার চালানো হলো, এর কি কোনও প্রতিকার নেই?' (বনফুল, ২০১৩/১১: ৪২২) বাঙালি উদ্বাস্তুদের দুঃখ, দুর্দশা, তাদের অসহায়ত্ব লেখকের মর্মবেদনার কারণ ছিল, যা মাস্টার গণেশ হালদারের দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। *পশ্চাৎপটে* লেখকের সে মনোবেদনার কথাই রয়েছে –

> উদ্বাস্তু পাঞ্জাবীরা এখানে ভালোভাবেই নিজেদের স্থান করিয়া লইল।... কিন্তু হিন্দু বাঙালীদের বেলায় গভর্নমেন্ট কিছু করিলেন না। করিলেন কেবল উদ্বাস্তু ক্যাম্প।...স্বাধীন ভারতেও বাঙালীদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ দেখিয়া মনটা বড়ই দমিয়া গেল। মনে হইল, এখনও আমরা, হিন্দু বাঙালীরা, পরাধীন আছি। তফাৎ কেবল, আমাদের আগেকার প্রভুরা ইংরেজ ভাষাভাষী ছিলেন, এখানকার প্রভুরা হিন্দি-ভাষাভাষী। হিন্দু বাঙালীরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ, তাই শাসন ব্যাপারে তাহাদের কোনো হাত রহিল না। (বনফুল, ১৯৯৯: ২১৯-২০)

ঝিনুকের মত হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তুরা এ দেশে সম্মান নিয়ে থাকতে না পারার কারণে তাঁরা বিদেশ পাড়ি জমাচ্ছেন। সরকার তাদের জন্যে কিছু করছেন না। উদ্বাস্তু ক্যাম্পের সহায়তা তাদের জন্যে পর্যাপ্ত নয়। এ দেশের হর্তাকর্তারা তাদের দাবিয়ে রাখছে। তাদের জুতোর টিপুনিতলা থেকে তাঁরা পালাতে চায়। তাই মনের কষ্টের কথা মুখার্জিকে বলেন তিনি –

> এ দেশে আমাদের স্থান নেই এটা বুঝেছি। বাঙালি ছেলে-মেয়েদের নতুন দেশে নতুন দিগ্বিজয়ের আশায় বেরুতে হবে। এ দেশে ভোটের জোরে যারা রাজত্ব করেছে, আদর্শকে বলি দিয়ে যারা দেশ ভাগ করেছে, ভোটাধিক্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পূর্ববঙ্গ ভাগ করেও exchange of population করে নি, তাদের একমাত্র লক্ষ হচ্ছে বাঙালিকে দাবিয়ে রাখা। তাদের জুতোর টিপুনিতলা থেকে আমরা পালাতে চাই। (বনফুল, ২০১৩/১১: ৬১৭)

অবহেলা, অনাদর, অসম্মান ও অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে কোনো কোনো রেফিউজি নিজের আত্মসম্মান বোধ বজায় রাখার চেষ্টা করে। জীবন যন্ত্রনায় এভাবে পথচলা রেফিউজি ঝিনুক তাদেরই প্রতিনিধি। ডাক্তার মুখার্জিকে একবার একটি ছোট ছেলে নিজের খড়ের বিছানায় বসতে দিয়ে লেখার সুযোগ করে দেয়। ছেলেটি রেফিউজি এবং তার মা জ্বরে ভুগছে জানতে পেরে তিনি ছেলেটিকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঝিনুক ছেলেটিকে মুখার্জির কাছে এনে সেই টাকা ফেরত দিয়ে দেন। কারণ বাঙালি রেফিউজিদের বদনাম রটেছে, তারা নাকি ভিখারি। তাই তাদের চেনাশোনা কাউকে তিনি ভিক্ষা করতে দেবেন না। তারা সবাই রোজগার করেই খাবেন। তবে ঝিনুকদের দলে যারা আছেন তাঁদের রোজগারের পথ বেআইনি, তারা উগ্রপন্থী। সরকার তাদের জন্যে কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় তারা লুটেরা হয়েছে। তারা এদেশের লোকের সাথে ভদ্র ব্যবহার করছে না। তাদের ঘরবাড়ি-জমি দখল করছে। কারণ এদেশে তারা নিঃস্ব হয়ে এসেছে। তাই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তারা যা করছে তার জন্যে তাদের কোনো অনুশোচনা নেই বরং দুঃখবোধ আছে কারণ তাদের দিকে কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না। কিন্তু পাঞ্জাবিরা রেফিউজিরা এদেশে নিঃস্ব হয়ে আসেনি, এদেশে তারা তাদের নিজের দেশের মতোই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে।

মাস্টার গণেশ হালদারের উদ্বাস্তুবিষয়ক মতের সাথে (প্রবন্ধে লেখা) ডাক্তার মুখার্জি দ্বিমত পোষণ করে ডায়রিতে নিজের মতামত লিখেছেন যা প্রকারান্তরে লেখকেরই কথা –

> উদ্বাস্তু সম্বন্ধে আপনার ও আমার দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। আপনি নবযৌবনের আবেগে আইনসম্মত উপায়ে উদ্বাস্তুদের প্রতি অবিচারের যে প্রতিকার সন্ধান করেছেন, আমাদের সংবিধানের যে-সব দোষ ত্রুটির সংশোধন কামনা করছেন, তা নবোদ্‌গত অঙ্কুরের মতো আপনার প্রাণবন্ত জীবনীশক্তির পরিচায়ক। সবুজ রঙের সঙ্গে তার মিল আছে, তা চিরনবীন, তা সুন্দর। আমার যে দৃষ্টিভঙ্গি তাতে বিশেষ কোনও রঙের প্রাধান্য নেই। অথচ সব রঙই তাতে আছে। তাকে সাদা বলতে পারেন।... তৃতীয় ভাবেরও ভাবুক একদল আছেন। তাঁদের রং লাল।... উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে এই তিন জাতের ত্রিবর্ণ, একই সমস্যাকে নিয়ে তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, তিন রকমের মনোভাব আবিষ্কার করে আমি যেন একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আনন্দ উপভোগ করছি। তিন সংখ্যাটি মানবসভ্যতাকে বহুদিন থেকেই প্রভাবিত করেছে।... পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করেই বোধহয় মোটামুটি এই তিন ধরনের মনোভাব ফুটে উঠে। (পৃ. ৫৮৩)

সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিত মানবিকবোধ সম্পন্ন অনেকেই উদ্বাস্তু সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন নিজ উদ্যোগে। ডাক্তার মুখার্জি এমনই একজন ব্যক্তিত্ব যার অবদান স্মরণীয়। পাকিস্তানে রায়টের সময় বিলেত ফেরত মুখার্জি পাকিস্তান-হিন্দুস্থান বর্ডারের হাসপাতালে কর্মরত তাঁর বাল্যবন্ধুর বাসায় থাকতেন। উক্ত বর্ডার থেকে অজ্ঞান অবস্থায় ধর্ষিত একটি মেয়েকে হাসপাতালে আনা হয়। অনেক চেষ্টা করে দুই ডাক্তার বন্ধু মিলে মেয়েটিকে সুস্থ করে তোলেন। মেয়েটিকে উদ্বাস্তু কলোনিতে রাখা হলে সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা করত। তাই জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং মানুষের প্রতি ঘৃণা থেকে একদিন মুখার্জির কাছে এসে সে বলে – "আপনারা আমাকে না বাঁচালেই পারতেন। নরককুণ্ডে পঁচে মরার চেয়ে মৃত্যুই ভালো ছিল।" (পৃ. ৬৫৯) ডাক্তার মুখার্জির মনে হলো মেয়েটিকে যমের মুখ থেকে বাঁচিয়ে আনতে যখন পেরেছেন তখন তাঁকে মানুষের মতো বাঁচতে দিতে হবে। মেয়েটির মতামত নিয়ে আইনমতে, তিনি তাকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। এখানেই শেষ নয়, শুরু হলো সমস্যা। মেয়েটি স্বাভাবিক হতে পারছে না। 'ওকে এখানে নিয়ে এলাম। তারপরই সমস্যা শুরু হলো। ... রাত্রে আলাদা ঘরে, আলাদা বিছানায় শোয়। দিনের বেলা বেশিরভাগই ঠাকুর ঘরে বসে থাকে আর কাঁদে।' (প্রাগুক্ত)

মিস্টার মুখার্জিরা যেমন উদ্বাস্তুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তেমনি সরকারিভাবে রেফিউজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা রেফিউজিদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। মিস্টার সেন তেমনি একজন রেফিউজি-তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর বাড়িতে ঝিনুকের বোন শামুক কাজ করত। তাঁর পক্ষাঘাত স্ত্রীর সেবায় নিয়োজিত ছিল শামুক। এ সময় তাকে সেনের অনেক অপ্রীতিকর আচরণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেক চেষ্টায় সেনের কবল থেকে সে বেরিয়ে এসেছে। বিদেশ যাওয়ার আগে সেনকে উদ্দেশ্য করে সে চিঠিতে লিখেছে –

রাজনীতির কুটিল চক্রান্তে পড়ে আমরা গৃহহীন, সর্বস্বান্ত হয়েছি, আত্মীয়-স্বজন সব হারিয়েছি। বেড়াজালে যেমন মাছ ধরে তেমনি করে আমাদের ধরে এনে যে সব খাল-বিল-নালা-পুষ্করিণীতে দয়ার অবতার কর্তৃপক্ষেরা ছেড়ে দিয়েছেন, সেখানেও হয়তো আমরা কোনও রকমে টিকে থাকতে পারতাম। কিন্তু আপনাদের মতো হাঙর-কুমিরের উপদ্রবের জ্বালায় তা-ও আর সম্ভবপর হল না। আপনি শুনেছি আমাদের দেশের লোক, কিন্তু আপনার সরকারি মুখোশের আড়ালে যে মূর্তি দেখলাম তা ভয়ঙ্কর।...গুণ্ডাদের মুখোশ ছিল না, আপনাদের আছে, এইটুকুই যা তফাৎ। (পৃ. ৫৭৪-৭৫)

মিস্টার সেনের অনৈতিক কাজ সম্পর্কে তাঁর মেয়ে তনিমা ডাক্তার মুখার্জিকে বলেছে, বাবা তাকে টোপের মতো ব্যবহার করেছেন। বাবার বন্ধুরা তাকে মদ খেতে শিখিয়েছে। তনিমা তৎকালীন সময়ের একটি বাস্তব চরিত্র। এ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে বনফুল পাঠককে ইতিহাসের ক্রীতদাস যুগের সময়কে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলেননি। তনিমার জীবন কাহিনি শুনে এবং তার কান্না দেখে ডাক্তার মুখার্জি –

যেন এক ধর্ষিতা ক্রীতদাসীর কান্না শুনেছেন। তাঁর মনে হয়েছে দাস-বিক্রয় প্রথা উঠে যায় নি, তার বাইরের চেহারাটা বদলেছে কেবল। কামের দাস, লোভের দাস, অহঙ্কারের দাস, মানুষ আগে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার উপায়টা শুধু বদলেছে। (বনফুল, ২০১৩: ৫১৪)

ত্রিবর্ণ উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার দুই বছর আগে লেখকের *হাটে-বাজারে* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। সেখানেও তিনি দাস-প্রথার প্রসঙ্গটি এনেছেন ঠিক একইভাবে। ঘরে-বাইরে গীতাদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের কথা শুনে দাস-প্রথা সম্পর্কে ডাক্তার সদাশিবের যে গভীর উপলব্ধি হয়েছিল, একই উপলব্ধি হয় ডাক্তার মুখার্জির বেলায়ও। মানুষের প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতা থেকে, সমাজকে দাসমুক্ত করার মানসিকতা থেকে বারবার একই প্রসঙ্গ লেখকের কলম দিয়ে বেরিয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবাসীর মনুষ্যত্বের অভাববোধ বনফুলকে নিয়তই পীড়া দিয়েছে। তাঁর 'সম্বর্ধনার উত্তর' প্রবন্ধে এমন ভাবই ব্যক্ত হয়েছে:

মনুষ্যত্বের যে প্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে একদা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া উচিৎ। নপুংসক ভীরু মনোবৃত্তি আজ বাঙ্গালি জাতিকে বাকসর্বস্ব, হাস্যাস্পদ, বিদূষকে পরিণত করিয়াছে। স্বাধীনতার পরে আমাদের মনুষ্যত্ব দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থার অবসান ঘটাইতে গেলে রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্বের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমাদের এখন আত্মানুসন্ধানের একান্ত প্রয়োজন। (পবিত্র, ১৯৯৯: ২১৮)

উদ্বাস্তু কলোনির ডাক্তার অকৃতদার রাঘব ঘোষাল উদ্বাস্তুদের দেখভাল করেন। তিনি চোরাবাজার থেকেও রোজগার করেন। ঝিনুকের পরিবারকে দাঙ্গার সময় মুসলমানের কবল থেকে তিনিই রক্ষা করেন এবং তাদের বসবাসের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে দেন। কৃতজ্ঞতাবশত ঝিনুক তাঁর বাসায় থেকে রান্নাবান্নার কাজ করে দেন। ঝিনুকের দলের

আরেকজন হলো, সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে সুবেদার খাঁ। সে কালোবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং দেশের ধনীদের সম্পদ লুট করে বাঙালি উদ্বাস্তুদের কল্যাণে তা ব্যয় করে।

রাজনীতি-অবলম্বী জীবনের চালচিত্রবিষয়ক আলোচনান্তে বলা যায়, বনফুল সক্রিয় রাজনীতি-কর্মী ছিলেন না কিন্তু রাজনীতি সংক্রান্ত খবর সবসময় তাঁর মনকে বিচলিত করতো। একজন উঁচু দরের সাহিত্যিক সমাজ বাস্তবতায় রাজনীতিকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই সমাজের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই রাজনীতিকে অবলম্বন করে তিনি উপন্যাস লিখেছেন। আমরা দেখতে পেয়েছি, রাজনীতিবিষয়ক প্রথম উপন্যাস *সপ্তর্ষি*-তে বনফুলের রাজনীতি বিষয়ে কোনো স্পষ্ট মতবাদ প্রকাশিত হয়নি। সাতটি চরিত্রের দৃষ্টিকোন থেকে তিনি সমসাময়িক রাজনীতির বিভিন্ন ধারাকে তুলে ধরেছেন। উক্ত উপন্যাসে বনফুলের রাজনীতি বিষয়ে কোনো পক্ষপাতমূলক মনোভাব নেই। কিন্তু পরবর্তীকালের উপন্যাস *অগ্নি*, *স্বপ্নসম্ভব*, *পঞ্চপর্ব* ও *ত্রিবর্ণ* তে রাজনীতি বিষয়ে তাঁর মতামত অনেকটা স্পষ্ট বলে ধরে নেয়া যায়। *অগ্নি*-তে তিনি বেয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনকে উপজীব্য করেছেন। প্রকাশ্যভাবে তিনি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, ঠিক। তিনি শনিবারের চিঠির একজন নিয়মিত লেখক এবং এ গোষ্ঠীর অনেকেই প্রগতিশীলতার বিরোধী ছিলেন। কোনো ইজম তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাঁকে আঘাত করেছিল তা অবশ্যই গণতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা নয়। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম অপশক্তির বিরুদ্ধে চলার আন্তর্জাতিক লড়াইকে দুর্বল করবে – এ বিশ্লেষণ থেকে কমিউনিস্ট পার্টি বেয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিপক্ষাচার করেছেন। এ বিপক্ষাচার এবং সে সঙ্গে মুসলিমদের পাকিস্তানের দাবিতে অবিমিশ্র সমর্থন দেওয়ায়, বনফুল এবং তাদের মতো কংগ্রেসপন্থী যারা ছিলেন তাঁরা এ বিষয়গুলো মেনে নিতে পারেননি। এসব কারণে বনফুল সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। সমাজ-ইতিহাস-কমিউনিজম সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন – রাশিয়ায় যে অর্থে সমাজতন্ত্র সম্ভব হয়েছে, সে অর্থে এ দেশে তা সম্ভব আমি মনে করি না। আমরা বুঝেছি, আর্য সভ্যতার আলোকে এদেশে যে সাম্যবাদ চলে এসেছে তাই শ্রেয়। সাম্যবাদ কেবল অর্থের সমতায় বিচার্য নয়, বিচার্য মনে। তিনি কংগ্রেসপন্থী ছিলেন বটে তবে সব ক্ষেত্রে তিনি কংগ্রেসের সব সিদ্ধান্ত মেনে নেননি। কংগ্রেসের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতারণা, তাদের অসততার কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি। আমরা বলতে পারি যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। *সপ্তর্ষি* উপন্যাসের ঘটনার যে সময়সীমা (১৯৩৫-৩৮) সেখানে রাজনীতির বিভিন্ন ধারার পরিচয় রয়েছে এবং বনফুলের বিশেষ কোনো রাজনীতিক দলের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দৃশ্য হয়নি। পরবর্তী সময় *স্বপ্নসম্ভব*, *অগ্নি*, *পঞ্চপর্ব*, *ত্রিবর্ণ* উপন্যাসগুলোতে পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থক কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বনফুলের একরকম বিরাগ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইতিহাস-আশ্রয়ী জীবনকথা

ইতিহাস কী

গ্রিক শব্দ historia থেকে ইতিহাস শব্দের উৎপত্তি। ইংরেজি history শব্দের বাংলা শব্দ ইতিহাস যার উৎপত্তি 'ইতিহ' শব্দ থেকে হয়েছে। সাধারণভাবে ইতিহাস মানে অতীত কথা, প্রাচীন কাহিনি। এ শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয়, ইতিহ+আস=ইতিহাস। আবার 'ইতিহ' শব্দের অর্থ ঐতিহ্য। তাই মানবসভ্যতার ঐতিহ্যের কালানুক্রমিক বিবরণ বা পর্যায়ক্রমিক ঘটনার বিবরণকে ইতিহাস নামে আখ্যা দেয়া যায়। তবে সব ঘটনাকে ইতিহাস বলা যাবে না। যুক্তিসঙ্গতভাবে তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য কোনো ঘটনার বিশ্লেষণই ইতিহাস। ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া বা এক কথায় বলা সহজ নয়। সময়ের বিবর্তনে মানুষের বোধ-বোধি পরিবর্তন হয়ে পরিপক্বতা লাভ করে। তার সাথে সাথে পৃথিবীর সবকিছুরই সংজ্ঞা পরিবর্তন হতে থাকে। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে, থিওরি অব রিলেটিভিটি। ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য হলো মানুষ। ইতিহাস দুভাবে পাওয়া যায়– লিখিত ও অলিখিত। লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় প্রাচীনকালের মুদ্রা, শিলালিপি, সাহিত্য, নথিপত্র, ডায়েরি প্রভৃতির মাধ্যমে। আর অলিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়– পোশাক, মানুষের তৈরি বিভিন্ন প্রকার হাতিয়ার, নানারকম সৌধ, স্থাপত্যকর্ম, খাদ্যশস্য, ব্যবহার্য অনেক রকম জিনিসপত্র প্রভৃতি থেকে। ঐতিহাসিকরা ইতিহাসকে দুভাগে ভাগ করেছেন: এক. অবস্থানগত ইতিহাস, দুই. বিষয়বস্তুগত ইতিহাস। ইতিহাসে যে বিষয়টি স্থান পেয়েছে তা কোন প্রেক্ষাপটে রচিত, স্থানীয়, জাতীয় না আন্তর্জাতিক; সেদিক বিবেচনায় ভৌগোলিক অবস্থানগত ইতিহাস রচিত হয়। আর যে ইতিহাসে বিষয়বস্তুই প্রধান অর্থাৎ যে বিষয়টির ওপর ভিত্তি করে ইতিহাস রচিত হয়েছে তাকে বিষয়বস্তুগত ইতিহাস বলে। বিষয়বস্তুগত ইতিহাস অনেকভাবে লেখা হয়– সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাম্প্রতিক ইতিহাস প্রভৃতি।

মানবজীবনে ইতিহাসের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাস রচিত হতে হলে কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। যেকোনো বিষয়ের ওপর ইতিহাস রচিত হতে পারে। এ কথা সবার জানা যে, ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস কাহিনি বিবৃতির মাধ্যমে ইতিহাস লিখেছিলেন। আর থুসিডাইডিসের ইতিহাস রচনার স্টাইল ছিল বিজ্ঞানসম্মত। উল্লেখ করা হয়েছে, যেকোনো বিষয় ইতিহাস হতে পারে, যেমন পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক; ঠিক তেমনি ইতিহাস শাস্ত্রের সাথে সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সাহিত্যের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। বলা যায়, ইতিহাস ও সাহিত্য পরস্পরের ওপর

নির্ভরশীল। কোনো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হলে কখনো কখনো সাহিত্যকে যেমন ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়, তেমনি সাহিত্যকেও কখনো কখনো ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয়। তবে সব ক্ষেত্রে এ নির্ভরশীলতা নয়, কারণ সাহিত্যে লেখকের কল্পনা মিশে থাকে, তাই তা সত্য সুন্দরের এক মিথস্ক্রিয়া।

২. বনফুলের উপন্যাসে ইতিহাস

২.১

বাঙালির জনজীবনে সংঘটিত বহুবিধ ঘটনা বাংলা সাহিত্যের গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও নাটকে মূল উপজীব্য হিসেবে আবার কখনো নিছক উপাদান হিসেবে স্থান পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের *দুর্গেশনন্দিনী*, *কপালকুণ্ডলা*, রবীন্দ্রনাথের *গোরা*, সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী*, *ঢোঁড়াই চরিত মানস* বনফুলের *সপ্তর্ষি*, *অগ্নি*, *স্বপ্নসম্ভব*, *পঞ্চপর্ব*, *ত্রিবর্ণ* রাজনীতিকে অবলম্বন করে লেখা হয়েছে। বনফুলের কিছু উপন্যাস আছে ইতিহাসের মোড়কে বিবৃত জীবন-কাহিনি। সেসব উপন্যাসে ইতিহাসের বিভিন্ন কালখণ্ডের উল্লেখ রয়েছে। বনফুল বৈচিত্র্য-সন্ধানী লেখক, ব্যক্তিগত জীবনেও একরকম তরকারি বেশিদিন খেতে পারতেন না, তাই নিজেই অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের রান্নার রেসিপি শিখতেন এবং রান্না করে খেতেন। লেখার বেলাতেও তাঁর এরূপ বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল। রাজনীতিকে অবলম্বন করে টানা উপন্যাস লিখে বৈচিত্র্য-সন্ধানী লেখক পরবর্তীকালে লিখে ফেলেন *গোপালদেবের স্বপ্ন* (১৯৪৬), *মহারাণী* (১৯৫৮), ও *সন্ধিপূজা* (১৯৭২) নামে তিনটি উপন্যাস। ইতিহাসের বিশেষ তিন কালখণ্ডে গড়ে উঠেছে তাঁর এই ত্রয়ী উপন্যাস যেখানে ঔপন্যাসিকের শিল্পী মনের বিস্তার রয়েছে। উপন্যাসগুলোকে ঐতিহাসিক উপন্যাস না বলে ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস বলা হয়েছে। কারণ ইতিহাসের সরাসরি কোনো কাহিনিকে অবলম্বন করে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেনি। ইতিহাসের কোনো আলোকিত চরিত্রকে অবলম্বন করে আবার কখনও ইতিহাসের বিশেষ কোনো ঘটনাংশকে উপজীব্য করে উপন্যাসের কাহিনি সৃষ্টি হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসগুলোতে ইতিহাস-আশ্রয়ী জীবন কথা লেখক কোন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন, তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

২.১

প্রকাশকাল অনুযায়ী প্রথমে *মহারাণী* (১৯৫৮) উপন্যাসটির দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। উপন্যাসটিতে বনফুল দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে বলেছেন, "একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার, গল্পটি একালের নয়, সেকালের। সিপাহি বিদ্রোহ সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু তার জের তখনও সম্পূর্ণরূপে কাটে নি।" (বনফুল, ২০১৩/৯: ২৮) এখানে ইতিহাসের বিশেষ কালপর্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপন্যাসের কাহিনির সারবস্তু, বঙ্গদেশের বা বাংলাদেশের এক জমিদারের বাড়িতে সিপাহি বিদ্রোহের নেতা নানাসাহেবের নাটকীয় আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং নানাসাহেবকে ঘিরে কাহিনির

অভিনব পরিসমাপ্তি। আরও রয়েছে মহারাণী এবং শ্রীহর্ষ কাব্যতীর্থের প্রেমকাহিনি। কাহিনির শুরুতে সিপাহি বিদ্রোহের কথা, মাঝে প্রেম-বিচ্ছেদ এবং পরে নানাসাহেবের আগমন ও প্রস্থান এবং নায়ক-নায়িকার মিলন সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়েছেন লেখক। মহারাণী-শ্রীহর্ষের প্রেম-কাহিনি ইতিহাসের ঘটনাটিকে বেগবান করেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে উপন্যাসে কিছু উদ্ভট বা কাল্পনিক ঘটনাংশ রয়েছে কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে তা প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হবে। যেমন, মহারাণীর পশুপ্রীতি নিয়ে যেসব ক্রিয়াকলাপ রয়েছে।

কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বাংলার জমিদার সমুদ্রবিলাসের একমাত্র উত্তরাধিকারী তাঁর মেয়ে মহারাণী চৌধুরাণী। সমুদ্রবিলাসের বাল্যবন্ধু ভবভূতি ভট্টাচার্যের একমাত্র পুত্র শ্রীহর্ষ মহারাণীর ছেলেবেলার বন্ধু। শ্রীহর্ষ মহারাণীর উপযুক্ত পাত্র, গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, আচার-ব্যবহারে প্রশংসনীয়। মহারাণী অশ্ববিদ্যা-পারদর্শী, বুদ্ধিতে, কর্মনিপুণতায় পটু, অহংকারী তবে উদার মানসিকতার অধিকারী। ঘরজামাই থাকার শর্তে পারিবারিকভাবে তাদের বিয়ের কথা হয়। কিন্তু শ্রীহর্ষ আত্মসম্মান বোধের কারণে ঘরজামাই থাকার শর্ত মেনে নিতে রাজি না হওয়ায় তাদের বিয়ে হয় না। তবে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় ছিল। শ্রীহর্ষের বিয়ের পরও মহারাণী তাকে ভুলতে পারেনি। শ্রীহর্ষের দারিদ্র্য ঘোচাতে মহারাণী তার জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক এবং এক সময়ের তার পাণি-প্রার্থী মহেন্দ্রের সাথে পরামর্শ করে মহেন্দ্রের বাবার নামে একটি টোল প্রতিষ্ঠা করে এবং শ্রীহর্ষকে টোলের দায়িত্ব নিতে বাধ্য করে সে।

মহারাণী চরিত্রটি দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা এবং বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন লেখক। সমুদ্রবিলাসের মৃত্যুর পর মহারাণী বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এ সময় মহারাণীর চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতি সবার নজর পড়ে। অন্দরমহলে সব পুরুষ ভৃত্য একে একে মারা যাওয়ার পর সেখানে আর পুরুষ নিযুক্ত করেনি মহারাণী। পুরুষ বাইরের মহলে ছিল। মহারাণী কুড়িটি পর্দার অন্তরালে থেকেই মহেন্দ্রসহ পুরুষ কর্মচারীদের সাথে বৈষয়িক সব ধরনের কাজ সম্পন্ন করে। শ্রীহর্ষের ব্যাপারে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। তবে অন্দরমহলের খিড়কি বাগানে বিপরীত নিয়ম চালু হয়। সেখান থেকে স্ত্রী পশুগুলোকে সরিয়ে নেয়া হয়। মহারাণী চরিত্রটিকে লেখক সমুদ্রবিলাসের বিপরীত চরিত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মহারাণী স্বদেশিকে সম্মান করেছে আর তার বাবা স্বদেশিকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে ধরিয়ে দিতেন। সিপাহি বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি দেখালে গভর্নমেন্ট কঠিন শাস্তি দেবে, ইতোমধ্যে দুজন জমিদারের ফাঁসি দিয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে মহারাণী তার শিবমন্দিরে লুকিয়ে থাকা নানাসাহেবকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে তাকে আশ্বস্ত করে। নানাসাহেব মহারাণীর আশ্রয় প্রার্থনা করবে – এমন ইঙ্গিত পেয়ে আগে থেকেই সে নানাসাহেবের জন্য বিশেষভাবে একটু বড় আকারের পালকি তৈরি করে রাখে। এক অভিনব পদ্ধতিতে মহারাণী

তাঁকে বাড়ি থেকে পালাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, মহারাণীর বাবা সমুদ্রবিলাস পলাতক বিদ্রোহী সিপাহিদের বাড়িতে আশ্রয় দেয়ার গুরুতর অপরাধে তার প্রজা বিশ্বদেব শর্মাকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেন এবং প্রজার স্ত্রী ও বড় ছেলেকে ফৌজ দিয়ে গুলি করিয়ে হত্যা করেন। বিশ্বদেব শর্মা নিরুদ্দেশ হয়ে থাকেন এবং অসুস্থ হয়ে বিন্দ্যাচলের এক সরাইখানায় শোচনীয় মৃত্যু ঘটে তাঁর। ঘটনাচক্রে মৃত্যুর সময় সমুদ্রবিলাসের ভাই পর্বতবিলাস সেখানে উপস্থিত থাকায় তাঁকে দেখে মুমূর্ষু শর্মা সমুদ্রবিলাসকে আবারও নির্বংশ হওয়ার শাপ দেয়। শর্মার সে শাপ বাস্তবে ফলেছে, সমুদ্রবিলাস একাধিক বিয়ে করেও তাঁর আর সন্তান হয়নি।

লেখক ইতিহাসের সময় এবং জীবনের সাথে কাহিনির যোগ সচেতনভাবে শুরুতেই করে দিয়েছেন। তিনি জানেন জীবনের রহস্যময়তার অনির্বচনীয়, জিজ্ঞাসাতাড়িত অভেদ্য দিকটিই গল্প-শিল্পের সার্থকতার চূড়ান্ত কথা। খেয়ালি স্বাধীনচেতা মহারাণীর কার্যকলাপের বাস্তবোচিত ভিত্তি তৈরি করে নিতে চেয়ে লেখক গোড়ার দিকেই জানিয়ে রাখেন: ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের আদর্শটা সেকালের অভিজাত-বংশীয় মেয়েদের মধ্যে চলতি হয়েছিল কিছুদিন (ভূমিকা, অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, বনফুল, ২০১৩/৯: ১২)।

নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসীর রাণী, কুনওয়ার সিং, মৌলভী আহমদ উল্লাহ প্রমুখ নেতা গণবিপ্লবে নেতৃত্ব দেন। এ কথা অনেকেরই জানা যে, বিদ্রোহীদের মধ্যে পূর্ব-পরিকল্পনা, সংহতি, সংগঠিত আদর্শবোধের অভাব ছিল। যোগাযোগ ও প্রস্তুতির অভাবের দরুন বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান বিনষ্ট হয়েছে। (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ১০৫) মহারাণীর শিবমন্দিরে নানাসাহেবের হঠাৎ আবির্ভাব এবং তাঁর অবস্থান যোগাযোগের অভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মহারাণীর সাথে নানাসাহেব যদি যোগাযোগ রক্ষা করে আসতেন তাহলে দাসীর চোখকে এড়িয়ে যেতে পারতেন। শ্রীহর্ষের স্ত্রী সর্বমঙ্গলাও বেঁচে যেতো। কাহিনির শুরুর দিকে আছে স্বদেশ-হিতৈষী বিশ্বদেব শর্মা জমিদারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সিপাহীদের তার বাড়িতে আশ্রয় দেয়ার অপরাধে জমিদারের রোষানলে পড়ে। রোষানলের আগুনে পুড়ে স্ত্রী ও বড় ছেলে অঙ্গার হয়ে যায় চিরতরে। ছোট ছেলেকে নিয়ে গ্রামছাড়া এবং শেষে নিঃস্ব হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে তাকে। কাহিনির মাঝে শ্রীহর্ষ এবং মহেন্দ্রকে নিয়ে মহারাণীর মনস্তত্ত্বের জটিলতা পাঠক বোঝে ওঠার আগেই সিপাহি বিদ্রোহের নেতা নানাসাহেবের নাটকীয় আবির্ভাব ঘটে। এবং তাঁর তিরোভাবের পরপরই আবারও বিশ্বদেব শর্মার ছোট ছেলে শঙ্করদেব ওরফে উদয়প্রতাপের আগমন। উদয়প্রতাপ মহারাণীর স্টেটের ম্যানেজার কিশোরীমোহনের মুণ্ডটা সাথে করে নিয়ে আসে। কারণ নানাসাহেবকে ধরিয়ে দিতে সে সাহায্য করেছিল। যে জমিদারি থেকে উদয়প্রতাপের বাবা বিশ্বদেব শর্মাকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং তার মা ও বড় ভাইকে হত্যা করা হয়েছে সেই জমিদারি করতলগত করে প্রতিশোধের আগুন নেভাতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে

উদয়প্রতাপ। এভাবে সিপাহি বিদ্রোহের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। এর মধ্যে দিয়ে লেখকের স্বদেশ-চেতনার সচেতন প্রয়াস সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়েছে। তাছাড়া 'উনিশ শতকের মধ্যভাগের সামন্ত-সমাজনীতি, উৎসব-পার্বণ, অন্তঃপুর-প্রথা, লোক-লৌকিকতা, সাজসজ্জা, যানবাহন ডাকাতি ও ডাকাতের প্রসঙ্গ ইত্যাদির বিবরণ একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সময়কেই চিহ্নিত করে।' (ভূমিকা, অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, বনফুল, ২০১৩/৯: ১১)

২.২

বনফুলের জীবনে ১৯৬৮ সাল স্মরণীয় বছর। এ বছর তিনি ভাগলপুরের দীর্ঘদিনের আবাসস্থল গুটিয়ে কলকাতায় এসে বসবাস করেন এবং বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি হন। এ সময় ভাগলপুর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ তাকে আন্তরিক সংবর্ধনা জানায়। তার *রবীন্দ্রস্মৃতি* এবং *গোপালদেবের স্বপ্ন* এ বছরই প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালের দিক থেকে *গোপালদেবের স্বপ্ন* বনফুলের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত *মহারাণী*তে ইতিহাসের বিষয় হিসেবে এসেছে সিপাহি বিদ্রোহ আর দশ বছর পর ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত *গোপালদেবের স্বপ্ন*তে ইতিহাসের বিষয় হিসেবে এসেছে প্রাচীন বাংলার রাজা গোপালদেবের রাজত্বের পূর্ববর্তীকাল অর্থাৎ মাৎস্যন্যায়ের যুগকে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের অরাজকতার সাথে তুলনায়। লেখক এ উপন্যাসে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের অরাজকতা, জোর যার মুলুক তার – এ কঠিন সময়কে মাৎস্যন্যায়ের সাথে তুলনা করে দেশের স্থিতিশীলতা আনয়নে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। কারণ ঐতিহাসিক চরিত্র গোপালদেব মাৎস্যন্যায়ের যুগে আবির্ভূত হয়ে তার শাসনকালে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন। ইতিহাসে মাৎস্যন্যায় বলতে বোঝায় মাছের ন্যায় বা মতো, মানে বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে তেমনি মানবসমাজে ধনীরা গরিবদের শোষণের চাকায় ফেলে নিষ্পেষিত করে ফেলছে, যা মানবিক সমাজে মোটেই কাম্য নয়।

চারটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে *গোপালদেবের স্বপ্ন* উপন্যাসের কাহিনি। প্রধান দুটি চরিত্র অধ্যাপক গোপালদেব এবং কার্তিক ইতিহাসের রাজা গোপালদেবের আদর্শে উদ্দীপিত হয়েছে। তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে গোপালদেবের আদর্শকে ধারণ করতে চেয়েছেন। ইতিহাসের ছাত্র ফকিরচাঁদ সামন্তের লেখা পাণ্ডুলিপির মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাসের অধ্যাপক ও গবেষক গোপালদেব। অধ্যাপক গোপালদেবের চিন্তা-চেতনায় প্রতিভাত হয়েছে বাংলার প্রথম রাজা গোপালদেবের কথা যিনি মাৎস্যন্যায়ের যুগে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইতিহাসের এই একটি চরিত্রের ভাবনা-কল্পনায় ঐতিহাসিক তথ্যের বিবরণ বিন্যস্ত দেখা যায়; কখনো কখনো যা সরাসরি উঠে এসেছে ইতিহাসের পাতা থেকে (উর্মি, ১৯৯৭; ২২৬)।

স্বেচ্ছায় একটি ঘরে নিজেকে বন্দি রাখলেও গোপালদেব প্রতিদিন বাংলা ইংরেজি অনেক খবরের কাগজ পড়েন। কারণ দেশের মধ্যে পাপের আবর্জনা ভরে উঠেছে – এ খবর তাঁর জানা। তিনি অনুভব করেন যে, স্বাধীনতার নামে অরাজকতাই এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর মনে পড়ে –

> ঐতিহাসিক গোপালদেবের কথা। মনে পড়িত তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে দেশে মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল। বড়রা ছোটদের গিলিয়া খাইত।... পুকুরে যেমন বড় মাছ ছোট মাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে, দেশে অরাজকতার সময় সেইরূপ প্রবল অবাধে দুর্বলের উপর অত্যাচার করে (বনফুল, ২০১৩/১৩: ২০৯)।

অধ্যাপক গোপালদেব বর্তমান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চান না। তার একটি আদর্শ আছে, সে আদর্শ নিয়ে চলেন তিনি। তার ধারণা, তার পরিবার ও সন্তানেরা হাল-ফ্যাশনের মতো করে চলে। তাদের পোশাক-আশাক, চলাফেরা, ওঠাবসা – সবকিছুই অতি আধুনিক। খুব প্রয়োজন হলে তার স্ত্রী আত্মীয়স্বজনের তদবির নিয়ে কখনো স্কুল-কলেজ ও অফিসে কাজ করার সুপারিশ নিয়ে তার কাছে আসেন। তাঁর ছেলে প্রবাল নীচু জাতের মেয়ে বিয়ে করায় তলোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করতে দ্বিধা করেননি। এমনকি অসুস্থ অবস্থায় ছেলের অর্থ-সাহায্যও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে বন্ধু সিভিল সার্জনকে তিনি বলেন –

> যে ছেলে আমার আদর্শের উপর লাথি মেরে চোং প্যান্ট পরে বেলাল্লাগিরি করে বেড়াচ্ছে, যে নীচ বংশের মেয়েকে বিয়ে করে আমার বংশে কালি দিয়েছে তার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নেব একথা যদি তুমি ভেবে থাক তাহলে বলবো, এতদিনের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তুমি আমাকে চেন নি। (বনফুল, ২০১৩/১৩: ২৬৬)

সেকেলে মানুষ, আধুনিকতার ঘোর বিরোধী গোপালদেব স্বেচ্ছায় নির্জনবাসে গিয়ে দিনের পর দিন তিনি ইতিহাসের কাল্পনিক জগতে বাস করেছেন। তিনি বরাবরই ভিশন-টিশন দেখেন। তাঁর বিভ্রান্ত মানসিকতা উদ্ভূত এসব ইতিহাসের প্রেক্ষাপট যেন প্রায়শই তাঁর দৃষ্টিভ্রম ঘটাত। (ঊর্মি, ১৯৯৭: ২২৫) ইতিহাস-বাস্তব-কল্পনা নানা রঙে মিশ্রিত হয়ে অনেক ঘটনা তাঁর ভাবনার আকাশপটে মূর্ত হয়ে ওঠে। সেসব ঘটনার কার্যকারণ নিয়ে গোপালদেবের অন্তর্নিহিত জ্ঞান তাঁর সাথে কথা বলে কখনো সূত্রধার, কখনো কবি, কখনো মানুষরূপী ইতিহাস আবার কখনো অরণ্য, কখনো জ্যোর্তিময় পুরুষ হয়ে। বন্ধু সিভিল সার্জনকে তিনি বলেন – "আগে ইতিহাসের কথা কাগজে লিখতাম, বইয়ে পড়তাম, এখন তা চোখের সামনে আকাশে মূর্ত হয়ে উঠে। ভারি ভালো লাগে। সত্যের সঙ্গে কল্পনা, কল্পনার সঙ্গে আশা-আকাঙ্ক্ষার নানা ছবি দেখি।" (বনফুল, ২০১৩/১৩: ২৭০) ভারতবর্ষে বাইরে থেকে

এতো শত্রু এসেছে কেবল দেশের বিশ্বাসঘাতকদের কারণে। বিশ্বাসঘাতকরা প্রাচীনকালেও ছিল কিন্তু তাদের কী নাম ছিল জানা যায়নি। তবে আধুনিক ইতিহাসের উমিচাঁদ, মীরজাফরকে বাঙালিমাত্রই চেনে। তার পরের বিশ্বাসঘাতকের দল যারা স্বদেশি-আন্দোলনের গোড়ার দিকে দেশের বিদ্রোহী তরুণ-তরুণীদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে, জেলে পুরে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে স্বাধীনতার আদর্শকে নিষ্পিষ্ট করে ইংরেজের কাছ থেকে খেতাব পেয়েছিল তাদেরও কথা আশা করি মনে আছে তোমার। অতি আধুনিক যুগে আর একদল বিশ্বাসঘাতক আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে তাদেরও আশা করি তুমি চিনেছো। এরা সব ইনটেলেকচুয়ালিজম অথবা আর্টের মুখোশ পড়ে থাকে। বিদেশের চোখে ভারতবর্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করাই এদের উদ্দেশ্য। মনে রেখো এরা দেশের মহাশত্রু – জ্যোতির্ময় পুরুষের একথাগুলো লেখকেরই মনোবেদনা (পৃ. ২৭৪)। সমকালীন সমাজের ভঙ্গুরতা, দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, ছাত্র সমাজের বিশ্বাসহীনতা, বনফুলের শুদ্ধতাবোধে আঘাত হেনেছে বারবার। স্বাধীনতা উত্তর দেশের মেরুদণ্ডহীন অবস্থার কথাই ডাক্তার সুরেশ বাবুর মুখে শোনা যায় গোপালদেবের ছেলের কথা প্রসঙ্গে –

> কমপিটিটিভ (competitive) পরীক্ষাতেও পক্ষপাতের বিষ ঢুকেছে।... আজকাল অধিকাংশ মাস্টার প্রফেসারই অর্থলোলুপ দোকানদার। আজকালকার ছেলেমেয়েরা কোনও শিক্ষককেই শ্রদ্ধা করতে পারে না। সকলেরই উপর তাদের ঘৃণা আর অশ্রদ্ধা তাদের চরিত্রকে বিষময় করে তুলেছে। শুধু শিক্ষকদের উপর নয়, গভর্নমেন্টের উপর, নেতাদের উপর, লেখকদের উপর, ব্যবসায়ীদের উপর – কারো উপরই এ যুগের ছাত্ররা সশ্রদ্ধ হতে পারছে না, তাদের মনে হচ্ছে সবাই চোর, সবাই মতলববাজ। (পৃ. ২৬৮)

গোপালদেব তাঁর ওল্ড ভ্যালুজকে আঁকড়ে থাকতে চান। প্রায়ই মেঘের মতো উদ্ভট কল্পনা ভেসে আসে তার মনে। তিনি ভাবেন–

> গোপালদেব বাংলার গৌরবময় যুগের তৃতীয় শিখর, ইংরেজিতে বললে বলতে হয় – থার্ড পিক (third peak)। প্রথম পিক গঙ্গারিডই নন্দরাজা, দ্বিতীয় পিক শশাঙ্ক, তৃতীয় পিক গোপালদেব। বাংলার প্রথম সার্বভৌম রাজা শশাঙ্কের মহিমা ভগ্নস্তূপের উপর গোপালদেবের কীর্তি-সৌধ স্থাপিত হয়েছিল –। (পৃ. ২৪৮)

মাঝে মাঝে অধ্যাপক গোপালদেবের ভাবনা-চিন্তায় ঐতিহাসিক তথ্যের বিবরণ বিন্যস্ত দেখা যায়। কখনও কখনও সেসব তথ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সরাসরি উদ্ধৃত হয়েছে, যেমন –

> বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনিই প্রথম আর্যাবর্তে বাঙালির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। তার স্বপ্ন কিছুটা সফলও হয়। পরাক্রান্ত মৌখরি রাজশক্তিকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন। উত্তরাপথের অধীশ্বর হর্ষবর্ধন তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেননি। তার সব অপচেষ্টা ব্যর্থ করে আমরণ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।

> কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, তিনি স্বদেশে অখ্যাত, অজ্ঞাত ছিলেন। কোনো বাঙালি তাকে নিয়ে কোনো ইতিহাস লেখেননি, যে কারণে জগতে শত্রুর কলঙ্ককালিমাই তার পরিচয় হিসেবে রয়েছে। (রমেশচন্দ্র, ১৯৩৭: ৩০)

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সব শেষ হয়ে যায়, এরপর শুরু হয় মাৎস্যন্যায়ের যুগ। উল্লেখ্য, বনফুল *গোপালদেবের স্বপ্ন* গ্রন্থটি উক্ত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারকে উৎসর্গ করেন। তাই বলা যায়, রমেশচন্দ্রের ইতিহাস বিষয়ক লেখা তাঁকে প্রভাবিত করেছে। গোপালদেব প্রসঙ্গে আরও উঠে এসেছে পাল বংশ, রাজা শশাঙ্ক, হর্ষবর্ধন, জয়াপীড়, বল্লাল সেন, রাজা গণেশ, চৈতন্যদেব এমনকি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু – সবার কথা। এসব ঐতিহাসিক চরিত্রদের বীর্যবত্তা, তাদের শাসনদক্ষতা, সুবুদ্ধি ইত্যাদির ভাবনা অনুপ্রাণিত করেছিল অধ্যাপক গোপালদেবকে।

ওল্ড ভ্যালুজকে আঁকড়ে থাকা অধ্যাপক গোপাল যখন জানতে পারেন তাঁর সেবায় নিযুক্ত নার্সটি ছিল তাঁরই পুত্রবধূ তখন তাকে পুত্রবধূর মর্যাদা দিতে না পারার কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেন। "আমার অতীত বংশগৌরব তোমার আমার মধ্যে বিরাট প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ভুশায়ী করে তোমার কাছে আমি যেতে পারব না। আমরা সেকেলে লোক। প্রাচীন মত প্রাচীন পথ আমরা ত্যাগ করতে পারি না। ত্যাগ করবার ইচ্ছেও নেই।" (বনফুল, ২০১৩/১৩: ৩০৫) এ আদর্শকে হাতিয়ার করে পূর্বপুরুষের তলোয়ারটি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে পড়েন তিনি এবং একটি গর্তে পড়ে গিয়ে ঘোড়াটির কোমর ভেঙে যায় আর তলোয়ারটি গোপালদেবের কণ্ঠে বিদ্ধ হলে তিনি মারা যান। এখানে ফকিরচাঁদের গোপাল বৃত্তান্ত শেষ হয়। এ গোপাল বৃত্তান্তের প্রভাব পড়ে ইতিহাসের সাবেক ছাত্র কার্তিকের ওপর যা কাহিনির দ্বিতীয় ধারা বলা যায়।

শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় কার্তিক যার ডাক নাম সুরং। ডাস্টবিনে খাদ্য অন্বেষণ করতে যেয়ে সে ফকিরচাঁদের লেখা গোপাল বৃত্তান্তের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে। সময় পেলেই সে পাণ্ডুলিপির কাহিনি পড়ে। ধীরে ধীরে রাজা গোপালদেব তার মধ্যেও প্রভাব ফেলতে শুরু করে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সে গোপালদেব হয়ে উঠার প্রয়োজন অনুভব করে। পথ চলতে একদিন মেলায় দেখা হয়ে যায় তার পূর্ব পরিচিত চপলাদির সাথে। তাকে সে তার গোপালদেব হওয়ার বাসনার কথা জানায়। চপলাদি তার স্বপ্নপূরণকে বাস্তবায়ন করার আশ্বাস দেয় এবং তার সাথে থেকে জনস্বার্থে কাজ করার অনুরোধ জানায়। তিনমাস পর কলকাতা থেকে ফিরে এলে কার্তিককে তার অবৈধ কাজের কথা বলতে বাধ্য হয় চপলাদি। কিন্তু "নোট জাল করে পরোপকার সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিবে না। কিছুতেই না।" (পৃ. ৩০৮) সে এমন কাজকে বরাবরই ঘৃণা করে আসছে। একবার কলেজ জীবনে কার্তিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাকাতি ও নারী হত্যা করে টাকা এনে সে টাকা স্বদেশিদের বন্দুক

বোমা কিনে দিয়ে সাহায্য করতো। বন্ধুর এ গর্হিত কাজকে কার্তিক মেনে নিতে পারেনি। তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে। একই বিষয় সে চপলাদির মধ্যেও দেখতে পায়। চপলাদির সঙ্গও সে ছেড়ে দেয়। এরই মধ্যে কার্তিকের পাণ্ডুলিপি পাঠও শেষ হয়ে যায়। এদিকে পুলিশ জাল নোটের গোপন খবর পেয়ে যায়। কিন্তু চপলাদি তাতে বিচলিত না হয়ে দুঃস্থদের সেবায় রয়ে যায়। কিন্তু তার সহকর্মী পুলিশের ভয়ে পালিয়ে যায়। এদিকে মুসলমানের ছেলে হিন্দুর মেয়েকে ভাগিয়ে নেয়ার ইস্যুতে গ্রামের জনতা জমায়েত হলে চপলাদি তাদের বোঝায়। হঠাৎ ঘরবাড়িতে আগুন লাগার চিৎকার শোনা যায়। উত্তেজিত জনতার মধ্যে থেকে এক গুণ্ডার ইটের আঘাতে চপলাদির প্রাণ যায়। ভীষণ দাঙ্গা বেধে যায়, নারী ধর্ষিত হয়, পুলিশ গুলি চালায় কারফিউ জারি হয়। কিন্তু তাতেও শান্তি ফিরে আসে না। সুযোগ পেলেই সবল দুর্বলকে আঘাত করছে, পীড়ন করছে। দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় হিতোপদেশ দিতে এবং শান্তির কথা শোনাতে গভর্নমেন্ট শান্তি সমিতি গঠন করে। কার্তিক এমনই একটি সমিতির নেতা হয়ে যায়। সে পুলিশ-ফোর্স নিয়ে সভায় সভায় বক্তৃতা করে বেড়ায়। তার একসময় মনে হতে থাকে কোনো অদৃশ্য শৃঙ্খল যেন তাকে বেঁধে ফেলছে। কেউ একজন যেন তাকে বলছে –

> অষ্টম শতাব্দীতে মাৎস্যন্যায়ের যুগে গোপালদেব যা করেছিলেন এ যুগে তোমাকেও তাই করতে হবে। কারণ এ যুগটাও মাৎস্যন্যায়ের যুগ। এ যুগের গণতন্ত্রও মাৎস্যন্যায়ের গণতন্ত্র। তোমাকে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন করতে হবে সুরং। (পৃ. ৩১৮)

কার্তিক চরিত্রটি সমগ্র কাহিনির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছে এবং অনেকটা বাস্তবঘেষা চরিত্র। তার ব্যক্তিগত জীবন এবং ফকিরচাঁদ সামন্তের পাণ্ডুলিপির কাহিনির মধ্যে দিয়ে লেখক ইতিহাসের অতীত বিবৃত থেকে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিচরণ করেছেন বিন্যাসকৌশলে। (ঊর্মি, ১৯৯৭: ২২৭) চারটি চরিত্রের মধ্যেই লেখক সচেতনভাবেই একটি বিষয় সাধারণীকরণ করেছেন। চারটি চরিত্রেরই ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞান আছে। গোপালদেব ইতিহাসের অধ্যাপক, ফকিরচাঁদ সামন্ত এবং কার্তিক ইতিহাসের ছাত্র এবং খেজুরি বিবি ওরফে চপলাদির পড়ালেখা ইতিহাস নিয়ে। চারটি চরিত্রের মধ্যে ঐতিহাসিক গোপালদেব প্রভাব ফেলেছে। খেজুরি বিবি এবং কার্তিককেই দেশের কাজে সক্রিয় হতে দেখা যায়। খেজুরি বিবি চরিত্রটির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে *ত্রিবর্ণ* উপন্যাসের 'ঝিনুক' চরিত্রটির। দুজনেই অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে দেশের অসহায়দের সহায়তা করেছে।

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্রে, চাকরি ক্ষেত্রে, ব্যবসা ক্ষেত্রে রাজনীতিতে সব জায়গায় ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম, ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় এবং কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে চলছে দেশ। দুর্বলের ওপর চলছে সবলের অত্যাচার। বাংলার অষ্টম শতাব্দীর মাৎস্যন্যায় আবার শুরু

হয়েছে যেন। বনফুলের বিশুদ্ধ অন্তরাত্মা ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠে দেশের এ দুরবস্থায়। দেশকে মাৎস্যন্যায় থেকে উদ্ধার করতে তিনি ইতিহাসের পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং জনপ্রিয় নেতা গোপালদেবের মতো দেশ নায়কের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন গভীরভাবে। যিনি সব মানুষকে মনুষ্যত্ব মর্যাদার আশ্বাস দিয়েছিলেন। ঠিক একই আশ্বাসের বাণী লেখক শুনেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে তার 'আখেরী' কবিতায়। বনফুলের মতে, যেদিন আন্তরিক সাম্য জাগবে সবার মনে সেদিনই সমাজে শান্তি ফিরে আসবে। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে তা সম্ভব নয়। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখকের ক্ষুদ্র প্রয়াস *গোপালদেবের স্বপ্ন* রচনা। এক সমাবেশে কার্তিকের বক্তৃতাতে একই সুর ধ্বনিত হয়েছে –

> জোর যার মুল্লুক তার– এ নীতি ভুল নীতি। সংস্কৃতে এর নাম মাৎস্যন্যায়। দেশে অষ্টম শতাব্দীতে এই মাৎস্যন্যায় আমাদের দেশকে যখন ছাড়খার করছিল তখন দেশের লোকেরা গোপালদেব নামক একজন লোককে নির্বাচন করে এ দেশে গণতন্ত্র স্থাপন করেন। দেশে আবার সুখ শান্তি ফিরে আসে।...অষ্টম শতাব্দীর গোপালদেব যা করতে পেরেছিলেন আমরাই বা তা পারব না কেন? যে গণতন্ত্রে টাকা দিয়ে বল প্রয়োগ করে লোভ দেখিয়ে ভোট জোগাড় করতে হয় সে গণতন্ত্র, গণতন্ত্র নয়– গণতন্ত্রের নামে তা-ও ধনতন্ত্র, তা-ও জবরদস্তিতন্ত্র।... আপনারা পশুত্বের পথ ত্যাগ করে মনুষ্যত্বের আদর্শের দিকে উন্মুখ হোন, স্থাপন করুন সেই গণতন্ত্র যা স্বাধীন বিচার শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা লোভ বা মোহ দ্বারা প্রভাবিত নয়। (পৃ. ৩১৮)

২.৩

বনফুলের ইতিহাস আশ্রয়ী তৃতীয় উপন্যাস *সন্ধিপূজা* ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসে ইতিহাস হিসেবে উঠে এসেছে বাংলার স্বাধীন শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকাল। এ উপন্যাসের কাহিনি কাল্পনিক। এখানে লেখক নবাব সিরাজউদ্দৌলার শাসনকালে হত্যা, ধর্ষণ, লুঠতরাজ, মারামারি, বাড়িঘরে আগুন দেয়ার ঘটনাগুলো কাহিনির সাথে প্রাসঙ্গিকক্রমে জুড়ে দিয়েছেন। নবাবকে এখানে কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্তী একজন হিসেবে দেখানো হয়েছে, যার প্রকোপ হতে কোনো ধর্মের লোকই রেহাই পেত না–

> সিরাজউদ্দৌলা যখন বাংলার মসনদে বসিয়া পাশবিকতার পঙ্ককর্দমে নিজেকে অবলিপ্ত করিতেছিল, যখন তাঁহার কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য প্রকোপ হইতে হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান কাহারও নিস্তার ছিল না, যখন সতীনারীদের আর্তনাদে, গুপ্তঘাতকের নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতে নিহত নর-নারীদের অভিশাপে, ভীত রাজপুরুষদের জটিল ষড়যন্ত্রে বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মীর ললাট ভ্রুকুটি কুটিল–। (বনফুল, ২০১৩/১৪: ৩৪)

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধূর্জটিমঙ্গল। তাকে ঘিরে ইতিহাসের ঘটনা বিস্তৃত হয়েছে। তার বাবা মহেশমঙ্গল ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। নবাবি আমল হতে তিনি বহু বিষয়-সম্পত্তি জায়গীরস্বরূপ পেয়েছেন এবং ব্যবসাবাণিজ্য করেও প্রচুর

অর্থ উপার্জন করেন। আলীবর্দি খাঁও তাকে সুনজরে দেখতেন। ধূর্জটিমঙ্গল মহেশমঙ্গলের একমাত্র সন্তান ছিলেন। তার বোন ছিল ছয়জন, তৎকালীন কুলপ্রথা অনুযায়ী সবার কুলীনের ঘরে বিয়ে হয়। প্রত্যেক কুলীনের ঘরে শতাধিক স্ত্রী ছিল। তার বোনেরা স্বামীর ঘরে যায়নি, তাদের স্বামীরা টাকার লোভে তাদের কাছে এসে কিছুদিন করে থেকে যেতেন। ধূর্জটিমঙ্গলের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, জগদ্ধাত্রী। তার গর্ভের দুই পুত্রসন্তান– শম্ভুমঙ্গল ও জটামঙ্গল, তাদের ডাকা হতো খাম্বা ও খুঁটি বলে, ঝকমারি ধূর্জটির দূর সম্পর্কের বোন, নীলু রায় দূর সম্পর্কের ভাই, কস্তুরী ও লালী খাম্বা-খুঁটির লালনপালনকর্তা – সবাই মিলে ধূর্জটির পরিবার। ধূর্জটিমঙ্গলের পারিবারিক জীবনের বিপর্যয়ের কাহিনি এ উপন্যাসের বিষয়। উপন্যাসে পরম্পরাহীনভাবে ছড়িয়ে থাকা ইতিহাসের নানা উপাদান মূল কাহিনিকে তাৎপর্যপূর্ণ না করলেও সবশেষে ধূর্জটির বাড়িতে সন্ধিপূজার প্রার্থনার সময় লেখকের মনস্তত্ত্ব স্পষ্ট হয়েছে।

ধূর্জটির সুতানুটিতে যেমন জমিদারি আছে তেমনি কলকাতাতেও ঘরবাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি আছে। নবাবের দুঃশাসনে যখন সবাই অতিষ্ঠ, ইংরেজের সাথে যখন তার বনিবনা হচ্ছিল না, তখন ধূর্জটিমঙ্গল তার সুতানুটির বাস ছেড়ে সিংভূমের জঙ্গলে জন সাহেবের কুঠিতে এসে আশ্রয় নেন। এ সময় নবাব ফৌজ কলকাতা আক্রমণ করেন। কলকাতা দখলের বিভীষিকা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ সময় তিনি ও তার দূর সম্পর্কের বোন ঝকমারি সুতানুটির জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিলেন। সে কারণে কলকাতায় গিয়ে থাকা নিরাপদ মনে করেননি ধূর্জটি। নবাবের লোক বৃদ্ধ মীর মহম্মদের কুনজর থেকে জগদ্ধাত্রীকে রক্ষা করার জন্য তার বাবা রামলোচন মেয়েকে নিয়ে জন সাহেবের কুঠিতে আসেন। ধূর্জটিমঙ্গলের পরিবারের ওপর নবাবের হিংস্র-থাবা পড়েছে। নবাবের সৈন্যরা ধূর্জটির বোন ও স্ত্রীদের ধর্ষণ করায় তারা আত্মহত্যা করেছেন আবার কেউ কেউ গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। ধূর্জটি এসব হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু যখন জানতে পারেন বেগম লুৎফুন্নিসা সাহায্য চেয়ে মধুসামন্তকে চিঠি লিখেছেন তখন ধূর্জটিমঙ্গল সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। নবাবের জয়-পরাজয়কে পেছনে ফেলে লুৎফুন্নিসাকে সাহায্য করার কথা তিনি ভাবেন। তাই পরিবারের দায়িত্ব নীলু রায়কে দিয়ে লুৎফুন্নিসার চিঠি নিয়ে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে রওনা হন। তাঁর মিশন দুটো – পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়া এবং বেগম লুৎফুন্নিসাকে সাহায্য করা।

ধূর্জটিমঙ্গল চরিত্রটি একটি বাস্তবঘেঁষা চরিত্র। তার মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রতি দরদ যেমন রয়েছে, তেমনি বাইজী-প্রণয়ী মৈনি বিবির প্রতি রয়েছে সম্মানবোধ। তাই মৈনি বিবি যখন মীরজাফরের মসনদে বসার অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন শেষে রাতে নিজের বাড়িতে না গিয়ে কলকাতায় ধূর্জটির বাড়িতে গিয়ে উঠে তখন ধূর্জটি তাকে দেখে অবাক হন। এ সময় মৈনি বিবি তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে। ধূর্জটি তার অনুরোধকে অসংগত

আবদার বলে প্রত্যাখ্যান করেন। দূর সম্পর্কের বোন ঝকমারিও জীবনের কঠিন সময় কাটিয়েছে ধূর্জটিমঙ্গলের পরিবারের সাথে। এবং তার নিরবচ্ছিন্ন পথচলায় ধূর্জটির পক্ষ থেকে কোনোরকম অসম্মানজনক আচরণ পায়নি ঝকমারি। বড় জমিদার হওয়া সত্ত্বেও অনৈতিক আচরণ থেকে নিজেকে সংযত রেখেছেন বরাবর। মানুষের প্রতি তার দরদবোধ লক্ষ করা যায়, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঘ মারার কাহিনিতে। অন্যায়ের প্রতিবাদে খড়্গহস্ত ধূর্জটিমঙ্গল। বিশেষ করে যারা তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছে তাদের নিজ হাতে তিনি মৃত্যুদণ্ড দেবেন। দেশে রাজা স্বেচ্ছাচারী, যেখানে পশুবল ও অর্থবল ন্যায়বিচারের সিংহাসন জবরদখল করে বসে আছে সেখানে আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে হলে পাপী নির্মূল করতে হবে দেশ থেকে। তাই প্রতিপক্ষ কংস ও আসফ আলি খাঁর দণ্ডের পর তিনি উজির আহম্মদকে শাস্তি দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ধূর্জটিমঙ্গলের বাবার বন্ধু পাণ্ডব প্রধানের ছেলে মাণিক্য প্রধান তাকে সাহায্য করার আশ্বাস দেয়। আর এ সময় মাণিক্য প্রধান ওয়াটসনের কাছ থেকে খবর আনে ইংরেজরা চন্দননগর দখল করেছে। কিছু ফরাসি এখানে পালিয়ে এসেছে, নবাব তাদের আশ্রয় দিয়েছে। আর ক্লাইভের ভাষ্য – নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা চন্দননগর দখল করেছে এবং এখানেই তারা থেমে যাবে না। তারা নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করে ছাড়বে। এদিকে, ফরাসিদের সাথে যুদ্ধে ইংরেজদের জয় লাভের খবর শুনে ধূর্জটিমঙ্গল অবাক হন। তার ধারণা ছিল, ফরাসিরা বীর তাদের হারানো সহজ হবে না। ধূর্জটির এ ধারণাকে ভেঙে দিয়ে মাণিক্য প্রধান বলেন –

> ওদের মধ্যেও মীরজাফর আছে যে। ফরাসিরা কেল্লার সামনে নদীর বুকে অনেক নৌকা উপুড় করে রেখেছিল। অ্যাডমিরল ওয়াটসনের যুদ্ধ-জাহাজ কাছে ভিড়তে পারছিল না। কিন্তু একটা গোপন পথ ছিল। ফরাসি ফৌজের টেরানু সাহেব সেই পথটি ইংরেজদের দেখিয়ে দিলেন। সেই পথে হুড়মুড় করে এসে পড়ল ওয়াটসনের যুদ্ধ-জাহাজ, দমাদ্দম গোলা পড়তে লাগল। দু'ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ...। (পৃ. ১৫৪)

লেখক এ বিবরণটির মধ্যে দিয়ে মীরজাফরকে দেয়া মোহনলালের অভিশাপ বাস্তবে কতটা ফলেছে সে বিষয়টি পাঠকের সামনে এনেছেন। বাঙালি বিশ্বাসঘাতককে মীরজাফর বলেই তিরস্কার করে আসছে যুগ যুগ ধরে। *গোপালদেবের স্বপ্ন*-তে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের প্রতি তীব্র ঘৃণার পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গোপালদেবের অন্তরাত্মারূপ জ্যোতির্ময় পুরুষের উক্তিতে। গোপালদেবের চিন্তাচেতনা মূলত লেখকেরই চিন্তাচেতনার প্রকাশিত রূপ। ধূর্জটিমঙ্গল, হত্যাকারী উজির আহম্মদের শিরশ্ছেদ করেছেন। এক কোপে শিরশ্ছেদ করে তার পারিবারিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিয়েছেন। তার অনুচরেরা তাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

লেখক এখানে আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করে পাঠককে অবাক করে দেন। ফরাসিদের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধার সময় কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ ল সাহেবের অনুরোধে সিরাজউদ্দৌলার হুকুমে দুই সহস্রাধিক সৈন্য চন্দননগর গিয়েছিল। তাদের মধ্যে আসফ আলি খাঁ ছিলেন। নন্দকুমারের নেতৃত্বে তারা যুদ্ধ করতে যায় কিন্তু ইংরেজদের সাথে নন্দকুমারের ষড়যন্ত্র চলছে বিধায় তিনি যুদ্ধ করে ইংরেজদের বিব্রত করতে চাননি। তাই লোক দেখানো যুদ্ধ করে গোলাগুলির সম্মুখীন হয়ে শেষে পলায়ন করেছেন তিনি। ইতিহাসের এ ঘটনাটির মধ্যে অবাক করা ছোট ঘটনাটি হলো (যা লেখকের কল্পনাপ্রসূত)– এ যুদ্ধে আসফ আলি খাঁ নিহত হন, তা বলা নেই। আর তাকে হত্যা করেছে ইংরেজ ফৌজের পোশাক পরা এক যুবক। সে আসফ আলির বুকে ছুরি বসিয়ে দেয় এবং পরক্ষণেই প্রকাণ্ড একটি গোলা পড়ে দুজনের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। "ঝকমারির আসল নাম ছিল ঝঙ্কারিণী। মহাকালের তাম্বুরায় দীপক রাগে যে ঝঙ্কারটা সে বাজাইয়া গেল তাহা কেহ শুনিল না। শুনিবে এ প্রত্যাশাও সে করে নাই।" (বীতশোক; ২০১৩: ১৫৮) বনফুল তার অনেক উপন্যাসে এমন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ঘরে বাইরে কাজ করার মানসিকতাসম্পন্ন নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন। নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী লেখকের ঝকমারি চরিত্রটিও তার এমনই একটি চরিত্র। তবে এ চরিত্রটিতে অসম্ভব ক্ষমতার সমন্বয় ঘটেছে।

ঝকমারি ছোটবেলায় বাবা-মা হারিয়ে ধূর্জটির পরিবারেই প্রতিপালিত হয়। ওই পরিবারের আপন সদস্যরূপেই সে বেড়ে ওঠে। উদ্ভট ক্ষমতার সমন্বয় সাধন করে লেখক তার চরিত্র বিকশিত করেছেন। যেমন, কোনো সংকটময় মুহূর্তে তার কল্পনায় ভেসে ওঠে ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড ছবি, যেসব ছবির সাথে সে একাকার হয়ে মিশে থাকে। উন্মুখ ঔৎসুক্যসহকারে সুদূর অতীতের দিকে চেয়ে থাকে সে, ভেসে ওঠে ইতিহাস। সে ইতিহাসে, রাজা গণেশকে কীভাবে হত্যা করে তার ছেলে যদু রাজা হয়েছে, তার সাক্ষী সে। কল্পনায় সে দেখতে পায় –

> অনেকের বিশ্বাস যদুই ষড়যন্ত্র করে তাঁর খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। তুমি সেই যদু। তুমি জানু নত করে আমার প্রণয়-ভিক্ষা করেছিলে, বলেছিলে আমাকেই পাটরানি করবে। আমি তোমার মুখে লাথি মেরেছিলাম। তোমার বাবার মৃত্যুর পর তোমার ঘাতক আমার শিরশ্ছেদ করেছিল। আমার সেই ছিন্ন মুণ্ডটাও আমি দেখতে পাচ্ছি। যদু, ইচ্ছে করলে সে মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি এখনই নিতে পারি। (বীতশোক; ২০১৩: ১৮৭)

আসফ খাঁকে হত্যা করার চিঠি ভাষান্তর করে ঝকমারির মধ্যে তীব্র জেদ চেপে যায় তাকে হত্যা করার। এই রূপ সংকটময় পরিস্থিতিতে ঝকমারির মানসপটে ছবি ভেসে উঠে–

আমি দেখতে পাচ্ছি রানি দুর্গাবতীকে।... আমিই দুর্গাবতী। আমি বিধবা হয়েছি। স্বামী চার বছর আগে মারা গেছেন। আমার রাজ্য আক্রমণ করেছেন সম্রাট আকবর। অনেক সৈন্য নিয়ে এসেছে সেনাপতি আসফ খাঁ। আমিই হাতির পিঠে চড়ে সেনা পরিচালনা করেছি, তার বিরুদ্ধে।... নিরুপায় হয়ে মাহুতের হাত থেকে ছোরা নিয়ে আত্মহত্যা করলাম তখন।... সেই আসফ খাঁ আমাদের ঘর পুড়িয়েছে, এবার তাকে আমিই শাস্তি দেব। (বনফুল, ২০১৩: ১৩৯)

আবার মানসপটে স্পষ্ট হয় আওরঙ্গজেবের বাদী হিসেবে – এভাবে ইতিহাসের অনেক খণ্ড খণ্ড ছবি ঝকমারির মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অনেক বিজ্ঞজনের মতে, ঝকমারি চরিত্রটির পরিণতি উদ্ভট ধরনের হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কথা স্মরণ করলে, সেখানে দেখা যাবে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব দেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সেদিক থেকে ঝকমারির ফৌজি পোশাক পরে শত্রুকে হত্যা করার ঘটনাটি উদ্ভট পরিণতি বলে মনে করা যুক্তিসংগত নয়।

জগদ্ধাত্রী ও নীলু রায়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে লেখক ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড ঘটনা তুলে ধরেছেন। সেসব ঘটনায় কল্পনার রঙমিশ্রিত হয়ে অনেকটা বাস্তবানুগ মনে হয়। কখনো লেখক ইতিহাসের ভেতর ইতিহাসের, কখনো ইতিহাসের ভেতর মিথের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সে অংশটুকুকে বিশ্বাসযোগ্য করার চেষ্টা করেছেন। নীলু রায়কে জগদ্ধাত্রী খাওয়াতে বসালে রূপোর গ্লাসে দামি পাথর বসানো ঢাকনা প্রসঙ্গে কথা উঠে। ঢাকনাটি তার বাবার বন্ধু উমিচাঁদ জগদ্ধাত্রীকে বিয়ের উপহার হিসেবে দেন। উমিচাঁদ জগদ্ধাত্রীদের বাড়িতে আসতেন তার বাবার সাথে তাস খেলতে। উমিচাঁদের সুন্দরী ভাগনি, লাখপতিয়ার সাথে খুব বন্ধুত্ব ছিল তার। উমিচাঁদের কথা উঠতেই জগদ্ধাত্রী তার সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। নীলু রায়ও উমিচাঁদের পরিবারের কাহিনি এবং নবাবের কলকাতা আক্রমণের ঘটনাটি জগদ্ধাত্রীকে শোনান – একবার চরাধিপতি রামরাম সিংহের বাড়িতে একটি গানের মজলিসে গিয়েছিলেন নীলু রায়। গান শেষে বাড়িতে ফেরার সময় রামরাম সিংহ তাকে একটি চিঠি দিয়ে বলেন, চিঠিটি তার বন্ধু উমিচাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে। নানা ঝামেলায় চিঠিটি তার দেয়া হয়নি। ঘটনাচক্রে মীর মহম্মদের সাথে তার দেখা হয়। মীর মহম্মদকে নীলু রায় ওই চিঠিটি উমিচাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন। প্রতারক মীর মহম্মদ সে চিঠি উমিচাঁদকে না দিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম সাহেবদের কাছে বিক্রি করে দেন। আর এদিকে ইংরেজরা চিঠি পড়ে বুঝতে পারে উমিচাঁদ ভেতরে ভেতরে নবাবের সাথে ষড়যন্ত্র করছে। এ অবস্থায় তারা উমিচাঁদকে বন্দি করে ফোর্ট উইলিয়ামে পুরে ফেলে। এতেই ক্ষান্ত হয়নি ইংরেজরা। তারা উমিচাঁদের বাড়ি ঘিরে ফেলে। বাড়ির জমাদার জগন্নাথ যখন দেখে ইংরেজ সৈন্যরা বাড়ির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে তখন তিনি লোকলস্কর নিয়ে বাধা দেন। রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। শেষরক্ষা করতে না পেরে তিনি অন্দরমহলের ভেতর ঢুকে সব মেয়ের উদ্দেশে বলেন–

আমি চিতা তৈরি করছি, তোমরা যদি আত্মসম্মান বাঁচাতে চাও এই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দাও। স্মরণ কর পদ্মিনীর কথা, জহরব্রতের কাহিনি। মেয়েরা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে ভয় পেতে লাগল। তখন ক্ষত্রিয় জগন্নাথ কি করল জানেন? তার হাতে শানিত তলোয়ার ছিল, সে টপাটপ তেরোজন মেয়ের মুণ্ডু কেটে জ্বলন্ত চিতায় ফেলে দিল একে একে। তারপর আত্মহত্যা করবার জন্যে নিজের বুকে ছুরি বসালো। কিন্তু মরল না সে। (বনফুল, ২০১৩: ৯৯)

আহত অবস্থায় তিনি পড়ে থাকেন এবং সুযোগ বুঝে অন্তর্ধান করেন। প্রতিশোধস্বরূপ তিনি নবাবের সৈন্যের ছাউনিতে গিয়ে সৈন্যদের কলকাতায় যাওয়ার টালার রাস্তাটা দেখিয়ে দেন। সে রাস্তা অনুসরণ করে নবাব ইংরেজদের মেরে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেন।

উক্ত ঘটনায় লেখক ইতিহাসের মধ্যে ইতিহাসকে নিয়ে এসেছেন জহরব্রতের কাহিনি উল্লেখের মাধ্যমে। তবে ইতিহাসে পদ্মিনীর জহরব্রতের কাহিনি নিয়ে অনেক মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ বলেন, ইতিহাসে জহরব্রতের কোনো কাহিনি নেই। ওই সময়ের ঐতিহাসিকগণের লেখা কোনো বইতে পদ্মিনীর জহরব্রতের উল্লেখ নেই। আবার অনেক পণ্ডিত বলে থাকেন, ইতিহাসে প্রচ্ছন্নভাবে কবিতা, গল্প, নাটকের মোড়কে আড়াল হয়ে থাকে অনেক সত্য ঘটনা, অনেক ইতিহাস।

এবার আসা যাক লৌকিক মিথের কথা। প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পেতে অনেক সময় দেবীরা মন্দির-সেবকদের ওপর ভর করেন। স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তাদের বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের পথ দেখান। লৌকিক মিথ রয়েছে, জমিতে ফসল না ফললে রঙ্কিণী দেবী স্বপ্নে নরবলির আদেশ দিয়ে থাকেন। বনফুলের অনেক গল্প-উপন্যাসে এমন স্বপ্নের কথা রয়েছে। *সন্ধিপূজায়*ও এ নরবলির কথা আছে। এক বছর ক্ষেতের কচি ফসল সব শুকিয়ে গেলে বনদেবী রঙ্কিণী মন্দিরের সেবক ঝামরিকে স্বপ্ন দেখান নরবলি ও শিশুবলি করতে হবে। পুত্র শোকে কাতর জগদ্ধাত্রীর উদ্দেশে ঝামরিকে তাই বলতে শোনা যায়– "শুধা শুধা ওই রক্তখাকিকে, শুধা কেন ও তোর ছেলেটা কেড়ে লিলেক, কেন আমাকে স্বপ্ন দিলেক– শুধা তুই।"(বনফুল, ২০১৩/১৪: ১২৮)

উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে ধূর্জটিমঙ্গল তার নতুন বাড়িতে দুর্গাপূজা উদযাপন করছে। অষ্টমী পূজা সম্পন্ন হয়েছে। এখন মহাসমারোহে সন্ধিপূজার আয়োজন চলছে। ধূর্জটিমঙ্গলের আহ্বানে জোড়হস্তে সবাই প্রতিমার সামনে এসে দাঁড়ায়। সাহেব এবং মুসলমান থেকে শুরু করে আহুত, অনাহুত, ধনী, দরিদ্র, বালক, যুবক, পৌঢ়, বৃদ্ধ – এক বিরাট জনতা। এ সময় নীলু রায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলেন–

এই সন্ধিপূজার সময় মায়ের কাছে বর প্রার্থনা করুন আমরা যেন বিজয়ী হই। আজ আমরা যুগ সন্ধিক্ষণেও উপস্থিত হয়েছি। মুসলমানের রাজত্ব শেষ হয়েছে, ইংরেজদের রাজত্ব শুরু হলো। এই সন্ধিপূজাও আমাদের করতে হবে। এই পূজার মন্ত্র পাঠ

করবেন আমাদের বিবেক। এই পূজায় আমরা শপথ নেব যে আমরা চিরকাল সত্যের দিকে, ন্যায়ের দিকে, ধর্মের দিকে থাকব। অসত্য অন্যায় অধর্ম আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। মা আমাদের আশীর্বাদ করুন। (পৃ. ১৭৩)

বনফুল প্রতিটি সময় প্রতিটি ক্ষণ ভারতবর্ষের অস্থির সময়কে নিয়ে ভেবেছেন এবং শোষণহীন, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। তার *অধিকলাল*, *এরাও আছে*, *গোপালদেবের স্বপ্ন* সহ অনেক উপন্যাসে বর্তমানের দুঃসহ সময় থেকে উত্তরণের আশাবাদী ইঙ্গিত দিয়ে এসেছেন। *সন্ধিপূজা* উপন্যাসটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

রাজনীতি-অবলম্বী জীবনের চালচিত্র বিষয়ক আলোচনান্তে বলা যায় যে, রাজনীতিতে কোনো ইজমের প্রতি বনফুলের ঝোঁক দেখা যায়নি। দেশের সহজ-সরল-অসহায়-নিপীড়িত মানুষের জন্য সহমর্মিতা তার মনকে আলোড়িত করেছে। সাম্যবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তবে সেই সাম্যবাদ অবশ্যই মনের সাম্যবাদ। বামপন্থী রাজনীতিতে তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি কংগ্রেস-অনুরাগী ছিলেন। মহাত্মাগান্ধিকে আদর্শ পুরুষ মানতেন। তবে তাদের সবরকম কাজকে তিনি সাধুবাদ জানাতেন না। দেশের সাধারণ অসহায় মানুষদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব কাজের প্রতি ছিল তাঁর পূর্ণ সমর্থন। যেই দলই হোক না কেনো, তাই রাজনীতিতে ভণ্ডামী চলে এলে তা সাথে সাথেই বর্জনীয় ছিল তাঁর কাছে। প্রথম উপন্যাস *সপ্তর্ষি*-তে বনফুলের রাজনীতি বিষয়ে কোনো স্পষ্ট মতবাদ প্রকাশিত হয়নি। সাতটি চরিত্রের দৃষ্টিকোন থেকে তিনি সমসাময়িক রাজনীতির ধারাকে তুলে ধরেছেন। উক্ত উপন্যাসে বনফুলের রাজনীতি বিষয়ে কোনো পক্ষপাত নেই। কিন্তু পরবর্তীকালের উপন্যাস *অগ্নি*, *স্বপ্নসম্ভব*, *পঞ্চপর্ব* ও *ত্রিবর্ণ* তে রাজনীতি বিষয়ে তাঁর মতামত অনেকটা স্পষ্ট বলে ধরে নেয়া যায়। *অগ্নি*-তে তিনি বেয়াল্লিশের রাজনীতির আন্দোলনকে উপজীব্য করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়
অতীতের নৃতাত্ত্বিক মানবসমাজ

নৃতত্ত্ব কী

অতীতের নৃতাত্ত্বিক মানবসমাজ নিয়ে আলোচনার শুরুতে 'নৃবিজ্ঞান' কী সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রয়োজন। 'নৃ' শব্দের অর্থ মানুষ আর বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান। তার মানে দাঁড়াচ্ছে মানুষ সম্পর্কে যে বিজ্ঞানে বিশেষভাবে জানা যায় তা-ই নৃবিজ্ঞান। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, পরিবেশ ও সংস্কৃতিতে মানুষের বিভিন্ন রকম আচার ব্যবহার লক্ষণীয়। মানুষকে জানার কৌতুহল বা আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। সে আগ্রহ থেকে মানুষ মানুষকে নিয়ে নানা রকম কেচ্ছা-কাহিনি তৈরি করে। কিন্তু তা সব ক্ষেত্রে সমান তথ্যপূর্ণভাবে বলা হয়ে ওঠে না। সে কারণে মানুষ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান সৃষ্টির জন্যে নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব। নৃবিজ্ঞানের ইংরেজি শব্দ Anthropology গ্রিক শব্দদ্বয় Anthropos এবং Logos থেকেই উৎপত্তি। অতীতের মানব সমাজ ও তার আচরণকে অধ্যায়ন করে নৃবিজ্ঞান। "এনসাইক্লোপিডিয়া অব অ্যানথ্রোপলজি'র সম্পাদকদ্বয় ডেভিড ই হান্টার ও ফিলিপ হুইটেনের মতে, এই জ্ঞানশাস্ত্রটিকে মনুষ্য প্রকৃতির একটি নিয়মতান্ত্রিক অধ্যয়ন হিসেবে অধ্যয়ন করা যেতে পারে।" (মাহফুজ, শাহারিয়ার, ২০২০: ১২) লক্ষ কোটি বছর আগের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনধারাও নৃবিজ্ঞানের আওতার অন্তর্ভুক্ত। নৃবিজ্ঞানে সব মানুষকে তার সমগ্রবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। নৃবিজ্ঞান চারটি ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে থাকে।

১. সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান: বিভিন্ন সমাজের সংস্কৃতি, সেসব সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্যক্তি বিশেষে সাংস্কৃতিক পার্থক্য নিরূপণই এ শাখার কাজ।

২. জৈবিক নৃবিজ্ঞান: জেনেটিক্স, বিবর্তন, প্রাচীন মানুষ, প্রাইমেট এবং তাদের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াতে বেশি জোর দেয়।

৩. প্রত্নতত্ত্ব: প্রাচীনকালের নিদর্শন এবং ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষণের মাধ্যমে সমসাময়িক মানুষ তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি প্রভৃতির অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করাই এ শাখার উদ্দেশ্য।

৪. ভাষাতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞান: এখানে মানুষের ভাষাসমুহ অধ্যয়ন করা হয়। উপরিউক্ত চারটি শাখা ছাড়াও নৃবিজ্ঞান আরও কিছু জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছে। (পৃ. ৩০-৩১) বিশেষ কোনো যুগে এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ নয়। বনফুলের *স্থাবর* ও *প্রথম গরল* উপন্যাস দুটিতে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে আলোচ্য উপন্যাস দুটি আলোচনা করা হবে।

প্রথম স্থাবর উপন্যাসের আলোচনায় আসা যাক। *স্থাবর* এর প্রকাশকাল ১৯৫১ কিন্তু এ উপন্যাস লেখার বীজ নিহিত ছিল বনফুলের হাজারিবাগ কলেজ জীবন থেকে। এ সময় কলেজের হুইটলে হলে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর এক্সটেনশন লেকচার দেয়া হতো। বনফুল সেসব লেকচার খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতেন। তেমনি একটি লেকচার শুনেছিলেন বনফুল ইতিহাসের অধ্যাপক জ্ঞানবাবুর। তিনি মানবের অতীত ইতিহাস নিয়ে একটি তথ্যবহুল আকর্ষণীয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন –

> সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমার মনে *স্থাবর* লিখিবার কল্পনা প্রথম অঙ্কুরিত হয়। মনে হইয়াছিল অতীতের এই মানব-সমাজ যেন রূপকথার দেশের সমাজ। সে রূপকথা কি লেখায় মূর্ত করিতে পারিব? সে সময় হইতেই নৃতত্ত্ববিষয়ক বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতাম। (বনফুল, ১৯৯৯: ৬৮)

উপন্যাসটি রচনা করতে লেখক যাদের সহযোগিতা পেয়েছেন *স্থাবর* রচনার ভূমিকায় তাদের নামোল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা হলেন – অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু, নৃতত্ত্ববিষয়ক অনেক বই দিয়ে বনফুলকে সাহায্য করেছেন। নৃবিজ্ঞান বিষয়ে বনফুলের কলেজ জীবনে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল তা কীভাবে বিকশিত হয়েছে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত তাঁর *বনফুল* গ্রন্থে বনফুল রচনাবলীর সম্পাদক শ্রীসরোজমোহন মিত্রের কথাগুলো স্মরণ করেছেন। সরোজমোহন মিত্র বলেছেন –

> বনফুল যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র তখনই তিনি মানবজাতির অভ্যুদয়কে নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার ইচ্ছে পোষণ করেন। সে সময় তিনি একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান। বনফুলের পিতার এক পিতৃব্য আশুতোষের বাড়িতে গৃহশিক্ষক ছিলেন। সেই সুবাদে বনফুল আশুতোষের বাড়ি যেতেন মাঝে মাঝে। একদিন বনফুলের সাথে আশুতোষের সাক্ষাৎ হয়। তিনি বনফুলকে বলেছিলেন – শ্রীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগ খোলা হবে। বনফুলকে তিনি ক্লাসে যোগ দিতে বলেন। ক্লাসে যোগ দিয়ে বনফুল খুব interested হয়ে পড়েন। আশুতোষের বাড়িতেই অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু এবং অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায়ের সঙ্গে বনফুলের আলাপ হয়। (প্রশান্তকুমার, ২০০০: ৯৩)

স্থাবর বনফুলের চ্যালেঞ্জিং একটি উপন্যাস। প্রতিদিনের কর্ম ব্যস্ততার জীবনে দীর্ঘ ত্রিশ বছর আগে দেখা স্বপ্নকে তিনি সফল করে

তুলেছেন যা এক সময় তাঁর কাছে ছিল অসম্ভব ভাবনা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবজাতির বিবর্তনের ইতিহাসকে তিনি একটি অমরাত্মা উত্তম পুরুষের জবানীতে বিবৃত করেছেন। বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসকে তুলে ধরতে তিনি মানুষের আচার-ব্যবহার, চলাফেরা, ভাব-বিনিময়, তাদের জীবনধারণের বৈচিত্র্য, তাদের ভাষা, পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়, হিংস্র আচরণ থেকে মানবিক আচরণ, নারী মাংস ভক্ষণ থেকে নারীকে জীবন চলার পথে অপরিহার্য করা, বিয়ে, বংশ স্থাপন, সন্তানকে মেরে ফেলা বা খেয়ে ফেলা থেকে তাকে রক্ষা করার

প্রয়োজনীয়তা, গোত্র-গোত্র লড়াই, ভূমি দখল, কল্পনাশক্তির বিকাশ, রোমান্টিক হয়ে ওঠা, কৃষিকাজ করে জীবন ধারণ করা – মোদ্দা কথা মানবজাতির সভ্য সমাজে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্রমবিন্যাস দক্ষতার সাথেই বর্ণনা করেছেন। সে সাথে প্রকৃতি ও পরিবেশের বর্ণনা যতটুকুই এসেছে তা যুতসই হয়েছে। এর আখ্যায়িকা কাল্পনিক হলেও মানবজাতির ইতিহাসকে তিনি নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন বলা যায়। মহাকালের পথ চলায় অক্লান্ত অমর চরিত্র 'আমি'র জীবনের বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনার বর্ণনায় বনফুলের কঠোর অধ্যয়ন ও কল্পনাশক্তির প্রমাণ মেলে।

স্থাবর এর ভূমিকায় বনফুল বলেছেন, মানবজাতির কাহিনি ইতিহাসের অন্ধকারে স্থাবর হয়ে আছে তার সম্পূর্ণ রূপ আজও অজ্ঞাত। গবেষণায় যতটুকু জানা গেছে, মানবজাতির প্রাথমিক পর্ব নিয়ে এ উপন্যাসের কাহিনি রচিত হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধতা এই উপন্যাসে নেই। কারণ এ উপন্যাসের বক্তা বিশেষ কাল বা পাত্রে আবদ্ধ নন। যুগ যুগান্তের বহু খণ্ড-জীবনের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। তার স্মৃতিকথা নিয়ে এ উপন্যাস। এ আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু ইতিহাসে এ কল্পনার সমর্থন আছে।

অতি প্রাচীনকালে নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডে বসবাস ছিল না মানুষের। বেঁচে থাকার জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সময় পরিক্রমায় যাযাবর জীবনযাপনের ফলে মানুষ বিশ্বের নানা জায়গায় নানা পরিবেশে নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান এক আদিম মানবকে দেখতে পাই যাকে তাড়া করেছে তার দলপতি। সামনের দিকে ঝুঁকে চলা ক্ষুধা আর কামনা সর্বস্ব লোমশ বন্যমানবের যুগে এটাই ছিল নিয়ম। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দলে তার ঠাঁই নেই। তাকে বাঁচতে হবে নিজের চেষ্টায়, সঙ্গীনি জুটিয়ে, শিকার করে, লড়াই করে। আদিম ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে গিয়ে, এক যুবতীকে জাপটে ধরে নিজের দিকে টানতে গিয়ে, তাড়া খেয়েছিল সে। কোনো রকমে প্রাণ হাতে নিয়ে গাছের কোঠরে রাত কাটিয়ে যখন সে নতুন সকাল দেখলো তখন ক্ষুধা তাকে প্রথম সাড়া দিতে বাধ্য করে। সে বুঝতে পারলো, আরেক দলপতি জুজুমের এলাকায় সে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু এখানেও সে নিরাপদ নয়। বনের বাস্তবতায় মানুষ কিংবা পশু কেউ কারো কাছে নিরাপদ নয় বরং নিজস্ব বিচরণ এলাকায় সবাই সবার প্রবল প্রতিপক্ষ। ভিতর থেকে সে অনুপ্রেরণা পেলো – যেকোনো মূল্যে বাঁচতে হবে, আর বাঁচতে হলে চাই সঙ্গী, ক্ষুধার সঙ্গী, লড়াইয়ের সঙ্গী, চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সামনের যাওয়ার সঙ্গী। আদিম উদ্দাম আকর্ষণে অনাবৃত রমণী ইকার প্রতি নায়ক চিরজাগ্রত ক্ষুধা অনুভব করে তীব্রভাবে।

নৃবিজ্ঞানে মানবজাতির মুখের গঠনের বা মুখাবয়বের যেমন বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসে তেমনি করে উপস্থাপন করা হয়েছে মানুষের অবয়ব। পানিতে নায়ক নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় – ঝাঁকড়া চুল, ঝাঁকড়া ভ্রু, ছোট ছোট

চোখ, মুখ বুক কালো কর্কশ লোমে পরিপূর্ণ, আজানু লম্বিত দীর্ঘ বাহু, বিরাট থ্যাবড়া নাক তাতে বিরাট গর্ত এবং সামনের দিকে আগানো চোয়াল। অনেকটা দেখতে পশুর মতোন। এ মানুষদের খাদ্য আর পশুদের খাদ্য প্রায় একই। তখনও মুখে ভাষা ছিল না, ইঙ্গিতের চাহনি ছিল ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম। এ যুগে পাথরই প্রথম বন্ধু এবং আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র ছিল। আদিম মানুষ পাথর ঘসে আগুন জ্বালাতো, পশু শিকার করতো এবং শীত নিবারণার্থে পশুর চামড়া পরিধান করতো। সে জলাশয় আবিষ্কার করলো এবং পরবর্তীতে জলাশয়ে ফিরে আসতে শুকনো পাতা পথে ফেলে পথ-চিহ্ন দিয়ে রাখার কৌশল রপ্ত করে। পাহাড়ের গায়ে গাছের ডাল দিয়ে মাচা বানিয়ে রাত্রি যাপন। ইকাকে যেকোনো উপায়ে করায়াত্ব করার মনোবাসনা থেকে পথে লাল ফুল ফেলে রেখে ওত পেতে থাকে এবং তাকে বাগে পেয়ে জোর জবরদস্তি করে পাহাড়ে নিয়ে আসে। এভাবে আদিম মানুষের গৃহস্থালি স্থাপিত হয়। ইকাকে নিয়ে নায়কের শুরু হয় এক নতুন জীবন। এ জীবনে সে নিজেই দলপতি, আত্মবিশ্বাসী, শিকার সন্ধানী, কৌতুহলী আদিম জীবন। এ জীবনও কেটে যায় বহুদিন, বহুকাল ধরে শিকার করে, সন্তান জন্ম দিয়ে, কাড়াকাড়ি করে, হানাহানি করে, গর্জন করে, হত্যা করে বহু চড়াই-উৎড়াই অতিক্রম করে। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার, এ সময়টাতে বন্য নারীর মাথায় ফুল গুঁজে রাখার যে সৌন্দর্যানুভূতি তা কি প্রকৃত অর্থেই আদিম নারীদের সহজাত ছিল, নাকি তা একান্তই শিল্পীর স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ – বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ।

উপন্যাসের পট পরিবর্তনে এবার আসে জলবায়ুর পরিবর্তন। অনেক ইকা এসেছে আবার চলেও গেছে, সন্তান জন্মেছে, মরেছে। এ পর্যায়ে কথক ভৌগোলিক নতুন সীমায় এসে পড়েছে যেখানে তীব্র শীত আর তুষারপাতের কবলে দিন কাটছে তার। শীত এবং তুষার – দুই শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পেতে অবিরাম লড়াই করতে করতে একদিন হঠাৎ গর্তে পড়ে গিয়ে সে আবিষ্কার করে ফেলে গুহার। শুরু হয় গুহা-জীবন। সাদা শত্রু তুষারের কবল থেকে কাচিনকে সন্তানসহ উদ্ধার করে দুর্দিনের খাদ্য হিসেবে গুহায় সংরক্ষণ করে রাখে কথক নায়ক। প্রাকৃতিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে এক সময় দুজন দুজনের খাদ্য হিসেবে নয় বরং পরস্পর পরস্পরের জন্যে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। গুহাবাসী জীবনে আবার পরিবার গড়ে ওঠে, ফলে কাচিনের সংসারে জন্ম নেয় নায়কের অনেক সন্তান। শীত নিবারণের উপকরণের অভাব এবং তীব্র শীতে খাবারের অভাবে সন্তানরা একে একে মারা যেতে থাকে। এদিকে কাচিনের স্তন পান করে নায়কের দেহে অসুরের বল সঞ্চারিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে নায়কের প্রতি কাচিনের মধ্যে বাৎসল্যভাব জেগে উঠে। জলবায়ু সহনশীলতায় টিকে যাওয়া গাছ, লতাপাতা, ফলমূল এবং প্রাণীরা যোগান দিতে থাকে খাদ্য। তাদের খেয়ে মানুষের দল এগিয়ে চলতে থাকে নতুন পরিস্থিতির, নতুন পরিণতির দিকে। একদিন সেই জীবনেরও শেষ হয়, এক বিরাট বন্যজন্তুর গুহায় পড়ে যাওয়ার ভেতর দিয়ে। জন্তুর পাদপিষ্ট

হয়ে ও পাথরের চাপে কাচিনের বীভৎস মৃত্যু হয়। এ মৃত্যু অনেক দিন তাড়া করে ফিরেছিল নায়ককে। জীবনের নতুন বাঁকে সে আবার একা, গুহা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে সে। শেষ হয় গুহা-জীবন।

গুহার বাইরে এসে কথক দেখতে পায় এক নতুন দৃশ্য, বিরাট একদল মানুষ, প্রকাণ্ড জনতার ঢল। যে জন্তুটা কিছুক্ষণ আগে তার পরিবার কাচিনের বীভৎস্য মৃত্যু ঘটিয়েছে সে জন্তুটাকে ঘিরে ধরে একদল মানুষ বল্লম দিয়ে খোঁচা মারছে। এ দৃশ্য অবলোকনে তার উপলব্ধি হয় একক মানুষের দিন শেষ, বাঁচতে হলে দলবদ্ধভাবে বাঁচতে হবে মানুষকে। সমর্থ মানুষকে কাজে লাগাতে হবে – এ মানসিকতা থেকে সমাজভুক্ত হয়ে দলবদ্ধাভাবে চলতে শুরু করে মানুষ। গড়ে উঠে যাযাবরের সামাজিক জীবন। এখানে কেউ কারো ভাষা বুঝতে না পারলেও ইঙ্গিতের ভাষায় কাজ চালিয়ে যায় কিন্তু দলভঙ্গ হয় না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়ে সবাই লড়াই করে টিকে থাকতে শুরু করে। দৃশ্য-অদৃশ্য শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পেতে দলবদ্ধ জীবন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। দলীয় জীবনের বিকল্প নেই। নতুন দলের হাতে দেখা যায় পাথর, নতুন ধরণের অস্ত্র, আরো ধারালো, আরও তীক্ষ্ণ আরও মসৃন এমনকি অস্ত্রের গায়ে চিত্রঅংকিত থাকতো। দলীয় শৃঙ্খলার ইঙ্গিত মানুষের মধ্যে একত্রে বসবাসের এবং শিকার ও আহারের মধ্যে বন্ধনের জন্ম দিতে থাকে। এখানে হিংস্রতার পাশাপাশি আছে লোভ, হিংসা, ঈর্ষা, কুটিলতা আর নতুন নিয়ম, আরও আছে নেতৃত্ব, আনুগত্য। এসব মানুষেরা কূল চিহ্নিত টোটেমে বিশ্বাস করে, পূজা করে, মিথ্যা বলে, লুকোচুরি করে হনন করে, হরণ করে। নতুন পরিবেশে দক্ষ শিকারী কথক নারী জুমনির প্রতি আকর্ষণবোধ করে। জুমনির গলায় শোভা পায় অলংকার (ঝিনুকের মালা, নাকে নোলক) ও মুখে-কপালে মেকাপ (লাল, হলুদ রং) এবং পোশাকে ঘাগরা। জুমনির কথায় নায়ক দুঃসাধ্য ম্যামথ শিকার করে তার হৃদপিণ্ড বের করে আনে। জুমনি হৃদপিণ্ডটা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে খেতে থাকে বুভুক্ষুর মতো। এখানে নায়কের কাছে একটি বিষয় নতুন ঠেকেছে, তা হলো – জুমনির স্বামীকে সমাধি বা কবরস্থ করার বিষয়টি। দলের জন্যে অনেক কিছু করেও তার আশ্রয় হয়নি তাদের মধ্যে। অবশেষে সে ভেসে যায় বরফ খণ্ডের সাথে।

বড় বড় বিপদ থেকে বারবার উদ্ধার পাওয়ায় কথকের অজ্ঞাতসারেই তার মধ্যে এরূপ বিশ্বাস জন্মায় যে, অদৃশ্যলোকে কেউ একজন আছেন যিনি তার রক্ষক। প্রতিবারই তাকে বড় ধরণের বিপদ থেকে রক্ষা করে চলছে সে। এ পর্যায়ে বন্য হিংস্র জন্তু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে যুঝে অলৌকিকে বিশ্বাস স্থাপন হয় কথকের। ঘটনা পরম্পরা এবং একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নায়কের অদৃশ্যলোকে বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই কাহিনির এ পর্যায়ে দেখানো হয়েছে।

নতুন আরেক ধরণের সমাজে নায়কের আগমন। এ সমাজে বরফ বা খাদ্য সংগ্রহ কোনো সমস্যা ছিল না, ভাষাও ছিল পরিচিত। তবে এখানে মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের বৈচিত্র্য ছিল প্রধান প্রেরণা। "পুঠা, লুং, রূঠা, হুংজুরা বরফের ভয়ে ভীত নহে, খাদ্যাভাবে কাতর নহে, তাহাদের সমস্যা অন্য জাতীয়।" (বনফুল, ২০১৩/৬: ৪৪১) এখানে মানুষের আচরণের মধ্যে একটা কাঠামো নির্মিত হচ্ছিল। বল্গা হরিণের পিছু পিছু ছুটে চলা শিকারী মানুষ পশুর সমান্তরাল অবস্থান থেকে ক্রমান্বয়ে মনুষ্যত্বের অবস্থানের দিকে অগ্রসরমান। তার সম্মুখপানে এভাবে এগিয়ে চলা যতটা না বাহ্যিক তার চেয়ে বেশি অভ্যন্তরীণ। আদিম চেতনার ইঙ্গিতে বারবারই সামনে এগিয়ে চলেছে মানুষ। প্রত্যেকবার বিপদের সম্মুখে পড়ে প্রাণ যখন্ন বিপন্ন হয়েছে তখনই বাঁচার প্রেরণায় উঠে দাঁড়িয়েছে সে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচতে চেয়েছে বলেই বেঁচে থেকেছে, আহত হয়েছে, রক্তাক্ত হয়েছে। নতুন সমস্যা এনেছে নতুন নতুন সমাধান। পুরানো অভিজ্ঞতা নতুন কৌশল অবলম্বনে সহায়তা করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে গায়ে তুলেছে পশুর চামড়া, আশ্রয় নিয়েছে পাহাড়ের গুহায়, হাতে নিয়েছে নতুন পাথর, নতুন অস্ত্র। জীবনের প্রতিকূল পথের বাঁকে বাঁকে মানুষের ভেতরের হিংস্রতা ও অসহিষ্ণুতা কিছুটা সমঝোতার ভেতরে আসতে শুরু করে। এ নতুন সমাজ মূলত মাতৃতান্ত্রিক। এখানে মায়ের পরিচয়েই গোষ্ঠীর পরিচয়। মানবীয় আচরণের নার্সারী এ সমাজের সমাজপতি হলেন পুঠা। পুঠা পুত্রহারা গোত্রপতি, মূলত পুঠার বোন রূঠার সন্তান ও তাদের বংশধরেরাই এ সমাজের বাসিন্দা। নতুন এ আচরণবাদী মানবসমাজের আর একটা লক্ষণীয় উপাদান হলো ভাষা। এতকাল মানুষ ইশারা ইঙ্গিতের সাহায্যে কিংবা গরগর করে, চিতকার করে, গর্জন করে অগঠিত অব্যক্ত ধবনির শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে পারস্পরিক যোগাযোগ করতো কিন্তু। এ সমাজে দেখা গেলো পুঠা ও রূঠা গোষ্ঠীর ভাষার সাথে কথকের ভাষার মিল রয়েছে। তারা একে অপরের সাথে বোধগম্য ভাষায় ভাব-বিনিময় করে প্রয়োজন মিটিয়েছে –

> একটি কথাই বার বার মনে হইতেছিল ভাগ্যে ইহাদের ভাষার সহিত আমার ভাষার কোনও অমিল নাই। থাকিলে কি পুঠা আমাকে আশ্রয় দিত? কি করিয়া যে ইহাদের ভাষার সহিত আমার ভাষার মিল হইল তাহাই চিন্তা করিতে করিতে চলিয়ছিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, হয়তো কোনও কালে ইহাদের সহিত ঘনিষ্টতর সম্পর্ক ছিল। হয়তো আমার পূর্বপুরুষ এবং ইহাদের পূর্বপুরুষ একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিপর্যয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় ছিলাম আমরা? অতীতের দিকে চাহিতে গিয়া কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেলো, একটা কুয়াশার মধ্যে যেনো দিশাহারা হইয়া পড়িলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা কথাই কেবল মনে হইতে লাগিল, ইহারা আমার ভাষা বোঝে, ইহারা আমার আত্মীয় এবং ইহারা জয়ী হইয়াছে। এই করাল বরফকে ইহারা জয় করিয়াছে। বরফেরই গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতেছে। (পৃ. ৪৪৩)

ঔপন্যাসিক এখানে দেখিয়েছেন, ভাষার মিলগত কারণে নায়ক নতুন গোষ্ঠীর কাছে আশ্রয় পেয়েছেন এবং তাদেরকে আত্মীয় মনে করেছেন এবং তার উপলব্ধি হয়েছে এদের পূর্বপুরুষ এবং তার পূর্বপুরুষেরা একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল

অর্থাৎ মানুষের ক্রমাগত অগ্রযাত্রার এ উপলব্ধির গতি, তার ধাবমান স্পন্দন এভাবে কাল থেকে কালান্তর প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে এগিয়ে চলেছে। ভাষা মানুষের অগ্রযাত্রার প্রথম চলক যার সাহায্যে সে অভিজ্ঞতা, তার জ্ঞানকে অন্যের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে শিখেছে। এতোদিন আগুনের আবিষ্কার জীবনযাত্রাকে করেছে সহজ, পাথরের অস্ত্র দিয়েছে শিকারের সহজ উপায় আর এ পর্বে ভাষা তাকে দিয়েছে সমষ্টিচেতনা। এ চেতনা থেকে পরবর্তী সময়ে 'সামাজিক বিশ্বাস' জন্ম নিয়েছিল এসব সমাজে। এসেছে বংশ বা কূল চিহ্নিত টোটেম যেমন, টিট্রিভ গোষ্ঠীর সাথে পুঠার লড়াই কিংবা রূঠার জলভল্লুক হয়ে যাওয়ার অলৌকিক চেতনা। এ চেতনা বিশ্বাসই বটে তবে বিশ্বাসের চেয়েও জোরালো, প্রভাবশালী এবং প্রথম ধরাছোয়ার বাইরের অদৃশ্য সত্য, অদৃশ্য নিয়ন্তা। সন্তানহারা প্রৌঢ়া পুঠার সন্তানরূপে তার আশ্রয়ে থেকে নায়কের ভিন্ন রকম জীবনের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ হয়। এ জীবনে নতুন বেশভূষা ধারণ, চামড়া দিয়ে বাঁধা কাঠের জুতা পরিধান, নারী-নেতৃ পুঠার – "বলিষ্ঠ গঠন, উদভ্রান্ত দৃষ্টি, স্বল্প-ভাষণ...নিশীথ অভিযান, গভীর রাত্রিতে তাহার একক চিৎকার সত্যি তাহাকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল।" (পৃ. ৪৪১) কর্মগুণে নায়ককে এ মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পুঠা দলপতি বানায় নায়কের বংশ পরিচয় আড়াল করে। এ সমাজে সবাইকে নিয়ম-রীতি মেনে চলতে হতো। রূঠা, পুঠা ও ডিংঘা তিনজন তিনটি বংশ স্থাপন করে। রূঠা জলভালুককে, পুঠা রোমশ গণ্ডারকে আর ডিংঘা টিট্রিভ পাখিকে স্বপ্ন দেখে। তিনটি জন্তু দিয়েই তাদের মা তিনটি বংশ স্থাপন করেছিল। তিনি মৃত্যুর প্রাক্কালে সন্তানদের সাবধান করে ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন, ভাইবোনের মধ্যে সম্পর্ক করা হলে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। তাদেরই এক ভাই মায়ের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বিয়ে করে এবং দুই দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় ভীত হয়ে সবাই সাবধানতা অবলম্বন করে। এ বংশের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এরা নিজ সন্তানদের মধ্যে নবজীবন লাভ করে। যার কোনো সন্তান নেই সে নবজীবন লাভ থেকে বঞ্চিত হয়, যেমন পুঠা, তার সব সন্তান মারা গেছে কেউ বেঁচে নেই, সে নিঃসন্তান। এভাবে আদিম মানুষের মধ্যে বংশ-চেতনা গড়ে উঠে। এসময় মানুষ সম্মোহন শক্তি আবিষ্কার ও তার ব্যবহারের পাশাপাশি, ভবিষ্যত দর্শন, ভাগ্য এবং ভাগ্য গগণার কৌশল পর্যন্ত আবিষ্কার করেছে। জীবন সংগ্রাম আগের তুলনায় বেড়েছে, বিবাহ প্রথার প্রচলন হয়েছে, কুকুরকে পোষ মানানো থেকে শুরু করে, স্লেজ গাড়ির ব্যবহার, অপহরণ, বংশ এবং বংশ মর্যাদা, সম্পদ এ সময় সামাজিক অস্তিত্ব সৃষ্টি করেছে। মানুষ অতিমানবিক শক্তির সাধনা শুরু করে এবং অবিশ্বাস্য সামর্থ ও সফলতার দেখা পায়। নারী ও পুরুষের মাঝে পারস্পারিক অধিকার ও মর্যাদাবোধ, দোষ-গুণ, নালিশ, সালিশ, বিচারবোধ, শাস্তি – সবই ক্রিয়াশীল ছিল এ সমাজে। এসব মানুষের কাছে তারা-ভরা আকাশকে অনেক চোখওয়ালা দৈত্য মনে হতো কিন্তু তা ক্ষতি সাধন করতো না। অধিকাংশ সময় সে প্রসন্ন থাকে তবে চটিয়া গেলে বজ্র নিক্ষেপ করে। অবশেষে

নায়কের ছদ্ম পরিচয়ের (জলভালুক) মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়লে প্রাণদণ্ডের ভয়ে সে নিজেই সমাজ থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

সাংস্কৃতিক অভিঘাতের এ পর্যায়ে বরফে ঢাকা তুষার আচ্ছাদিত জীবন থেকে শ্যামশোভাময় নবীণ অরণ্যে সংসার করার মানসিকতা জেগেছে নায়কের। নতুন অঞ্চলে একদল বলগা হরিণের পিছু নিয়ে শ্মশ্রুমণ্ডিত নায়ক ছুটেছে জোলমার সন্ধানে। বৃহার মেয়ে জোলমাকে নিয়ে সংসার করার বাসনা জেগেছে তীব্রভাবে। গর্তে পড়ে পা ভেঙে শত সদস্যের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নায়ক শ্যেনসম্প্রদায়ের দলে ঢুকে পড়েছে। যেকোনো মূল্যে জোলমাকে পেতে চায় সে। অসভ্য যুগে কিছু সভ্য সমাজের লক্ষণ এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন, জোলমাকে পেতে নায়কের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা থাকায় সে অন্য নারীর দিকে মনোযোগ দেয়নি; বংশ বিস্তারের চেতনার বশবর্তী হয়ে বৃহার মা গৌ বৃহার হত্যাকারী যে নায়ক, তা জেনেও তাকে হত্যা করেনি বরং কৌশলে শ্যেনসম্প্রদায়ের দলনেতা বানায় তাকে; গৌ জোলমার কোলে সন্তান দেখতে চায় এ শর্তে নায়ককে নানাভাবে প্ররোচিত করে এমনকি তাকে নপুংসক বলে তিরষ্কার করতে দ্বিধা করেনি; আধুনিক যুগের পাত্রের মতো নায়ক বিয়েতে নায়িকা জোলমার মতামত জানতে চেয়েছে এবং লৌকিক সংস্কারাচ্ছন্ন অসভ্য যুগের যুবতী নারীর বিয়ের পর স্বামীকে তার অঙ্গ স্পর্শ না করতে প্রতিজ্ঞা করানো।

জোলমার রহস্যময়ী নারীরূপ এখানে ব্যক্তিত্বের আভাসে প্রস্ফুটিত। মানবচরিত্র প্রথম মনুষ্যত্বের মূর্তরূপ পরিগ্রহ করেছে। এইখানে প্রেম ভালোবাসা, অভিমান অনুযোগ, অভিযোগ আহ্বান, কামনা আকর্ষণ, জিঘাঙসা আরও উন্নত আরও মানবিক। টাহা ও বৃহার মা গৌ এর মধ্যে মানবিকবোধ বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। যেখানে হরিণকে অনুসরণ করে জীবন-ধারা নির্ধারিত সেখানে কোনো শিশু জন্ম গ্রহণ করেছে এমন খবর পেলেই গৌ সেখানে ছুটে যেতো। তার মতে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস মানুষ, আর সবচেয়ে সুন্দর জিনিস শিশু। পাহাড়ে হরিণ-উৎসবকে কেন্দ্র করে পুরুষ ও যুবতীর হরিণ-হরিণীর সাজে গান-নাচের অন্তরালে নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি গান গেয়ে আকর্ষণ অনুভব করাকে গুরুত্ব দিয়েছেন – "ও হরিণ, ও হরিণ, তুমি ঘাস খাও, জল খাও, হরিণীর দিকে মন দাও, এবার হরিণীর দিকে মন দাও। ... ও হরিণী ও হরিণী, তুমি ঘাস খাও, জল খাও, তুমি হরিণের দিকে মন দাও, এবার হরিণের দিকে মন দাও।" (পৃ. ৪৭৫) এ পর্বে উপন্যাসের মূল আকর্ষণ নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, তার মতামতের গুরুত্ব এবং অধিকার সংরক্ষণের প্রচেষ্টা।

নায়কের মধ্যে নীল চোখ জোলমার প্রতি টান ছিল অভেদ্য। তার প্রমাণস্বরূপ এলাহি বিয়ের পর নায়ককে তার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করলে নায়ক তা ছাড়িয়ে নেয়। জোলমাকে পাওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাকে অন্য নারীর প্রতি

বিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে সাহায্য করেছে। প্রথম দিকে নায়ক জোলমার কুমারী থাকার পেছনের ইতিহাস শোনার পর তাকে স্পর্শ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। নায়কের জোলমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকার ব্যাপারটি গৌ বুঝতে পেরে তাকে অপমান করে ফলে নায়কের মধ্যে আবার ভাবান্তর ঘটে। এদিকে নায়কের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বীরত্ব ও ছবি আঁকার ক্ষমতা জোলমাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু জোলমার পবিত্রতার উপর শ্যেনসম্প্রদায়ের জীবন-মরণ নির্ভর করে বিধায় আজীবন সে কুমারিত্বকে বরণ করে নিয়েছে। হরিণ শিকারের ফাঁদ হিসেবে হরিণের ছবি আঁকবার সময় প্রদীপ হাতে সে বৃহার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। সংস্কারবশত বাবা-মেয়ে দুজনে বিপরীত লিঙ্গকে স্পর্শ করতে পারবে না – এমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তারা। এছাড়াও জোলমার সাথে কারো সংসার হলে বড় রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সব সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সমাজপতি গৌ, কেবল বংশ রক্ষা করার ব্যাপারটি বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। একারণে গৌয়ের পরিকল্পনা মাফিক বৃহা বনে আগত মহিষের দল প্রতিহত করতে যায়। এসময় বৃহা টাহাকে বলেছে তার পক্ষে গুহায় ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হবে না অর্থাৎ বৃহা বুঝতে পেরেছে এ যাত্রায় তার মৃত্যু অনিবার্য। আদতে তা-ই দেখা গেছে। নায়ককে দলনেতা করার এবং বৃহাকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে গৌয়ের এ পরিকল্পনা ছিল। বৃহার হাতে কুলদেবতার জীবন বিপন্ন দেখে বাণ নিক্ষেপ করে বৃহার মস্তক বিদীর্ণ করতে এতটুকু পিছপা হয়নি নায়ক। এখানে ধর্ম-চেতনা তার বহু কাঙ্ক্ষিত জোলমাকে পাওয়ার ইচ্ছাকে ক্ষণিকের জন্যে বিসর্জন দিতে তাকে উদ্দীপ্ত করেছে। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় – 'সবাই দলবদ্ধ হয়ে যে চলে তা নয়; কেউ কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অন্য কোনো দূরদেশের সম্প্রদায়ের নীলচোখ মানুষের সঙ্গে (জোলমার মা) নায়কের সাক্ষাৎ প্রমাণ করে দেশ দেশান্তরের জাতিগত পার্থক্য ধীরে ধীরে ঘুচে যাচ্ছে।' (পবিত্র, ১৯৯৯: ১৮২)

বিয়ের পর নায়ক ওয়াদা ভঙ্গ করে জোরপূর্বক জোলমার হাত চেপে ধরলে পরক্ষণেই প্রবল ভূমিকম্প এবং বন্যা হয়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এদিকে নায়ক শ্যেনসম্প্রদায়ের দলনেতা হওয়ায় তার উপর জিকাটু পর্বতের গুহায় আটকে পড়া শঙ্খচূড়াকে নিধনের দায়িত্ব পড়ে। নায়ক লোকবল নিয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রজ্জ্বলিত কাঠ গুহার ভিতর ফেলে এবং গুহার মুখ পূর্বের মতো বড় পাথর দিয়ে আটকে দেয়। এতে করে পাহাড় ফেটে যায়। পাহাড় ফেটে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো – পাহাড় ফেটে পড়া এবং নায়কের জোলমাকে স্পর্শ করা ঘটনা দুটি কাকতালীয়ভাবে এক রাতেই ঘটে। দুটি ঘটনা একই সাথে ক্রিয়াশীল ছিল। লৌকিক সংস্কার মতে, জোলমাকে স্পর্শ করায় ভূমিকম্পে পাহাড় ফেটে পড়েছে আবার পাহাড়ের প্রকাণ্ড গুহায় প্রচুর প্রজ্জ্বলিত কাঠ ফেলে গুহামুখ ঢেকে দেয়ার কারণে পাহাড় ফেটে ভূগর্ভস্থ পানি বেরিয়ে এসে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। (বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এ কথা অমূলক নয় যে, গুহার ভিতর অনেক আগুন দিয়ে গুহা মুখ বন্ধ করে দিলে পাহাড় ফেটে মাটির নিচ থেকে পানি বেরিয়ে আসতে পারে। বন্যার জলে ভেসে যায় জোলমা।) নায়ক গাছে আর অবস্থান করতে না পেরে লাফিয়ে পড়ে

পানিতে, দূরের পাহাড় চূড়া লক্ষ করে সন্তরণ দিয়ে চলে। জোলমা সম্পর্কে ওহালির দেওয়া ভবিষ্যৎ বাণী ফলে যায়।

পরের পর্বে নায়ককে প্রথম ও শেষ বারের মতো স্ত্রী চরিত্রে দেখা যায়। সে ঝিলমের স্ত্রী, নাম জিতা। এখানেও পশুর চামড়ার পরিচ্ছদ পরিধানের রীতি বজায় ছিল। তবে এ সমাজে মেয়েরা মাছ ধরে। এক ধরণের সাদা মাছ তাদের খুবই প্রিয় খাদ্য। তারা এ মাছের নাম দিয়েছে 'জলের বলগা-হরিণ'। শিকারের প্রধান লক্ষ্য এবার জলের তিমি মাছ। এ মাছ দিয়ে তাদের অনেক রকম উপকার সাধিত হয়। নৌকায় অস্ত্র নিয়ে বসে হরিণ শিকার করে ঝিলমের দল। তদুপরি, ভীষণ-দর্শন লোমশ কস্তুরী-বৃষ ও উড়ন্ত পাখিও শিকার করে তারা।

স্ত্রী চরিত্র থেকে এবার নায়ক দশ বছরের বালক। তুষারের দেশ, পর্বত বা অরণ্য অতিক্রম করে নায়কের আবাসস্থল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানের লৌকিক সংস্কারের একটি বিশেষ দিক প্রাধান্য লাভ করেছে। মায়ের প্রথম সন্তানকে মেরে ফেলা হয় কারণ তার বাবার পরিচয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অজ্ঞাত থাকে এবং শিশুটি হয় অপুষ্টিসম্পন্ন। তাদের মধ্যে এমন বিশ্বাস প্রচলিত – প্রথম শিশুটি দ্বিতীয় শিশুরূপে নবজন্ম লাভ করে এবং দশ বছর বয়স পর্যন্ত সে মায়ের দুধ পান করে। অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে দীক্ষা নিতে হয়। দশ বছরের পর বালক সমাজের হয়ে যায়। তাই তাকে সব রকম কষ্ট সহ্য করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। বালকের সমবয়সীরা তাকে গোসল করায়, একজন এসে সামনের পাটির দাঁত ভেঙে দেয় এবং কাঁদতে বারণ করে। গ্রামের পুরোহিত এসে তাকে উপদেশ দেয়: –

> খুব বেশি স্বার্থপর হইও না, যাহা শিকার করিবে তাহা একা ভোগ করিও না। সকলে মিলিয়া ভোগ করিলে বেশি আনন্দ পাইবে। কলহ করিবে না, শান্তিতে থাকিবার চেষ্টা করিবে। তোমাদের কুলদেবতা বানরের মাংস কখনও খাইবে না। বানরের যাহাতে অপকার হয় তাহা কখনও করিবে না। স্ত্রীলোকদের বেশি প্রশ্রয় দিও না। বেশি স্ত্রীলোকদের সংস্রবেও আসিও না। গ্রামের সমস্ত লোকদের নিজের লোক মনে করিবে। জানিবে তাহাদের সম্মানে তোমার সম্মান, তাহাদের অপমানে তোমার অপমান। যাহা বলিলাম, তাহা যদি পালন কর হোমভু তোমার সহায় হইবেন। হোমভু সর্বত্র আছেন। আকাশে তাঁহার বাড়ি, কিন্তু থাকেন তিনি সর্বত্র, কে কি করিতেছে সব লক্ষ্য করেন। (পৃ. ৫৫৯)

দীক্ষা শেষে তাকে নিজে পাত্রী পছন্দ করে বিয়ে করতে হয়। লক্ষণীয় বিষয়, এ সমাজে যৌতুক প্রথা প্রচলিত ছিল। সে প্রথা অনুযায়ী যে পাত্রী-পক্ষ তাকে বেশি উপঢৌকোন বা যৌতুক দিতে পারবে তার সাথেই তার বিয়ে হবে। এ ক্ষেত্রে বালকের মা চারটি শঙ্খের মালা এবং একটি বাঘের চামড়া দাবি করেছে পাত্রী পক্ষের কাছ থেকে।

বিরামহীন চলার পথে অন্ধকার গুহার আরেকটি বাঁকের স্মৃতি-চিহ্নের এ পর্যায়ে দেখা যায়, পাথর ও আগুনের মতো এ সমাজে কুকুরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এ কারণে এ সমাজের মানুষেরা কুকুর পোষে। জীবন সংগ্রাম এখানে অনেক কঠিন। সবলেরা বনের সবটুকু দখল করে রাখে। দুর্বলেরা বিতাড়িত হয়ে হ্রদের মাঝখানে বড় বড় নৌকায় বাস

করে। নায়ক এবার হ্রদের নৌকা-গ্রামের দলনেতা। ভুঙ্গ সম্প্রদায়ের সবলেরা রাতে যখন উৎসবে মেতে থাকে তখন দুর্বলেরা কুকুরের সাহায্যে হরিণ শিকার করে থাকে। কুকুরের ঘ্রান-শক্তি বেশি থাকায় হরিণ শিকারে অনেক সুবিধা হয়। নায়কের স্ত্রী শীলিনা, তাদের দুই ছেলে গোধা ও অবহি এবং এক মেয়ে চোনা। বড় ছেলে লোহাকে প্রবল শক্তিশালী বনরক্ষক ভুরুষ তীরাঘাতে মেরে ফেলেছে। এ সমাজে সবলেরা একটি জায়গায় দুর্বলের মুখাপেক্ষী হয়, সেটি হলো তাদের মেয়েদের সম্পর্কে সবলদের অপরিসীম মোহ। তাই নায়কের মেয়ে চোনা বাহারি সাজে সজ্জিত হয়ে শঙ্খের গহনা পরে, কড়ির মেখলা দুলিয়ে, সর্বাঙ্গে নানাবর্ণে রঞ্জিত করে এবং মুখে হাব-ভাব ফুটিয়ে বনরক্ষকদের ভুলিয়ে রাখে শিকারের সুবিধার জন্যে। এ পর্বে সন্তানের প্রতি মায়ের নাড়ীর টান স্পষ্ট হয়েছে। তাই বনরক্ষকের হাতে শীলিনার বড় ছেলে মারা যাওয়ার পর থেকেই সে বিদ্রোহিনী হয়ে ওঠে। সে সন্তানদের আর শিকারে যেতে দেয় না। তাদের পরিবর্তে সে নিজেই শিকারে যেতে শিকারের সাজে প্রস্তুত হয়ে আসে এবং স্বামীর বিরুদ্ধাচারণ করে। কিন্তু স্বামী জোরপূর্বক সন্তানদের নিয়ে রওনা হলে তাকে উদ্দেশ্য করে সে বলে – "আমি হরিণের মাংস চাই না, আমরা মাছ খাইয়াই থাকিব, আমার ছেলেমেয়েদের ফিরাইয়া দাও, উহাদের আমি যাইতে দিব না – ।" (পৃ. ৫৬৩) নায়ক নারীর এরূপ মূর্তি দেখে বিস্মিত হয়েছে। বিচিত্ররূপিণী পৃথিবীর মতোই নারীর বিচিত্র অভিব্যক্তি – এ প্রসঙ্গে কিছুদিন পূর্বে নায়ক তার স্ত্রী রাহুলাকে দূর করে দেয়ার পশ্চাৎপটে ফিরে যান। প্রকৃত অর্থে রাহুলা প্রসঙ্গটিতে নারীর ক্ষমতায়ণ, নারীর অপমাণের প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা, স্বার্থপর স্বামীকে স্ত্রীর কাছে নতজানু হতে বাধ্য করা সর্বোপরি স্বাধীনপ্রিয় নারী ব্যক্তিত্বের দিকটি পরিস্ফুটিত হয়েছে। এ কারণে যে নারীকে একাগ্রচিত্তে, অনেক ধৈর্য্যসহকারে কাজের কৌশল রপ্ত করতে হয়েছে সে বিষয়টিও সমান গুরুত্বে তুলে ধরা হয়েছে।

দলবদ্ধ-ভ্রাম্যমাণ জীবনে চলাই জীবন, থেমে থাকলেই মৃত্যু অনিবার্য। বড় বড় গরু শিকারের লক্ষ্যে দলবদ্ধ হয়ে সবাই গরুকে তাড়িয়ে বেড়ায়। যাযাবর জীবনে গরু বা দলের কোনো মানুষ ক্লান্ত হয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে পথ চলতে অপারগতা প্রকাশ করলে তার জীবন সেখানেই স্থির হয়ে পড়ে। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের লোক তাকে সহজে নিতে চায় না। এমনিভাবে নায়ক তার ভাই খিংখু এবং স্ত্রী নিমাকে পথে ফেলে এসেছে। ফেলে এসেছে নাভিলাকে। উলুম পুত্র সন্তান প্রসব করে মারা গেছে। যাযাবর জীবনে সন্তানকে লালন-পালন করা সম্ভব না বিধায় দলপতি কাংড়ার নির্দেশ রয়েছে সদ্যপ্রসূত শিশুকে ফেলে দেয়ার। কিন্তু তাদেরই একজন দলপতির অজ্ঞাতসারে একটি শিশুকে বুকে আগলিয়ে রাখে। একটি গরু একটি মৃত বাছুর প্রসব করে এবং গরুটি দুর্বল হয়ে পড়ায় তাকে না মেরে বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় দলপতি। এদিকে অনাহারে থাকা শিশুটি কোল থেকে দুর্বল গাভিটির উপর পড়ে গিয়ে তার দুধ পান করতে থাকে শান্তভাবে। মানবশিশুর পশুর দুধ খাওয়ার দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয় দলপতি। ব্যাপারটি তাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করে। সে আফসোস করে বলে, এমন দৃশ্য যদি সে আগে দেখতো তাহলে অনেক

শিশুকে বাঁচাতে পারতো। যে-সময় পশু মাংসই ছিল মানুষের প্রধান খাদ্য সেসময় পশুকে না খেয়ে মা-পশুকে এবং মানবশিশুকে আগলিয়ে রাখার প্রবৃত্তি প্রবলতর হয়। এভাবেই শুরু হলো মানবজীবনের আদিম সভ্যতার পত্তন। এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ্যযোগ্য যা ঘটেছে দলপতি ওবুকীর নেতৃত্বে। ওবুকী তৃণ চাষে সফলতা আনে। এ জন্যে তাকে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। বন্য-গরু শিকারে সিদ্ধহস্ত ওবুকীর জীবনে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। একবার অনাবৃষ্টির কারণে সব গরু মারা গেলে ওবুকীর দলের সদস্যরা তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। ওবুকী রয়ে যায় রিয়া নদীর তীরে। ক্ষুধার তাড়নায় তার একসময় মনে হয় গরুতো মাংস খায় না, ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করে। ঘাসে এমন কিছু আছে যা জীবে প্রাণরক্ষা করে। তার এরূপ বুদ্ধিদীপ্ত প্রেরণা থেকে সে ঘাস খাওয়া শুরু করে, বলবান হয়। একদিন পেটের ব্যথায় কাতর হয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় সে। জ্ঞান ফেরার পর বৃষ্টি দেখে আত্মহারা হয়ে পড়ে। হঠাৎ সে লক্ষ করে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের কিছু অংশ ফিকে রোদ পড়ে আলোকিত হয়েছে। আলোকিত অংশের তৃণগুলোর মাথায় শিষ রয়েছে। সূর্য-পূজোক ওবুকীকে যেনো সূর্যদেবতা অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিচ্ছে শিষগুলো খেতে। শিষ খাওয়ার পর তার মনে হলো ঘাসের চেয়ে এগুলোর স্বাদ ভালো এবং একটু বেশি তৃপ্তিদায়ক। এরপর থেকে সে শিষ খেয়ে জীবন ধারণ করে। একবার শিষের সন্ধানে বেরিয়ে রিয়া নদীর তীরে লিনাপাকে দেখতে পায় ওবুকী। সেই রিয়া নদীর তীরে লিনাপাকে নিয়ে শফরী সম্প্রদায় গড়ে তোলে সে। তাদের প্রধান খাদ্য হয়ে উঠে ঘাসের বীজ। তবে তারা মাছ ধরা ও পশু শিকার করতো মাঝে মাঝে। নদী শুকিয়ে গেলে এবং পশুপাখিরা অন্তর্ধান করলে তৃণবীজই জীবনধারণের একমাত্র উপায় হয়ে ওঠে। এ সময় সমাজে বিনিময়-প্রথা চালু হতে দেখা যায়। শফরী সম্প্রদায়ভুক্ত নায়ক রিয়া নদীর তীরে ঘুরে ঘুরে ঝিনুক সংগ্রহ করতো। সেসব ঝিনুক দিয়ে মেয়েরা অলঙ্কার বানাতো এবং ঝিনুকের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় নানারকম দ্রব্য সংগ্রহ করতো তারা। অরণ্যবাসী তরক্ষু সম্প্রদায়ের লোকেরা পশু চামড়ার বিনিময়ে ঝিনুক নিত। রিয়া নদীর তীরে যেমন লিনাপাকে নিয়ে শফরী সম্প্রদায় স্থাপন করে ওবুকী, তেমনি রিয়া নদী সাতরিয়ে আরেক রমণী লীরা এসে তাদের দলভুক্ত হয়। লীরার মুখাবয়বের গড়ন একটু অন্যরকম – বংশীনাসা, আয়তনয়না, কুন্দদন্তী। ফলে শফরী সম্প্রদায়ের লোকেরা তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। ফলে শফরী সম্প্রদায়ের মেয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। তারা সবাই মিলে তাকে আক্রমণ করে এবং সৌন্দর্যহানীর জন্যে তার একটি স্তন কেটে ফেলে দেয়। কোনো রকমে পালিয়ে নদীতে ঝাপ দিয়ে প্রাণ বাঁচায় সে। পরে তার সম্প্রদায়ের লোকবল নিয়ে সে তাদের উপর বীভৎস প্রতিশোধ নেয়। শফরী সম্প্রদায়কে প্রবল আক্রমণে ধ্বংস করে দেয়। মেয়েদের হত্যা করে পুরুষদের পায়ে দঁড়ি বেঁধে নিয়ে যায় তারা। কেবল রক্ষা পায় তাদের তৃণবীজগুলো। নিজ সম্প্রদায়ের নারীর মর্যাদা রক্ষায় দলীয় আক্রমণের বিষয়টি এখানে লক্ষণীয়।

এই আক্রমণ থেকে নায়ক প্রাণে বেঁচে অন্য জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে শবরী লালচুমের ফাঁদে পড়ে সে। লালচুম একটি সদ্যজাত শিশু এবং শিশুর বাবাকে তার সম্প্রদায়ের নরভুক লোকদের উপহার দেবে – এ শর্তে সে গাছের শাখায় ঘর বানিয়ে ফাঁদ পাতে। বিনিময়ে সে বৃক্ষ ও চারপাশের জমি ভোগদখল করে। নায়ককে ফাঁদে ফেলে লালচুম গর্ভবতী হয় এবং সদ্যজাত শিশুটিকে তার লোকেরা নিয়ে যায়। শিশুটির বাবা নায়ককে ধরতে যখন নরভুকরা বের হয় তখন বিষয়টি টের পেয়ে নায়ক তার শফরী সম্প্রদায়ের লোক শোংছার সহায়তায় লালচুমের ফাঁদ থেকে পালিয়ে যায়। নদী পার হয়ে ভাগ্যক্রমে তারা দুজন ওবুকীর কাছে ফিরে আসে। ওবুকীও লীরার জলদসূদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে পালিয়ে ছিল। এক সময় বিধবা নীলগাই মুনতার সাথে ওবুকীর পরিচয় হয়। মুনতার চার ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে রিয়া নদীর তীরে ফিরে আসে এবং নীলগাই দল গড়ে তোলে সবাই মিলে। মুনতাদের ভাষা এবং আচরণের মধ্যে নিজের ভাষার সাদৃশ্য পায় ওবুকী। এখানে এসে দেখে, তাদের (পূর্বের শফরী সম্প্রদায়) স্তূপ করে রাখা তৃণবীজগুলো থেকে শত শত তৃণ অঙ্কুরিত হয়েছে। দেবতার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে ওবুকী মাটি খনন করে অঙ্কুরিত তৃণগুলোকে লাগিয়ে দেয়। মুনতার ছেলেরা পরবর্তী সময়ে ওবুকীর সাথে মিলে রিয়া নদীর তীরে তৃণবীজ চাষাবাদ করে। তাদের তৃণ ক্ষেতে মাঝে মাঝে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বন্য-গরু-মহিষ-ঘোড়া এসে হানা দেয়। ফলে শিকারের জন্যে তাদের কোথাও যাবার প্রয়োজন হয় না। তাদের অনিশ্চিত শিকারি-জীবনের অবসান ঘটে এবং খাদ্যাভাব ঘোচে। ওবুকী শোংছা ও নায়ককে মুনতার দুই মেয়েকে বিয়ে করে তৃণবীজ উৎপাদনে মনোযোগী হতে বলে। নীলগাই সম্প্রদায়ের ভাই-বোনেরা কৃষিকাজে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ছাগ-সম্প্রদায়ের লোকদের আগমনের সংবাদ পাওয়া যায়। এভাবে অনেক সম্প্রদায়ের একত্র সম্মিলনে কৃষি কাজের সূচনা করে।

ওবুকীর প্রচলিত কৃষিকাজ নিয়ে চলছে নবজীবন-ধারা। এবারের জীবনে অনাবৃষ্টির কারণে কন্যা নদীর তীর ঘেষে চলে কৃষি-জীবন। এ জীবনে পানির তৃষ্ণায় নানারকম বন্য পশু নদীর তীরে আসে পানি পান করতে। ফলে পশু শিকারও সহজতর হয়। পর্যটকের আবির্ভাব এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। পর্যটকেরা বিভিন্ন দেশ ঘুরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের কাছে জীবনযাপনের সুবিধার নিমিত্তে অনেক তথ্য এনে দেয়। তারা অনেকটা সংবাদবাহকের কাজ করে। তৃণবীজ খেয়ে জীবনধারণ করা দলপতি ধবলদের পর্যটক নীহু মাটির নিচে ফসল মজুত করে রাখার কৌশল শিখিয়ে দেয় এবং অনাবাদী জমিকে আবাদী করার বিষয়েও তারা জ্ঞান দেয়। দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে হঠাৎ কিছু না করা এবং দলের সদস্যর মতামতকে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা দলপতিদের মধ্যে দেখা গেছে। দলপতি ধবলের লোকদের মধ্যে এবং উন্নগা পর্বতের ওপারে বসবাসকারী মাংসাশী দলপতি রোহার লোকদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে কোনো দলপতিই একক সিদ্ধান্তে সমাধানের পথ অন্বেষণ করে না। সম্মিলিত মতামতকে সম্মানের চোখে বিবেচনা করে দলপতিরা। রোহার লোকেরা গরু পালন

করে এবং তার দুধ খায় – বিষয়টি খুব আশ্চর্যের মনে হয় নায়কের কাছে। "একজন মানুষ আর একজন মানুষকে আহার করে এ সংবাদও বিস্ময়কর ছিল না। কিন্তু মানুষ গরুর দুধ খাইতেছে, এ সংবাদ ইতিপূর্বে আর শুনি নাই। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে শিলাঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।" (পৃ. ৬০৪) এ সময়ে মাটি দিয়ে পাত্র তৈরি, বাঁশ দিয়ে বেড়া ও ঘরের চাল তৈরি স্বাভাবিক ছিল কিন্তু বাঁশ কেটে দুধের কেঁড়ে তৈরি করা ছিল একেবারেই নতুন কিছু। সবজির মধ্যে লাউ চাষের কথা জানা গেছে। তখন লাউয়ের খোলা দিয়ে পাত্র বানানো হতো। প্রার্থনা করে গাছকে অবনত করা যায় না, গাছের একটি ঢাল ধরে টান দিলেই গাছ অবনত হয় – এমন যুক্তিতে চলতে থাকে কৃষি-জীবন। জীবন যুদ্ধের তাড়নায় যুগে যুগে জন্মজন্মান্তরে দুটি পথ অবলম্বন করেছে নায়ক, একটি শক্তির অপরটি ভক্তির পথ। কিন্তু কোন পথটি প্রকৃতই সত্যের পথ তা নির্দিষ্ট করা তখনও দুরূহ বিষয় ছিল। তবে নারী এ পর্বে অনেক বেশি স্বাধীনপ্রিয়, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, ওজোস্বী, যুক্তিবাদী এবং তেজোদীপ্ত। তাই প্রেমিক ও স্বামীর মধ্যে শিলাঙ্গী বন্ধু-সত্তাকে দেখতে তীব্র ইচ্ছা পোষণ করে। তাই বিয়ের পরদিনই শিলাঙ্গী তার স্বামীকে বলেছে – "জংলা, বল, তুমি চিরকাল আমার বন্ধু থাকিবে তো?" (পৃ. ৭১০) স্বামীর অধিকারের চেয়ে বন্ধুত্বের দাবি নারীর কাছে অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত ছিল কৃষি নির্ভর সমাজে। ধবল-পত্নী নিনানির চরিত্রটি শিলাঙ্গী চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র। তার মধ্যে সৌন্দর্যের অহংকার এতোটাই ক্রিয়াশীল ছিল যে সে জংলাকে পেতে চক্রান্ত করে প্রেতিনী সেজে ধবলকে দিয়ে শিলাঙ্গীকে মেরে ফেলে। জংলার হাত ধরে পাড়ি জমায় সে অনন্তের পথে। জোলমা, শিলাঙ্গীদের কাছ থেকেও এ আহ্বান এসেছিল কিন্তু তাদের আহ্বানে সাড়া দেবার মতো যোগ্যতা নায়কের ছিল না তাই তাদের পেয়েও তাকে হারাতে হয়েছে বারবার। তবে নায়কের দৃঢ় বিশ্বাস, তার অন্তরতম সত্তা যেনো নিনানির হাত ধরেই জোলমা, শিলাঙ্গীকে অনুসন্ধান করে চলছে, বিকশিত হচ্ছে মানব-সভ্যতা আর এ সভ্যতার বিকাশ পরিপূর্ণ হবে সেদিন যেদিন নিনানির সাথে জোলমা, শিলাঙ্গীর কোনো তুলনা চলবে না। যে নিনানি সে-ই জোলমা, সে-ই শিলাঙ্গী, একাকার হয়ে মিশে থাকবে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে। ওই অনাগত যুগের উদ্দেশেই নায়কের পথচলা অব্যাহত রয়েছে।

নৃ-তাত্ত্বিক মানবসমাজের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস *প্রথম গরল* প্রকাশিত হয় *স্থাবর* লেখার দীর্ঘ তেইশ বছর পর ১৯৭৪ সালে। কৃষি-সভ্যতার অনেক ধাপ পেরিয়ে যে-জীবন সে-জীবনে নায়ক জংলা থেকে হয়েছে টালা। টালারা শান্তিপ্রিয় লোক, যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বরাবরই তারা দূরে সরে থাকার চেষ্টা করে। এ পর্যায়ে নারী-পুরুষের মধ্যে রয়েছে ভালোবাসার টানে আকর্ষণ অনুভব করা পূর্বে যেখানে নারী কেবল ছিল যৌন-চাহিদা বা ভোগের সামগ্রী। এসময় মুদ্রার প্রচলন ছিল না, দ্রব্যের বিনিময়ে জিনিস এবং ক্রীতদাসী ক্রয়-বিক্রয় হতো। বিদেশি হাট থেকে ক্রীতদাসী কিনে এনেও এ যুগে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করার, মেয়ে হিসেবে মর্যাদা দেবার মানসিকতা দেখতে পাওয়া যায়

ক্রীতদাসী শিকারার মণিব রোমীয় বণিকের মধ্যে। আবার পিরালা রাজ্যের রাজা তেমুজিনের মধ্যে ক্রীতদাসী শিকারাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়ার বিষয়টিও দৃষ্টিগ্রাহ্য। এ সমাজে নারীর স্বাধীন মতামতকে মূল্যায়ন করা হয়। নারী চাইলেই স্বামীর সমর্থন ব্যতিরেকে অন্য পুরুষের কাছে যেতে পারে। টালার শত স্ত্রীদের মধ্যে সুলমা এবং কণ্টকা চরিত্র দুটিতে এ ধরণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে। কণ্টাকা নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থে অনেক দুঃসাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে নিজের একক সিদ্ধান্তের বলে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে তার দলকে রক্ষার জন্যে সে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তা আগে থেকে কাউকে জানায় না। এমনকি তার মেগা-পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে দেখা যায় না উপন্যাসের কোথাও। প্রতি কাজে তার সফলতা দলকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। আবার হুন কন্যা এবং তেমুজিনের প্রথমা পত্নী, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী শিকারার মধ্যে নিজ রাজ্য রক্ষার পাশাপাশি অন্যের রাজ্য দখল করার দুর্দমনীয় লোভ তাকে বিনাশ করে ছাড়ে। এ শিকারাকেই অন্যরূপে দেখা যায়, যখন সে দোহার মধ্যে পৌরুষত্বের আকর্ষণে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় এবং প্রত্যাখাত হয়ে অন্যের (দোহাদের) রাজ্য দখল করার চক্রান্ত করে। অন্যদিকে ঘোড়া নিয়ে স্বেচ্ছায় দেশান্তরিত হওয়া সুলমার স্বামীর কাছে ফিরে আসার লক্ষ্যে যুদ্ধবিদ্যায় নৈপূণ্য লাভ করে এবং বহুগামী হয়ে সেনাবাহিনি গড়ে তোলে। সেও তার পরিকল্পনা মাফিক নিজেদের রাজ্য শত্রুমুক্ত করতে সৈন্যবাহিনি নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং স্বামীকে এ সময় সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে বিশ্রামে রাখে – সর্বোপরি স্বামীর প্রতি ভালোবাসার টান পরিলক্ষিত হয়। সুলমা তার স্বামী টালাকে বলেছে – "বিশ্বাস কর একাধিক পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদের ভালোবাসি নাই। ভালোবাসি শুধু তোমাকে। না বাসিলে ফিরিতাম না।" (বনফুল, ২০১৩/৬: ৩৮৮) তবে টালার প্রতি সুলমার ভালোবাসা নিঃস্বার্থ নয়। সে ভালোবাসায় স্বার্থজড়িত – বহুগামী সুলমার পিতৃহীন সন্তান টালার পিতৃ-পরিচয়ে বড় হওয়ার স্বার্থ। নারীর যে সমাজে অবাধ স্বাধীনতা সে সমাজে সন্তানের পরিচয় নির্ধারিত হয় পিতৃ-পরিচয়ে। সম্ভবত এ কারণে পুরুষদের শত স্ত্রী রাখার রীতি প্রচলিত ছিল ওই সমাজে।

ভূমির আধিপত্যকে কেন্দ্র করে যাযাবর হুন সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ হয় শান্তিপ্রিয় টালা-দোহা দলের সাথে। এর মধ্যে দিয়ে উঠে আসে কৃষিকাজের নিমিত্তে খাল খনন, ক্রীতদাস প্রসঙ্গ, তাঁত-শিল্প, বাদ্যযন্ত্র একতারা, চীনাদের তৈরি বাসন-কোসন, নদীর তীরে পাথরের বাড়ি, আত্মরক্ষার্থে ও সীমানা রক্ষার্থে সেনাবাহিনি গড়ে তোলা, হুনদের চীন সাম্রাজ্য দখল করার প্রবৃত্তি, নারীর যুদ্ধ পরিচালনা ও বহুগামীতা, পুরুষকে নারীর ভালো লাগার কথা বলা এবং তাকে জীবনসঙ্গী করার প্রস্তাব দেয়া, বুদ্ধ-মন্দির – প্রভৃতি প্রসঙ্গ। স্থাবরের মতো এখানে নায়কের টুকরো টুকরো স্মৃতির সমন্বয়ে কাহিনি গড়ে উঠেনি। একটি কাহিনি সরল গতিতে এগিয়ে পরিণতি লাভ করেছে। কিছু কিছু নিদর্শন বা ঘটনা থেকে কাহিনির পাত্রপাত্রীদের কার্যকলাপে স্থান-কাল নির্ণয় করা সহজ বলে মনে হয়। যেমন, শিকারার

জীবনের অতীত কাহিনি থেকে পাহাড়ের গুহায় সহস্র বুদ্ধের মন্দিরের কথা জানা যায়, যেখানে বুদ্ধমূর্তি এবং বুদ্ধের ছবি রয়েছে। আরও জানা যায়, নদীর তীরে পাথরের বাড়ির কথা। *স্থাবর* এ নির্দিষ্ট কোনো জায়গার নাম নেই তবে এখানে (বোখারা, তেহরান, রোম, সিডনি, মিসর, আরব এবং) চীনদের সাথে হুনদের চিরশত্রুতার কথা রয়েছে। চীন সম্রাটরা ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং বিলাসী লোক, তাই যুদ্ধে প্রায়ই তারা পরাজয় স্বীকার করতো। হুনরা চীন সাম্রাজ্যের অনেকটাই দখল করে নিয়েছে, তাদের বন্ধুপ্রীতি ছিল অসাধারণ।

প্রধান নারী চরিত্র সবাই ছিল ক্রীতদাসী, ব্যতিক্রম কেবল তাঁত-শিল্পী চিরকুমারী চম্বা। নারীর অবাধ স্বাধীনতার এ কৃষি-সভ্যতার যুগে পুরুষের যেমন শত স্ত্রী রাখার অধিকার আছে নারীরও তেমনি শত পুরুষের সাথে সহবাসের অধিকার আছে। তবে একজন নারী তিনবারের বেশি সময় ধর্ষিত হলে সে সমাজপতিদের কাছে ধর্ষণের কথা গোপন রাখার চেষ্টা করে। এ সমাজে নারীর সতীত্ব বলে কিছু নেই কিন্তু ধর্ষকের শাস্তির বিধান রয়েছে। আবার এ ধরণের সমাজেই সংখ্যায় নগণ্য হলেও টালা ও দোহার মতো মহৎ মানুষও দেখতে পাওয়া যায়। চিরকুমারী চম্বা ও দোহার মতো প্রকৃত প্রেমিক-প্রেমিকা ছিল! কথকের ভাষায় যদিও তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। পাঠক কন্টকার মাধ্যমে তা জানতে পারে যখন শিকারার দোহার প্রতি কামনার ভাব উদ্রেক হওয়ায় তাকে কাছে পেতে ইচ্ছে পোষণ করেছিল। পরিবার ও পরিবারের বাইরে যুদ্ধক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কাজের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয় না। নারী ঘরে কাজ করছে আবার সেই নারী যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করছে। নারীর নেতৃত্বে সেনাবাহিনি গড়ে উঠছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবলীলায় সর্বত্র গমনাগমনের এরূপ স্বাধীনতা নারীর প্রতি পুরুষের সম-দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে বলে ধরে নেয়া যায়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে কিন্তু পুরুষের প্রতি নারীর সমান দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করতে দেখা যায়নি। সেখানে পুরুষকে নারীর আজ্ঞা পালনকারী হিসেবে দেখা গেছে। সেখানে নায়ককে পুঠার নির্দেশ মেনে চলতে হয়েছে, জোলমাকে বিয়ে করে তার কথা রাখতে হয়েছে আবার জোলমার কোলে সন্তান দিতে পুঠার আদেশ পালন করতে হয়েছে। নারীর ভালোবাসার প্রস্তাব প্রত্যাখান করার সাহসের অভাবের দরুন আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে টালার দলভুক্ত বিরাট বিরানি অরণ্যের যোগ্য অধিপতি দোহাকে। প্রকৃত অর্থে সাহসের অভাব নয় নিজেদের জনগণ এবং সাম্রাজ্য রক্ষার নিমিত্তে দোহাকে শিকারার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে হয়েছে।

টালার সমাজে লোকদের মধ্যে অনেক রকম তুক বা সংস্কার প্রচলিত ছিল। একটি নামহীন বৃহৎ গাছের তলায় তিনবছর দোহার মা কাটিয়ে দেন। টালার ফুপাতো ভাই দোহার বাবা নপুংসক হওয়ায় গাছটিকে তার মা বিষ-কুণ্ডা স্বামীরূপে বরণ করে নেয়। গাছটিতে প্রচুর ফুল ফোটে তখনই দোহার জন্ম হয়। গাছটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য দোহার শারীরিক গঠনের সাথে সাদৃশ্যসূচক। তাই তার মা তাকে মহাবৃক্ষের সন্তান বলে আখ্যায়িত করে। তারা সে গাছটির

নাম দিয়েছিল 'টুকচুম্বা' যার অর্থ দেবতা। এ গাছে ফুল ফোটা শুভ লক্ষণ। ফুল ফুটলে এ গাছকে পুজা করা হয়। গাছের তলায় দুধ ঢেলে দেওয়া হয়, অনেক সময় পশুও বলি করা হয়। এবং তাকে ঘিরে নাচগানের আয়োজন করা হয়। তাছাড়া, টুকচুম্বায় অনেক ফুল ফুটলে নারীরা গর্ভবতী হয়। আরেকটি সংস্কার হলো, কাউকে মেরে ফেলা হলে, মৃত্যুর সাথে সাথে তার সবকিছু লোপ পায় না, মৃত ব্যক্তির আত্মা পূর্বের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে হননকারীর ওপর প্রতিশোধ নেয়। তাই মৃতের ক্রোধকে প্রশমনের জন্য বিভিন্ন উপায়ে তাকে প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করতো টালারা। তাদের বিশ্বাস ছিল, তারা এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হতো। কখনও তাদের দ্বারা অদৃশ্য শক্তির বিধানের প্রতি অন্যায় করা হয়ে যায় কিনা সে ব্যাপারে সবসময় তাদের ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হতো। নিজেদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সমুহ সম্ভাবনা থাকার পরও বৈমাত্রেয়-ভাই ভিংড়াকে না মেরে তাকে বারবার বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা যেমন টালার মানবিকবোধকে প্রশস্ত করেছে ঠিক এর বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে ভিংড়ার মধ্যে। সে নিষ্ঠুর, ঘাতক, তার বর্শার আঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে টালাকে।

পৃথিবীতে মানবজাতির ইতিহাসের সূচনা হয় পুরাপ্রস্তর যুগে। সে যুগ থেকে পরবর্তী সময়ে নব্যপ্রস্তর যুগের যাত্র শুরু হয়। এর আগে মানুষ যাযাবর জীবন কাটাতো। এমনটাই দেখতে পাওয়া গেছে *স্থাবরের* গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে। পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষিকাজের ব্যাপক উন্নতি ঘটে, কৃষিতে বিপ্লব আসে। মানুষ তখন যাযাবর জীবন ছেড়ে ভূমিকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। তারা নদীর তীরঘেষে তাদের বসতি গড়ে তোলে এবং কৃষিকাজে মনোনিবেশ করে। তবে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলোতে এবং যেসব জায়গায় আবাদযোগ্য উদ্ভিদ প্রজাতির অভাব ছিল সেখানকার মানুষেরা কৃষিকাজ করতে পারেনি। কৃষি থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকায় মানুষের গোষ্ঠীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। উদ্বৃত্ত খাদ্য দিয়ে মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা জিনিস ক্রয় করে। *প্রথম গরল* এ যাযাবর হুন সম্প্রদায়ের কথা রয়েছে। সর্দার মালেক হুন সম্প্রদায়ের দলপতি। জানা যায়, ভারতের একেবারে ভৌগোলিক সীমান্তে অবিস্থত অঞ্চলগুলো হুনদের অধীন ছিল। শস্যের বিনিময়ে ক্রীতদাস-দাসীও কেনা হতো। শস্যের বিনিময়ে টালার সৎভাই ভিংড়াকে হাট থেকে কিনে এনেছে তার মা। শস্যের হাটে সুলমাকে তার বাবা এবং বাগদত্ত স্বামী নিলামে বিক্রি করে দিয়েছে। সুলমা তার মতো সুলক্ষণা ও গুণবতী মেয়ের শস্যের হাটে বিক্রি হওয়ার প্রচলিত বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি। তাই কোনো দিন নিজের দেশে ফেরার সুযোগ হলে সুলমা তাদের হত্যা করবে বলে মনস্থির করে রেখেছে।

কৃষি সভ্যতার যুগে যোগাযোগের বাহন হিসেবে পশুর ব্যবহার বিশেষ করে ঘোড়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। তেমনি উপন্যাসেও টালা প্রথম তাদের ক্ষেতে সহসা তিনটি ঘোড়ার আবির্ভাব দেখতে পেয়ে অবাক হয় এবং

বিষয়টিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে। অনেক দেশে যোগাযোগের দ্রুততম বাহন হিসেবে ঘোড়ার ব্যবহার হচ্ছে – এ কথা মাথায় রেখে মাহো সম্প্রদায়ের দলপতি টালা নিজের দলের লোকদের ঘোড়সওয়ার হতে আহ্বান করে। একই সঙ্গে সে হাট থেকে তিনজন অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ার কিনে আনার নির্দেশ দেয়। গাংগাং নদীতে নৌকার মাধ্যমে জিনিসপত্র আদান-প্রদানের বিষয়টি জানতে পারা যায়। কাহিনির শেষের দিকে যোগাযোগের বাহনরূপে হাতি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে হাতি-বাবার প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের মধ্যে হ্রদ এবং নদী-তীরবর্তী এলাকাগুলোতে গড়ে উঠে শহর। তেমনি কাহিনিতে নদীর তীরে কয়েকটি পাথরের তৈরি বাড়ির কথা আছে। নদী-তীরবর্তী এলাকায় গড়ে উঠা প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে মিসরের নীলনদ সভ্যতা, সিন্ধু নদকে কেন্দ্র করে সিন্ধু সভ্যতা মেসোপটেমিয়া এরকম অনেক সভ্যতা। কথিত আছে, চীনের প্রধান নদীগুলোর তীরেও গড়ে উঠে এমন সভ্যতা।

কৃষি সভ্যতার যুগে বেশিরভাগ সমাজেই দাসপ্রথা চালু ছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রধান নারী ক্রীতদাসী চরিত্রদের মধ্যে কেবল চম্বা ছাড়া বাকি সবাই হাটে বিক্রি হয়েছে। কিন্তু তাদের কাউকে দাসীরূপে চিত্রিত করা হয়নি। মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থানে রেখে লেখক সেসব চরিত্রকে বিকশিত করেছেন। কাহিনিতে, ক্রীতদাস হিসেবে কেবল ভিংড়ার কথা আছে। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সালে মেসোপটেমিয়ায় প্রথম ক্রীতদাস প্রথা চালু হয়। গ্রিসে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ থেকে ৭০০ এবং রোমে খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে ক্রীতদাস প্রথার কার্যক্রম চালু হতে দেখা যায়। (মিজানুর রহমান, নয়া দিগন্ত: ২০২২) প্রাচীন গ্রিস ও রোম সভ্যতা ছিল দাসনির্ভর। ফলে গ্রিস ও রোম সাহিত্যে ক্রীতদাসের পরিচয় পাওয় যায়। এর হাজার বছর পরে মিশর ও ভারতে এবং তারও অনেক সময়ের ব্যবধানে চীনে ক্রীতদাস প্রথা বহাল তবিয়তে বজায় ছিল। সমাজে ধনিক শ্রেণির অধীন অসহায় মানুষেরা যেভাবে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হতো দাসপ্রথা নামক সামাজিক ব্যাধির অন্তরালে, তাতে ধনবান মানুষের বিবেকের চরম বিপর্যয়ের যে চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, অনুরূপ ক্রীতদাস প্রথার চরম বিপর্যয়ের কোনো চিত্র কাহিনিতে নেই।

ধরে নেয়া যেতে পারে, আদিম মানুষের পশুবৃত্তি ত্যাগ করে পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় কিছু রীতিনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা জীবনযাপনের সময় থেকেই সভ্যতার যুগ শুরু হয়েছে। অর্থাৎ কোনো বিশেষ মানবগোষ্ঠী তাদের নিজেদের বংশ পরম্পরা থেকে প্রাপ্ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোনো বিশেষ ধরণের জীবনযাত্রা নির্বাহ করলে ওই বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেটাকে সভ্যতা বলা যায়। তবে অঞ্চলভেদে সভ্যতার বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কৃষিকাজ এবং পশুপালনে নির্ভরশীল টালারা তাদের রাজা

বা রাজকর্মচারীদের কখনও দেখেনি। অনেক মাধ্যম হয়ে তাদের খাজনা রাজকর্মচারীদের হাতে পৌঁছায়। এমনকি রাজা টালাদের খবর জানে কিনা তা নিয়ে তাদের মধ্যে সন্দেহ আছে। রাজা আবার সংখ্যায় অনেক –

> তাহারা নীলনদের ধারে রাজত্ব করে। তাহাদের বড় বড় মন্দির, মন্দিরে নানারকম দেবতা। তাহারা বড় বড় পাথরের স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের চূড়া আকাশচুম্বী। তাহাদের ভিতর নাকি রাজাদের মৃতদেহ আছে। আরব দেশের মাথার উপরে ব্যাবলদের রাজত্ব। তাহারা বড় বড় বাড়ি করিয়াছে। বাড়ির উপর বাড়ি। চারতলা পাঁচতলা। বাড়িকে ঘিরিয়া অদ্ভূত ঢালু রাস্তা। সে রাস্তা দিয়া উপর তলায় চড়া যায়। পাথরের উপর কিংবা মাটির ফলকের উপর ছবি আঁকিয়া ইহারা লেখে। ইহাদের লোকজন সৈন্যসামন্ত বিস্তর। উহারা মূর্তি প্রস্তুত করে। (পৃ. ৩৭০)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে একই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে সভ্যতার তারতম্য লক্ষণীয়। টালাদের পরিবারবর্গ ছোট ছোট গ্রামে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করে। তাদের সন্তানরা পর্যন্ত চাষবাদের কাজে নিয়োজিত। বিরানি বিশাল জঙ্গলের অধিপতি দোহা আবার গম্ভীরা বিশাল জঙ্গলের অধিপতি হাতি-বাবা। এসব গ্রাম-জঙ্গল-জনপদ রাজার অধীন। কিন্তু রাজা জানে না তার নাম ভাঙিয়ে অন্য লোক (সুদ্‌মা) টালাদের এবং তাদের আশপাশের গ্রাম থেকে খাজনা আদায় করছে এবং প্রকাণ্ড বাড়ি এবং অনেক সম্পদের মালিক হয়েছে। এমনকি সেসব কথা রাজার কর্ণগোচরই হয় না। নীলনদের ধারে রাজার রাজত্বের বর্ণনায় নগর সভ্যতার গোড়াপত্তনের কথা স্মরণে আসে। কৃষি সভ্যতার সময়ে নগর সভ্যতা এবং রাজার আধিপত্য বিস্তারের এবং মধ্য-স্বত্বভোগীর অস্তিত্বের পরিচয় রয়েছে। এর আগে *স্থাবরে* উলম্ভনের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতেও উলম্ভনের অন্য অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের ইঙ্গিত রয়েছে।

ভাবতে অবাক লাগে যে, সভ্যতা নামক শব্দটির সাথে তখনও মানবিকতার বা সহমর্মিতার ছোঁয়া লাগেনি। তাই সভ্যতার যুগেই ক্রীতদাস প্রথার মতো অমানবিক, অসভ্য-প্রথা মানুষ সৃষ্টি করেছে। এবং সভ্যতার গায়ে তা অনেক সময় ধরে টিকে ছিল।

শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপন্যাস দুটি সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের আলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহলে নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতি কী সে বিষয়ে ধারণা নেয়া প্রয়োজন। নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যেও সংস্কৃতির ধারণা নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর নৃবিজ্ঞানী অ্যাডওয়ার্ড টেইলরের সংজ্ঞাই গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া হয়। তাঁর সংজ্ঞার আলোকে সংস্কৃতি হলো – মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, আইন, নৈতিকতা, প্রথা এবং অন্যান্য সামর্থ্য ও অভ্যাসের এক জটিল বিন্যাস। (মাহফুজ, শাহারিয়ার, ২০২০: ৪০) সংস্কৃতিকে দুটি অর্থে বিভক্ত করা যেতে পারে। একটি সার্বিক অর্থে, অন্যটি গোষ্ঠী অর্থে। সার্বিক অর্থে বোঝায় সংস্কৃতির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা সব

সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান আর গোষ্ঠী অর্থে বোঝায় কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। *প্রথম গরলে* গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সংস্কৃতিতে কু-সংস্কার, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, প্রথা, মান্যতা, আধিপত্য বিস্তারের কথা জানা যায়।

নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতির আলোচনা করতে গেলে – ভিন্নতা এবং পরিবর্তন এ দুটি বিষয় প্রাধান্য পায়। কোনো ব্যক্তির বেড়ে উঠা এবং তার চারপাশের পরিবেশের ভিন্নতাই তাকে অন্য সংস্কৃতির লোকদের থেকে আলাদা বা ভিন্ন করে তোলে। এ ধরণের ভিন্নতা সব ধরণের সংস্কৃতি ও উপ-সংস্কৃতির লোকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আর সংস্কৃতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নির্বাচিত হস্তান্তরকরণ এবং চাহিদার পরিবর্তন – এ দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। যখন কোনো গ্রামের খাদ্যের উৎসে ঘাটতি দেখা দেয় তখন ওই গ্রামের মানুষরা তাদের জীবন ধারায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়। এ পরিবর্তনের ফলে সংস্কৃতির যেকোনো ধরণের পরিবর্তনই হতে পারে। সেটা হতে পারে সম্ভাব্য পূনর্বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন অথবা আদি নিবাস ছেড়ে সে নতুন নিবাসে যাত্রা করতে পারে। উপন্যাসের নায়কের বেলায় নতুন নিবাসে যাত্রার বিষয়টি সঙ্গত কারণেই প্রতি পর্বে বা প্রতিটি পর্যায়ে দেখা গেছে। তৃণভোজী জংলাকে উদ্দেশ্য করে মাংসভোজী নিনানি বলেছে, নিগম বনে তাদের গরু-ছাগলের খাদ্য ফুরিয়ে গেলে তারা কন্যার নদীর তীরের ঘাস পশুদের খাওয়ানোর জন্যে প্রয়োজনে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, কন্যা নদীর তীর থেকে তাদের তাড়িয়ে দেবে। এ উদ্দেশে দলপতি রোহার অধীন ঝোনঝিরা একটি দল গঠন করছে। তৃণবীজভোজী জংলা এ খবরে চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং শেষে সে রাজি হয় তাদের দলপতি ধবলকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলার জন্যে। কারণ তারা ঘাস খেয়েই জীবন ধারণ করে, ঘাসের উপরই তারা নির্ভরশীল। তাদের দলে লোক সংখ্যা বেশি হওয়ায় সবার জন্যে মাংসের সংস্থান করা সম্ভব নয়। নৃবিজ্ঞানের ভাষায় 'এনকালচারেশন' বলে একটি টার্ম আছে। গুহার বাইরে গোষ্ঠীবদ্ধ বা সমাজবদ্ধভাবে মানুষ যখন বাঁচতে শুরু করেছে তখন থেকে তারা সংস্কৃতির বেঁধে দেওয়া পূর্বপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ, সংস্কার-কুসংস্কার, রীতি-নীতি এবং নিষিদ্ধ আচরণ এবং বিশ্বাসের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালিয়েছে – এ পুরো ব্যাপারটিই এনকালচারেশন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখে।

অতীতের নৃতাত্ত্বিক মানবসমাজের আলোচনান্তে বলা যায়, *স্থাবর* মানুষের অগ্রযাত্রার নৃতাত্ত্বিক মহাকাব্যিক উপন্যাস যা বনফুলের প্রখর মেধা, অমোঘ স্মৃতিশক্তি, আর প্রফুল্ল শিল্পী-মনের রূপচিত্র। ঔপন্যাসিক এখানে যেনো একজন নৃবিজ্ঞানী। তিনি মানুষের বিবর্তনের চিত্র-কঙ্কাল ক্লাসে বসে হাতে করে নিয়ে শেখাচ্ছেন, আবার কখনও মনে হয় তিনি মনোবিজ্ঞানী, জংলার অন্তরে তিনি যেন শুধু ফুল নন, গভীর বনও বটে। সর্বোপরি কথক একজন দৃশ্যকার

যিনি জংলার রূপ ধারণ করে নামগোত্রহীন আদিম যুগ থেকে ক্রমাগত একটির পর একটি দৃশ্যের অবতারণা করে যাচ্ছেন এবং পাঠকের সাথে কথা বলে যাচ্ছেন। শুরুতেই তিনি বলে নেন, এর কোনো শেষ না থাকার কথা। মানুষের অন্তর্গত হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, লোভ, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাস, মায়া-মমতা, দয়া তার ছিল, বহুকাল আগে থেকেই ছিল – সেটাকে নিজের ভেতরে অবদমিত করে মানুষ এগিয়ে গিয়েছে অন্ধকার থেকে আলোকময় পথে। সে-যাত্রায় সে জয়ী, একটার পর একটা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে সফলতার সূত্র আবিষ্কার করে চলেছে সে নিরন্তর, তার কাছে ধরা দিতে শুরু করেছে প্রকৃতির গুপ্ত রহস্য। বন, বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, বরফ সমতলের জীবনযাত্রার যে সিম্ফনি তা বনফুলের কলমে সুর হয়ে বেজেছে। সেই সুর আদিম জীবন-জীবিকা, ক্ষুধা, লোভ, শিকার নৃশংসতা, মায়া, প্রেম, বেদনা, বিলাপ, সংশয়, সংকল্প থেকে নতুন জীবনান্বেষণের।

বিজ্ঞানের ছাত্র এবং পেশায় ডাক্তার বনফুল প্রতিনিয়তই খুঁজে ফেরেছেন জীবনের বৈচিত্র্য যেমন চিন্তা-চেতনায় তেমনি তাঁর লেখায়। বৈচিত্র্য সন্ধানী আলো ফেলেছেন এবার মানুষের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টায়। সে চেষ্টাকর্ম চরিতার্থ করতে লেখককে মানবজাতির ইতিহাস বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় অনেক বিখ্যাত গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হয়েছে মনোযোগ ও ধৈর্য্যসহকারে। 'উল্টোরথ' এ ১৯৭১ সালে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বনফুল বলেছেন –

> প্রচুর পড়াশোনা করি। আমি একসঙ্গে – ছ'সাতখানা বই পড়ি। যেমন ক্লাসে পিরিয়ড ভাগ করে পড়ানো হয় বলতে পার সে রকম। সারা দিন এক একটা সময় এক একটা পড়ি। ইতিহাস, কাহিনী, ধর্মগ্রন্থ, কবিতা এবং ক্লাসিকেল বই। বিশেষ করে বিদেশি বই বেশি পড়ি। যেমন ধর, ডিকেন্স সকট (বড্ড শক্ত। তাই কম পড়ি) থ্যাকারে, টলস্টয়, টুর্গেনিভ, গোর্কী, শেখভ, ওহেনরি, ইউ. ফকনায়ার, আপটন সিনক্লিয়ার। এবং সিনক্লিয়ার আমার খুব প্রিয়। যেমন প্রিয় রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্কিম। ...আমি একটু স্বতন্ত্র ধরণের বই পাড়তে ভালোবাসি। সম্প্রতি পড়লাম 'সীতারাম' এবং রমেশ দত্তের 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'।...সম্প্রতি আমি স্থাবর-এর দ্বিতীয় পার্ট-এ হাত দিয়েছি। লেখা খুব ধীরে হচ্ছে। সে জন্যে দেখ এই বইগুলো পড়ছি – The Aryan-by V. Gordon Childe; The story of the HUNS-by Marcel Brion; The Gobi Desert.

বনফুলের অধীত অধ্যয়নের ফলেই পাঠক পেয়েছেন নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে মহাকাব্যিক উপন্যাসের মানুষের বিবর্তন ধারার ইতিহাসের পরিচয় যা কৃষি-সভ্যতা পর্যন্ত এসে ইতিহাসের প্রাথমিক পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। ঔপন্যাসিক *প্রথম গরল* এর শুরুতে *স্থাবর* এর চরিত্র ইকা-জোলমা-শিলাঙ্গী-নিনানির প্রসঙ্গ এনে কথককে জন্ম-জন্মান্তরে আবর্তিত করে জংলা ও টালার মধ্যে এক সেতুবন্ধন তৈরি করেছেন। কৃষি সভ্যতার যুগে নদীর তীরে লালিত মানুষের জীবনধারা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের আধিপত্য ধরে রাখতে সেনাবাহিনি গঠন এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে এতো দিনের সব অর্জনকে ধূলিসাৎ করে দেয়ার বিয়টিকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। এর পূর্বে পাথর যুগে যাযাবর জীবনে মানুষের জমির উপর আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারটি ছিল না। ভূমি দখল করে কৃষিকাজের সূচনা করে তার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন

করার ফলেই তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে লোভ-লালসা যার বশবর্তী হয়ে মানুষকে খুনাখুনি-হানাহানি, যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সব হারাতে হয়েছে। তাই ভূমি দখলকেই মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম গরল পান বলে অভিহিত করা হয়েছে উপন্যাসে।

মানুষের প্রকৃতি জয়ের সংগ্রাম তার বিজ্ঞান চেতনায় যে প্রভাব রেখেছে বনফুল এঁকেছেন তারই ভাষাচিত্র। সে চিত্র যে বিচিত্র বর্ণে বর্ণিল তারই বর্ণনা *স্থাবর* উপন্যাসটির সর্বাঙ্গ জুড়ে। বনজীবনে পশুর সমান্তড়াল মানুষ ছিল হিংস্র, শক্তিশালী, কৌতূহলী। দলবদ্ধভাবে সে বাস করে, লড়াই করে, শিকার করে হাতের নাগালে যা পায় তা, মানুষ বা পশু যা-ই হোক। জলে নিজের ছবিকে সে প্রতিদ্বন্দ্বি মনে করে, পাথর ছুড়ে পশুপাখিদের ঘায়েল করে, আবার বুঝতে পারে ছুড়ে মারা পাথর অন্য পাথরে আঘাত লাগলে জ্বলে ওঠে আগুন। তখনও মানুষের কোনো নাম ছিল না, শুধু ছিল আদিম প্রবৃত্তি, ক্ষুধা, জিঘাংসা। সে আদিম মানবের ভেতর এক অদৃশ্য প্রেরণা ছিল, সে ইঙ্গিত পেতো চলার; এক অবোধ্য বোধ তার ভেতর জেগে উঠতো যা তাকে নিরন্তর সামনে টেনেছে, আগ্রহী করেছে প্রকৃতিকে জানতে, লড়াইয়ে কৌশলের আশ্রয় নিতে, আত্মরক্ষায় জীবনবাজি রাখতে। আর এ পথে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান, তাই *স্থাবর* এবং *প্রথম গরল* উপন্যাস সেই অর্থে মানুষের নৃতাত্ত্বিক অগ্রযাত্রার এক বিজ্ঞানময় ইতিহাস যা মহাকাব্যিক ভাষা ও চিত্র পেয়ে পাঠকের সামনে সচিত্র ও সবাক হয়ে উঠেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামন্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস

বাংলা সামন্তবাদ শব্দটির উৎপত্তি ইংরেজি Feudalism থেকে হয়েছে। এটি মধ্যযুগীয় ল্যাটিন শব্দ Feudalis যার অর্থ fee, and feodum, আবার fee, and feodum, এর অর্থ fief . (world history encyclopedia) সভ্যতা ও সমাজ বিকাশের একটি বিবর্তিতরূপ হলো সামন্তপ্রথা। সামন্ত প্রথার উৎপত্তি ইউরোপে। বর্বর আক্রমণের এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে নবম শতকে পশ্চিম ইউরোপে সামন্তপ্রথা জন্ম হয় যা চতুর্দশ শতক পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। কারো কারো মতে, ক্রীতদাস প্রথার পতনের মধ্যে দিয়ে সামন্ত প্রথার উৎপত্তি হয়েছে। সামন্ত প্রথা মূলত ভূমি কেন্দ্রিক একটি ব্যবস্থাপনা যা লর্ড এবং ভেসালকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। ইউরোপে কৃষি অর্থনীতিকে ভিত্তি করে তৎকালীন সমাজের সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিচালিত হতো। এ প্রথায় ভূস্বামীকে লর্ড আর যাদের উপর ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হয় তাদেরকে বলা হতো ভেসাল। সামন্ত প্রথায় ভূমি মালিকানাকে কেন্দ্র করে বেশকিছু শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে, যেমন রাজা, ব্যারন, নাইট ও কৃষক। কৃষি-নির্ভর সামন্ত সমাজে রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ স্তরে তারপর ব্যারন বা অভিজাত শ্রেণি এরপর নাইট এবং সর্বনিম্ন স্তরে কৃষক। এ চার শ্রেণির মধ্যে রাজা এবং নাইটের মধ্যবর্তীতে ছিলেন ব্যারন বা অভিজাত শ্রেণি তারা মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে পরিচিত ছিল। লর্ড থেকে নাইট পর্যন্ত ছিল শাসক ও শোষিত সমাজ। এ তিন শ্রেণির বিপরীতে ছিল কৃষকশ্রেণি যাদের ভূমিদাস বলা হতো। সামন্ত সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য হলো – রাজা শর্ত সাপেক্ষে সামন্তদের মধ্যে জমি বিলিব্যবস্থা করতেন; রাজাকে নিয়মিত উপঢৌকন, রাজস্ব ও সামরিক সাহায্য প্রদান করতে হতো; সামন্তপ্রভূর প্রাধান্য; শোষিত ভূমিদাস; দূর্গ; ম্যানর; বেগার খাটা; শোষিত ভূমিদাস, জমির গুরুত্ব। পশ্চিম ইউরোপে ১১ শতকের পরবর্তী সময়ে সামন্তপ্রথা ব্যাপক আকার ধারণ করে। তবে সামন্তবাদ পতনের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। সেসব কারণের মধ্যে প্রভূ এবং ভাসলের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হ্রাস পাওয়া; যুদ্ধ ও মহামারীর কারণে জনসংখ্যা ৪০% কমে যাওয়া। ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব একটি বিতর্কিত বিষয়। বি এন দত্ত, এস এ ডাঙ্গে এবং ডিডি কোশাম্বী কার্ল মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে ভারত ইতিহাসের গতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে ব্যাখ্যা সম্পর্কিত যুক্তির অনুসরণ করেছেন আর এস শর্মা। ১৯৫৮ সালে শর্মা পরিবর্তনশীল কৃষি সমাজের গঠন সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন খোঁজার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় – আদি ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি সম্পর্ক এবং করনীতি। শর্মা এ পরিবর্তনের গতি ও বৈশিষ্ট্য সামন্ততন্ত্রের আলোকে ব্যাখ্যা করেন ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ *Indian feudalism* এ। দ্বি-পর্যায় বিশিষ্ট সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে শর্মা কোশাম্বীর মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণদের মন্দিরগুলিকে বা বৌদ্ধ মঠে

জমিদানের ব্যবস্থা থেকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এবং এর ফলে ভূমি অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন মধ্যবর্তী শ্রেণির আবির্ভাব হয় যারা উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটায়। তিনি গুপ্তত্তোর যুগের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের উত্থানকে যুক্ত করেছেন (নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পিজিএইচআই; পাঠ-উপকরণ: ২৬২)। শর্মার মতে, ভারতে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব কাল ৩০০ – ৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। উন্মেষ কাল ছিল ৩০০–৬০০ খ্রিস্টাব্দ, ৬০০ – ৯০০ খ্রিস্টাব্দ ছিল বিকাশ পর্ব এবং পরবর্তী ৩০০ বছর অর্থাৎ ৯০০ – ১২০০ খ্রিস্টাব্দ ছিল পরিণতি ও ভাঙনের সময়। ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের অনুকরণে ড. শর্মা ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের যে বৈশিষ্ট্যর কথা বলেছেন তার সাথে অনেক পণ্ডিত দ্বিমত পোষণ করেছেন। হরবন্স মুখিয়া, দীনেশচন্দ্র সরকার, ব্রজদুলাল চট্টপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নয়। এবং ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সাথে ভারতবর্ষের সামন্ততন্ত্রের অনেক মিল থাকলেও অমিল ছিল প্রচুর। তবে শেষ পর্যন্ত সমালোচকরা মেনে নিয়েছেন যে, শর্মার ব্যাখ্যার মধ্যে নতুনত্ব ছিল।

ভূমিকে কেন্দ্র করে যেদিন থেকে কৃষিপ্রধান জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে সেদিন থেকে সমাজে গড়ে উঠেছে সামন্ত, উপসামন্ত, জমিদার, তালুকদার, গাঁতিদার নানা সুবিধাভোগী শ্রেণি। তারাই সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতো। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা ভূমিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। "ব্রিটিশ সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) প্রবর্তনের মাধ্যমে জমিদারদের ভূস্বামী করে দিয়ে এবং কৃষকদের তাঁদের অধীনস্থ প্রজা করে দিয়ে ইংরেজরাই প্রথম পরিপূর্ণভাবে ভূমি ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের পত্তন করে।" (গীতা, ২০০২ : ৩৩) ফলে কোনো শ্রেণি হয়ে পড়ে নিঃস্ব আবার কোনো শ্রেণি রাতারাতি হয়ে যায় ধনী। পক্ষান্তরে, ইংরেজদের তোষামদ করে অনেক অল্পবিদ্যা, মুর্খলোকও জমিদার বনে যায়। পরবর্তীতে রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে অনেক জমিদার নগরকেন্দ্রিক জীবনাভিমুখী হয়। পরবতী অনেকটা সময় পেরিয়ে "আভ্যন্তরীণ জটিলতা, ক্ষমতার অপব্যবহার ও প্রজা বিদ্রোহের আঘাতে আঘাতে সামন্ত শাসনের ভিত্তিমূল ক্রমশ দুর্বল হতে হতে এক পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।" (গীতা. ২০০২: ১৩)

বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক জীবন নিয়ে অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে। প্যারীচাঁদের (১৮১৪-১৮৮৩) *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮), তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *ধাত্রীদেবতা* (১৯৩৯), *গণদেবতা* (১৯৪৩), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) *যোগাযোগ* (১৯২৯) নারায়ণ গঙ্গেপাধ্যায়ের *লালমাটি*, *স্বর্ণসীতা*, *সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী* – এসব উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক জীবন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জমিদারের সন্তান ছিলেন এবং তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ও ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর দীর্ঘ দশ বছর জমিদারীর কাজ দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তথাপি জমিদার শ্রেণির প্রতি তাঁর কোনো পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। তাই তাঁর লেখায় জমিদার চরিত্রগুলোর ভালো-মন্দ দুটো দিকই উদ্ভাসিত হয়েছে। অর্থাৎ জমিদারিত্ব নিয়ে অহংকার বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পতনেও তাঁর মধ্যে কোনো দুঃখবোধ ছিল না। বনফুলের অগ্রজদের লেখায় সামন্ততান্ত্রিক জীবন যেভাবে উঠে এসেছে বনফুলের উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক জীবন একটু স্বতন্ত্রভাবে এসেছে। সেখানে সামন্ত সমাজের জীবনধারায় কৃষকের প্রতি সামন্ত প্রভূর অর্থনৈতিক নির্যাতনের দিকটির চেয়ে তাঁর দাম্ভিকতা, আভিজাত্যের অহমিকা ও শক্তিমত্তার দিকটি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে বিশেষ করে *দ্বৈরথ* উপন্যাসে। *মৃগয়া*তে সামন্তশ্রেণির সে-দিকটি আবার অনুপস্থিত বলা যায়। *দ্বৈরথ* প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। মূলত, এ সময় থেকে বনফুল উপন্যাস লেখার প্রতি বেশি ঝোঁকেন। এর আগে তিনি ছোটগল্প বেশি লিখেছেন। এ সময়ের তাঁর লেখা 'প্রভাতী', 'ভারতবর্ষ', 'আনন্দবাজার' এবং 'শনিবারের চিঠি'-তে প্রকাশিত হতো। *দ্বৈরথ* লেখার পেছনে একটি কাহিনি রয়েছে। তা হলো –

দোল সংখ্যা ও পূজা সংখ্যার জন্যে 'আনন্দবাজার' পত্রিকা এবং 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদকেরা বনফুলের কাছে লেখা চাচ্ছিলেন। এ সময় 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস বনফুলকে লেখা দেয়ার জন্যে তাগাদা দিচ্ছিলেন। বনফুল একটি বড় আকারে গল্প লেখেছেন সজনীকে দেয়ার জন্যে। গল্প লেখা যখন শেষ করলেন তখন সাহিত্য রসিক পটলবাবু এসে উপস্থিত হলে তাঁকে বনফুল গল্পটি পড়ে শোনান। গল্পটি শোনার পর তিনি বলেন, 'প্লটটি সুন্দর। এটিকে আরও বড় করুন। ইহাতে উপন্যাসের মালমসলা আছে।' (বনফুল, ১৯৯৯: ১৯৭) পরে এ বড় গল্পটি দ্বৈরথ উপন্যাসে পরিণত হয়। অবশ্য এর নামকরণের পেছনে আরও একটি ছোট কথা রয়েছে। প্রথমে এর নাম 'অহিনকূল' রাখার প্রস্তাব এসেছিল লেখকের কাছ থেকে। নামটি শরদিন্দুর পছন্দ না হওয়ায় তিনি দায়িত্ব নিলেন এর নামকরণ করতে। কিছুদিন পরে অনেক ভেবেচিন্তে বনফুলকে চিঠি দিয়ে জানান, তিনি উপন্যাসটির নাম দিয়েছেন 'দ্বৈরথ'।

উপন্যাসটি লেখার এবং প্রকাশকালের দিকে লক্ষ করলে, সহজেই অনুমান করা যায় যে, তখন বিহার উত্তর প্রদেশে জমিদারি প্রথা চালু ছিল পুরোদস্তুর। কারণ ১৯৫০ সালে 'ইস্ট বেঙ্গল এস্টেটস এ্যাকুইজিশন এ্যান্ড টিনেন্সী এ্যাক্ট' এর মাধ্যমে পূর্ববঙ্গে সামন্ত জমিদারী প্রথার বিলুপ্তি ঘোষিত হয়। (মহীবুল : ৩৩) বনফুলের *মৃগয়া* প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। উপন্যাসটিতে সামন্ততান্ত্রিক জীবন-চিত্র রয়েছে একটু ভিন্নভাবে। *দ্বৈরথ* এর সামন্ততান্ত্রিক জীবন ও *মৃগয়া*র সামন্ততান্ত্রিক জীবনের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। *দ্বৈরথ* এর ছয় বছর পর প্রকাশিত *জঙ্গম* এর তৃতীয় খণ্ডে

(১৯৪৫) জমিদারের সামন্ততান্ত্রিক দিকটি যেমন উঠে এসেছে তেমনি প্রজাদের দুর্নীতিপরায়ণ স্বভাবের স্বরূপটিও প্রতিফলিত হয়েছে। তাই *দ্বৈরথ* ও *মৃগয়া*কে সামন্ততান্ত্রিক জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস হিসেবে আলোচনা বিস্তৃত হবে।

দ্বৈরথ মানে প্রতিযোগিতা। দুই প্রতাপশালী জমিদার উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত। তাঁরা সম্পর্কে শালা-ভগ্নিপতি। সামনাসামনি দু'জন বসে দাবা খেলেন। আজ ওঁর বাসা তো কাল তাঁর বাসায়। আর ভেতরে ভেতরে চলে একজন আরেক জনকে জব্দ করার প্রতিযোগিতা। চন্দ্রকান্তের নামে ফৌজদারি মামলা দেয় উগ্রমোহন। সে মামলা অঙ্কুরেই ডিসমিশ হয়ে যায়। প্রতিশোধ হিসেবে চন্দ্রকান্ত উগ্রমোহনের জলকর লুঠ করে পাওয়া দুই মন মাছ উপঢৌকনস্বরূপ উগ্রমোহনকে পাঠিয়ে দেয় আবার উগ্রমোহনের বাহারকে নিখোঁজ করে দেয় (গরু)। উগ্রমোহন এর প্রতিশোধ হিসেবে তাঁর কাছে থাকা যৌবনে বাইজি রেশমকে লেখা চন্দ্রকান্তের প্রেমপত্র পাঠিয়ে দেয় এবং চন্দ্রকান্তের বাঘার বিল লুঠ করে। এভাবে চলতেই থাকে তাদের একজন আরেকজনকে হেনস্ত করার খেলা।

কাহিনির শুরুতেই জমিদার উগ্রমোহনের সাথে প্রজাদের সম্পর্কের স্বরূপটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। তোজি'র দিন, কাছারি বাড়ির বিস্তৃত ময়দানে বহু প্রজার সমাগম, উদ্দেশ্য খাজনা জমা দিতে এসেছে তারা। কাছাকাছি আট-চালায় প্রজাদের আহারের জন্যে দধি, চিড়া ও ফলারের ব্যবস্থা রয়েছে। ময়দানের সামনে নিম গাছের নিচে বসে কয়েকজন প্রজা উত্তেজিত হয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে আলোচনা করছে। এ সময় তাদের মধ্যে থেকে একটি যুবক বলে উঠছে, ন্যায্য খাজনা দিয়ে তারা থাকবে তাতে ভয়ের কিছু নেই। আরেকজন প্রজা তাকে সাবধান করে দেয়, রক্ত গরম না করতে কারণ জমিদারের বাড়িতে কাজ হাসিল করতে হবে। আরেকটু দূরে একটি যুবতীকে নিয়ে কানাঘোসা চলছে। সব কানাঘোসা ও কথাবার্তার ইতি টেনে জমিদার উগ্রমোহন এসে বিচারালয় বসালেন। কিন্তু খাজনা নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি গোছের কিছুই হয়নি সেখানে। উগ্রমোহন তাঁর দেওয়ানকে বিধবার (যে যুবতী মেয়েকে নিয়ে কানাঘোসা চলছে) চুল কাটতে আদেশ দেন এবং সাবধান করে দেন ভবিষ্যতে যেনো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এবং বিধবার গায়ে হাত দেয়ার অপরাধে তিনি উত্তেজিত যুবক ও তার বাবাকে গ্রাম ছাড়ার হুকুম দেন। এরপরে গরিব সাঁওতাল প্রজাদের সাথে খাজনা নিয়ে কথা বলেন তিনি। প্রজারা জানান, "অগ্‌ঘানি ফসলটা ভালো না হওয়ার দরুন তাহারা সম্পূর্ণ খাজনাটা আনিতে পারে নাই।" (বনফুল, ২০১২/১: ৩৩৩) আগামী বৈশাখীতে তারা বাকিটা শোধ করে দেবে। দিতে না পারলে জুতো মেরে আদায় করে নেবে উগ্রমোহন – এতোটুকু বলে তিনি ক্ষান্ত হলেন। অষ্টম পরিচ্ছেদে আরেকবারের মতো খাজনা প্রসঙ্গ এসেছে। তাতে দেখা গেছে, উগ্রমোহন দুইজন প্রজার খাজনা মাফ করে দেন এবং আরেকজন প্রজার মেয়ের বিয়ের দিন উগ্রমোহনের নাতনি

রুমনি ও ঝুমনির বিয়ের একই তারিখে হওয়ায় সে প্রজার খাজনা মাফ করাসহ তার মেয়ের বিয়ের গহনা ও কাপড়চোপড়ের বন্দোবস্তসহ খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও করে দেন।

উক্ত কাহিনির অংশে দেখা যাচ্ছে, উগ্রমোহনের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণে প্রজা উৎপীড়নের কোনো চিত্র কাহিনিতে নেই। কিন্তু উগ্রমোহন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন সজাগ, তাই দেওয়ানজি যখন প্রজার সমস্যার কথা নিজেই আগ বাড়িয়ে বলতে উদ্যত হলো তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে রূঢ়কণ্ঠে উগ্রমোহন বলেন, "তাদের নিবেদন তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না। বুড়ো বয়সে ঘুষ খাচ্ছ না কি? ডাক তাদের–" (বনফুল, ২০১২/১: ৩৩৩) সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা মধ্যস্বত্বভোগী দেওয়ানজিদের কারণে অনেক সময় প্রজারা তাদের সত্য কথাটি জমিদার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না – উক্তিটির মাধ্যমে এ সত্যটিও উঠে এসেছে। তবে লেখক, প্রজা শোষণ ও নির্যাতনের চেয়ে উগ্রমোহনের মধ্যে ক্ষমতার দাম্ভিকতার দিকটিকে প্রকটিত করেছেন। একটি উদাহরণের মধ্যে দিয়ে তা স্পষ্ট করা যাক। উগ্রমোহনের প্রজা, ধনী মহাজন গোলকচন্দ্র সাহার অবাধ্যতা বা আদেশ অমান্য করার অপরাধে তাকে শেষ পর্যন্ত জীবন দিতে হয়েছে। গোলক সার উপর কড়া আদেশ ছিল সে যেনো দ্বিতীয়বার উগ্রমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বি চন্দ্রকান্তকে টাকা ধার না দেয়। আদেশ অমান্য করায় তাকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে। জঙ্গলের ভিতরে যমঘরে আটকে রেখে ময়াল সাপের দংশনে প্রাণ দিতে হয়েছে। এদিকে সামন্ততন্ত্রের চক্রান্তে পড়ে জীবন দিতে হলো বহ্নিকুমারীকে।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বি জমিদারের পরস্পরকে জব্দ-করা খেলাখেলিতে বিশেষ করে জলকর ও বাঘারবিল লুণ্ঠনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক নিরীহ প্রজার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে, প্রাণ যায় অনেকের। তাদের খামখেয়ালিপনার কারণে লাগে দাঙ্গা, লুণ্ঠন, বলি হয় প্রজার জীবন। চন্দ্রকান্তের নেপথ্যে নেয়া সব প্রতিশোধ কেবল উগ্রমোহনকে ঘিরে, কোনো প্রজাকে কেন্দ্র করে নয়। চন্দ্রকান্ত একজন ভদ্র, সংগীতানুরাগী, সংস্কৃতমনা মিষ্টভাষী ব্যক্তিত্ব। কাহিনির কোথাও তাঁকে ঘিরে প্রজাদের খাজনা বা কোনো উৎপীড়নের কথা নেই। কেবল উগ্রমোহনকে হেনস্তা করার সুযোগের সন্ধানে থাকেন। তবে ভিতরে ভিতরে তাঁর দরদি মন উগ্রমোহনের জন্যে কাঁদে। গোলক সাকে যমঘরে আটকে রাখার কারণে পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের দরুণ উগ্রমোহনের শাস্তি হতে পারে, ফলে চন্দ্রকান্ত হারাবেন তাঁর দাবা খেলার সাথী–এ কথা ভেবে তিনি উগ্রমোহনকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। প্রকৃত অর্থে চন্দ্রকান্ত একজন নিঃস্ব একাকী মানুষ। তাঁর অবসরটুকু আনন্দে মাতিয়ে রাখেন উগ্রমোহন।

জমিদার বাড়ির অন্দরমহলের এবং বাহিরের সব ঠাট জমিদারের স্বভাবজাত করে চিত্রিত করেছেন লেখক। দুই জমিদারের আচার-ব্যবহার, তাদের অধীন মুন্সি, দেওয়ানজি, নায়েব, মিশিরজি, সীতারাম পাঁড়ে, চৌবেজি নামের

চরিত্রগুলো সামন্তশ্রেণিকে প্রতিনিধিত্ব করে। জমিদার চরিত্রের শ্বাশত রূপটি উগ্রমোহন এবং চন্দ্রকান্ত দুজনের চরিত্র-চিত্রণে যথাযথভাবে এসেছে। দুজনই যৌবনে নারী-ঘটিত ব্যাপারে জড়িত ছিলেন। এ ক্ষেত্রের উগ্রমোহনের উগ্রতা চন্দ্রকান্তের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। সংলাপ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। আবার দুই জমিদারের স্বভাবগত দিকের সাথে তাদের নামের সামঞ্জস্যতা রয়েছে। উগ্রমোহন একটু বেশি রকমের উগ্রস্বভাবের আর চন্দ্রকান্তের স্বভাব অনেকটা শান্ত সমাহিত, চাঁদের মতো সুন্দর, স্নিগ্ধ। তাই উগ্রমোহন সহজেই বহ্নিকুমারীর হাত থেকে এস্রাজটা নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে তাকে বলতে পেরেছে – গান গায় পাখিতে, মানুষে নয়। আর গানপ্রিয় চন্দ্রকান্ত বাড়িতে গানের আসর বসায়। কাফি রাগিণীর গৎ এবং নহবতখানার বাঁশিতে পুরবি শোনে আর তাঁর মনে হয় – "পৃথিবীতে কিছুরই কোনও অর্থ নাই।" (বনফুল, ২০১২/১: ৩৭০) স্বাভাবিকভাবেই উক্ত দুই সংলাপের মধ্যেই নিহিত আছে দুই জমিদারের মনস্তত্ত্ব। চন্দ্রকান্তকে মিশিরজি গান শোনায়। গানের অনেক রাগ-রাগিণীসহ অনেক সুরের ব্যঞ্জনার, সুরের ঝংকার নিয়ে চন্দ্রকান্ত এবং মিশিরজির মধ্যে আলাপ চলে। গানের এরূপ আবহ সৃষ্টি, বাইজীকে দিয়ে নৃত্য-গীত পরিবেশন, সুরা পান – সামন্তশ্রেণির বৈশিষ্ট্যকে প্রতিভাত করে। এখানে সামন্তশ্রেণির চরিত্রগুলো এতোটাই বাস্তব করে বনফুল চিত্রিত করেছেন যে, তা রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা কুড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে বলেছিলেন – "তুমি যে গানের কিছু কিছু বোঝ তার প্রমাণ তোমার *দ্বৈরথ* বইয়ে আছে। আচ্ছা, *দ্বৈরথ* বইয়ে তুমি যেসব চরিত্র এঁকেছ তাদের তুমি দেখেছ?" বনফুল জবাব দিয়েছিলেন, "খুব ছেলেবেলায় দেখেছি। বাবা ওইসব জমিদারদের বাড়ির ডাক্তার ছিলেন, তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে গেছি ওদের বাড়িতে। চরিত্রগুলো খুবই জীবন্ত হয়েছে।" (বনফুল, ২০১৩/১৩: ১৩৯-৪০) উগ্রমোহন চরিত্র কিছুটা যোগাযোগের মধুসূদনের ছাঁচে ঢালা–নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *স্বর্ণসীতা* উপন্যাসের সোমনাথ চরিত্রের সঙ্গেও তাঁর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। তার কারণ, সামন্ত শ্রেণির চরিত্র বিশিষ্ট কতগুলি উপাদানে গঠিত ছিল এবং এর মধ্যে যাঁরা ব্যতিক্রম তাঁরাই জনদরদী, প্রজাদরদী জমিদার বিরোধী হতেন। (গীতা, ২০০২: ১৮৩)

মৃগয়ায় তিন জমিদার পরিবারের বাঘ শিকার যাত্রার কাহিনির সাথে অনেক মানুষের অংশগ্রহণের এক আনন্দানুভূতির বর্ণনা। গ্রামে, পথে এবং প্রান্তরে – তিনটি ভাগে বর্ণিত কাহিনির শুরু হয়েছে অতি সাধারণ মানুষদের কথা দিয়ে। তারপর জমিদারবাবুদের প্রসঙ্গ ওঠে এসেছে। শিকার যাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় রয়েছে – কে, কীভাবে অংশগ্রহণ করতে চায়, কেনো চায়, অংশগ্রহণে কার কী উদ্দেশ্য, কাকে রাজি করিয়ে নিতে হবে তার কারণও বলা আছে প্রথম ভাগে। এ যেনো মহাউৎসব-আয়োজন। এতো মানুষের ভীরে আরও একদল বেকার যুবক ছোটবাবুর কাছে এসে বায়না ধরেছে তারাও যেতে চায়। ছোটবাবু তাদের নিরাশ করেননি। "ছোটবাবুই আসলে জমিদার"।

(বনফু, ২০১২/২: ২৭৩) বড়বাবু অনেকটা খামখেয়ালি, উদাসীন প্রকৃতির আর মেজবাবুর কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন, তিনি নির্বাপিত। ছোটবাবুর চরিত্র বিশ্লেষণে কৌতুকাবহ সৃষ্টি করা হয়েছে –

ছোটবাবুকে কেন্দ্র করে
হিরণপুর গ্রামে
নানা গুজব আবর্তিত হয় নানা রসনায়।
চিরকালই হবে।
কারণ,
এমন একটা কন্দর্পকান্তি জমিদারপুত্র
নিষ্কলঙ্কচরিত্র –
বিশ্বাস করা কঠিন। (বনফুল, ২০১২/২: ২৭৩)

ছোটবাবুকে দেখতে কড়া মেজাজের মনে হলেও তিনি অতিশয় অমায়িক লোক। তিনি মহালে মহালে ঘোরেন, প্রজাদের সাথে কথাবার্তা বলেন, তাদের খোঁজ খবর নেন এবং বিচার-ব্যবস্থাও করেন। বড় জমিদার এবং মেজ জমিদারকে পুরোভাগে রেখে তিনিই পরিচালনা করেন সব কাজ। শিকার যাত্রা পথের মাঝে ছোটবাবু শঙ্করা-কাছারিতে নামেন একটি জটিল কাজের সমাধানের নিমিত্তে। কিছুদিন আগে জগাই ক্ষ্যাপা নামের এক সিদ্ধপুরুষ শঙ্করা গ্রামে এসে আড্ডা গাড়ে। তার কার্যকলাপে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সিদ্ধপুরুষের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে দুটি দল গড়ে উঠেছে। একদলের মতে, জগাই ক্ষ্যাপা আসলেই সিদ্ধপুরুষ আরেক দল, যারা যুবক শ্রেণির তাদের মতে, জগাই এর মতলব খারাপ। কারণ সে কেবল যুবতী মেয়েদের দিয়ে গা-হাত-পা টেপাবার আধ্যাত্মিক কোনো অর্থ খুঁজে পান না। তারা সিদ্ধপুরুষের একেবারে 'ন্যাকোট' করে ছেড়ে দেবে। এরূপ গুরুতর অবস্থায় মীমাংসা অনিবার্য। ছোটবাবু বড়বাবু ও মেজবাবুর কাছে গেলেন এর সমাধানের উপায় খুঁজতে। শেষে ছোটবাবুকেই সমাধানের পথ বের করতে হলো। তিনি দুকুল রক্ষা করে সমাধানের উপায় বাতলে দেন। এবার ছোট জমিদারের মহানুভবতার আরেকটি পরিচয় রয়েছে খাজনা সংক্রান্ত বিষয়ে। কলমিপুর মাঠে ছোটবাবুর তাঁবুতে এসে ঠানদি প্রজা তিনু চাটুজ্জের খাজনা মওকুফের দরখাস্তের কথা জানান। তার সুদে-আসলে এবার খাজনা দাঁড়িয়েছে অনেক। এতো বেশি খাজনা মাপ করে দেয়ার কথা শুনে উগ্রমোহনের মতো করে বলেনি যে, আগামী বৈশাখীতে দিতে না পারলে জুতিয়ে আদায় করে নেবে। বরং তিনি ঠানদিকে অমায়িকভাবে বলেছেন, "আপনি যদি হুকুম করেন, আমার সাধ্য আছে অমান্য করি। (বনফুল, ২০১২/২: ৩৩৯)

বড় জমিদার সবাইকে সমান চোখে দেখেন। সে সাধু হোক বা অসাধু হোক। কারো স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করতে চান না। তাই সিদ্ধপুরুষের বিচার করতে তিনি তৎপর নন। তাকে বলতে শোনা যায়, কেউ যদি সিদ্ধপুরুষকে কারো বাড়িতে স্থান দেয় দিক, কেউ যদি তাকে পেটাতে চায় পেটাক, কোনো মেয়ে যদি তার হাত-পা টিপে আনন্দ পায় তাহলে সে তা করুক। ছোটবাবুও যদি কিছু করতে চায় করুক। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় সবাই যখন দিশেহারা বড়বাবুও তখন দিলখোলা মনে মজুত রাখা ছয় বোতল শ্যাম্পেন এর এক বোতল লাহিড়িকে দিতে বলেন। ময়রা নদীতে বেড়াতে বেড়াতে শ্যাম্পেন জমবে ভালো। কিন্তু প্রজা নীলু অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে কোমল পানীয় যোগাড় করেছে বিধায় সে দিতে রাজি ছিল না কোনো মতেই। নীলু সে কষ্টের কথাই তিনুকে বলছে। আর এ কথাতে বড়বাবুর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কথাও জানতে পারেন পাঠক – "আমাদের বড়বাবুর যে রকম দরাজ হাত, ছোটবাবুর হাতে জমিদারি না পড়লে উনি সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতেন। অমন কাছাখোলা হলে জমিদারি থাকে।" (বনফুল, ২০১২/২: ৩১৯) মেজবাবুর যে পরিচয়টুকু রয়েছে তাতে পূর্ণিমার রাতে মেজ বউয়ের সাথে রোমান্স করার পরিচয় মেলে। তিনি সিদ্ধপুরুষ বিষয়ে সমস্যার সমাধান দিতে গিয়েও পরে তা ছোটবাবুর কাছে চাপিয়ে দেয়।

দ্বৈরথের উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্তের চরিত্রের সাথে *মৃগয়ার* তিন জমিদারের চরিত্রের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথমত, ছোটবাবুর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক; দ্বিতীয়ত, তিনি মহালে মহালে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার কথা শোনেন; তৃতীয়ত, প্রজার অনেক বকেয়া খাজনার কথা শোনে প্রসন্ন মুখে তা মুওকুফ করে দেন – চরিত্রের এসব মহৎ গুণ উগ্রমোহন এবং চন্দ্রকান্তের মধ্যে দেখা যায়নি। তবে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে, তা হলো দু'জায়গাতেই মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের তেমন সক্রিয় থাকতে দেখা যায় না। জমিদাররা নিজেরাই সরাসরি প্রজাদের সাথে কথা বলেছেন। দেওয়ানজি নিজ উদ্যেগে প্রজার সমস্যা কথা বলতে চাইলে, উগ্রমোহন তাকে বুড়ো বয়সে ঘুষ নিচ্ছ নাকি বলে থামিয়ে দেন। প্রায় শত মানুষ নিয়ে বাঘ শিকারে যাওয়া বিলাসিতা ছাড়া জমিদার চরিত্রের সংগীত চর্চার বিষয়টি অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিলাসিতার দিকটি এখানে অনুপস্থিত তবে নাচ-গান উপভোগ করার মানসিকতা দেখা গেছে। পূর্ণিমার রাতের স্বপ্নাচ্ছন্ন প্রভাব এবং মদিরাসক্ত হয়ে বড়বাবু বড় বউকে নতুন করে আবিষ্কার করেন। জমিদার গৃহিণীরা নিজেদেরকে মেলে ধরেছেন। বড়বাবু বড় বউয়ের এতো রূপ আগে দেখেননি, এতোদিন তা গহনার তলায় চাপা পড়েছিল। তবে গোহুমনাদেরর নাচ-গান উপভোগ করেছেন তারা।

মৃগয়ায় তথাকথিত সমান্ততান্ত্রিক জীবনধারা দেখতে পাওয়া যায় না। মৃগয়ায় ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নতুন যুগের প্রবেশকে স্বাগত জানিয়েছেন বনফুল। জমিদারের মা, সেকেলে মানুষ বৃদ্ধা গৃহিণীর সময়কালের

সাথে একালের মানুষদের সময়ের ব্যবধানকে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে দুই কালের শিক্ষা, সংস্কৃতি, উৎসব-পার্বণ, পোষাক-পরিচ্ছেদ, জীবনধারা, পরিবার-প্রথা – সবকিছুর প্রসঙ্গ রয়েছে। সেকেলে মেয়েদের বিয়ে হতো পুজো-হোমের আবহাওয়ায় সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে। একশো ঢাকি-ঢুলি, রোশনচৌকি, নহবত, যাত্রা, ঢপ, গোরার বাজনা বাজিয়ে এবং একমাস ধরে লোক খেয়ে। আর এখন সোমত্ত সোমত্ত মেয়েরা চুপি চুপি আদালতে গিয়ে নাম সই করে বিয়ে করে আসছে। আগে মেয়েদের নয় বছর বয়সে বিয়ে হতো কুল-গোত্র-কুষ্ঠি বিচার করে এখন মেয়েদের বিয়েতে টাকা ছাড়া দেখে না কিছুই। ছেলের উপার্জন ক্ষমতা, কেবল টাকাই দেখে। ভাগ্যের উপর আজকাল কারো বিশ্বাস নেই। সব দেখে শুনে দিতে চায়। সে যুগে জমিদারের অন্তঃপুরে মেয়েদের কলেজী লেখাপড়া ছিল না। অন্তঃপুরে মেয়েরা নিজেদের শালীনতা বজায় রাখতো এমনকি পয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের ঘোমটা খোলার সাহসই হতো না। আর শিকারে পুরুষদের সঙ্গী হওয়ার কথা তারা কল্পনাই করতে পারতো না। আজকাল মেয়েরা নিজেরাই শিকারে যাওয়ার হুজুগ তোলে। পুরুষদের সাথে তারা ঘেঁষাঘেঁষি করে লেপটে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের মতোই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ধাত্রীদেবতা*, *কালিন্দী*, *গণদেবতা*, *পঞ্চগ্রাম* বিভিন্ন উপন্যাসে সামন্ততন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন দিক উঠে এসেছে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের স্থলে আত্মচেতনায় জাগ্রত নতুন শ্রেণিটিকেও তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে অত্যাচারী জমিদারের শোষণের চিত্র যেমন তিনি অঙ্কন করেছেন তেমনভাবে জমিদারের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদের চিত্রটিও বাস্তবানুগ করে তুলে ধরেছেন। "ধাত্রীদেবতায় চিরন্তন জমিদারি অভিমান ও আড়ম্বরের সঙ্গে নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। ফলে গৌরব শেষ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে ব্যক্তিত্বের মহিমার কাছে।" (গীতা, ২০০২: ১২৯) বনফুলের মৃগয়াতেও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সাথে নতুন যুগের দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সামন্ত্রতন্ত্রের সাক্ষী বৃদ্ধা গৃহিণীর কথাতেই ধরা পড়ে সে দ্বন্দ্বের আভাস।

বনফুলের অনেক উপন্যাসেই নিগৃহীত, অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষের কথা রয়েছে। আমরা জানি, বনফুলের জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে তাদের শারীরিক ক্ষত নিরাময়ের পাশাপাশি মনোজগতে বিচরণের অনায়াস প্রয়াসে। এবং তাঁর সে প্রয়াস অনেকাংশে বাস্তব-ঘেষা, দরদী মনের সাক্ষ্য বহন করে। আলোচ্য উপন্যাস দুটিতে সামন্তজীবনই প্রধান হয়ে উঠেছে যেখানে জমিদার ও প্রজাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। *দ্বৈরথে* তথাকথিত সামন্তসমাজ ব্যবস্থায় অত্যাচারিত জমিদার এবং অত্যাচারিত প্রজাদের নিখুঁত চিত্র রয়েছে আর মৃগয়াতে লেখক সামন্ততন্ত্রের পতন এবং এর স্থলে আত্মচেতনায় জেগে উঠা নতুন শ্রেণিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাই বলা যায়, দুটি উপন্যাসে সামন্ত্রতন্ত্রের চেহারায় কিছুটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

আঙ্গিক বিচার

উপন্যাসের আভিধানিক অর্থ দীর্ঘ আখ্যায়িকা, বড় গল্প বা কাল্পনিক কাহিনি। আধুনিকযুগে ব্যক্তি মানুষের যুগযন্ত্রণার তীব্র জীবন জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির তাগিদেই উপন্যাসের জন্ম। উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য মানুষ, তাই মানুষের হৃদয় যন্ত্রণার, হাসি-কান্নার হার্দিক ছবি বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে এবং লেখকের জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতি বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে রূপায়িত হয়ে উপন্যাস গড়ে ওঠে। উপন্যাসকে শিল্পীর অন্তরাত্মার বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। আর্নল্ড কেটল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে উপন্যাসের প্রধান উপাদান কী– একথা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, উপন্যাসে থাকা চাই জীবন ও জীবনের বিন্যাসগত শিল্পরূপ দুই-ই। এই Life and pattern-এর যুগল দাবিতে গড়ে ওঠে সার্থক উপন্যাস। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে লেখকের ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন হলো উপন্যাস। প্রকৃত অর্থে ঔপন্যাসিকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় বিষয় হলো জীবনের সমগ্রতার সন্ধান। উপন্যাস জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। জীবনের এই আত্মীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে উপন্যাসকার জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান করেন। এই সামগ্রিকতা ছাড়া কখনো সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি হতে পারে না।মানুষের জীবনের যেমন কোনো নির্দিষ্ট ছক নেই, তেমনি উপন্যাসের ধরাবাঁধা কোনো ছক নেই। তবুওবিষয় ও আঙ্গিকবিচারের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে উপন্যাস গড়ে ওঠে। উল্লেখ্য, পরিবর্তনশীল বিশ্বে সময় ও সমাজেরওপর নির্ভর করে উপন্যাসের আঙ্গিক বিচার। উপন্যাসে কোন পদ্ধতিতে লেখক জগৎ এবং জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন; তিনি কী গভীরভাবে অনুধাবন করেন; কী তিনি পরিহার করেছেন; কোন ধরনের সমস্যা তিনি উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন এবং এসব অভিজ্ঞতা থেকে কোন নৈতিক মূল্য তিনি নিষ্কাষিত করেছেন–এ পঞ্চ পরিচয়ের ওপর ঔপন্যাসিকের মানসোৎকর্ষের বিচার হয় (সরোজ, ১৯৬১: ১৪-১৭)। কথাসাহিত্যে বিষয় উপস্থাপনের সাফল্য নির্ভর করে তাঁর উপস্থাপনা কৌশল বা আঙ্গিকের ওপর। উপস্থাপনা কৌশলের কারণে যেকোনো বিষয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং শ্রোতা-পাঠকের কাছে তা গ্রহণযোগ্যতা পায় ও হৃদয়গ্রাহী হয়। ঔপন্যাসিক কোন টেকনিক অবলম্বন করে উপন্যাস লিখছেন, বিষয়ীর উপস্থাপনা কীভাবে করছেন, উপন্যাসের আঙ্গিক বিচারের বেলায় সেই দিকটি অধিক বিবেচ্য বিষয়। উপন্যাসের আঙ্গিকবিচারে ছয়টি উপাদান বিবেচ্য বিষয়–প্লট, চরিত্র, ভাষা, সময়, দৃষ্টিকোণ এবং ঔপন্যাসিকের জীবন-দর্শন। আলোচ্য ঔপন্যাসিক বনফুলের উপন্যাসের আঙ্গিক বিচার উল্লিখিত ছয়টি উপাদানকে স্মরণে রেখে আলোচনা অগ্রসর হবে। কেবল প্রচলিত রীতির উপন্যাসে এই আঙ্গিক বিচার যাবে প্রযোজ্য।

বাংলা কথাসাহিত্যে বনফুল একজন স্বতন্ত্রধারার লেখক– যেমন বিষয় নির্বাচনে, তেমনি চরিত্র গঠনে এবং রচনারীতিতে। কল্লোলের ভাবধারার সাহিত্যচর্চা থেকে বনফুল দূরত্ব বজায় রেখে হাসিকান্না-আনন্দ-বেদনামিশ্রিত মানব জীবনের সদর্থক প্রান্তকে তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু করেছেন। বনফুল রূপরীতি ও কলাকৌশলে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা চালিয়ে নবনব আঙ্গিকের গল্প, উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। গল্পের ক্ষেত্রে তিনি যেমন কাব্য-গল্প, পত্র-গল্প, নাট্য-গল্প সৃষ্টি করেছেন তেমনি উপন্যাসের বেলায়ও তিনি কাব্যোপন্যাস, পত্রোপন্যাস, নাট্যোপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। বনফুলের রচনা কৌশলের বৈচিত্র্য সম্পর্কে তাঁর নিজের মন্তব্যটি স্মরণীয়–

> আমার একটা স্বভাব আমি একঘেয়ে ব্যাপার বেশিদিন বরদাস্ত করিতে পারি না। উপর্যুপরি একই রকম তরকারি খাইতে পারি না। আমার আহারের বৈচিত্র্যেও জন্যও লীলাবতীকেও নানারূপ নতুন রান্না শিখিতে হইয়াছে। আমি নিজেও মাঝে মাঝে রান্নাঘরে ঢুকিয়া নতুন কিছু রাঁধিবার চেষ্টা করিতাম। ডিম-বেগুন, ব্রেন-বরবটি, লাউয়ের স্ট্যু প্রভৃতি নানারকম Experiment করিয়াছি। মাংসের রোস্ট, স্ট্যু, শিক-কাবাব প্রভৃতি করিয়াছি। লিখিবার বেলাতেও আমারএই স্বভাব ক্রমশঃ নিজেকে জাহির করিতে লাগিল। (বনফুল, ১৯৯৯: ১৯৩)

বনফুলের উপন্যাসের আঙ্গিক বিচারের ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য। এ অধ্যায়ে আলোচ্য উপন্যাসগুলোকে প্রচলিত রীতির উপন্যাস, গদ্য-পদ্য রচিত উপন্যাস, মহাকাব্যিক উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, ডায়েরিধর্ম উপন্যাস, নাট্যোপন্যাস ও কোলাজধর্মী উপন্যাস–সাতটি পর্যায়ে ভাগ করে আঙ্গিক বিচারের আলোচনা বিস্তৃততর করার চেষ্টা করা হবে। বনফুলের এক-একটি উপন্যাস নব নব আঙ্গিকের দাবিদার। আঙ্গিক বৈচিত্র্যে বনফুলের গল্প বা উপন্যাস স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত।

১. প্রচলিত রীতির উপন্যাস

১.১

দ্বৈরথ, *ভুবন সোম*, *নবদিগন্ত*, *ওরা সব পারে*, *মহারাণী*, *তীর্থের কাক*, *সন্ধিপূজা*–এগুলো প্রচলিত রীতির উপন্যাস। সাধারণত এ ধরনের উপন্যাসে সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত প্লট বা আখ্যান থাকে। যেখানে চরিত্রগুলোর মাধ্যমে বাস্তব জীবন অনেক আকর্ষণীয় ও জীবন ঘনিষ্ঠ হয়।এখানে একাধিক চরিত্র থাকে, যারা ঘটনার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। চরিত্রগুলো তাদের নেগেটিভ ও পজিটিভ ক্রিয়াকর্ম দ্বারা সমগ্রতা অর্জন করে। চরিত্রগুলোর মুখে সংলাপ আরোপ করা হয়, ফলে তারা পারিবারিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঘটনাকে গতিশীল করে তোলে। লেখকের সামগ্রিক জীবনদর্শন, তাঁর স্টাইল এবং উপন্যাসের বিষয় অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ, দেশ-কাল অনুযায়ী পরিবেশ বর্ণনা, পটভূমিকা–সবকিছু মিলে একটি সার্থক উপন্যাস গড়ে ওঠে।

দ্বৈরথ উপন্যাসটি উনত্রিশ পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। এখানে কোনো পর্ববিভাগ বা অধ্যায় নেই। ভগ্নিপতি ও শ্যালক দুই জমিদার পরস্পরের নীরব প্রতিদ্বন্দ্বী। গোপনে তাঁরা লোক দিয়ে একজন আরেকজনের অনিষ্ট করে বাহাদুরি দেখান। তবে দাবা খেলায় তাঁরা দুজন পরস্পরের কাঙ্ক্ষিত সঙ্গী। জমিদার উগ্রমোহন কাছারিতে এসে প্রজাদের সাথে দেখা করে তাদের সব রকম সমস্যার কথা শোনেন এবং সমাধান করেন। মূল কাহিনি উগ্রমোহনের মৃত বোনের ঘরের দুই নাতি রুমনি-ঝুমনিকে নিজের পছন্দের পাত্রের সাথে বিয়ে দেয়ার জেদকে বাস্তবায়িত করা। এ কাহিনির সাথে অনেক উপকাহিনি বা শাখা কাহিনি রয়েছে। যেমন,রুমনি-ঝুমনির বিয়েতে বাধা দেয়ার নিমিত্তে মৃন্ময়ের দুই ছেলে অজয়-বিজয়কে চন্দ্রকান্তের লুকিয়ে রাখা, উদ্দেশ্য যমঘরে আটকে রাখা গোলক সাকে মুক্ত করা; দোল-পূর্ণিমার মেলায় ঘোড়া ক্রয় করার ঘটনা নিয়ে মামলা লড়া; উগ্রমোহনের স্ত্রী বহ্নিকুমারীর সাথে গঙ্গাগোবিন্দের অতীত প্রেমের কথা এবং সবশেষে বহ্নিকুমারীর একাকীযম ঘর থেকে গোলক সাকে উদ্ধার করতে গিয়ে যমঘরের অজগরের করাল আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট হয়ে মারা যাওয়া – এসব উপকাহিনি মূল কাহিনিকে গতিশীল এবং ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছে। উনত্রিশ পরিচ্ছেদে, বহ্নিকুমারীর মৃত্যুতে উগ্রমোহনের যেন মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। দাবা খেলায় তাঁর আর মনোযোগ নেই। সামন্ততন্ত্রের প্যাঁচে পড়ে বহ্নিকুমারীর জীবনাবসান ঘটে।

কাহিনি শুরু হয়েছে উগ্রমোহনের কাছারি বাড়িতে প্রজাদের খাজনা প্রদান করতে সমাগম হওয়ার মধ্য দিয়ে। কোনো প্রজার খাজনার সময় বাড়িয়ে দেয়া, যুবককে পঁচিশবার জুতো মারার এবং বিধবার চুল কেটে দেয়ার আদেশ দেয়া, প্রজা গোলক সাকে চড় মেরে চন্দ্রকান্তকে টাকা দিতে নিষেধ করা এবং ডাক্তারি পাস করা যুবককে চাকরি দেয়ার মাধ্যমে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটে। পরের পরিচ্ছেদগুলোতে–চন্দ্রকান্ত চক্রান্ত করে উগ্রমোহনের জলকর লুণ্ঠন করিয়ে দুই মণ মাছ উগ্রমোহনের বাসায় উপঢৌকন হিসেবে পাঠান। গোলক সাকে তাঁর পীরপুর বাজারের বাড়িতে বসবাস করার জন্য রাজি করান। প্রতিশোধস্বরূপ উগ্রমোহন সিপাহিদের আদেশ করেন চন্দ্রকান্তের জলকর বাঘার বিলে রক্তের স্রোত বইয়ে দিতে। এর প্রতিশোধ নিতে উগ্রমোহনের রতনপুর কাছারি লুট করার আদেশ দেন চন্দ্রকান্ত – এভাবেই প্রতিশোধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতেই থাকে বহ্নিকুমারীর মৃত্যুর আগপর্যন্ত। লুট করার বা প্রতিশোধের ঘটনাগুলো লেখক এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বাস্তবের সাথে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। গোলক সাকে উদ্ধার করতে বহ্নিকুমারীর নিশি-ভ্রমণের মধ্য দিয়ে কাহিনি ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে এবং যমঘরে বহ্নিকুমারীর মৃত্যুতে কাহিনির সমাপ্তি।

এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র চারটি–উগ্রমোহন, বহ্নিকুমারী, চন্দ্রকান্ত ও গঙ্গাগোবিন্দ। উগ্রমোহন চরিত্রটি জমিদারের দাম্ভিকতা, প্রতাপ, প্রতিশোধ-স্পৃহা–সবকিছুর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। প্রজা গোলক সা উগ্রমোহনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বারবার চন্দ্রকান্তকে টাকা ধার দেয় এবং তাঁর বাড়িতে থাকে। এই কারনে তাঁর প্রতি সামন্ততন্ত্রের স্টাইলে নির্যাতন করেছেন উগ্রমোহন –"এখনও শেষ হয় নি। একটু বিশ্রাম করে নাও। আরও চাবুক লাগাব। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর আজ চাবকাব তোমায়। তোমার টাকার অত্যন্ত গরম হয়েছে।" (বনফুল, ২০১২/১: ৪০৪) প্রজার প্রতি তাঁর দরদ মনও রয়েছে। উগ্রমোহন প্রসন্নচিত্তে প্রজাদের করুণ-কাহিনি সহানুভূতির সাথে শোনেন। উগ্রমোহন বহির্বাটিতে বসে এক প্রজার দুর্দশার কাহিনি শুনে তার খাজনা, বকেয়া মাফ করে দেন। উপরন্তু ওই প্রজার মেয়ের বিয়ের তারিখ আর রুমনি-ঝুমনির বিয়ের তারিখ মিলে যাওয়ায় আবেগায়িত হয়ে প্রজার মেয়ের বিয়েতে আধমণ দই, আধমণ মাছ, একজোড়া ভালো শাখা, রুপার সিঁদুর কৌটা, শাড়ি ও দূর্বাঘাস পাঠানোর ব্যবস্থা করতে গোমস্তাকে আদেশ দেন। শাসন ও দরদ দুই-ই রয়েছে তাঁর চরিত্রে। রেগে গেলে বহ্নিকুমারীর এসরাজ ছুড়ে ফেলতেও দ্বিধা করেন না আবার দীর্ঘ সময় স্ত্রীর দেখা না মিললে তাঁকে স্মরণ করেন। উগ্রমোহন চরিত্রটি একটি সামগ্রিক চরিত্র। এ চরিত্রটি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে চিত্রিত হয়েছে। চরিত্রটির মনোজগৎ সম্পর্কেও পাঠক ধারণা লাভ করতে পারেন।

বহ্নিকুমারীর চরিত্রটিকে লেখক জমিদারের সহধর্মিণীর যথাযথ চরিত্ররূপেই অঙ্কন করেছেন। এ চরিত্রটিকে সমতল বা ফ্ল্যাট চরিত্র হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। উপন্যাসে তাঁর অন্তর্জগৎ বিষয়ে পাঠক বিস্তৃত জানতে পারেন না। অল্প কথায় তাঁর অতীত ও বর্তমানের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পান। বহ্নিকুমারী আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র। বহ্নিকুমারীর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান যেমন রয়েছে, তেমনি প্রজাদের প্রতিও রয়েছে তাঁর সমান ভালোবাসা। যার গলায় একসময় ফুলের মালা পরিয়ে বলেছিল "তুমি আমার বর", সেই গঙ্গাগোবিন্দের কাছ থেকে তিনি যখন শোনেন যমজঙ্গলের যমঘরে তাঁদের প্রজা গোলক সাকে মারতে উগ্রমোহন আটকে রেখেছেন এবং পুলিশ বিষয়টির তদন্ত করতে আসছে শিগগির, তাৎক্ষণিকভাবে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, যেমন করে হোক, স্বামীকে পুলিশের কাছ থেকে বাঁচাতে হবে, তাঁর মান রাখতে হবে এবং প্রজা গোলক সাকেও যমঘর থেকে উদ্ধার করতে হবে। গোলক সাকে উদ্ধার করতে রাতের অন্ধকারে রওনা হলেন এক বিশ্বস্ত দাসী নিয়ে। যমজঙ্গলের পথ হারিয়ে নানা প্রতিকূলতাকে উতরিয়ে, দাসীকে মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে একাকিনী যমঘরে পৌঁছলেন। অবশেষে ময়াল সাপের নিষ্পেষণে পিষ্ট হলেন তিনি।

চিরকুমার চন্দ্রকান্ত একটি সামগ্রিক চরিত্র। উপন্যাসে তাঁর অন্তর্জগতের পরিচয় রয়েছে এবং অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সব চরিত্রের সাথে ক্রিয়াশীল থাকে এই চরিত্রটি। তাঁকে শান্ত প্রকৃতির সংগীত-প্রিয় জমিদার হিসেবে পাঠক দেখতে পান। এমনকি বোনের মৃত্যুর পর তিনি মনোযোগ দিয়ে দাবা খেলেন যেখানে উগ্রমোহন সম্পূর্ণ অমনোযোগী। তাঁকে কোনো প্রজা-উৎপীড়ন করতে দেখা যায় না উপন্যাসে। জীবনের ছোট ছোট আনন্দ পেতে তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করেন। সংগীত বিদ্যার মতো এ বিদ্যাটিও বহু কৌশলে বহু অর্থ ব্যয় করে তিনি আয়ত্ত করেছেন। তিনি চোখ বন্ধ করে তন্ময় হয়ে একদিকে কাফিগৎ বাজান, আরেকদিকে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনার কথা ভাবেন এবং ধীরস্থিরভাবে পরামর্শ দেন। আলবোলার নলটা মুখে দিয়ে অসহায়ের মতো তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে ভাবেন – "পৃথিবীতে কিছুরই কোনও অর্থ নেই।" (পৃ, ৩৭০)

গঙ্গাগোবিন্দ সরল প্রকৃতির ধার্মিক লোক এবং আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন। স্ত্রী বিয়োগের পর দুই মেয়েকে পিতৃস্নেহে নিজের কাছে আগলে রেখেছেন। নয় বছর ধরে দাদু উগ্রমোহন অনেক চেষ্টা করেছেন নাতিদের তাঁর কাছে এনে রাখতে, কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ তাঁর মেয়েদের দেননি। তবে শক্তির জোরের কাছে হার মেনে শেষে উগ্রমোহনকে দিতে বাধ্য হন তিনি। উগ্রমোহনকে কখনো তিনি আপন ভেবে মনে জায়গা দিতে পারেননি। তাঁর জীবনের প্রধান সুর, কারো কাছে কখনো খাটো হবেন না, চিরকাল তিনি মাথা উঁচু করে থাকবেন। তাঁর ছিল দারিদ্র্যের দম্ভ, এ দম্ভের কারণে তিনি বহ্নিকুমারীকে ভালোবেসেও কাছে রাখতে পারেননি। প্রধান চারটি চরিত্রকে ঘিরে অঘোরবাবু, গোলক সা, রামপ্রতাপ চৌবে, বিশ্বাস মশায়, মৃন্ময় ঠাকুর, কমলাক্ষবাবু, রাধিকামোহন, বৃন্দাবন মোদক, মল্লিনাথ পাড়ে, মানিক মণ্ডল, দেওয়ানজি, মিশিরজি, অক্ষয়, রুমনি-ঝুমনি, অজয়-বিজয় – অপ্রধান চরিত্রগুলো মূল কাহিনিকে এগিয়ে নিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।

উপন্যাসের আঙ্গিক বিচারে স্থানগত এবং কালগত ঐক্য বিচার্য বিষয়। এ উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯৩৭ সাল, ওই সময়ের কাহিনির স্থান এবং কালগত ঐক্য রক্ষিত হয়েছে বলা যায়। ব্রিটিশশাসিত ভারতে তখন জমিদারি প্রথা প্রচলিত ছিল। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয় ১৯৫৩ সালের দিকে। উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে লক্ষ করলে বোঝা যায়, এর কাহিনি উত্তরবিহারের। সেখানে বাঙালি ও বিহারিদের বসবাস থাকায় দুই রকম ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। *ভুবন সোম* উপন্যাসে এরূপ ভাষার ব্যবহার রয়েছে। *ভুবন সোম*-এর কাহিনিও বিহার অঞ্চলের। উপন্যাসটিতে চল্লিশ/একচল্লিশ দিনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। এরই মধ্যে নয় বছর আগের ঘটনারও ইঙ্গিত দেয়া আছে উগ্রমোহনের নাতিদের সম্পর্কে। দিনের প্রতিটি সময়ের উল্লেখ করে কাহিনি ধারা বিস্তৃত হয়েছে। শীতকালের ঊষা, সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত–প্রতিটি সময়ের বিন্যাসে লেখক সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন:

(ক) শীতের নির্মেঘ আকাশে অগণ্য নক্ষত্র। ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ তীব্র বাতাস বহিতেছে। দৃঢ় বজ্রমুষ্ঠিতে উগ্রমোহন অশ্বের বলগা ধরিয়া বসিয়া আছেন। (পৃ. ৩৩৭) সেদিন সকাল হইতে বাদল নামিয়াছে। সূর্যের দেখা নাই। সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। পথে লোকজন নাই বলিলেই হয়। (প্রাগুক্ত)

(খ) পশ্চিম দিগন্তে মহাসমারোহে সূর্য অস্ত যাইতেছে। ছোট, বড়, কালো, সাদা, স্তর, স্তূপ–সকল প্রকার মেঘেই অস্তগামী সূর্যের দীপ্ত প্রভাব। কেহই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না। অস্তগামী রবির আলোক-সমুদ্রে যেন তাহারাছোট ছোট দ্বীপ। বিভিন্ন ভঙ্গিতে সকলেই যেন এই বিরাট দৃশ্যকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। অস্তালোকচ্ছটার বিচিত্র অভিব্যক্তির ঐক্যতানে চরাচর সম্মোহিত। প্রান্তর-লক্ষ্মী ক্ষুদ্র নদীটিও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছে। তাহার ঊর্মি শিহরিত বক্ষেও এই শাশ্বত স্বপ্নের ক্ষণিক উৎসব। তরঙ্গে তরঙ্গে অবর্ণনীয় বর্ণ-বিন্যাস। সে যেন চঞ্চল গতি-বেগকেক্ষণিকের জন্য সংহত করিয়া অস্তগামী সূর্যকে বর্ণ-অভিনন্দন জানাইতে ব্যগ্র। (পৃ. ৩৩৫)

(গ) আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন – চাঁদ অস্ত যাইতেছে। স্বাতী পাশটিতেই আছে। পরদিন প্রভাতে ভৃত্য ব্রজলাল প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করিতে আসিয়াদেখিল যে উগ্রমোহন অঘোরে ঘুমাইতেছেন এবং তাঁহার শয্যাপার্শ্বে একটি ভাঙা এস্রাজ রহিয়াছে। (পৃ. ৩৫৫)

(ঘ) বেলা প্রায় দশটার সময় উগ্রমোহন সিংহ বহির্বাটিতে আসিয়া বসিলেন। মন বেশ প্রসন্ন। দুইজন প্রজার খাজনা মাপ করিয়াছেন। (পৃ. ৩৫৫)

(ঙ) সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইতেছে। সমস্ত বন পূর্ণ করিয়া ঝিল্লি-ধ্বনি। দুই একটা নিশাচর পাখির ডাক–তীব্র তীক্ষ্ণশব্দে অন্ধকারকে যেন চিরিয়া ফেলিতেছে। ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্রটি শিরীষ গাছের মাথার উপর দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি অগ্নিকুণ্ড। তাহার চতুর্দিকে কয়েকজন সিপাহি বসিয়া অগ্নি সেবা করিতেছে। অঘোরবাবু নিজ ঘরে বসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেছেন–রুমনি-ঝুমনি নিদ্রামগ্ন। (পৃ. ৩৬৭)

সন্ধ্যা প্রকৃতির মুগ্ধকর চিত্র উগ্রমোহন সিংহ একাগ্রচিত্তে অবলোকন করছিলেন। পরিবেশের যথাযথ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে লেখক তা তুলে এনেছেন –

উগ্রমোহন সিংহ বাহিনি নদীর উপর বজরার ছাদে বসিয়া পশ্চিম দিগন্তের দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। সূর্য অস্ত যাইতেছে। অস্ত রবির কিরণে বন্য স্রোতস্বিনী বাহিনী অপূর্ব শোভায় সাজিয়াছে। নদীর জলে একদল চক্রবাক ভাসিতেছিল। তাহাদেরগৈরিক অঙ্গে, বাহিনী-তীরবর্তী শীতরিক্ত বনশ্রীর পর্ণ-পল্লবে অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণারুণরাগ স্বপ্নলোক সৃজন করিয়াছিল। (পৃ. ৩৮০)

উগ্রমোহনের অশ্ব যখন গ্রামে প্রবেশ করিল তখন গ্রাম নিসুপ্ত। গ্রামের ভিতর কতগুলি কুকুর অকারণে চিৎকার করিতেছে। একদলশৃগাল ডাকিতে ডাকিতে হঠাৎ একযোগে চুপ করিয়া গেল। তারার আলোয় গ্রাম প্রান্তরেরতালগাছগুলি রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। কর্কশরবে ডাকিতে ডাকিতে একটা পেচক উড়িয়া গেল–রাত্রির অন্ধকার ঘনতর হইয়া উঠিল। (পৃ. ৩৭৩)

চন্দ্রকান্তের প্রহরীর সাথে উগ্রমোহনের হিন্দি ভাষায় আলাপ:

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন–"চন্দ্রকান্ত কোথায়"

"বাবু সাব আভি বাহার নিকলে হে!"

"সওয়ারি পর?"

"জি নেহি। পয়দল!"

"হামারা সেলাম কহ দেনা–"

"জি হুজুর" (পৃ. ৩৭৩)

লেখকের **জীবনদর্শন** চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে –

"পৃথিবীতে কিছুরই কোনও অর্থ নাই।" (পৃ.৩৭০)

"মানুষের মতামত কখন কোন কারণে যে কি করিয়া বদলায় তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।" (পৃ. ৩৮৮)

প্রবাদ:" ধরি মাছ না ছুঁই পানি।" (পৃ. ৩৮২)

"আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর।"(পৃ. ৩৫৮)

"তুমি যাও ডালে ডালে, আমি যাই পাতায় পাতায়।" (পৃ. ৩৬৮)

"কিসে আর কিসে, সোনা আর সীসে।" (পৃ. ৩৭৮)

উপমা: "সুদূর আকাশে শুভ্র বকের সারি উড়িয়া চলিয়াছে–যেন সন্ধ্যার কুন্তলে শ্বেত-পুষ্পের একগাছি মালা।" (পৃ. ৩৮০)

গাছকে মানুষের সাথে তুলনা করে লেখকের অসাধারণ উপমা –

"প্রকাণ্ড একটা বৃদ্ধ বৃক্ষের উপর একটা দুঃসাহসিনী পরগাছা লতা উঠিয়া স্তবকে স্তবকে সুন্দর ফুল ফুটাইয়া হাসিতেছে–যেনবৃদ্ধ ঠাকুরদাদার কাঁধে চাপিয়া অলঙ্কৃতা নাতনি আবদার জুড়িয়া দিয়াছে।"(পৃ. ৩৬০)

প্রকৃতির অসাধারণ বর্ণনা –

> শ্যামলতালেশহীন রুক্ষ চামা-প্রান্তরে সূর্য অস্ত যাইতেছে। চতুর্দিকে একটা নিষ্করুণ রক্তাভা। রক্তাম্বরধারী কাপালিকের মত চামা-প্রান্তর স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাহার নীরব উদ্ধত গাম্ভীর্যে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। অনুর্বর তাহার বক্ষে সবুজেরচিহ্নমাত্র নাই। বৃক্ষ নাই, গুল্ম নাই, তৃণদলও নাই। ছায়াবিহীন দীর্ঘ দিবস তাহার উপর দিয়া বহিয়াগিয়াছে। প্রখরসূর্যের তীব্রদাহে যুগযুগান্ত ধরিয়া চামা-প্রান্তর এইরূপ প্রতিদিন দগ্ধ হইতেছে। পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার কোমলতা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আছে শুধু এক বিশাল ব্যাপ্তি। যতদূর দৃষ্টি যায়–শেষ নাই। ঊষর প্রান্তর আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। মনে হয় যেন একটা অতৃপ্ত বুভুক্ষা মূর্তি ধরিয়াছে। (পৃ. ৪০২)

গান: চরিত্রের মনের অবস্থা বোঝাতে এবং বিরাজমান পরিস্থিতি থেকে কিছু সময় পরিত্রাণ পেতে চরিত্রের মুখে লেখক গান আরোপ করেছেন। চন্দ্রকান্ত যখন নিজেকে ভীষণ একাকী ভাবেন, অতীত স্মৃতিতে ফিরে যান, তাঁর ক্ষুধিত আত্মা অতীত জীবনের সুজাতা, কমলাকে খুঁজে ফেরেন সে-মুহূর্তে তাঁর মনের মধ্যে বেহাগের পদ বেঁজে উঠে –

> শ্যাম মোরি আঁখন বীচ সমায় রহো
>
> লোগ জানে কজরারে! (পৃ. ৩৮৫)

চন্দ্রকান্তের গানবাজনা আর ভালো লাগছে না। উগ্রমোহন না থাকায় দীর্ঘ সময় দাবা খেলা বন্ধ আছে। নিঃসঙ্গ চন্দ্রকান্ত নদীর ধারে বেড়াচ্ছেন। এসময় ডিঙ্গি নৌকা থেকে চিরন্তন বিরহের গান ভেসে আসে। এ গান চন্দ্রকান্তের মনের অবস্থাকেই প্রতিভাত করেছে –

> আখি রাতি রে পাপিহারা
>
> পিয়া পিয়া বোলে–!
>
> পিয়া পিয়া বোলেরে পিয়া
>
> পিয়া গিয়া বিদেশে
>
> কৈ সে ভঁজু রে সন্দেশ! (পৃ. ৩৮৬)

উগ্রমোহনের বাহার গাভীটিকে চন্দ্রকান্ত নিখোঁজ করে আবার তাঁকেই বাহার রাগ শুনিয়ে দেন। আর উপহাস করে তাঁকে বলেন, বাহার গাভী হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে কিন্তু বাহার সুর একবার আয়ত্ত করলে তা পালিয়ে যাবে না।

ভাষা:উপন্যাসে ভাষার সাধু ও চলিত দুই রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। লেখক সাধু রীতিতে বলেছেন এবং চরিত্রদের মুখে ভাষার চলিতরূপ দিয়েছেন। তাছাড়া ফারসি শব্দ (বালাপোশ, বয়েৎ) এবং ফারসি কবিতাও রয়েছে। দশ বৎসর আগে চন্দ্রকান্ত তাঁর প্রেয়সী রেশমকে প্রেমপত্র লিখেছেন। প্রেমপত্রে তিনি সম্রাট শাহজাহানের লেখা একটি ফারসি বয়েৎও দিয়েছেন –

আগর বে খবর-ম্ জুদ্ দও আয়ি, চে শাওয়াদ?

মানন্দ্-এ নছীম্ এ সহর আয়ি, চে শাওয়াদ?

হর চন্দ্র কে বু-এ-গুল জে গুল আয়েদ পেশ

আর গুল তু জে-বু পেশতর, আয়ি, চে শাওয়াদ? (পৃ. ৩৫৪)

পাখির ডাক: বনফুলের অনেক উপন্যাসে বিভিন্ন পাখির প্রসঙ্গ থাকে যা তাঁর লেখার সহজাত একটি অনুষঙ্গ। আর পাখি নিয়ে তো তাঁর *ডানা* উপন্যাসই রয়েছে। লেখকের পাখি বিষয়ে অভিজ্ঞতা থেকেই নানারকম পাখির ডাক এবং তাদের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। পাখির ডাক অনেক সময় অনেক কিছুর ইঙ্গিতবাহী। বহ্নিকুমারী গভীর রাতে যমঘরে যাওয়ার সময় টিট্রিভ পাখির ডাক (টি ট্টি হি–টি ট্টি হি–টি ট্টি হি) তাকে ভুল পথে আসার এবং সঠিক পথ অনুসরণ করার কথা যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। তেমনি রুমনি-ঝুমনির খেলার সময় তিতির পাখি ডেকে ওঠে।

স্বপ্ন: গঙ্গাগোবিন্দের বাস্তব জগতে স্বপ্ন প্রভাব ফেলেছে। তাঁর মেয়ে রুমনি-ঝুমনির বিয়ে দিতে রাজি ছিলেন না তিনি। কিন্তু রানি বহ্নিকুমারীকে স্বপ্ন দেখার পর তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। চন্দ্রকান্তের কাছে গিয়ে মেয়েদের বিয়ে দিতে তাঁর সম্মতির কথা জানান এবং পাত্র অজয়-বিজয়কে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন।

জমিদার উগ্রমোহনের উগ্র কাজের খেসারত হিসেবে স্ত্রী বহ্নিকুমারীকে প্রাণ দিতে হয়। উগ্রমোহন স্ত্রীকে ভালোবাসতেন। তাই বহ্নিকুমারী মারা যাওয়ার পর দাবা খেলায় আগের মতো মন দিতে পারেননি। খেলার মাঝে মাঝে চন্দ্রকান্তের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর আগের সে উগ্রতা আর নেই। পরাক্রমশালী সামন্তবাদী জমিদারের

বীর বিক্রম যেন পরাভূত হলো।

১.২

ভুবন সোম একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ষাটোর্ধ্ব নিঃসঙ্গ মানুষের জীবনের গল্প। ডিউটি ফার্স্ট সেলফ লাস্ট – এ মোটো নিয়ে চলেন তিনি। তাই জীবনে অভাব-অনটন, কটূক্তি, অবহেলা, কোনো কিছুই তাঁকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি।

তাঁর একদিনের পাখি শিকারের গল্প *ভুবন সোম* উপন্যাসের কাহিনি। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব, বোন, বোন-জামাই, নাতি-নাতনী সবার কথা স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে উঠে আসে। জাহাজ থেকে নামার পর রয়েছে তাঁর শিকার যাত্রা এবং শিকারের বর্ণনা। শিকারে এসে তাঁর সাথে অনেক মানুষের পরিচয় হয় যারা তাঁকে আতিথেয়তায় গ্রহণ করেছিল। উপন্যাসের আখ্যান ভাগ সাত পরিচ্ছেদে বিভক্ত। পরিচ্ছেদে কোনো নাম নেই, কেবল সংখ্যা দিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে। তিন, চার, পাঁচ – এই তিনটি পরিচ্ছেদ এক, দুই এবং ছয় পরিচ্ছেদ থেকে আকারে বড়। পরিচ্ছেদের দৈর্ঘ্যের সমতা রক্ষা না হলেও কাহিনির ভাবধারা বজায় ছিল। প্রতিটি পরিচ্ছেদেই ভুবন সোমের স্মৃতি বিজড়িত কথা রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে অনিল তার দূর-সম্পর্কের কিন্তু অনেক ঘনিষ্ঠ কাকা ভুবন সোমকে রিসিভ করতে জাহাজ ঘাটে আসে। জাহাজ খুব লেট হবে তাই অনিল সখীচাঁদের কোয়ার্টারে গিয়ে দাবা খেলে সময় পার করে। এ সখীচাঁদ ভুবন সোমের পূর্ব পরিচিত যার বিরুদ্ধে ঘুষ নেয়ার অপরাধে রিপোর্ট তৈরি করে রেখেছেন ভুবন সোম। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে ভুবন সোমের পারিবারিক জীবনের কথা যেখানে দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিঘ্ন ও জীবনের সংগ্রামের কথা আছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভুবন সোম অনিলের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। সেখানে শিকারের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ওইদিন রাত তিনটায় অনিলের বাড়ি থেকে মোষের গাড়িতে করে শিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। যাত্রা পথে বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে পরিশ্রান্ত হয়ে গঙ্গার উদ্দেশ্যে অনেক দূর পথ পায়ে হেঁটে চলছেন ভুবন সোম। এরইমধ্যে তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে ভুট্টা, ভাগিয়া, ভিখন, চতুর্ভুজ গোপ, ক্ষেতে কর্মরত কয়েকজন মজুরের। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ভুবন সোমের সাথে বিদিয়ার দেখা হয় যার সাথে ঘুষখোর সখীচাঁদের বিয়ে হয়েছে। পরিচয় হয় বিদিয়ার বাবা চতুর্ভুজের সাথে। তাদের আতিথেয়তা গ্রহণ এবং সর্বোপরি শিকারে সাহায্য করা এবং অবশেষে পাখি শিকার। পাখিটির বাঁধন কেটে দিয়ে তাকে তার সঙ্গিনীর কাছে ফিরিয়ে দেয়া। এ পরিচ্ছেদে ভুবন সোমের চিন্তায় অভ্যাসগত পরিবর্তন সাধন করেছেন লেখক। ভুবন সোমের মতো মানুষদের স্বভাবে এতো দ্রুত পরিবর্তন সাধারণত হয় না। এ ক্ষেত্রে লেখক স্বতন্ত্র্য টেকনিক অবলম্বন করেছেন। নাতনির গাওয়া 'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে' রবীন্দ্রসংগীতটি ভুবন সোমকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে মজুর শ্রেণির মানুষদের সাথে মিশে যেতে সহজ করে দিয়েছেন। শিকারে এসে ভুবন সোমের প্রাণ সংশয়ের মতো ঘটনাও ঘটেছে। এত কষ্টের বিনিময়ে এবং বাজিতে হার মেনে যে পাখিটি শিকার করেছেন, সেটি তিনি ছেড়ে দেন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে পাখি শিকারে বিদিয়ার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন ও সফলতায় পৌঁছানো এবং তার শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার ব্যাকুলতার কথা মনে পড়ায় তিনি সখীচাঁদকে মাফ করে দেন। তামা তুলসীগঙ্গাজলে শপথ করিয়ে ছেড়ে দেন। কিন্তু কাহিনির শেষ অংশে লেখক পাঠকের জন্য চমক রেখেছেন। ঘুষ না নেয়ার শপথ করেও ঘুষ নেয়ার লোভ ছাড়তে পারেনি সখীচাঁদ। সে নতুন স্টেশনে বদলি হয়ে বউকে চিঠি লিখেছে– "ওটা খুব ভালো স্টেশন। অনেক উপরি–।" (বনফুল, ২০১৩: ৬৪৪)

অন্তর্বেদনায় জর্জরিত ভুবনসোম চরিত্রটি অনেক মানসিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। সময়ের প্রয়োজনে জীবনের সবরকম পরিবর্তনকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছেন ভুবন সোম। ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, সংস্কার-কুসংস্কার সবকিছু মিলে একটি দ্বন্দ্বাত্মক বিন্যাসেই একটি পরিপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি হয়। তাই ভুবন সোম একটি সার্থক চরিত্র হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের ভাষাগত অবয়ব সৃষ্টি আঙ্গিক বিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। উপন্যাসের বর্ণনা, পরিচর্যা, চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয়ে যথাযথ ভাষা প্রয়োগ ঔপন্যাসিকের স্বাভাবিক প্রবণতা। স্থান ও কাল অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ ঔপন্যাসিকের বিশিষ্টতার পরিচায়ক। উপন্যাসের "এই প্লটটুকু বিকশিত হয়েছে সাহেবগঞ্জ, মণিহারী, দিলারপুর, বাঘারবিল, কাটাহা, ফাসিয়াতলা এর মতো অঞ্চলে...।"(প্রশান্তকুমার. ২০০০: ১০৩) বনফুল এসব অঞ্চলের মানুষদের সাথে মিশতে যেসব ভাষা ব্যবহার করেছেন। ভুবন সোমের বেলায়ও ত-ই দিয়েছেন। ভুবন সোম তাদেও সাথে হয় বাংলায় না হয় ইংরেজিতে কথা বলেছেন। যারা বাংলা, ইংরেজি কিছুই বোঝে না তাদের সাথে তিনি ভাঙা ভুল হিন্দি বলেই কাজ চালিয়ে গেছেন। তবে বিদিয়া বাংলায় কথা বলেছেন ভুবন সোমের সাথে। দুর্ঘটনা রোধে মোষের গাড়ির গতিবেগ স্বাভাবিক রাখতে ভুবন সোম কৌশলে ভুট্টার সাথে ভাঙা হিন্দিতে কথা বলেছেন –

'কোন খানা তুমরা পসিন হ্যায়?

'বুটরো সাততু।'

'বুটের ছাতু? হামার ভি পসিন্ হ্যায়। 'ভুট্টা ঘাড় ফিরিয়ে হাসল।

'গুড় দেকে, না, তেল মিরচাইন দেকে?'

'যো কুছু হোয় সবহি আচ্ছা।'

'ভাত ভালোবাসতা হ্যায়, না রোটি?'

'রোটি।'

'আর তরকারি?'

'করেলা।'

উচ্ছে দিয়ে রুটি খেতে কেমন লাগে! আশ্চর্য রুচি তো!

'আলু পরবল?'

'হ্যাঁ, উসব ভি কুছ কুছ। মগর করেলারো ছোকা পেয়াজরো সাথ, বড়ি আচ্ছ ছে।' (পৃ. ৬০৫)

উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষার দিক থেকে বলা যায়, বাঙালি ও বিহারিদের বসবাস থাকায় দুই রকম ভাষার ব্যবহার করেছেন লেখক। *ভুবন সোম* উপন্যাসে এরূপ ভাষার ব্যবহার রয়েছে। চরিত্রদের মুখে ভাষার ব্যবহার স্থান ও কালের ঐক্য বজায় রেখেছে।

ভুবন সোমের একদিনের শিকারের ঘটনার পাশাপাশি উঠে এসেছে তার বিগত জীবনের কথা। ভুবন সোমের বয়সকাল পর্যন্ত সময়ের সব ঘটনাই পাঠক জানতে পারে। তাছাড়া উপন্যাসে ঘটমান বর্তমান কালের উল্লেখ আছে। ভুবন সোম ও অনিলের কথোপকথনে বর্ষকালের কথা বলা আছে:

'বর্ষাকালে মোষের গাড়ি ছাড়া চলে না। এখানকার রাস্তা যা খারাপ, বর্ষাকালে গরুতে টানতে পারে না। এখানকার রাস্তাঘাট ভালো হয়ে যাবে শুনছি মোটরেবল রোড হবে নাকি–সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা দিচ্ছে–'

নাম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা উপন্যাসটিতে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন উপন্যাসকে অলংকারসমৃদ্ধ করেছে –
(ক)'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।'

(খ) 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।'

২.২

মহারাণী আখ্যান পরিকল্পনা সাত পরিচ্ছেদে গঠিত হয়েছে। উপন্যাসে 'পরিচ্ছেদ' শব্দ নেই, ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য পরিচ্ছেদ শব্দটি রাখা হলো। প্রথম পরিচ্ছেদে, শ্রীহর্ষেও জরুরি তলব পড়েছে মহারাণীর মহলে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, সিপাহি বিদ্রোহীদের কথা, বিদ্রোহীদের সাথে ইংরেজদের সম্পর্কের কথা। ইংরেজদের সাথে মহারাণীর বাবা সমুদ্রবিলাসের সখ্যের কথা। সিপাহি বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেয়ায় প্রজা বিশ্বদেব শর্মার ওপর সমুদ্রবিলাসের অত্যাচারের কথা এবং নির্যাতনের ফলস্বরূপ সমুদ্রবিলাসকে নির্বংশ হওয়ার শাপ দেয়া। শ্রীহর্ষের সাথে মহারাণীর বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে যাওয়ায় শ্রীহর্ষের ওপর মহারাণীর অভিমান ও জেদ চড়ে যাওয়া। মহারাণীর বিয়ে নিয়ে জটিলতা; বাবা সমুদ্রবিলাসের এবং কাকা পর্বতবিলাসের মৃত্যু এবং মহারাণীর সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া; মহারাণীর অদ্ভুত ধরনের পশুপ্রীতির কথা জানতে পারা; জমিদারি পরিচালনায় মহারাণীর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া; নানাসাহেবের আগমনের আগাম খবর; তৃতীয় পরিচ্ছেদে, বিশ্বদেব শর্মার ছোট ছেলে ডাকাত সর্দার শঙ্করদেবের চিঠির কথা শ্রীহর্ষকে জানানো, শঙ্করদেব ওরফে উদয়প্রতাপকে মোকাবিলা করতে মহারাণীর পরিকল্পনার কথা শ্রীহর্ষকে জানানো এবং তাঁকে রাজি করানো; নানাসাহেবকে লুকিয়ে রাখা এবং তাঁর

জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা, নানাসাহেবের বিদ্রোহের কথা শোনা এবং তাঁকে পালানোর কৌশলের কথা জানানো; চতুর্থ পরিচ্ছেদে, পরিকল্পনামতো মহা আয়োজন করে নানাসাহেবকে বাড়ি থেকে নির্বিঘ্নে পালাতে সাহায্য করা; পঞ্চম পরিচ্ছেদে, উদয়প্রতাপকে জব্দ করা;ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নানাসাহেবকে বাঁচাতে গিয়ে শ্রীহর্ষের স্ত্রীর শোচনীয় মৃত্যু; সপ্তম পরিচ্ছেদে মহারাণী তার অন্তরঙ্গ বন্ধু মহারাজ সিংহের ওপর চড়ে বেড়িয়ে পড়া এবং সবশেষে নিঃসঙ্গ শ্রীহর্ষের পায়ে মহারাণীর আত্মসমর্পণ।

সাতটি পরিচ্ছেদের মধ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ তুলনামূলকভাবে অনেক দীর্ঘ হয়েছে। এ পরিচ্ছেদে ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে প্রায় সব ঘটনাই উঠে এসেছে। এক, তিন, চার,পাঁচ, ছয় ও সাত পরিচ্ছেদের মধ্যে পরিমিতির সমঞ্জসতা রয়েছে। কিন্তু এতে করে গল্প রসের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

নানাসাহেব, সমুদ্রবিলাস, পর্বতবিলাস, মহারাণী, শ্রীহর্ষ, মহেন্দ্রনাথ, উদয়প্রতাপ, সর্বমঙ্গলা – প্রধান চরিত্রগুলোর জীবন মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ, সংস্কার-কুসংস্কার সবকিছুর রসায়নে সৃষ্টি করেছেন লেখক। ফলে প্রতিটি চরিত্রই সমগ্রতা লাভ করেছে এবং অনেকটা বাস্তবসম্মত হয়েছে। নানাসাহেব চরিত্রটি একটি যথার্থ বিদ্রোহী নেতারূপে চিত্রিত করেছেন লেখক। দেশের প্রতি তার ত্যাগ এবং মহারাণীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনায় তাঁর বিনয়, ধৈর্য এবং তেজোদীপ্ত দুর্বার সাহসিকতা মহারাণীকে অভিভূত করেছে। যার দরুন মহারাণী প্রাণ দিয়ে হলেও তাঁকে রক্ষা করার সংকল্প করেছে। মহারাণী ছোটবেলার খেলার সাথী শ্রীহর্ষের সাথে বিয়ে না হওয়ায় ভেতরে ভেতরে সে হৃদয় যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে। প্রতিটি ক্ষণ প্রতিটি মুহূর্ত শ্রীহর্ষের ভালোবাসার কাঙাল ছিল মহারাণী। প্রেমাস্পদকে কাছে পেতে মহারাণী বারবারই ডেকেছে তাকে, বলেছে, মেঘদূত পড়ে শোনাতে এবং অর্থ বুঝিয়ে দিতে। তার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিতে। শুধু তা-ই নয়, শ্রীহর্ষের আর্থিক সমস্যার সমাধান করেছে মহারাণী। শ্রীহর্ষের অশরীরী প্রেম ভর করেছে মহারাণীর ওপর। (বনফুল, ২০১৩/৯: ৯৯) শ্রীহর্ষও মহারাণীকে না পেয়ে হৃদয় বেদনায় কাতর হয়েছে। স্বামী সম্পর্কে সর্বমঙ্গলার আক্ষেপ করার মধ্য দিয়েই বিরহকাতর শ্রীহর্ষের মানসিক অবস্থা বোঝা যায় –

> শ্রীহর্ষকে পেয়ে সর্বমঙ্গলা সুখী হয় নি।...কাছে পেয়েও যেন পায় নি, সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে, অথচ ভয়ের কারণটা যে কি তা-ও জানে না। এমন দিনও নাকি গেছে যে শ্রীহর্ষ সমস্ত দিন একটি কথাও বলে নি তার সঙ্গে, পুঁথি নিয়ে ছাত্রদের নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।...রাত্রে কখন সে শুতে আসে সর্বমঙ্গলা টের পায় না সব সময়ে। আলাদা বিছানায় শোয় শ্রীহর্ষ। বলে একসঙ্গে শুলে তার নাকি ঘুম হয় না। খাওয়ার সময়ও অন্যমনস্ক থাকে সামনে যা দেওয়া যায় তাই খেয়ে নেয়।(পৃ. ৯৩-৯৪)

শ্রীহর্ষ ও সর্বমঙ্গলার ওপর মহারাণীর বিশেষ অনুগ্রহ থাকায় সর্বমঙ্গলার দিন অস্থিরতার মধ্য দিয়েই কেটেছে। শ্রীহর্ষের বিয়ের দেড় বছরের মাথায় মহারাণীর ডাকে সাড়া দিতে শ্রীহর্ষ সর্বমঙ্গলার অনুমতি চাইলে সে বলে "যাবে বই কি। ছেলেবেলার সই ডেকেছে, না গেলে কি চলে।...তাছাড়া আমার কেমন যেন ভয় ভয় করে ওকে।"(পৃ. ৭৭) এ বাক্যটিতেই সর্বমঙ্গলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। মহেন্দ্রনাথ চরিত্রটি জীবনে সহজে স্থির হতে পারেনি। মনের গহিন কোণে পুঞ্জীভূত হয়েছিল মহারাণীর প্রতি তার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। মহারাণীর অনুরোধে তার বিষয় সম্পত্তির ভার সে নিয়েছে। পর্দার আড়াল থেকে মহারাণীর সাথে বৈষয়িক সব কাজ করতে হয়েছে তাকে। মহারাণীর ভালোবাসা পেতে সে উৎসুক ছিল। না পেয়ে প্রতিমুহূর্তে সে দগ্ধ হয়েছে। শেষে মহারাণীকে না পেয়ে হৃদয় যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে ফিরে গেছে প্রণয়িনী বেদানার সন্ধানে। প্রধান তিন চরিত্রকে ঘিরে সমুদ্রবিলাস, পর্বতবিলাস, উদয়প্রতাপ, কিশোরীমোহন, বেদানা, রঞ্জাবতী, শৌরসেনী এসব অপ্রধান চরিত্রগুলো কাহিনির পরিণাম নির্দেশে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রতিটি চরিত্রই স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

উপন্যাসের মাঝে মাঝে লেখকের সরব উপস্থিতি কাহিনির গতি প্রকৃতি বুঝে উঠতে পাঠকের জন্য অনেক সহায়ক হয়। লেখকও পাঠকের ভাবনাকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে লেখক, পাঠক ও চরিত্ররা সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলে –

> (ক) সেদিন এ ঘটনাটি যদি না ঘটত তাহলে পরবর্তী ঘটনাগুলোর চেহারা বদলে যেত হয়তো। হয়তো মহারাণী মহেন্দ্রের সাহায্য চাইত, হয়তো মহেন্দ্রনাথের লাঠি সড়কি বন্দুকধারী বরকন্দাজের দল রৈ রৈ করে ছুটে আসত তাকে রক্ষা করতে। কিন্তু এ ঘটনার পর তা আর সম্ভবপর হল না। (পৃ. ৯৬)

> (খ) মহারাণীর পরিকল্পনায় কিন্তু একটি খুঁত ছিল। ছাদ-বাগানে বন্দিনী রঞ্জাবতীর সম্ভাব্য প্রতিশোধের কথাটা কল্পনায় আসেনি তার। একথাও তার মনে ছিল না যে ছাদের যে ঘরে রঞ্জাবতী আছে সে ঘর থেকে শিবমন্দিরের ভিতর পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। শিবমন্দিরে যে একজন অচেনা লোক এসে ঢুকেছে এটা রঞ্জাবতীও দেখতে পেয়েছিল রাত্রে। (পৃ. ১০৩)

সংলাপ উপন্যাসের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপে উঠে আসে তৎকালীন সময় ও স্থানের বিষয়টি। একটি চরিত্রের ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে তার সংলাপের ওপর। সংলাপের মাধ্যমেই চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বুঝে উঠতে পারে পাঠক। সর্বমঙ্গলার শেষকৃত্য করে এসে শ্রীহর্ষ বারান্দায় বসে ভাবছে– "দ্রুত লয়ে কি অদ্ভুত ঘটনা পরম্পরা ঘটে গেল একদিনের মধ্যে। সমস্ত জীবনটাই যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। আবার যেন সব নতুন করে আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু আরম্ভ করা যাবে কি? মহারাণী বাল্যকাল থেকে তার জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে। সে-ও কোথা চলে গেল।" (পৃ. ১২৩) নানাসাহেব মহারাণীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার পর মহারাণী তাঁকে বলে–"যদি প্রয়োজন হয় প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব আপনাকে।" (পৃ. ১০০-১০১) এখানে মহারাণীর দেশপ্রেমের বিষয়টি

বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আবার নানাসাহেবের আরেক কথার জবাবে সে বলে, নানাসাহেবের দেশের মেয়ে সে–এর চেয়ে বড় পরিচয় তার আর কিছু নেই। মহারাণীকে বিয়ে করতে আসা উদয়প্রতাপ নানাসাহেবকে নিয়ে যখন মহারাণীকে বলে তার ম্যানেজার কিশোরীমোহন কালেক্টার সাহেবকে খবর দিয়েছে মহেন্দ্রনাথ এবং মহারাণী তারা নানাসাহেবকে লুকিয়ে রেখেছে। আর এ কারণে পুলিশ ফৌজ মহারাণীর বাড়িতে হানা দেবে। উদয়প্রতাপ আরো জানায়, কিশোরীমোহনের মুণ্ডটা একটি পিতলের হাঁড়িতে করে পুরে এনেছে মহারাণীকে উপহার দেবে বলে–উদয়প্রতাপের এ সংলাপের মধ্যে নিহিত আছে তার জটিল মনস্তত্ত্ব।

উপন্যাসের আঙ্গিক বিচারের উল্লেখযোগ্য দিক হলো সময়ের যথাযথ ব্যবহার। ঘটনা এবং চরিত্রগুলো তাদের স্থান ও কালগত ঐক্য বজায় রেখেছে। কাহিনিতে বর্ষাকালের প্রকৃতির কথা রয়েছে: "তখন বর্ষাকাল। দুপুরেও রাত্রির মায়া নেমেছে আকাশে থমথম করছে মেঘ, স্নিগ্ধ কোমল হয়ে এসেছে সূর্যালোক, অঞ্জন পরেছে আকাশ বাতাস।" (পৃ. ৫৬) সময়ের পরিধি অনেক ব্যাপক– সিপাহি বিদ্রোহের প্রসঙ্গ এবং ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মহারাণীর মধ্যে রয়েছে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উপমা ব্যবহারে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীহর্ষ বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে কিছুদিন পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে মহারাণীর কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে, ওই অবস্থায় মহারাণীর অভিব্যক্তি বোঝাতে অসাধারণ উপমা দিয়েছেন লেখক –"কোনও শ্বাপদ যেন লোলুপ দৃষ্টিতে শিকারের দিকে চেয়ে আছে।"(পৃ. ৬২) মহারাণী তাকে বলে তার ভালোবাসার রূপ সর্বগ্রাসী। তার বিয়ে হলে সে কেবল শ্রীহর্ষকেই নিয়েই তার ভবিষ্যৎ স্বর্গ রচনা করতে চাইবে যেখানে পরিবারের আপনজনেরা বঞ্চিত হবে। তাই সেও শ্রীহর্ষকে ফিরিয়ে দেয় অনেকটা অপমানের প্রতিশোধস্বরূপ। নাম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা উপন্যাসে ইতিহাসের মোড়কে আশ্রিত জীবন কথায় লেখকের জ্ঞান ও দক্ষতার পরিচয় রয়েছে।

২.৩

সন্ধিপূজা উপন্যাসেও লেখক ইতিহাসকে আশ্রয় করে জীবন-কথাকে রূপায়িত করেছেন। এখানে ধূর্জটিমঙ্গলের পারিবারিক বিপর্যয়ের কথা উঠে এসেছে। এর প্লট বিন্যাস্ত হয়েছে সতেরটি (সংখ্যাক্রম অনুযায়ী) পরিচ্ছেদে। প্লট বিন্যাসে লেখকের শিথিলতা দৃষ্টিগ্রাহ্য। সাত নং পরিচ্ছেদের শুরুতেও পরোক্ষভাবে পাঠককে সম্বোধন করে বলার ধরণটিতে বিশেষ করে মীর মহম্মদের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয়টি ইঙ্গিতাবহ। কোনো কোনো

পরিচ্ছেদ বিস্তৃত হয়েছে অনেক ঘটনার সমন্বয়ে আবার কোনো পরিচ্ছেদ একটি ঘটনা বর্ণনায় শেষ হয়েছে। যেমন, তেরো নং পরিচ্ছেদের কথাই ধরা যাক। সেখানে পাঠককে থামিয়ে দিয়ে সচেতন করে তোলে ইতিহাসে অনুল্লিখিত ঘটনাটির বর্ণনা দেয়া হয়। একই ইতিহাসের মোড়কে বিবৃত এ কাহিনিতে লৌকিক সংস্কার-কুসংস্কার, মিথ–এসব প্রসঙ্গের অবতারণা পাঠককে ইতিহাসের আবহ থেকে কিছু সময় দূরে সরিয়ে রাখে। যেমন, রঙ্কিণী মন্দিরের সেবক ঝামরির স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে শিশুবলির ঘটনা। ঝকমারিকে নিয়ে উদ্ভট ক্ষমতার যেসব কল্পনা দৃশ্য রয়েছে সেসবের মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রের কথা উঠে এলেও সেগুলো কাহিনির সাথে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে এসে জুড়ে বসেছে। সেসব চরিত্রের ক্রিয়াকলাপের সাথে ঝকমারি স্বয়ং নিজেকে প্রতিস্থাপন করেছেন অনেকটা অসম্ভব ক্ষমতার জোরে। কাহিনির মাঝে মাঝে লেখক পাঠকের সাথে কথা বলেন। এতে করে কাহিনি পাঠে লেখকের সাথে সংযোগ স্থাপনেরএ প্রক্রিয়াটি পাঠকের মনোযোগকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। কাহিনির মাঝে মাঝে ফ্ল্যাশব্যাক রীতির ব্যবহারে অতীত ইতিহাস নিয়ে আসাতে প্রবহমানতায় বিঘ্ন ঘটেছে। তবে যারা লেখকের উপন্যাস পড়ে এর কলাকৌশলের ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তাদের বেলায় এটি ততটা হ্যাম্পার হবে না।

অসংখ্য ঐতিহাসিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে উপন্যাসটিতে। প্রধান চরিত্র ধূর্জটিমঙ্গল, নীলু রায়, মধু সামন্ত, ধলরাজা, কংস, জগদ্ধাত্রী, লুৎফুন্নিসা, ঝকমারি, বাহারি; ঐতিহাসিক চরিত্র আলিবর্দি, শাহজাহান, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর, মীরন, শওকৎজঙ্গ, উমিচাঁদ, মীর মুহম্মদ, মীর মদন, মোহনলাল, মানিকচাঁদ, ইয়ার লতিফ খাঁ, রায় দুর্লভ, জগন্নাথ পাড়ে, আসফ আলি খাঁ,উজির আহম্মদ; ইংরেজি ঐতিহাসিক চরিত্র মিস্টার জন, লর্ড ক্লাইভ, ওয়াটসন, ওয়ারেন হেস্টিংস, দানিয়ের – এসব চরিত্র গতিশীল রেখে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অপ্রধান চরিত্রগুলো। অর্থাৎ মৈনি বিবি, ফৈজু বিবি, ঝামরি, তির্কি, রোমনি শাওনি মূল ধারার সাথে সংগতি বজায় রেখেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র ধূর্জটিমঙ্গলের কোনো পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধে লড়ার কোনো ঘটনা নেই। রয়েছে কেবল তার পারিবারিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার ঘটনার বর্ণনা। ঘটনার পরতে পরতে কখনো আলোচনায় কখনো স্মৃতিতে ঐতিহাসিক খণ্ড খণ্ড ঘটনাগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন পাঠক। জগদ্ধাত্রী, ঝকমারি ও বারাহি – এদের জীবনে সমসাময়িক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত আঘাত হেনেছে বেশি। দুঃখের আগুনে পুড়ে জয়ী হয়েছে তারা। তৎকালীন সমাজে নারীদের যথাযথ মর্যাদা দেয়া হতো না, তাদের সামাজিক মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা হতো না। তাই ঝকমারি পুরুষের সাজ নিয়ে চলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছে। প্রতিশোধের আগুন নেভাতে সে আসফ আলি খাঁকে হত্যা করে। বারাহি দেবর কংসকে বধ করার সংকল্প করে। জগদ্ধাত্রী নীলু রায়ের কাছ থেকে যখন শুলেন নবাববাহাদুর কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তখন তিনি স্বামীহীন জীবনে

নিরাপত্তার অভাববোধ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি একটি দা এনে নীলু রায়কে দিয়ে বলেন, তাঁকে হত্যা করতে। তিনি আরো বলেন–

> এ দেশে মেয়ে মানুষ হয়ে বাঁচবার আর ইচ্ছে নেই আমার। এ দেশে একদিকে মুসলমান অন্যদিকে ইংরেজ। যে সমাজে বাস করি সে সমাজের পুরুষরা নিষ্ঠুর, ভীতু, অমানুষ। তারা গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করে কিন্তু স্ত্রীদের রক্ষা করতে পারে না। স্ত্রীদের দিকে ফিরেও চায় না। তারা নিজেদের নিয়েই মত্ত। (পৃ. ১০০)

পুরুষ জাতি সম্পর্কে বারাহিরও একই অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে যখন ঝকমারি আসফ আলি খাঁকে হত্যা করার কথা জানায় এবং দিবাস্বপ্ন দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে বিড়বিড় করে কিছু বলে কিন্তু তাহার অর্থ কেউ বুঝতে পারে না। তখন বারাহিরও মাথা খারাপ হয়ে যায়। পুরুষ জাতির প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং ক্ষোভ থেকে সেও চিৎকার করে বলে ওঠে–"মর মর মর, মরে শান্তি পা। এদেশে মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মালে আর নিস্তার নেই। মরতেই হবে। আমি মরব। কিন্তু কংসকে মেরে তারপর মরব।" (পৃ. ১৩৯)

নাম পুরুষের দৃষ্টিকোণে লেখা উপন্যাসটির চরিত্রদের মুখে লেখক ভাষার চলতিরূপ এবং কাহিনি বিবৃতিতে লেখক সাধুরূপ ব্যবহার করেছেন। স্থান-কাল অনুযায়ী লেখক চরিত্রের মুখে ভাষা দিয়েছেন, তবে সব ক্ষেত্রে তা রক্ষিত হয়নি। চরিত্রদের মুখে বহুরকম ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, জন সাহেবের সাথে থাকা তিন ওরাওঁ যুবতী তির্কি, শাওনি ও রোমনি – এরা ওরাওঁ ভাষায় কথা বলেছে। কিন্তু উপন্যাসের সর্বত্র তারা ওরাওঁ ভাষায় কথা বলেনি। কাহিনির শুরুতে তাদের মুখে ওরাওঁ ভাষা ছিল, তবে শেষের দিকে তা আর থাকেনি। "উটাকে এখানে আনা করা তাহলে। উ বলছে খাল পেরাতে লারবেক।" "এখুনি আনা করাচ্ছি। ফট্। তালতা ও তালতা শুনে যা–"। (পৃ. ১১০) উপন্যাসে মধু সামন্তকে লেখা লুৎফুন্নিসার চিঠির ভাষা বাংলা অনুবাদ করে দেয়া আছে। আসফ আলি খাঁকে হত্যার হুমকি দিয়ে যে চিঠি লিখা হয়েছে, সে চিঠি উর্দু বা ফারসিতে ভাষান্তর করার কথা বলা আছে। কেরামত ও পুতলির কথাবার্তা ছিল উর্দু ভাষায়, লেখক বাংলায় অনুবাদ করে লিখেছেন। কেরামতের গানের ভাষা হিন্দি রাখা হয়েছে। কিছু নতুন ধরনের শব্দ ব্যবহার করে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন লেখক। যেমন– ঘুগনি, সিন্দুকি শব্দ। ঘুগনি হলো, খবরের ঘুগনি, নবাব পক্ষের খবর, নবাবের আমিরওমরাদের খবর, ইংরেজদের খবর, ফরাসিদের খবর–এমন পাঁচরকম খবর মিলে তৈরি হয় ঘুগনি খবর। কোন বাড়িতে সুন্দরী নারী আছে, কোন বাড়িতে সোনা ও রুপার প্রতিমা তৈরি হয়, সেসব খবর জেনে যারা নবাবকে সরবরাহ করতো তারা 'সিন্দুকি'। এ শব্দের চলিত বাংলা টিকটিকি ইংরেজিতে যাকে বলে স্পাই, সেকালে সিন্দুকিরা ছিল তাদেরই সমগোত্র।

উপন্যাসে স্থানগত ঐক্য যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ঐতিহাসিক স্থানের উল্লেখের ফলে অনেকটা বাস্তবঘেঁষা বলে মনে হয়েছে। সুতানুটি, কলকাতা, দিল্লি, উড়িষ্যা, মুর্শিদাবাদ, পলাশী, চন্দননগর, অগ্রদ্বীপ, কাটোয়া, হুগলি, ত্রিবেণী, ফলতা, পাটনা, কৈঁকালা, বরানগর, জাফরাগঞ্জ, বাংলাদেশ, ঢাকা এসব স্থান ঐতিহাসিক স্থানকে ঘিরে ইংরেজ-ফরাসি এবং ইংরেজ-নবাবের সাথে যুদ্ধ হয়। ছেলেকে বলি দেয়ার কথা জানতে পেরে জগদ্ধাত্রীর বুকফাটা চিৎকারে ঝামরি তাকে সান্ত্বনা দেয়ার মানসিকতা থেকে বলে ওঠে– "মায়ার বিষ আর কত খাবি।" (পৃ. ১২৭) নীলু রায় নবাবের শাসনকর্তা মানিক চাঁদের দরবারে যেতে পারেন আবার প্রয়োজনে ফলতায় ইংরেজ মহলেও রয়েছে তাঁর অবাধ যাতায়াত। নীলু রায়ের এমন স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে লেখক অসাধারণ উপমা দিয়েছেন –"সর্বঘটে যেমন কাঁঠালি কলা থাকে নীলু রায়ও তেমনি সর্বঘটে বিরাজ করিবার ক্ষমতা রাখিতেন।" (পৃ. ৪৪)লেখকের প্রতিটি উপন্যাসেই প্রবাদ প্রবচনের সার্থক ব্যবহার রয়েছে। তেমনি এ উপন্যাসে আছে–"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।"(পৃ. ১৫৫)

সময়ের ব্যবহার সম্পর্কে বলা যায়, সাড়ে তিন বছরের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। কাহিনির শুরুতে চৈত্র মাসের কথা রয়েছে। পরবর্তীতে আছে বর্ষা ঋতুর কথা। তাছাড়া অমাবস্যার ঘোর রজনীসহ দিনের রাতের সবসময়ের ব্যবহার রয়েছে।উপন্যাসে সমাজের দুই অবস্থানের মানুষের গান রয়েছে। একজন ওরাওঁ যুবতীর গান। মনের আনন্দে তাৎক্ষণিকভাবে গান রচনা করে শোনায় তারা। আরেক রকম গান বাদশাহি দরবারের গান, যা বাইজি মৈনি বিবি ধূর্জটিকে এবং মীরজাফরের মসনদে বসার অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেছিল। কেরামত সারেঙ্গি বাজিয়ে পরিবেশন করে হিন্দি গান। দরবারী কানাড়াও বাজানো হয়।

অদ্ভুত কিন্তু সচরাচর শোনা না এমন ধরনের কুসংস্কার রয়েছে এ উপন্যাসে। ধূর্জটিকে বাঘ আঘাত করেছে। আঘাতের চিকিৎসা সারানোর জন্য মলম তৈরি করতে গাছগাছরা, বাঘের চর্বি, ময়াল সাপের পিত্তির সাথে চোখের জল প্রয়োজন। তবে সে জল হতে হবে যে তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার চোখের জল। অবশ্য এ ব্যাপারটির মধ্য দিয়ে লেখক কৌশলে বুঝিয়ে দেন স্ত্রী জগদ্ধাত্রী নয়, ঝকমারি ধূর্জটিকে বেশি ভালোবাসে।

নবদিগন্ত (১৯৪৯) উপন্যাসটির প্লট – ধনী সূর্যকান্ত চৌধুরী তাঁর একমাত্র ছেলে দিবসকে আইন পড়াতে এবং তাঁর ওকালতির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চান। কিন্তু ছেলের স্বপ্ন ভিন্ন প্রকৃতির। সে বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী। সেদিকেই তার ধ্যান-খেয়াল। তারপরও বাবা ছেলেকে জোর করে বাবা 'ল' কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন। প্রতিবাদস্বরূপ দিবসও বাড়ি ছেড়ে খোলার ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। উদ্দেশ্য আত্মনির্ভরশীল হওয়া। সে হারুন-অল রশিদি স্টাইলে জীবনযাপন করতে চায়। খোলার ঘরের লোকদের সাথে সে সখ্য স্থাপন করে। পাশাপাশি সে মেসে

চাকরের কাজ নেয়। এরই মধ্যে রঙ্গনার সাথে পরিচয় হয়। তার বাবা সংগীতশিল্পী। তাঁর কাছে দিবস গানের তালিম নিতে আসে। ঘনিষ্ঠতা হয় রঙ্গনার সাথে। সে পড়াশোনা করে নিয়মিত। একবার আত্মসম্মান বিষয়ে দেয়া তার বক্তৃতা শুনে বাবা সূর্যকান্ত ও মেসের হরিদাস মুগ্ধ হয়েছে। তার ধারণা ছিল রঙ্গনা তার বক্তৃতা শোনে এমন কিছু বলবে যাতে সে নতুন করে উদ্দীপনা খুঁজে পাবে। একপর্যায়ে সে রঙ্গনার মধ্যে জীবনবোধ সম্পর্কে গভীর কোনো প্রত্যয় খুঁজে না পেয়ে তার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এরই মধ্যে তার ভেতর গবেষণা করার চিন্তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এদিকে, রঙ্গনার বিয়ে ঠিক হলে সে পালিয়ে দিবসের কাছে আসে। দিবস তাকে আত্মনির্ভরশীল হতে উৎসাহিত করে। দিবস গবেষণার সুযোগ পেয়ে লন্ডনে পাড়ি জমায়।

প্রচলিত রীতির এ উপন্যাসটির আখ্যান সরল প্রকৃতির। যেহেতু সিনেমার উদ্দেশ্যে প্রথম লেখা হয়েছিল। ষোলটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত এর কাহিনিতে কেবল ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটিতে 'মেস'– সিনেমার স্ক্রিপ্ট লেখার আদলে রয়ে গেছে। সিনেমার জন্য বিশেষ করে নাচ-গানের পর্ব রাখা হয়েছিল, সে অংশটি উপন্যাসেও মানিয়ে গেছে এবং এর সাথে লেখকের স্বভাবসুলভ কবিতাও রাখা হয়েছে অনেক। তাছাড়া টুকরো টুকরো দৃশ্যও আছে এতে। মোদ্দাকথা, সিনেমা এবং উপন্যাস দুটি আদলের মিশ্রণ রয়েছে আখ্যান বিন্যাসে।

চরিত্র চিত্রণে লেখকের অভিজ্ঞ শিল্পী মনের পরিচয় রয়েছে –

> দিবসের পাশে কিরণকে এবং সূর্য চৌধুরীর পাশে সাণ্ডেলকে রেখে মনস্তত্ত্বেও বিপ্রতীপ কোণ তৈরি করতে বাংলা উপন্যাসের চিরায়ত কৌশলটিকেই হাতিয়ার করেন বনফুল বন্ধুর ভূমিকার মধ্য দিয়ে। দুই চরিত্রের দু রকম মানসক্রিয়া পরস্পরকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে সক্ষম হয় দ্বিক-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। (ভূমিকা, অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, বনফুল; ২০১৩/৬: ১৭)

গহনচাঁদ, বিশ্বনাথ কথক, সীতারাম, রঙ্গনা, সৌদামিনি, পটলি, ঊর্মি, কিরণ, অঘোর চরিত্রগুলো যেমন বাস্তবের রঙে রঞ্জিত, তেমনি সুবিধাবাদী এবং বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন অনন্য চরিত্র চুনিলাল। মিথের ব্যবহার, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও প্রবাদের প্রয়োগ করে চরিত্রগুলোর মানসিক অবস্থা সহজেই বোধগম্য করে তোলা হয়েছে। নাম পুরুষের দৃষ্টিকোণে রচিত উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারে রয়েছে হিন্দি ও বাংলার মিশেল। গল্পের মধ্যে তিনি যেমন চমক সৃষ্টি করেন তেমনিভাবে উপন্যাসে পাঠকের আগ্রহকে ধরে রাখতে অনুচ্ছেদের শুরু এবং শেষে কিছু বাক্যের অবতারণা করেন। যেমন– অনুচ্ছেদের শুরুতে (ক) দিবসের কিন্তু বর্ধমান যাওয়া হল না।' (খ) অনুচ্ছেদের শেষে 'দিবস আর আসবে না।' (বনফুল, ২০১৩/৬: ৩৮৫)

ওরা সব পারে (১৯৬০) উপন্যাসটির প্লট – একজন অপদস্ত, অপমানিত মায়ের জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়া এবং প্রতিশোধ নেয়ার কাহিনি। একজন সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ, গুরু ভক্ত, নারীমাংসলোলুপ, ধনী ও বিবাহিত বিজয় মল্লিক

অবিবাহিত সুহাসিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে করায়ত্ত করতে চায়। যাই হোক, সুহাসিনীর একটি মেয়ে হওয়ার পর তাকে কাছে পায় বিজয় মল্লিক। কিন্তু যখন জানতে পারে ইতোমধ্যে সে কন্যা সন্তানের মা হয়ে উঠেছে তখন আক্রোশে ফেটে পড়ে। গুরুর বাণী সে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। কোনো মা-কে নষ্ট করা যাবে না– গুরুর এ বাণীকে অবমাননা করা হয়েছে। তার সর্বনাশ অনিবার্য– এ ভয়ে বাড়ি থেকে অপমান করে বের করে দেয় সুহাসিনীকে। এ সময় সে সিনেমার অভিনেত্রীর কাজ পায়। কিন্তু তার ভেতর প্রতিশোধের ইচ্ছা তীব্র হয়। বিজয় মল্লিকের ছেলের সাথে নিজের বহুমুখী প্রতিভাময়ী মেয়েকে কৌশলে বিয়ে দিয়ে প্রতিশোধের আগুন নেভায়। এর আখ্যান দুটি ভাগে বিভক্ত– মা এবং মেয়ে। মা-সুহাসিনীর জীবন কথা রয়েছে প্রথম ভাগে। এখানে পাঁচটি চিঠি ব্যবহার করেছেন লেখক। পাঁচটি চিঠির অব্যবহিত পরেই আছে সুহাসিনীর স্বামীর চিঠি এবং এরপর দ্বিতীয় ভাগে আছে মেয়ে শুচিতার কথা সাথে মায়ের কথাও। দ্বিতীয় ভাগে অতীত নিয়ে কোনো চিঠি নেই। আখ্যানের শুরুতে নাটকীয় চমক ছিল কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়ে কাহিনির জটিলতা এড়ানোর জন্য লেখক সরাসরি চিঠি টুকে দিলেন পরপর পাঁচটি। এরপর থেকে কাহিনি সরল পথে অগ্রসর হয়েছে। কাহিনি বয়ানে দ্রুতলয়ের গদ্য প্রাধান্য পেয়েছে। ঘটনার পর ঘটনা এসেছে। বিজয় মল্লিক ও সুহাসিনী চরিত্র দুটি মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। বিজয় মল্লিকের চরিত্র বোঝাতে লেখক পশুর সাথে তাকে তুলনা করে বলেছেন –

> কোনও বাঘ কোনও মহিষীকে জখম করে যেই শুনলযে তার একটি সন্তান আছে অমনি তার মনে পড়ল গুরুদেবের কথা, বৎস কোন জননীকে নষ্ট কোরো না। ...তোমার যা ক্ষতি করেছি তার জন্য খেসারত দিতে প্রস্তুত আছি। বাঘের এরকম মতিগতি আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। কিন্তু উক্ত চতুষ্পদ শ্বাপদকে মনুষ্যে রূপান্তরিত করুন, দেখবেন সব খাপ খেয়ে যাবে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ওইখানেই, মানুষ সব পারে। (পৃ. ৩৬৩)

সুহাসিনী চরিত্রটি জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার এবং প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহায় দীপ্ত চরিত্র। সে জীবনে থেমে থাকা বা পরাজয়ের গ্লানি বয়ে বেড়ানোর মধ্যে কোনো সার্থকতা খুঁজে পায় না। 'না' শব্দ তার জীবন-অভিধানে নেই। তাই প্রথম বার ব্যর্থ হয়ে পরের বার সে সফল হয় এবং তার কাছে করজোড়ে মেয়েকে ভিক্ষা চাইতে বাধ্য করায় সে। "পত্রগুলির কথক নিজের কথা নিজের মতো করে গুছিয়ে বলতে পেরেছে। সর্বজ্ঞ কথক সর্বজ্ঞতার অধিকার খর্ব করে এই দায়টা চরিত্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মুক্তি পেতে চেয়েছেন।" (অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, ভূমিকা, বনফুল, ২০১৩/৬:১৮) কুড়ি বছর সময় প্রবাহকে মুড়ে দিয়েছে চিঠিগুলো। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', নাটক চণ্ডিদাসের অমর বাণী– "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" 'ঝাঁসি রাণী'র প্রসঙ্গ কাহিনিকে গাম্ভীর্য করে তুলেছে।

তীর্থের কাক (১৯৬) উপন্যাসটি বাস্তব এবং অবাস্তব উপাদানে গঠিত। প্রধান চরিত্র পণ্ডিত বিরাটেশ্বর শর্মার জীবন ট্র্যাজেডি উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এর বাইশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত এর প্লট সরল প্রকৃতির। শাখা কাহিনিগুলো মূল কাহিনিকে জটিল করে তোলেনি। কিছু অলৌকিক ঘটনা কাহিনির বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ন করেছে বলা যায়। যেমন, শ্মশান ভৈরবীর ষোড়শী মূর্তি ধারণ, উৎসাহের তান্ত্রিক সাধনা, উৎসাহের জীবন নিয়ন্ত্রণে মধুমতীর প্রভাব এবং বিরাট পণ্ডিতের কথা না মেনে চলায় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া এবং শ্মশান ভৈরবীর ষোড়শী মূর্তি ধরে বিরাট পণ্ডিতকে উৎসাহের মৃত্যুর খবর জানানো এবং সৎকারের ব্যবস্থা করতে বলা। মধুমতীর ষোড়শী রূপ ধারণ, মারামারির এক পর্যায়ে বিরাট পণ্ডিত এবং উৎসাহের মাঝখানে বিশাল ফণা তোলা সাপের আবির্ভাব, মুহূর্তের মধ্যে বিরাট পণ্ডিতের নমনীয় মূর্তি ধারণ ও উৎসাহের প্রতি স্নেহ জাগ্রত হওয়া– এ বিষয়গুলোকে হ্যালুসিনেশন বলে নবকিশোর উড়িয়ে দিয়েছে প্রথম দিকে। কিন্তু পনেরো বছর পর কাহিনির শেষের দিকে নবকিশোর এবং স্ত্রী প্রমীলা যখন মিশর ভ্রমণে গিয়েছে, তখন নীলনদের ভেতর দিয়ে তাদের জাহাজ চলছিল। একটি বন্দরে তাদের জাহাজ ভেড়ে। এ সময় পিকনিক করতে আসা স্কুলের একদল মেয়ে বন্দরে এসে ভিড় করে কাছ থেকে জাহাজ দেখার আশায়। তখন একটি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে প্রমীলা নবকিশোরকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিল– "দেখ, দেখ, ওই ফ্রক-পরা কালো মেয়েটি ঠিক জরির মতো দেখতে নয়?" (বনফুল, ২০১৩/১২: ৫৬৫) নবকিশোর জবাব করলো, অবিকল জরির মতো দেখতে। নগ্ন অবস্থায় কারণ খেয়ে মাতাল হয়ে এক রাতে জরি নবকিশোরকে অনুরোধ করেছিল কল্পনায় তাকে নয়, দশ বছরের খুকি ভেবে নিতে। নবকিশোরের সে ভাবনাই বাস্তবে রূপ পেলো যেন। বনফুল তাঁর লেখায় ভৌতিক প্রসঙ্গের অবতারণা সাধারণত যে ধরনের আবহ তৈরি করেন, এখানে সে ধরনের আবহ লক্ষ করা যায় না। হঠাৎ করেই মধুমতীকে দেখতে পায় নবকিশোর আবার উৎসাহ মধুমতীর আগমনের সময় এক ধরনের গন্ধ পায়। সাপের আগমনটিও তদ্রূপ। ভৌতিক লক্ষণ ছাড়াই অলৌকিকতার ঝলক দেখতে পান পাঠক। পনেরো পরিচ্ছেদে মেডিকেল কলেজের শিক্ষক বার্নাডো সাহেবের 'ক্লিনিকস' দিতে দেরি করে আসা এবং বাইরে রোগী দেখার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে পত্রিকায় যে অভিযোগ উঠেছিল, সে বিষয়টি এবং পরবর্তী সময়ে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ব্যাপক ভোজের আয়োজন– এসব টুকরো ঘটনা বনফুলের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নেয়া। *পশ্চাৎপটে* বনফুল উল্লেখ করেছেন –

> বার্নাডো সাহেবের বাড়ীতে ভীম নাগের ভিয়ান বসাইয়াছিলাম আমরা। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা টেবিল ছিল এবং প্রত্যেক টেবিলে প্রচরি খাবার। খাবার আরম্ভ করিবার পূর্বে বার্নাডো সাহেব হাসিয়া বলিলেন – "Before we start let me remind you that the capacity of normal human stomach is four ounces only. Now let us begin," (১৯৯৯: ১৩১)

এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নামগুলোও অবিকল রেখেছেন লেখক। এ টুকরো ঘটনাগুলো পড়ার সময় পাঠক কিছু সময়ের জন্য উপন্যাস থেকে বেরিয়ে বনফুলের মেডিকেল কলেজ জীবনেই ফিরে যান। বিরাট পণ্ডিত, নবকিশোর, উৎসাহ – এ প্রধান তিনটি চরিত্রের মধ্যে উৎসাহ ও বিরাটপণ্ডিত চরিত্র দুটি অনেক ভাঙা-গড়ার, অনেক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। তবে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে জীবনের স্বাভাবিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে উৎসাহ চরিত্রটি। নবকিশোর চরিত্রটি লেখক সরলরেখায় এঁকেছেন এবং তার সফলতার পথ মসৃণ করে দিয়েছেন। জরি চরিত্রটি শেষ অবধি রহস্যপূর্ণ রয়ে গেছে। অতুলকে লেখক জীবনকে উপভোগ করার মানসিকতাসম্পন্ন এবং কিছুটা হেয়ালি চরিত্ররূপে চিত্রিত করেছেন। প্রতিটি চরিত্রের উপযোগী ভাষা ব্যবহারে লেখকের পারদর্শিতার পরিচয় মেলে। নবকিশোরের মানসিক অবস্থা বোঝাতে লেখক যখন মনস্তাত্ত্বিক খানা-খন্দের না থাকার কথা বলেন এবং নেপথ্যবাসিনী প্রমীলা ছাড়া কোনও নারীর ছায়া পড়ে নাই সে পথে তখন ভাষা ব্যবহারের দিকটিও পাঠকের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। মেডিকেল কলেজের নার্স 'কিং'-এর মুখে ব্যবহৃত ইংরেজি ভাষা এবং বিহারীদের হিন্দি ভাষা এবং বাংলা ভাষা তৎকালীন স্থান-কাল-পাত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিন রকম ভাষার ব্যবহার দিয়েই নাম পুরুষে লেখা উপন্যাসের কাহিনি শুরু। এখানেও বরাবরের মতো কথকের মুখে ভাষার সাধুরীতি এবং চরিত্রদের মুখে চলিতরীতির সংলাপ রয়েছে। *পশ্চাৎপটে* উল্লেখ আছে, বনফুল মেডিকেল কলেজে পড়াকালীন জ্যোতিষচর্চা করেছিলেন কিছুদিন। আগ্রহবশত তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু শিবদাস বসুমল্লিকের সাথে মিলে এ বিষয়ে জ্ঞানচর্চা করেন। বিরাট পণ্ডিতের জ্যোতিষ ভাবনা বনফুলেরই ভাবনা ধরে নেয়া যায়। বিরাট মন্দিরের মতে, পৃথিবীরূপ মন্দিরে সব মানুষই কাকের দল। যেখানে যতটুকু খাবার পায় ছোঁ মেরে তুলে নেয়। বেগতিক দেখলে উড়ে পালায়। (বনফুল, ২০১৩/১২: ৫৫৩)

২. গদ্যে-পদ্যে রচিত উপন্যাস

চর্যাপদ থেকে বাংলা পদ্য-সাহিত্যের যাত্রা শুরু, যা মধ্যযুগের *অন্নদামঙ্গল* কাব্য পর্যন্ত বিস্তৃত। আর আধুনিক যুগের উন্মেষ পর্ব থেকে গদ্য-সাহিত্যের যাত্রা শুরু। ভাষার প্রধান এ দুটি ধারায় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সাহিত্য বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় সমৃদ্ধ হয়ে বিশ্ব দরবারে স্বীয় আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে হলায়ুদ মিশ্রের *সেখশুভোদয়া* সংস্কৃত গদ্যে-পদ্যে রচিত চম্পুকাব্য। এ কাব্যের রচনাকাল ধরা হয় বারো শতকের শেষ বা তেরো শতকের গোড়ার দিকে। এ গ্রন্থের পঁচিশটি অধ্যায় রয়েছে এবং বাংলা ভাষায় বচন, ছড়া জাতীয় শ্লোক ও গান আছে। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে চম্পুকাব্যের আর তেমন কোনো উল্লেখ নেই বললেই চলে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুসরণে যোগেশ চন্দ্র গুণের *কীর্তিবিলাশ* তারাশংকর শিকদারের *ভদ্রার্জুন* নাটকের মাধ্যমে বাংলা নাট্যসাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়। এর আগে ও পরে অনেক অনুবাদমূলক নাটক রচিত

হয়েছে। অধিকাংশই ছিল সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। তবে এর অনেক আগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত হয়ে নাটক লিখেছেন। তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা '(১৮৫৯)। বাংলা ভাষায় পদ্য-গদ্য-নাট্য আঙ্গিকের সমন্বয়ে উপন্যাস লেখার প্রথম কৃতিত্বের দাবিদার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের। আঙ্গিক পরিচর্যায় সর্বাধিক পরীক্ষা-প্রবণ শিল্পী বনফুলের পক্ষেই এ দুঃসাধ্য কাজে সফলতার শীর্ষে পৌঁছানো সম্ভব। হতে পারে, গদ্যে-পদ্যে মেশানো চম্পুকাব্যের ধারাকে প্রলম্বিত করতে বনফুল ত্রি-আঙ্গিকে উপন্যাস লেখেন *মৃগয়া* (১৯৪০) নামে। বনফুলের অর্ধশতাধিক উপন্যাসের মধ্যে *মৃগয়া* উপন্যাসটির সার্থকতা এর আঙ্গিকবিচারের। এ ক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছেন বলা যায় নির্দ্বিধায়।

২.১

বনফুল *মৃগয়ার* জন্ম-ইতিহাস *পশ্চাৎপটে* উল্লেখ করেছেন। ভাগলপুর থাকাকালীন শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস বনফুলকে একটি উপন্যাস লেখার জন্য তাগাদা দিচ্ছিলেন। কিন্তু বনফুল লেখার মতো নতুন কিছু পাচ্ছিলেন না। মনে নতুন কিছু না এলে তিনি লেখা শুরু করতে পারেন না। ঠিক এ সময় মুঙ্গের কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক কালীকিঙ্কর সরকার বনফুলকে শিকারের পটভূমিকায় নতুন ধরনের বই লিখে ফেলতে বলেন। বনফুল নতুন কিছু পেয়ে গেলেন, শুরু করে দেন *মৃগয়া* লেখার কাজ। তিনি রোজ যতটুকু লিখতেন, ততটুকু কালীকিঙ্কর এসে পড়ে যেতেন এবং প্রচুর উৎসাহ দিতেন তাঁকে। তিনি বনফুলের লেখার একজন ভক্ত ছিলেন। তাঁকেই বনফুল উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন –

> কালীবাবু,
>
> আশা করি আপনার মনে আছে, মৃগয়া লিখিবার বীজ আপনিই আমার মনে একদা বপন করিয়াছিলেন। আপনি সে সময়ে ভাগলপুরে না আসিলে হয়তো এ গল্প আমি লিখিতামই না। মৃগয়ার জন্ম-ইতিহাসের এই স্মৃতিটুকু জাগরূক রাখিবার জন্য প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে পুস্তকখানি আপনার নামে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম। ইতি
>
> ভাগলপুর — প্রীতিমুগ্ধ
>
> ১৫.০৫.৪০ — শ্রী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

মৃগয়া উপন্যাসে আদি, মধ্য ও অন্তযুক্ত কোনো প্লট নেই। এর আখ্যান তিনটি ভাগে তিন নামে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম 'গ্রাম', দ্বিতীয় ভাগের নাম 'পথে' এবং তৃতীয় ভাগের নাম 'প্রান্তরে'। প্রথম ভাগ গ্রাম পর্বে রয়েছে জমিদার পরিবারের শিকারে যাওয়ার প্রস্তুতি। কলমিপুর মাঠের ওপারে বাঘ এসেছে। সে বাঘ শিকার করতে যাবে

জমিদার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব সবাই। শিকারে যাওয়ার হুজুগ তুলেছে বাড়ির ছোট বউ ঊষা আর মীনা। ২৫টি গাড়ি এবং শতলোক যাবে বাঘ শিকারে। সবাই যেন মহোৎসবে মেতে উঠেছে। এ অংশটুকু পদ্যরীতিতে লেখা। দ্বিতীয় ভাগ, পথের অংশটুকু গদ্যরীতিতে লেখা যেখানে গরুর গাড়ি, হাতি, পালকি ও ঘোড়াতে করে সবার শিকার অভিযানে রওনা পথের বর্ণনা। কোনো গাড়িতে জিনিসপত্র, কোনোটাতে বিছানাপত্র, কোন গাড়িতে কারা যাচ্ছে, শেষের দুই গাড়িতে কুঞ্জলালের দল যারা গোঁফ-দাড়ির শ্লোক বলে যাত্রাপথ অধিক আনন্দদায়ক করে তুলছে। যাত্রাপথের বিরতিতে কেউ হাতিকে গোসল করায়, কেউ রেশমি চুড়ি কিনে দেয় প্রণয়িনীকে। কেউ দুষ্টুমির ছলে মৌচাকে ঢিল ছুড়ে মারে। কেউ প্রেমিকার মন রক্ষার্থে কবিতা লেখে – এভাবেই বিচিত্র মানুষের বৈচিত্র্যময় প্রাণোল্লাসে পথের ক্লান্তি নাশ হয়। প্রান্তরে নাট্য অংশে রয়েছে ছয়টি দৃশ্য। এখানে কলমিপুরের মাঠে নয়টি তাঁবু খাটানো হয়েছে। কলমিপুর মাঠে এসে জানা গেছে, বাঘ একটি নয়, দুটি– বাঘ ও বাঘিনি। কলমিপুর মাঠে এসে সবাই যেন বাঘ শিকারের চেয়ে নিজেদের মতো করে সময় কাটিয়েছে বেশি। অনেক দিন পারিবারিক গণ্ডি ছেড়ে খোলা আকাশের নিচে এসে জ্যোৎস্নাভেজা রাতে আনন্দ ও রোমান্সে মেতে ওঠে সবাই। নাচ-গানের আসর বসে। ভেসে আসে বাঁশির সুর, কেউ বা দোলনা টানিয়ে দোলে।

উপন্যাসের ভাষা ব্যবহার বিষয়ে বলা যায়, লেখক প্রতিটি চরিত্রের মুখে সময় উপযোগী ভাষা আরোপ করেছেন। বড় বউ গায়ের সব গহনা খুলে রাখায় বড়বাবু তাকে নতুন করে আবিষ্কার করেন– "হঠাৎ ঢাকনাটা খুললে যে?... তোমার যে এত রূপ ছিল, চোখেই পড়ে নি তা এতদিন।"(বনফুল, ২০১২/২: ৩১৪) "তোমার নীলাম্বরী শাড়িখানা এনেছ তো?... আজ নিজের হাতে তোমাকে সাজাব।...তারপর কি করব আর ভাবতে পারছি না।" (পৃ. ৩৩৬-৩৭) ছোটবাবু ছোটবউ তরঙ্গিণীকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবেন তাই বউয়ের পায়ে আলতা পরিয়ে দেন। ছোটবাবুর এমন অভিলাষ প্রকাশের মধ্যে দিয়েই তরঙ্গিণীর প্রতি তার সুপ্ত ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। লেখক স্থান-কাল উল্লেখসহ হাবুল, পাঁচু বীরেন, বঙ্কু ও কুঞ্জলালদের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে তৎকালীন বাস্তবতাকে যথাযথ ভাষায় বর্ণনা করেছেন– "হাবুল, পাঁচু বীরেন, ও কুঞ্জলাল বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত, যা বাংলাদেশে বেকার নামে প্রখ্যাত। টাকা রোজগার করতে পারে না যদিও, কিন্তু নির্গুণ নয়। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও গ্রামের থিয়েটারটিকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে; বঙ্কুর হাসাবার ক্ষমতা আছে; হাবুলের নানা খ্যাতি, অনেক কাজ পারে সে; বীরেন হচ্ছে সবার মধ্যে কৃতবিদ্যা। বীরেনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় তৎকালীন রাজনীতি, সামাজিক অবস্থা, সাহিত্য ও খেলার খবর উঠে এসেছে। যেমন –

বি এ পাস,

নানা রকম খবর জানে

রাখে,

বিতরণ করে।

গান্ধীর সাথে রবীন্দ্রনাথের মৈত্রীর নিগূঢ় কারণ কি,

জ্যানেট গেনারের বয়স কত,

আগামীবারে কে মেয়র হবে,

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে কে কত রান করলে,

শরৎবাবু 'প্রবাসী'তে কেন লিখতেন না,

আধুনিক কোন লেখকের কি কি দোষ,

রাশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থা কেমন,

জাপানীরা জিনিস সস্তা করে কি উপায়ে,

ডি ভ্যালেরা, মাক্সিম গোর্কি, ইসাডোরা ডানকান,

মাড়োয়ারিদের পলিসি,

পি. সি. রায়ের উদ্দেশ্য,

হরিজন,

সাফ্রাজেটস,

কো-এডুকেশন,

শিশির ভাদুড়ী–

বীরেনের জ্ঞানভাণ্ডার যেমন অফুরন্ত,

শ্রোতাদের ধৈর্যও তেমনই অফুরন্ত। (পৃ. ২৭৭)

গদ্য ছন্দের অসাধারণ উদাহরণ। বনফুল একবার রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গদ্য ছন্দ সম্পর্কে ধারণা নিয়েছিলেন। গদ্যের লাইন যত বড়ই হোক যেখানে বিরতি দিলে অর্থের কোনো তারতম্য ঘটে না এবং শুনতে ভালো শোনায় সেখানে থামা যায়। *মৃগয়া* রচনাকালে ওই প্রথম পর্বের লেখার সময় গদ্যকবিতা রচনার হাতেখড়ি হয়েছিল বনফুলের, নিজেই সে কথা জানিয়ে লিখেছেন– "কী নিয়মে লাইনগুলো ভাঙা হয় এটা আমি পরে আবিষ্কার করেছিলাম নিজেই, যখন মৃগয়া লিখি। একসঙ্গে যতটা পড়লে ভালো শোনায় ততটাই এক লাইনে লিখতে হয়। এটা রবীন্দ্রনাথকে পরে জানিয়েছিলাম, খুব খুশি হয়েছিলেন শুনে। (ঊর্মি, ১৯৯৭: ১৪১)

উপন্যাসের ছোট, বড়, ধনী-গরিব, চাকর-বাকর– সব ধরনের চরিত্র চিত্রণে লেখক সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নশ্রেণির চরিত্রগুলোকে অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে বিকশিত হয়েছে তাঁর লেখায়।

সম্ভবত যে জীবন বা চরিত্রকে চোখে দেখেননি বনফুল, তাকে রূপদান করা যতটা কঠিন ছিল ততটাই সহজ ছিল সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষদের চরিত্র রূপদান করতে। কারণ তাদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। তাই *মৃগয়া*-তে তিনি সেসব চরিত্রদের গড়তে চেয়েছেন ব্যাপকতর পটভূমিকায় (প্রাগুক্ত)।

বনফুলের প্রায় সব উপন্যাসেই রবীন্দ্রসংগীত থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে উপন্যাসে গান ব্যবহার করে থাকেন তিনি। তবে নিছক গানই পরিবেশন করেন না লেখক, গানের মধ্য দিয়ে চরিত্রের মনের গহিনে লুকানো অব্যক্ত কথা বোঝানোর জন্য বা পরিবেশের যথাযথ রূপায়ণে অর্থাৎ কোনো অব্যক্তকে ব্যক্ত করার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার সার্থক প্রয়োগ করেছেন তিনি। তাছাড়া রয়েছে রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক গান, ভজন গীত। ইংরেজি ও বাংলা ভাষার মিশেলে রয়েছে দুটি সনেট, হিন্দি ভাষায় গোঁফ-দাড়িবিষয়ক দুটি শ্লোক। কাব্য অংশের সব শেষে যেখানে কলমিপুর মাঠে পৌঁছতে কী কী অতিক্রম করে যেতে হবে তার বর্ণনা যে অংশে রয়েছে, সে অংশটুকু ছোটদের গল্প বলার স্টাইলে বিবৃত করা হয়েছে।

শ্লোক: এক দাড়ি চুটুক পুটুক, এক দাড়ি তক্কো,
এক দাড়ি মনমহেশ এক দাড়ি বভতো। (বনফুল, ২০১২/২: ২৮৩)

সনেট: তথাপি চিন্তিত আমি – (নহে দেবী, নহে পরিহাস)
না পাইয়া কোনো বার্তা চিত্ত মম সত্যই বিবশ।
চতুষ্পার্শ্বে জানি তব নানা কর্ম করে গিজগিজ,
তবু ক্ষুদ্র অনুরোধ, দুলাইন চিঠি লিখো – please। (পৃ.২৮৩)

নাম পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা একদিনের মৃগয়া-অভিযানের এ উপন্যাসটিতে বাংলা,হিন্দি, ইংরেজি মিশ্র-ভাষার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন লেখক। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ভাষার মিশ্রণ কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলেনি। চরিত্র অনুযায়ী উপযুক্ত সংলাপ এবং অলংকারের যথাযথ ব্যবহার শিল্পীগুণের পারদর্শিতাকেই প্রতিভাত করেছে। প্রবাদ – "যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর"। (পৃ. ৩২০) উপমা– মন প্রস্তুত হবার আগেই/ যৌবনটা এসে গেছে দেহে/অকাল বসন্তের মতো। (পৃ. ২৬৩)

২.২

উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণে লেখা *তৃণখণ্ড* তেরোটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বনফুলের উপন্যাসে পরিচ্ছেদ বা পর্ব বিভাগ নেই। রয়েছে ক্রমিক সংখ্যা। আলোচনার সুবিধার্থে সংখ্যাগুলোকে পরিচ্ছেদ ধরা হয়েছে। একটানা কিছুদিন ব্যঙ্গ কবিতা লেখার পর ব্যঙ্গ কবিতা লেখায় বনফুলের আর রুচি কুলোচ্ছিল না। তাই নতুন

আঙ্গিকে নতুন কিছু চাই তাঁর। "আমি তখন একদিন তৃণখণ্ড নাম দিয়া একটি গদ্য-পদ্য মিশ্রিত গল্প লিখিয়া ফেলিলাম। পরে শুনিয়াছি, ইহাকেই সংস্কৃতে নাকি চম্পুকাব্য বলে।" (বনফুল, ২০১২/১: ১৯৪) বনফুলের অনেক উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসেও একজন ডাক্তার চরিত্র রয়েছে, যাকে লেখকের প্রতিরূপ হিসেবে কল্পনা করে থাকেন পাঠক। এ ডাক্তার চরিত্রটি অন্যের বাগদত্তার প্রেমে পড়েছেন। ডাক্তারি করার অবসরে তার সাথে স্বগতোক্তি করেন। তাকে নিয়ে কাব্য রচনা করেন। অন্যের বাগদত্তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা অন্যায় জেনেও তিনি এ কাজ করে চলেছেন। মানুষ যখন রোগে-শোকে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন এ সুন্দর ভুবনে আরো একটু সময় বাঁচার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে আর তখন ডাক্তারকেই তার একমাত্র ভরসাস্থল বা আশ্রয়স্থল বলে মনে হয়। তখন রোগী ধরেই নেয় ডাক্তার চেষ্টা করলেই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। ডুবন্ত মানুষ যখন খড়কুটো পেলে তাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, ঠিক তদ্রূপ। ডাক্তাররা হলেন তৃণখণ্ড। এই তৃণখণ্ডের ভাষ্য হলো–

> যতই দিন যাইতেছে, ততই নিজের অসারতা নিজের কাছে ধরা পড়িতেছে। ছদ্মবেশ খুলিয়া খসিয়া যাইতেছে। জ্ঞানের অহংকার!–কতটুকু আমদের জ্ঞান? এ যেন সামান্য শঙ্কিত দীপশিখা জ্বালিয়া বিশ্ব-ব্যাপী অন্ধকারকে আলোকিত করিবার চেষ্টা! অনেকের প্রদীপে আবার শিখাও নাই, শুধুই প্রদীপটা লইয়া ঘুরিতেছি। (পৃ. ১৩৭)

মোটামুটি পরিসরের উপন্যাসটিতে আঠারোটি কবিতা রয়েছে। কবিতাংশ প্রধান চরিত্র ডাক্তারের আত্মকথনের ভঙ্গিতে উঠে এসেছে অন্যের বাগদত্তার প্রতি অনুরক্তির সীমা-পরিসীমার বয়ান। কবিতাংশের ভাবার্থের সাথে গদ্যের অংশের ভাবার্থের সংযোগ নেই বললেই চলে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যাংশটুকু বাদ দিলেও গল্পের আবেদন ক্ষুণ্ন হয়নি। তবে ভাষার দুটো রীতি পাশাপাশি অবস্থানে দুই রকম রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। কোনো কোনো পরিচ্ছেদের বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে কবিতা যেমন, তিন ও এগারো পরিচ্ছেদ। কাব্যাংশজুড়ে ডাক্তারের একান্ত ব্যক্তিগত কথা থাকায় তাঁর মনোজগৎ বুঝতে পারা যায়।অর্থাৎ একদিকে ডাক্তারের ব্যক্তিগত জীবন, অন্যদিকে তাঁকে ঘিরে অসংখ্য মানুষের সুখ-দুঃখের কথা। ডাক্তারের প্রতিদিনের ডাক্তারি অভিজ্ঞতায় হাজারো বিচিত্র মানুষ তাদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরা দেয়। লেখক প্রতিটি চরিত্রকে পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিতে প্রতিস্থাপন করেছেন। জীবনে পথ চলতে কত রকমের মানুষ তিনি দেখেছেন, তাদের নিয়ে ভেবেছেন আর বলেছেন –"মানুষের কতটুকু চিনি আমরা"(পৃ. ১৩৮)।

এর আখ্যান গড়ে উঠেছে অনেক চরিত্রের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়ে। শারীরিক ও মানসিক ব্যধিগ্রস্ত এসব মানুষের মধ্যে রয়েছে প্রৌঢ় প্রাণকৃষ্ণবাবুর প্রেমের আবরণে অসংযত আচরণ, চকচকে স্যুটের ভেতর হতে বাঙালি মূর্তির আত্মপ্রকাশ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বংশীবাবুর স্ত্রীর নিঃস্ব হয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ,সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধব্যক্তির মনে বৈরাগ্য

আসায় নগদ দেড় লাখ টাকা এবং সব বিষয়-সম্পত্তি স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্যে ডাক্তারের নামে ট্রাস্টি করার ইচ্ছে পোষণ করার মতো লোক, আবার এরূপ লোকের বিপরীত স্বভাবের মানুষ আবার রং বাজারের আসমানীর প্রকৃত চেহারাও তৃণখণ্ডের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে।

লেখকের ডাক্তারি জীবনের তিন মাস সতেরো দিন সময়ের অভিজ্ঞতা যেন তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতার চিত্রই একের পর এক উঠে এসে জীবন ক্যানভাসকে মূর্ত করেছে। দিন ও রাতের প্রতিক্ষণের কাজের বিবরণ উপমা, চিত্রকল্প ও প্রবাদ-প্রবচনের ভাষাকে অলংকারমণ্ডিত করেছে–

করতে বা বরষায়, প্রভাতে বা সন্ধ্যায়,
হৃদয় প্লাবিয়া যায় অলকনন্দায়,
তারি বলকল্লোল
ছন্দের তোলে রোল
–সাগর চুমিতে চাহে চন্দ্রে!
সাগরের মন্ত্র কি শুনেছ কখনো প্রিয়া,
নির্জন সৈকতে একান্ত মন দিয়া?
দেখেছ কি প্রান্তরে,
পবন অশান্তরে,
উন্মাদ বনানীর গন্ধে! (পৃ. ১৩৭)

প্রবাদ: ভিক্ষার চাউল আঁকাড়া তো হবেই। (পৃ. ১৩০)

উপমা: (ক) পাণ্ডুর জ্যোৎস্না যেন পৃথিবীর বিষণ্ন হাসি। (পৃ. ১১৩)

(খ) এলোমেলো ধোঁয়ার কুণ্ডলী সার বাঁধিয়া ভোরের আকাশে উড়িতেছে। যেন পাগলিনীর
আলুলায়িত কেশভার!

শেষ পরিচ্ছেদের শুরুতে লেখকের জীবন বোধের কথা ব্যক্ত হয়েছে–

রোগী বাঁচে, রোগী মরে, টাকা রোজগার করি। বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। আবার যে দিন 'কল' কম থাকে সেদিনও শান্তি পাই না। কি চাই? বুঝিতে পারি না। এই জন্যই বোধ হয় মানুষ শেষ বয়সে ভগবানকে চায়–অর্থাৎ এমন একটা জিনিসকে আকাঙ্ক্ষা করে যাহা পাওয়া যায় না। সুতরাং মোহ ফুরায় না। শিশুর চাঁদ পাওয়ার মতো। (পৃ. ১৩৯)

নিজের জীবন দিয়েও ডাক্তার বনফুল উপলব্ধি করেছেন সংসার জীবনে মানুষের অসহায়তা কত অপরিসীম। প্রকৃতির নির্লিপ্ত অলঙ্ঘ্য নিয়মে যেখানে মানুষের উত্থান-পতন, জীবন-মৃত্যুর পরিক্রমা নিত্য নিয়ন্ত্রিত, সেখানে মানুষের একে অপরকে রক্ষা করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। অথচ জীবনের পরিহাসই হল যে এই সীমাটুকুর হিসাব পুরোপুরি জেনেও চূড়ান্ত মুহূর্তে মানুষ তা মেনে নিতে পারে না (উর্মি, ১৯৯৭:১৩২-৩৩)।

৩. মহাকাব্যিক উপন্যাস

১.১

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল কবিতাকেন্দ্রিক। তাই এসময় রচিত হয়েছে মহাকাব্য। আধুনিক যুগে গদ্যের প্রচলনের সাথে উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার ফলে মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসের জন্ম হয়েছে। ব্যাপক পটভূমিতে, বহু চরিত্রের সমাবেশে একটি দেশ-কাল ও জাতির প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাসকে মহাকাব্যিক উপন্যাস বলে। রবীন্দ্রনাথের *গোরা*, তারাশঙ্কর রায়ের *সত্যাসত্য*-কে মহাকাব্যিক উপন্যাস বলা চলে। তবে এ কথাও ঠিক, বিশাল কলেবরে হলেই তাকে মহাকাব্যিক উপন্যাস বলা যায় না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এতে আধুনিক যুগের সমস্ত জটিল সমস্যা, সমস্ত নতুন অনিশ্চয়তামূলক পরীক্ষা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ, মানব কল্যাণের পরস্পরবিরোধী আদর্শ, অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে আলোচিত হয়। (শ্রীকুমার, ১৯৫৬:) বনফুলের *জঙ্গম*, *ডানা* ও *স্থাবর*কে বিশাল পটভূমিতে রচিত মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসের আওতায় আলোচনা করা হলো।

জঙ্গম বনফুলের মহাকাব্যধর্মী প্রথম উপন্যাস। তিনখণ্ডে তিনকালে প্রকাশিত। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার মাঝে সময়ের দুই বছরের মতো ব্যবধান থাকলেও কাহিনি পরম্পরায় কোনো ছেদ ঘটেনি। পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত আখ্যানের প্রথম অধ্যায়ে চল্লিশটি পরিচ্ছেদ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনিশটি; তৃতীয় অধ্যায়ে আটত্রিশটি; চতুর্থ অধ্যায়ে বিয়াল্লিশটি এবং পঞ্চম অধ্যায়ে সাতচল্লিশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এর প্লট সরল রৈখিক। মূল কাহিনির সাথে মিশে আছে অনেক উপকাহিনি। বেশিরভাগ উপকাহিনি মূল কাহিনিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মূল কাহিনিকে উপকাহিনিগুলো জটিল করে তুলেনি। তিরিশের দশকের কলকাতার জঙ্গমতায় গা ভাসিয়ে পথ চলতে গিয়ে জীবনে অনেক রঙের মানুষের রঙের সাথে রঙ মেশাতে গিয়ে এক সময় শহরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে সে। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয় আর একদণ্ডও শহরে নয়, গ্রামে ফিরে যাবে সে। বন্ধু উৎপলের জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে চার বছর শহর জীবনের ইতি টানে সে। সেখানেও সে সবার রঙে রঙ মেশানোর

চেষ্টা চালায়। সে গ্রামোন্নয়নে নিজেকে সঁপে দেয়। শঙ্করের জীবন তাই শহর ও গ্রাম জীবনের বিচিত্র মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

শহরের জীবনে শিক্ষিত, অভিজাত পরিবারের নারীর সংস্পর্শে এসেছে শঙ্কর। লেখক প্রধান এ চরিত্রটিকে এতোটাই বাস্তবানুগামী করে সৃষ্টি করেছেন যে, নায়ক চরিত্রের নেতিবাচক দিকটিকে উপেক্ষা করেননি। প্রথম জীবনে রিনিকে ভালোবেসে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখেন এবং একই সময়ে মিষ্টিদিদির অসংযত আচরণকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে রিনির চোখে ধরা পড়েন। একদিকে রিনির সাথে দূরত্ব বাড়তে থাকে, আরেক দিকে মিষ্টিদিদির প্রতি ঘৃণা জন্মাতে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে সে দেহজীবিনী মুক্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মুক্তার কথামতো অনেক টাকা এনে তাকে দিলেও ঘটনাক্রমে এ যাত্রায় সে বেঁচে যায় অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে। এরপর থেকেই স্বাভাবিক পথে জীবনযুদ্ধে নেমে পড়ে সে। এখান থেকেই লেখক শঙ্করের জীবনে সরলরেখা টেনেছেন। তাকে আর বিপথগামী হতে দেখা যায় না। তবে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাতে হয়েছে তাকে। বিশ্বাসহীন শহর ছেড়ে পাড়ি জমায় গ্রামে। সহজ-সরল কৃষক জীবন বেছে নেয় সে। শঙ্করের চারপাশে আবর্তিত অসংখ্য চরিত্র, তাদের জীবনধারা, গ্রামের কৃষক শ্রেণিকে ঠকিয়ে শিক্ষিত মানুষের মুখোশ উন্মোচন, কলেরা মহামারিতে তাদের পাশে থাকা না থাকা– বিচিত্র সব মানুষের বিচিত্র মনন-ক্রিয়া তার জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে আবারো গ্রাম – এভাবে শঙ্করের জীবন জঙ্গমময় হয়ে ওঠে। উপন্যাসে "প্রত্যেক চরিত্রই তাহার স্বল্প আবির্ভাব-কাল ও কর্ম-পরিধির মধ্যে জীবন্ত। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে ভন্টু, করালচিরণ বকসি, ভন্টুর বাবা বাকু, মুক্তানন্দ ব্রহ্মচারী, অপূর্ব পালিত, অরিজিনাল, দশরথবাবু– এগুলি যেন ডিকেন্সের অতিরঞ্জনপ্রবণতাপ্রসূত উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের উদাহরণ।" (শ্রীকুমার, ১৯৩৫: ৭১)

সর্বোজ্ঞ কথনরীতিতে লেখা উপন্যাসটিতে কথকের মুখে ভাষার সাধুরূপ এবং চরিত্রদের মুখে ভাষার চলিতরূপ দিয়েছেন। সংলাপ ব্যবহারে লেখকের বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে। চরিত্রের ভিন্নতা অনুযায়ী ভাষার অনেক রকম ব্যবহার রয়েছে। রিনি, মিষ্টিদিদি, সোনাদিদির মুখের ভাষার সাথে কারু, ফরিদ, পুরণ হরিয়াদের ভাষার বৈসাদৃশ্য তাদের স্বতন্ত্র করে তুলেছে। তেমনি অমিয়া, সুরমা ও বউদির ভাষা তাদের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বকেই প্রকাশ করে।

আঙ্গিক বিচারে সময়ের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য বলে ধরে নেয়া হয়। কাহিনির ঘটমান কাল বারো/তেরো বছরের। উপন্যাসের শেষে নায়কের রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সংবাদে মন খারাপ হওয়ার কথা আছে। তাই ১৯৪১ সাল সহজেই ধরে নেয়া যায়।

ডানা সর্বোজ্ঞ কথনরীতিতে লেখা একটি মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস। তিনটি পরিচ্ছেদে রচিত এর আখ্যান বা প্লট সরল প্রকৃতির বলা যায়। কারণ একাধিক উপকাহিনি থাকলেও মূল কাহিনিকে তা জটিল করে তোলেনি। প্রথম পরিচ্ছেদে

এগারোটি অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একুশটি অনুচ্ছেদ এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাইশটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে তিনবন্ধু– কবি আনন্দমোহন, বৈজ্ঞানিক অমরেশ এবং রূপচাঁদ মিলে দুরবিন নিয়ে পাখি পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছেন। এ সময় রূপচাঁদ ডানা নামে একটি মেয়েকে পথ থেকে তুলে এনে আশ্রয় দেন। তিন বন্ধু মিলে ডানার দেখভাল করেন। বৈজ্ঞানিকের নদীর ধারে সবজি বাগানের পোড়ো বাড়িতে ডানা আশ্রয় পায়। সেখানে একদিন এক সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে। তিন বন্ধু তখন ডানার বাসায় অবস্থান করায় সবার সাথে সন্ন্যাসীর পরিচয় হয়ে যায়। তিন বন্ধু এবং তাদের স্ত্রীর সাথে ডানার আনন্দমোহন, অমরেশ ও রূপচাঁদ তিনজনের সাথে ডানার আন্তরিকতা গড়ে ওঠে। তবে রূপচাঁদের আচরণে বারবার যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হওয়ায় ডানা তার সাথে সহজ হতে পারেনি। কবি ডানাকে নিয়ে কবিতা লেখে, পাখি নিয়েও কবিতা লেখে। অমরেশের ধ্যান-খেয়াল পাখি পর্যবেক্ষণে। সন্ন্যাসীকে ডানার ভালো লাগে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে; রূপচাঁদের প্রতি ডানা বিরক্ত, ডানাকে না পেয়ে দুই বন্ধুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে রূপচাঁদ; পাখি পর্যবেক্ষণের নেশায় অমরেশ পরিবার সিমলায় ভ্রমণে বের হয়; রূপচাঁদ ডানাকে জড়িয়ে অমরেশের নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়ায়; আনন্দমোহনকে অমরেশের হরিপুর কাছারির ম্যানেজার করা হয়; সন্ন্যাসীকে রূপচাঁদের অনৈতিক ব্যবহারের কথা, টাকার অভাবের কথা জানায় ডানা এবং তার কাছে মানসিক আশ্রয় খোঁজে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে মহিলা প্রজা খুনের ঘটনায় ষড়যন্ত্রের প্যাঁচে ফেলে আসামি করে আনন্দমোহনকে জেল খাটায়; ডানার চেষ্টায় আনন্দমোহন জেল থেকে জামিনে ছাড়া পায়; সন্ন্যাসীর সম্পত্তির সন্ধান পায় কবি;ডানার বন্ধু ভাস্করের সাক্ষাৎ লাভ এবং তার বর্তমান পরিচয় পেয়ে তাকে ত্যাগ করে আসা; সন্ন্যাসীর প্রতি ডানার দুর্বলতা প্রকাশ; সন্ন্যাসীর সব সম্পত্তি ডানাকে উইল করে দেয়া এবং সন্ন্যাসীর কাছ থেকে প্রাপ্ত সব সম্পত্তি তিন বন্ধুকে দিয়ে আত্মানুসন্ধানে ডানার নিরুদ্দেশ হওয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদে পাখি নিয়ে নানা তথ্য থাকায় এবং এর মধ্যে প্রধান চরিত্রের আবির্ভাব হলে কাহিনি যাতে পাখি-তথ্যে ভারাক্রান্ত না হয়ে পড়ে, সে লক্ষ্যে ঔপন্যাসিক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বৈজ্ঞানিককে পাখি গবেষণার কাজে প্রথমে সিমলায়, পরে ইউরোপে পাঠিয়ে দেন। কবি ও ডানার সাথে চিঠির মাধ্যমে পাখিবিষয়ক আলোচনা চালিয়ে যান অমরেশ। এরই মধ্য দিয়ে মূল কাহিনি তার স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যায়। পরিমল গোস্বামী একটি চিঠিতে যেমন বনফুলকে বলেছিলেন, "তুমি বিজ্ঞানী এবং কবি। তোমার গল্পে এই দুয়ের অদ্ভুত মিলন ঘটেছে।" (প্রিয়কান্ত ও রামী; ২০১৭: ২৭) – এ উক্তিটি প্রকৃত অর্থেই যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর এ উপন্যাসে।

উল্লিখিত আখ্যানের মধ্যে প্রায় নব্বইটির মতো কবিতা এবং সাত/আটটি চিঠি রয়েছে। মূল কাহিনি এবং উপকাহিনির সাথে পাখিবিষয়কতথ্য (পাখির ডিম, কোন পাখি কখন ডিম পাড়ে, পাখির বারো রকম ডাক, তার

পালক, তার গান, তার ভাষা, প্রণয় নিবেদনের সময়); কমবেশি মোট ১৩৮ প্রজাতি পাখি সম্পর্কে ধারণা এবং ২০জন পাখিতাত্ত্বিক গ্রন্থকারের নাম; মহাভারতে উল্লিখিত প্রকৃতির কথা; মহাভারতের শান্তিপর্বে উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের কথা; ডারিনের সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট; নিটশের সুপারম্যান; শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ; স্বামী বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' প্রবন্ধ; রবীন্দ্রনাথের কবিতা; শেকসপিয়ারের বাণী (পৃথিবীটা একটা নাট্যমঞ্চ); বকুলবালার তেজোদীপ্ত আচরণের সাথে জোয়ান অব আর্কের তুলনা; পাখির স্বভাবের সাথে 'পথের পাঁচালী'র দুর্গার তুলনা; প্রাচীন সভ্যতা (ইজিপ্ট-ব্যাবিলন-উর), কবি কালিদাস; বিদ্যাপতির মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি; ষোল লাইনের ইংরেজি কবিতা (যে কবিতাটি বনফুল স্কটিশ নার্সকে উপলক্ষ করে লিখেছিলেন); গীতার শ্লোক ওকুমারসম্ভবের শ্লোক– এতোসব অনুষঙ্গের অবতারণা কোনোরূপ জটিলতার সৃষ্টি করেনি। কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাখি প্রসঙ্গ ছিল, কবির কবিতা রচনাও অব্যাহত ছিল। এখানে লেখকের পাণ্ডিত্য প্রধান চরিত্রের নামকরণে–ডানা, পাখি মিশে একাকার হয়েছে। পাখির স্বভাবের সাথে ডানার স্বভাবে কোনো বৈপরীত্য দেখা যায়নি। ডানা সন্ন্যাসীর সব সম্পত্তি দান করে মুক্তবিহঙ্গ হয়ে গেছে।

প্রধান চরিত্র ডানাকে মানসিকভাবে অনেক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে নিয়ত। প্রতিমুহূর্ত তাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। রূপচাঁদের কার্যকলাপ তার ভালো লাগেনি তারপরও তার সাথে স্বাভাবিক ভদ্রতাটুকু করে গেছে। নিজের সাথে নিজের যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথের– 'আমি নারী আমি মহিয়সী'...কবিতার লাইন মনে করে জীবনযুদ্ধে ক্রিয়াশীল থাকতে আবার উঠে দাঁড়ায়। ডানা ফিট হয়ে যাবার পর থেকে নতুন জীবন-প্রত্যয়ে দুর্গম পথচলা শুরু করে। সন্ন্যাসীকে একান্ত নিজের করে পেতে তাকে সরাসরি বলে– "আপনার দেহটাকে যদি ভোগের সামগ্রী করে তুলি, তা হলেও আপনি আপত্তি করবেন না?" (বনফুল, ২০১২/৫: ৩১৬) পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের ঢেউ প্রতিনিয়ত তাকে পাল্টে দিয়েছে। তাই প্রথম দিকে তার মনে হয়েছিল অনেক টাকা থাকলে সে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারতো সহজেই। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে তত্ত্বকথা শুনে শুনে জীবনবোধের অন্বেষণে পরবর্তীকালে টাকা তার কাছে কোনো গুরুত্বই বহন করেনি। সবরকম মোহের উর্ধ্বে উঠে সহায়-সম্বলহীন হয়ে বোহেমিয়ান জীবন বেছে নেয় সে। লেখক দৃঢ় প্রত্যয়ী, তেজোদীপ্ত, স্বাধীনচেতা, পরিশ্রমী নারী চরিত্ররূপে সৃষ্টি করেছেন ডানাকে। আনন্দমোহন, অমরেশ, বকুলবালা, মন্দাকিনি, রত্নপ্রভা চরিত্রগুলো জীবনের সরল রেখায় অঙ্কিত। এসব চরিত্রের মধ্যে ডানার মতো জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই বা যন্ত্রণা নেই। অমরেশের পাখি তত্ত্বের নেশা এবং কবির সৌন্দর্যবোধ ও রূপ-পিপাসার– এ দ্বৈতসত্তা ঔপন্যাসিকের দ্বৈতসত্তার বাহ্যিকরূপ। তবে স্বার্থপর, নারীলোলুপ রূপচাঁদ ও ডানার প্রাক্তন প্রেমিক ভাস্কর বসু চরিত্র দুটি একটু বক্ররেখায় গিয়েছে। সন্ন্যাসী চরিত্রটি এক রৈখিক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন লেখক। কাহিনির শুরুতেই তাকে যে অবস্থায় দেখা

গেছে, শেষেও তার একই রূপ দেখতে পান পাঠক। তন্বী মোহিনী ডানার হৃদয়-বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি সে। শুধু তাই নয়, সব বিষয়ে রয়েছে তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কাহিনির কোনো পর্যায়ে কোনো কিছুর প্রতি মোহ বা কাম-ক্রোধ-ভয় কিছুই তার চরিত্রে বাহ্যিক ক্রিয়া করেনি। একজন সাধারণ সন্ন্যাসীর লক্ষণ তার মধ্যে পরিস্ফুট হতে দেখা গেছে। তার ভাষা ব্যবহারও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রতিভাত করেছে।

লেখক চরিত্রের মুখে সময় উপযোগী ভাষার ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি-বাংলা প্রবাদ প্রবচন ও অলংকারের ব্যবহার ভাষাকে আরো গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তুলেছে। চরিত্রদের সংলাপের মাঝে অনুচ্চারিত সংলাপ পাঠকের সাথে কথকের উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বারবার –

> গর্ত থেকে মুখ সরিয়ে ঘার ফেরাতেই আর একটা জিনিস চোখে পড়ল ডানার। তারা যেখানে ছিল, সেখানে নদীর পাড়টা খুব উঁচু। আর কিছুদূর গিয়ে পাড়টা খাড়া নেবে গেছে। নীচে গভীর খাদ একটা। তাতে জল ঢুকেছে এসে। জলের এক ধারে চওড়া পাথর একটা এগিয়ে এসেছে ছোট বারান্দার মতো। ডানা দেখতে পেলেন তার উপর বসে আছে রূপচাঁদ আর সনাতন মল্লিক। সনাতন মল্লিক ফাতনায় নিবদ্ধ দৃষ্টি। রূপচাঁদ দুরবিন দিয়ে তাদেরই দেখছেন বোধ হয়। (পৃ. ২৭৫)

উপন্যাসে সময়ের ব্যবহার বিষয়ে বলা যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষের দিকে পনেরো অনুচ্ছেদে, ভাস্কর বসুকে ডানা জানায়, ছয় মাস হয়ে গেছে সে এখানে আছে। ডানার উপস্থিতি উপন্যাসের শুরু থেকেই লক্ষ করা গেছে। সব শেষ বাইশ অনুচ্ছেদে ঘনঘোর বর্ষার কথা বলা আছে। তাছাড়া প্রথম পরিচ্ছেদের শুরুতে বসন্ত বউরি পাখির কথা আছে। শুরুর দিকে বসন্তের কথা এবং শেষে বর্ষার কথা আছে অর্থাৎ ডানার ছয় মাসাধিক সময়ের মধ্যে উপন্যাসের কাহিনির ঘটমানকাল। এরই মধ্যে আবার দিনের প্রতিটি সময়ের উল্লেখ আছে।

স্থাবর উপন্যাসের গঠন কৌশল একেবারেই নতুন চেহারার। উত্তম পুরুষে রচিত মানবসভ্যতার ইতিহাসের বয়ান উঠে এসেছে এখানে। উপন্যাসের নায়ক জংলা চিরজীবী, সে অমর। মহাকালের হাত ধরে প্রাগৈতিহাসিক সময়ের মানুষরূপী জংলার বিবর্তন কীভাবে হয়েছে তা-ই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এ কারণে উপন্যাসের গঠন কৌশল ভিন্ন আঙ্গিকের। একই কারণে কথককেস্থান-কাল-পাত্রে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। অন্তর প্রেরণার তাগাদায় মানবজাতির সামনে ছুটে চলার ইতিহাস এ উপন্যাস। এ ছুটে চলার নায়ক জংলার স্মৃতিকথা উপন্যাসের কাহিনি। এটি একটি কাল্পনিক কাহিনি হলেও এর মনস্তাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এভাবে– "সুদূর অতীতের নিবিড় অন্ধকার হইতে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতেছি। আমি অমর আত্মা, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আকাশে-বাতাসে, সমুদ্রে-নদীতে, অরণ্যে-পর্বতে, মরুভূমির উষরতায়, শস্যক্ষেত্রের শ্যাম-শোভায় অহরহ সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছি।" (বনফুল, ২০১৩/৬: ৪০৩)

পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত উপন্যাসটির পঞ্চম পরিচ্ছেদটি এককভাবে অন্য পরিচ্ছেদ থেকে আকারে অনেক বিস্তৃত। পঞ্চম পরিচ্ছেদটির পর অনায়াসে আরো অনেক পরিচ্ছেদ করা যেত– এ বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে বীতশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত বনফুলের রচনাসমগ্র এর ষষ্ঠ খণ্ডে ভূমিকায় সুমিতা চক্রবর্তীর মন্তব্য যুক্তিসংগত বলেই ধরে নেয়া যায়। উপন্যাসের সংলাপ ও ভাষা প্রসঙ্গে বলা যায়,তৃতীয় খণ্ড থেকে সংলাপ ব্যবহার করেছেন লেখক। জংলা একটি নিহত হরিণকে টেনে টেনে পুঠার কাছে নিয়ে এলে তা দেখে অভিভূত পুঠা আদিম কায়দায় ভালোবাসা দিয়ে বলে ওঠে–"এই গর্তটার ভিতর হরিণটাকে বরফ চাপা দিয়া এখন লুকাইয়া রাখ। কাল যথাসময়ে ইহাকে বাহির করিতে হইবে। কাল রূঠার জীবনের শুভতম দিন।" (পৃ. ৪৪২) আধুনিক সমাজে অঞ্চল ভিত্তিক ভাষার যেমন তারতম্য রয়েছে তেমনি পুঠা-রূঠার সমাজেও ভাষার রকমফের ছিল। জংলার আত্মকথনে লেখক সে আভাসই দিয়েছেন –

> একটা কথাই বারবার মনে হইতেছিল ভাগ্যে ইহাদের ভাষার সহিত আমার ভাষার কোনও অমিল নাই। থাকিলে কি পুঠা আমাকে আশ্রয় দিত? কি করিয়া যে ইহাদের ভাষার সহিত আমার ভাষার মিল হইল তাহাই চিন্তা করিতে করিতে চলিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইতছিল, হয়তো কোনও কালে ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ছিল। হয়তো আমার পূর্বপুরুষ এবং ইহাতের পূর্বপুরুষ একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিপর্যয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। (পৃ. ৪৪৩)

বিষয়বস্তু ও গঠনরীতিতে লেখকের পরীক্ষা-প্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি উপন্যাসের চরিত্রদের নাম নির্বাচনেও সমুজ্জ্বল ছিল। চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গন্ধ গন্ধ মনে হয়। নামের বৈশিষ্ট্যও ধারণ করে আছে যেন প্রতিটি চরিত্র। যেমন– জংলা, বন-জঙ্গলে জংলীর কথা মনে করিয়ে দেয় আবার জুজুম উচ্চারণে জুলুমের কথা মনে পড়ে যায়। বিতং, দিক্ষু, লেধু, ঘিসু, ধবল, মীংরা, উলম্ভন, ইকা গৌ, জোলমা, রাহুলা, রূঠা, ডিংঘা, পুঠা, নিনানি, শিলাঙ্গী।

৪. পত্রোপন্যাস

প্রাপক ও প্রেরক– এ দুই চরিত্রের সমন্বয়ে পত্রসাহিত্যের সৃষ্টি। সেখানে চরিত্রই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যক্তির অন্তরের একান্ত অনুভূতি তার চিন্তন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে অন্যের কাছে প্রকাশ করাই পত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পত্রসাহিত্যের দুটি ধারা – পত্রকাব্য ও পত্রোপন্যাস। সাধারণভাবে পত্রের আকারে লেখা উপন্যাসকে পত্রোপন্যাস বলে। ইংরেজিতে পত্রোপন্যাসকে 'এপিস্টোলারি নভেল' (Epistolary novel) চরিত্রের মাধ্যমেই এর কাহিনি বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এ ধরনের উপন্যাসের সূত্রপাত হয়েছে মূলত পাত্রপাত্রীদের চিঠির বর্ণনা দেয়া থেকে পরবর্তীকালে উপন্যাসে বর্ণনার অংশ কমিয়ে চিঠিকেই প্রাধান্য দিয়ে চিঠিতেই প্রায় সব আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ইংরেজি সাহিত্যে অনেকে পত্রোপন্যাস লিখেছেন, তাদের মধ্যে স্যামুয়েল রিচার্ডসনের *পামেলা* ও *ক্লারিসা হার্লো*, স্মলেটের লেখা *হামফ্রি ক্লিঙ্কার*, হ্যারিয়েট লির *এরস অব ইনোসেন্স*, সুইনবার্নের *লাভস ক্রস-কারেস* উল্লেখযোগ্য। বাংলা

সাহিত্যে বনফুলের আগে অনেক পত্রোপন্যাস লেখা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম পত্রোপন্যাস লেখার কৃতিত্বের দাবিদার নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বসন্ত কুমারের পত্র*। পরবর্তীকালে যাঁরা পত্রোপন্যাস লিখেছেন, তাঁরা হলেন – মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, তরূণ কুমার ভাদুড়ীর, *সন্ধ্যাদীপের শিখা*, নিমাই ভট্টাচার্যের *মেমসাহেব*, সন্তোষকুমার ঘোষ, বুদ্ধদেব গুহ, আহমদ ছফা।

কষ্টিপাথর-এর কাহিনি গড়ে উঠেছে মোট তেপান্নটি চিঠির মাধ্যমে। এখানে অসিত, হাসি, নীলাম্বর,মহেন্দ্র, চিত্রাও অতুল– এ ছয়জনের চিঠি রয়েছে। এর আখ্যানকে পাঁচটি পর্বে বিভাজন করা যায়। প্রথম পর্বে 'অসিতের পত্রাবলি' নামে সাতাশটি চিঠি রয়েছে; দ্বিতীয় পর্বে 'নীলাম্বরবাবুর পত্রাবলি' নামে উনিশটি চিঠি রয়েছে; তৃতীয় পর্বে আবারো 'অসিতের পত্রাবলি' নামে পাঁচটি চিঠি রয়েছে; চতুর্থ পর্বে হাসির চিঠি এবং পঞ্চম পর্বে অসিতের উত্তর। অসিতের পত্রাবলিতে কেবল অসিতের স্ত্রী হাসিকে লেখা চিঠি নয়, এখানে অসিতের চিঠি এবং অসিতকে উদ্দেশ্য করে লেখা তার বন্ধু অতুল, মহেন্দ্র এবং মহেন্দ্রের স্ত্রী চিত্রার চিঠিও রয়েছে। অসিতের পত্রাবলিতে কাহিনি সমান্তরালভাবে এগিয়ে গিয়েছে। অসিতের চিঠিতে রয়েছে হোস্টেলে থাকা নববিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা এবং স্ত্রী-বিরহের কথা। হাসির বাবা নীলাম্বরবাবুর চিঠিতে রয়েছে তার বন্ধু সদানন্দকে উদ্দেশ্য করে লেখা। বন্ধু সদানন্দকে লেখা নীলাম্বরের চিঠিতে উঠে এসেছে নীলাম্বরের বিয়ে, সংসার, হাসির জন্ম এবং হাসিকে লালনপালন করার কথা। নীলাম্বরের চিঠিগুলো কাহিনির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, কাহিনির জটিলতা সৃষ্টি করেছে। ফলে অসিতের মনে হাসিকে নিয়ে পাওয়া না পাওয়ার একরকম আশঙ্কা কাজ করে। অসিতের পত্রাবলি নামে পরের পর্বে আছে হাসির নিখোঁজ হওয়া এবং হাসির জন্ম রহস্য উন্মোচন আর হাসির চিঠিতে রয়েছে হাসির নিখোঁজ হওয়ার পেছনে সংগত কারণ, তার ব্যক্তিত্ববোধ এবং জোর করে নয়, ভালোবাসার অধিকার নিয়ে ফিরে আসার ইচ্ছের কথা। হাসির চিঠির মধ্যে দিয়ে কাহিনির জটিল গ্রন্থনমোচন সহজ হয়ে দাঁড়ায়। সব শেষে 'অসিতের উত্তর'-এ পাঠক হাসি ও অসিতের মিলনের কথা জানতে পারে।

উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই বাস্তবের চেনাজগৎ থেকে উঠে এসেছে। চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের অন্বিষ্ট হয় দ্বন্দ্বপূর্ণ মানুষের প্রতিরূপ নির্মাণে। এখানে প্রধান তিনটি চরিত্রের মধ্যে অসিতের চরিত্রটি সরল ধারায় লেখক সৃষ্টি করেছেন। অসিত উদারমানসিকতার, আত্মপ্রত্যয়ী এবং আত্মবিশ্বসী চরিত্র। নীলাম্বর ও হাসি চরিত্র দুটি জটিল মানসিক যন্ত্রণায় উত্তীর্ণ হয়ে জীবনের মানে খুঁজেছে। নিঃস্বার্থভাবে অন্যের উপকার করে বেড়ানো নীলাম্বরের জীবনে ঝড় উঠেছে বারবার। সে ঝড়ের কবলে পড়ে পাখা ঝাপটিয়ে ঝাপটিয়ে মেরুদণ্ড সোজা রেখেছে। তাই জীবনটাকে

তাঁর খেলা বলে মনে হয়েছে–"জীবনটা আমার নিকট খেলা মাত্র। একটানা একটা খেলাও নয়, বহু খেলার সমষ্টি। ক্রিকেট খেলায় অনেকবার আউট হইয়াছি, অনেকবার আউট করিয়াছিও, কোনটা কতবার করিয়াছি তাহার হিসাব রাখি না, সব মনেও নাই।" (বনফুল, ২০১৩/৭: ৮৭) পরোপকারী নীলাম্বর জীবনে অনেকবার বাধার সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু মুষড়ে পড়েননি। জীবন তরী বেয়ে চলেছেন। অন্যের হিত করতে গিয়ে সমাজের চোখে হীন হয়েছেন। ফলে ভদ্রসমাজ থেকে পালিয়ে থাকার চেষ্টা করেছেন। কুম্ভমেলা থেকে এক মূক-বধির অপরিচিত একটি মেয়েকে গুণ্ডাদের কবল থেকে উদ্ধার করে আনেন। পরে বাধ্য হয়ে সামাজিক নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তাকে বিয়ে করে সংসারি হন। তাদের একটি মেয়ে হয়, তার নাম রাখেন হাসি। একদিন হঠাৎ অজ্ঞাতপরিচয় মেয়েটি শিশু হাসিকে ফেলে রেখে একটি চিঠি লিখে চলে যায়। চিঠি পড়ে নীলাম্বর জানতে পারেন, মূক মেয়েটি ছিল মুসলমান এক কাবুলিওয়ালার স্ত্রী। এরই মধ্যে জানতে পারা যায় মেয়েটি রক্তে পিতৃ-মাতৃপ্রদত্ত সিফিলিসের বিষ বয়ে বেড়াচ্ছে, যা বংশ পরম্পরায় হাসির মধ্যে সংক্রমণ হতে পারে। হাসিকে প্রতিপালনের জন্য তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে হয়েছে এবং হাসির জন্ম রহস্য গোপন রেখে তাকে মানুষ করার মানসিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি তিনি। যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়; হাসি বিয়ের পর তার জন্ম রহস্য জানতে পেরে বাবা নীলাম্বরকে ত্যাগ করে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর হাসির সন্ধান পেলেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি নীলাম্বর। এভাবেই দ্বন্দ্বসংকুল এ চরিত্রটি একটি সামগ্রিক চরিত্র হয়ে উঠেছে। হাসি চরিত্রটিকে মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত, শিক্ষিত, অধিকার সচেতন এবং ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন চরিত্র হিসেবেসৃষ্টি করেছেন লেখক।তাই নিজের জন্ম রহস্য জানার পরও সে বিপথগামী হয়নি। একটি ব্যাগকে সম্বল করে বাবাকে ছেড়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে ঘর ছেড়ে আসে সে। নিজের চেষ্টাতে চাকরি জুটিয়ে নেয়, চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং আত্মমর্যাদা নিয়ে স্বামীর কাছে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে চিঠি লেখে –

> তুমি আমাকে ফিরে নেবে কি? তোমার দিক থেকে যদি কোনও কুণ্ঠা থাকে তাহলে আমি ফিরতে চাই না। দোহাই তোমার, অনুকম্পা করে আমাকে ফিরে যেতে বোলো না। কারণ, ঠিক যেখানটিতে গিয়ে আমি দাঁড়াতে চাই সেখানটি তোমার চক্ষে গ্লানিহীন না হলে আমি দাঁড়াতে পারব না। বাইরের লোক কহু কুৎসার কর্দমে আমাকে নাইয়ে দেবে জানি কিন্তু সব আমিহাসিমুখে সহ্য করতে পারব তুমি যদি আমার সম্বন্ধে অকুণ্ঠিত হও। (পৃ, ১০২)

বনফুলের নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হাসি চরিত্রটি। প্রায় দশ বছর পূর্বে প্রকাশিত *জঙ্গম* উপন্যাসেও একই নামের একই স্বভাব বৈশিষ্ট্যের নারী চরিত্র আছে। বনফুল বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে এসে দেখেছিলেন –

যে, একদিকে সমাজে তখনও নারীরা নিগৃহীত হচ্ছে, অপরদিকে শিক্ষার প্রভাবে মেয়েদের স্বনির্ভরতার আকাঙ্ক্ষা ক্রমবর্দ্ধমান। সমাজসচেতন শিল্পী বনফুল সমর্থন করেছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতাকে, উপন্যাসের হাসি তাই এ যুগেরই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন এক স্বাধীন নারী;...। (ঊর্মি, ১৯৯৭: ১৮৩)

অতুল, মহেন্দ্র, চিত্রা চরিত্রগুলো তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরছে অনায়াসে। উত্তম পুরুষে রচিত এ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে পাঠকের কাছে। অসিত উদারমনস্ক এবং কিছুটা সাবধানী বলে মনে হয়। তাই নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা বা জন্ম-রহস্য নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা তার ধাতে নেই। অসিতের এ আধুনিকতা শিল্পীমনেরই আধুনিকতা। অতুল চরিত্রটি ক্ষীণ পরিসরে দস্তয়েভস্কির *দ্য ইডিয়েট*উপন্যাসের ইপ্পোলিত চরিত্রটিকে আভাসে মনে করিয়ে দেয়। (ভূমিকা, অপু দাস, বনফুল, ২০১২/৭: ১৩)

উপন্যাসের আঙ্গিকবিচারে সংলাপ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। স্থান-কালের বিবেচনায় এ উপন্যাসে চরিত্রদের মুখে ভাষা দিয়েছেন লেখক। নীলাম্বরবাবু ছাড়া বাকি চরিত্রদের মুখে ভাষার চলিতরূপ দিয়েছেন তিনি। নীলাম্বরের চিঠিতে সাধু ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। অতুলের চিঠিতে লেখক ইংরেজি ভাষার বাংলা উচ্চারণ ব্যবহার করেছেন। যেমন, "নেভার মাইন্ড, চীয়ার আপ।" (পৃ. ৬৮) উল্লেখ্য, উপন্যাসের চিঠিগুলো সব লেখকের ব্যক্তিজীবনে তাঁর নববধূ লীলাবতীকে উদ্দেশ্য করে লেখা। বিয়ের পর লীলা হোস্টেলে চলে যায় আর লেখক বাড়িতে ছিলেন এমবিবিএস পরীক্ষার ফল প্রকাশের অপেক্ষায়। তখন লীলাকে তিনি প্রেমপত্র ও প্রেমের কবিতা লেখতে শুরু করেন। বনফুল তাঁর আত্মজীবনী *পশ্চাৎপটে* উল্লেখ করেছেন:

পরিমল তাহার স্মৃতিচারণে লিখিয়াছে যে এই সময়টা আমি সাহিত্যচর্চা হইতে বিরত ছিলাম। মোটেই বিরত ছিলাম না। কিন্তু যে সাহিত্য আমি তখন রচনা করিয়াছিলাম তাহা মাসিকপত্রে প্রকাশযোগ্য ছিল না। তাহা লীলার নিকট প্রেরিত এবং সে তাহা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিত। এই চিঠিগুলির কয়েকটি পরে আমি কিছু পরিবর্তন করিয়া আমার *কষ্টিপাথর* উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছিলাম। (বনফুল, ১৯৯৯: ১৫২)

'আধুনিকা' নামে গদ্য কবিতায় লেখা বনফুলের চিঠিটি অসিতের চিঠিরূপে হুবহু ছাপিয়ে দিয়েছেন, যা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। (ঊর্মি, ১৯৯৭: ১৮৪)

অসিতের পঞ্চম চিঠি থেকে তারিখের উল্লেখ দেখা যায়, সেখানে উনিশ শ' ঊনপঞ্চাশ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি লেখা আছে। ধরে নেয়া যেতে পারে যে, একই বছরের জানুয়ারি থেকে চিঠি লেখা শুরু হয়েছে। কারণ চিঠিগুলোর তারিখের মধ্যে সময়ের ব্যবধান শেষ চিঠির তারিখ উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের ১০ জুন। নীলাম্বরের চিঠির তারিখ শুরু হয়েছে একই বছরের আঠাশ সাল থেকে এবং তাঁর চিঠি থেকে তাঁর বয়সের কথা জানা যায় পঁয়ত্রিশ বছর। যাই

হোক, নীলাম্বরের চিঠির তারিখ থেকে ধরে গণনা করলে সময় পাওয়া যায় বাইশ বছর। এ বাইশ বছর চার মাসের কাহিনি চিঠির মাধ্যমে জানতে পারেন পাঠক। হাসিকে লেখা অসিতের চিঠিতে কবি কালিদাসের মেঘদূতের প্রসঙ্গ আছে। বর্ষা ঋতুতে মেঘদূত পড়তে ভালো লাগার কথা *মহারাণী*তে লক্ষ করা যায়। সেখানেও বর্ষার দিনে মহারাণী শ্রীহর্ষকে ডেকে পাঠায় তাকে মেঘদূত পড়ে শোনাতে। বর্ষায় মেঘদূতের কথা বনফুলের মনে পড়তো, সে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে মনে করা যায়।

৫. ডায়েরিধর্মী উপন্যাস

৫.১

অনেকে পত্রোপন্যাস ও ডায়েরিধর্মী উপন্যাসকে মিলিয়ে ফেলেন। কিন্তু পত্রোপন্যাস ও ডায়েরিধর্মী উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। পত্রোপন্যাসে বক্তব্যের বিষয় দুজনের মধ্যে আদান প্রদানে সীমাবদ্ধ থাকে আর ডায়েরি ব্যক্তি বিশেষের রচনা। ডায়েরি পঞ্জিকানির্ভর, পঞ্জিকা মেনে লেখা হয় আর পত্রে নির্দিষ্ট দিনের তারিখ ও জায়গার নাম লিপিবদ্ধ থাকে। ডায়েরিতে ব্যক্তি তার দিনের স্মরণীয় বা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা মুহূর্তটুকু লিপিবদ্ধ করে, যা কোনো বিষয় বা ব্যক্তিকেঅবলম্বন করে গড়ে ওঠে। ডায়েরি অনেকটা তথ্যবহুল রচনা, অন্যদিকে পত্রে ব্যক্তির বিভিন্ন অনুভূতি নানা রঙে রঞ্জিত হয়েকালোত্তীর্ণ ও রসোত্তীর্ণ রচনা হয়ে ওঠে। ফলে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় স্বাভাবিক নিয়মে।

অন্যভাবে বলা যায়, যে রচনায় কোনো ব্যক্তির প্রতিদিনের অসংখ্য ঘটনা থেকে তথ্যবহুল উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় সে জাতীয় রচনাকে দিনলিপি বলা হয়। বনফুলের *অগ্নীশ্বর ও হাটে বাজারে* উপন্যাস দুটিকে ডায়েরিধর্মী রচনা বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এরমধ্যে *অগ্নীশ্বর* উপন্যাসটি একটু অন্যরকম ডায়েরিধর্মী রচনা। তবে *হাটে বাজারে* সম্পূর্ণ ডায়েরি আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস। দুটি উপন্যাসের আঙ্গিকে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। *অগ্নীশ্বর* প্রকাশিত হওয়ার তিন বছর পর তাঁর *হাটেবাজারে* প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ করা হয়েছে, *অগ্নীশ্বর* উপন্যাসের আঙ্গিক ভিন্ন ধাঁচের। বনফুলের মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জীবনের আদলে এউপন্যাস লিখেছেন। ডাক্তার বনবিহারী কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যেও তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বনফুল বলেছেন, তিনি তাঁর প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন মূলত সাহিত্য ক্ষেত্রে। লেখার জন্যই তিনি তাঁকে স্নেহ করতেন এবং প্রশ্রয় দিতেন একটু বেশি। তিনি ভাগলপুর থাকাকালীন বনফুল তাঁর অনেক লেখা তাঁকে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিতেন। বনবিহারী সেগুলো সংশোধন করে দিতেন। সাথে একটি চিঠিও দিতেন তিনি। বনফুল সে চিঠিকে শিক্ষকের বেত বলে মনে করতেন। বনফুলের

মতে, বনবিহারী ছিলেন তাঁর সাহিত্য সাধনার পথে প্রথম শ্রেণির গাইড একজন। লেখা ভালো হলে বলতেন – "সুর ঠিক বাঁধতে পার নি, বেসুরো ঠেকছে মাঝে মাঝে। আগাগোড়া ঢেলে লেখ।" (বনফুল, ১৯৯৯: ২২৫)

এর আখ্যানভাগ ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে অগ্নীশ্বরের প্রখর ব্যক্তিত্বের ও তাঁর কাজের ধরন সম্পর্কে পাঁচটি নমুনা-ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, অগ্নীশ্বরের সাহিত্য-প্রীতি এবং তাঁর প্রকাশিত লেখা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে অগ্নীশ্বরের বিয়ে, তাঁর সাংসারিক জীবন, স্ত্রীর সাথে তাঁর মিল না হওয়ার পেছনের কারণ, যৌতুক নেয়ার কারণে ছেলের বিয়েতে উপস্থিত না হওয়া এবং সংসারের সব দায়িত্বভার ছেলেকে দিয়ে দাতব্য হাসপাতালে যোগদান এবং মুক্ত-স্বাধীন জীবনের লক্ষ্যে চিরতরে গৃহ ত্যাগের কথা। এবং এরই মাঝখানে তিন বেদেনিসহ খা খা বাবার গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ পাঠককে জানানো হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে কথকের সাথে অগ্নীশ্বরের যোগাযোগ এবং ব্রিটিশ পুলিশের হাত থেকে কথককে প্রাণে বাঁচানো, কথকের ছদ্মবেশ নেয়া এবং ঘটনাক্রমে দ্বিতীয়বারের মতো নিজের প্রাণ বাঁচাতে দেশান্তরিত হওয়া। এ সময় জাহাজের ডেকে অগ্নীশ্বরের ছাত্রের সাথে কথকের পরিচয়, পরিচয়ের সূত্র ধরে ছাত্রকে লেখা অগ্নীশ্বরের 'আধুনিক পঞ্চকন্যা' নিয়ে আলাপ। পঞ্চম পরিচ্ছেদে, পুরাণের পঞ্চকন্যা এবং অগ্নীশ্বরের দেখা আধুনিক পঞ্চকন্যার বিস্তৃত বর্ণনা এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কথকের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার হয়ে ওঠার কাহিনি এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ,কথকের নিজ দেশে ফিরে এসে কাজের ফাঁকে ফাঁকেঅগ্নীশ্বরের খোঁজ করা;বেদেনি দলের নেতা খা খা বাবা ছদ্মনামে অগ্নীশ্বরকে চিনতে পারা, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ;কিন্তু অগ্নীশ্বরের খা খা বাবার পরিচয়ে অটল থাকা।

উত্তম পুরুষে রচিত উপন্যাসটির প্লট জটিল প্রকৃতির। প্রধান কাহিনির সাথে অনেক উপকাহিনি জুড়ে দিয়েছেন লেখক। উপকাহিনিগুলো এক-একটি স্বতন্ত্র উপন্যাস সৃষ্টির উপাদানে সমৃদ্ধ। তথাপি কাহিনিগুলো মূল কাহিনি থেকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে পৃথক বলে ভাবনার উপায় নেই কারণ কাহিনির সর্বত্রই অগ্নীশ্বরের উপস্থিতি বিদ্যমান। পুরাণের পঞ্চকন্যা এবং আধুনিক পঞ্চকন্যার প্রসঙ্গ অবতারণায় কাহিনি গ্রন্থন জটিল রূপ ধারণ করেছে। কাহিনির পরম্পরা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। উপন্যাসটির স্বাতন্ত্র্য বিশেষত বিষয়বস্তু এবং এর গঠন কৌশলে। বনফুল বনবিহারীর জ্ঞানের গভীরতা বোঝাতে এবং সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা বলতে গিয়ে পঞ্চকন্যাদের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পারতপক্ষে জ্ঞানের এ বিস্তৃতি বনফুলেরও।

কথক অগ্নীশ্বরের জীবন-কাহিনি লিখতে অনেক চিঠি ব্যবহার করেছেন। সেসব চিঠি অগ্নীশ্বরের ভাই, তাঁর মেডিকেল কলেজের বন্ধু এবং তাঁর ছেলের কাছ থেকে সংগৃহীত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাঁচটি এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে

চারটি চিঠির বয়ান ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে একটি করে চিঠি রয়েছে। কিন্তু কথকের কোনো চিঠি এখানে নেই। টেক্সটের ভেতরে টেক্সট (অগ্নীশ্বরের আধুনিক পঞ্চকন্যার নামে লেখাটা একটা টেক্সট, [যেমন, তার উত্তরে তিনি ছোটখাটো একটা বই লিখে পাঠিয়েছেন (বনফুল, ২০১৩/১০: ৫৯)], চিঠির ভেতরে চিঠি এবং জীবন-কাহিনির ভেতর জীবন-কাহিনি বলা [পাঠককে কথকের অগ্নীশ্বরের কাহিনি শোনানো: আজ তাঁহার জীবন-কাহিনি লিখিতে বসিয়াছি (পৃ. ৪২) ...আবার অগ্নীশ্বরের ছাত্রকে কথকের জীবন-কাহিনি বলা: তাঁহাকে আমার জীবন কাহিনি শুনাইতে লাগিলাম (পৃ. ৬৫)] যদিও কাহিনিটি ব্যক্ত হয়নি, পাঠকের আগেই কাহিনিটি জানা ছিল।

চরিত্র চিত্রায়ণের কৌশল আলোচনায় বলা যায়, অগ্নীশ্বরের চরিত্র সৃষ্টিতে সমগ্রতা লাভ করেছে। সারা জীবন আলেয়ার পেছনেই ছোটাছুটি করেছেন। জীবনে তিনি কিছুই চাননি। গরিবের ডাক্তার তিনি। কারো কাছ থেকে জোর করে ফি আদায় করেননি, অতি ভালো মানুষ সেজে আবার ফি ফেরতও দেননি। যে যেমন দিতে পেরেছেন তার কাছ থেকে তেমনই তিনি নিয়েছেন। কারো মতের সাথে মিল না হওয়ায় সারা জীবন নিজের মতো করেই চলেছেন। যখন সংসারে থাকতে ইচ্ছে করেনি আর, তখন সংসার ত্যাগ করেছেন। কোনো শহরে বেশি দিন অবস্থান করেননি,এক মাসের বেশি না। সারা দেশ তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। পুলিশ কথক অগ্নীশ্বরের সত্য পরিচয় জানতে উদগ্রীব,তাই বারবার জিজ্ঞাসাবাদে বের করার চেষ্টা করছে খা খা বাবার নির্মোক উন্মোচন করতে। কিন্তু বোহেমিয়ান এ মানুষটিকে বলতে শোনা যায় –

> দেখুন জীবনে কখনও কারও কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করি নি। আপনার কাছেও করছি না। আমাকে জেলে পুরে রাখলে বা ফাঁসি দিলে যদি আপনার চাকরির সুবিধা হয় তাহলে তাই করুন। ওই বেদের মেয়েদের সঙ্গে আমি নরকে যেতেও রাজি আছি। ওরা নরকেও স্বর্গ গড়ে তুলবে। জিপসিদের ইতিহাস পড়েছেন?...প্রতি দেশে ওদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার হয়েছে তা অবর্ণনীয়। তবু ওরা প্রত্যেক দেশেই টিকে আছে এখনও। শুধু টিকে নেই, নেচে গেয়ে মাত করে রেখেছে প্রত্যেক দেশকে...এই অবহেলিত অবজ্ঞাত কিন্তু দুর্জয় প্রাণরসে ভরপুর শিল্পীর দলে যদি ভিড়েই থাকি তাহলে ক্ষতি কি– (বনফুল, ২০১৩/১০: ১২৫)

ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় শেষ জীবনে কনখল রামকৃষ্ণমিশনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এর আগেও তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ছিলেন। বনবিহারীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাঁর জীবনযাত্রার কথা বলতে গিয়ে পরিমল গোস্বামী একই কথা বলেছেন। "শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'স্কলার জিপসি' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি নি।"(ঊর্মি, ১৯৯৭: ১৯২) বনবিহারীর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবশত বনফুলএ অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র, কথক-পুলিশ চরিত্র। এটি একটি কাল্পনিক চরিত্র। তবে লেখক এ চরিত্রটিকে বাস্তবোচিত করেই সৃষ্টি করেছেন। অগ্নীশ্বর একবার তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত সে বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে পুলিশ অফিসার হয়ে দেশে ফিরে এসে অগ্নীশ্বরকে খুঁজে বের করে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ঋণ শোধ করার মানসিকতা থেকে সে অগ্নীশ্বরের জীবন-কাহিনি লিখে। তার বাসায় অগ্নীশ্বরের ছবি টানিয়ে রাখে এবং প্রতিদিন সকালে ও ঘুমাতে যাওয়ার আগে ছবিটিকে সে নমস্কার করে। পরিতাপের বিষয়, এক সময় সে অগ্নীশ্বরকে খুঁজে পায় কিন্তু ছদ্ম পরিচয়ের আড়ালে।

বরাবরের মতো এ উপন্যাসেও লেখক স্থান-কালের ঐক্য অনুযায়ী চরিত্রদের মুখে ভাষার ব্যবহার করেছেন। চরিত্রদের মুখের সংলাপ তাদের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। যেমন, স্বদেশিকে যখন অগ্নীশ্বরের ছাত্র প্রশ্ন করে বিলেত গিয়ে সে কী করবে তখন সে বলে: "যদি ওখানে সুযোগ পাই, পুলিশ লাইনে ট্রেনিং নেব।"(বনফুল, ২০১৩/১০: ৬৬) সারেং তার ছেলের প্রাণ বাঁচানোর পুরস্কার দিতে চাইলে কথক বলেন– "আপনার ছেলের জান বাঁচাতে পেরেছি এটা তো আমার যথেষ্ট বকশিশ। খোদাতালা ওকে বাঁচিয়ে রাখুন, এর জন্যে আমি টাকা নিতে পারব না। গোস্তাকি মাপ করবেন। (বনফুল, ২০১৩/১০: ৫৫) অগ্নীশ্বর ছেলেকে লেখেন– বাইরে থাকলেই আমি সুখে থাকব এবং আমার ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্বের আঁচটা সরে গেলে তোমরাও সুখে থাকবে আশা করি। (পৃ.৫০-৫১)

অগ্নীশ্বরের জীবন-কাহিনি লেখার প্রথম দিকে দলনেতা খা খা বাবাসহ একদিন বেদেনির দল ধরা পড়ে। তখন কথক-পুলিশের আদেশে তাদের লকআপে রাখা হয় আর এদিকে কাহিনি লেখার কাজ চলতে থাকে। কাহিনি লেখা শেষ হওয়ার পর একদিন বিহারে কথকের কাছে দারোগা আসামিদের নিয়ে উপস্থিত হয়। তখন জেরার কাজ চলতে থাকে। কাহিনি শুরু ও শেষের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে উঠে এসেছে প্রায় চল্লিশ বছরের জীবন কথা। এ উপন্যাসেও বর্ষা ঋতুর কথা আছে। বনফুলের উপন্যাসের আঙ্গিক গঠনে মিথের ব্যবহার লক্ষণীয়।

হাটেবাজারে উপন্যাসে ডাক্তার সদাশিব যেন অগ্নীশ্বরের আরেক সংস্করণ। পাঠক লেখকের প্রতিরূপ আবার দেখতে পেলেন সদাশিবের মধ্যে। বনফুলের পুরস্কারপ্রাপ্ত বহুল জনপ্রিয় উপন্যাস *হাটেবাজারের* আখ্যান গড়ে উঠেছে উনিশটি পরিচ্ছেদে। এর মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে উপন্যাসে সদাশিবের বর্তমান সময় অর্থাৎ *হাটেবাজারে* ঘুরে অসহায়দের চিকিৎসা করে দিন অতিবাহিত করা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সদাশিবের পূর্বপুরুষদের কথা; সদাশিবের বিয়ে, বিহারে বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাসের কথা, তাঁর পরিবার-পরিজন ও চাকর-বাকরের কথা, সদাশিবের চাকরি থেকে অবসর নেয়া এবং ভ্রাম্যমাণ ডাক্তারি করে অবসর জীবন কাটানোর কথা।তৃতীয় পরিচ্ছেদে,সদাশিবের ডায়েরি থেকে তাঁর অতীত জীবনের টুকরো টুকরো জীবনচিত্র উঠে এসেছে।এখানে তাঁরপ্রায় পঞ্চাশটির মতো

Dhaka University Institutional Repository

জীবনচিত্র উঠে এসেছে এবং এসব চিত্র শেষ হয়েছে তাঁর চাকরি থেকে অবসর জীবনে ফিরে আসা পর্যন্ত। ফ্ল্যাশব্যাকে উঠে এসেছে ডায়েরির ঘটনাগুলো। এসব ঘটনার সাথে তাঁর সামাজিক জীবন, দেশের রাজনীতির কথা, স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের অধঃপতনের কথা বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়ের উচ্ছন্নে যাওয়ার কথা। লেখক এসব ঘটনাগুলোর সহজ ও সরল বর্ণনা করেছেন, যা অন্যান্য ঘটনার সাথে স্বাভাবিকভাবেই সমন্বয় সাধন করেছে। অগ্নীশ্বরের 'আধুনিক পঞ্চকন্যা'র মতো জটিল হয়ে ওঠেনি। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আবার সদাশিবের চলমান জীবনকথা। চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে শেষ উনিশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত তাঁর হাটেবাজারের মানুষদের সাথে তাঁর জীবনের নিবিড় সংস্পর্শতার কথা এবং তাদের বাঁচাতে গিয়ে তাঁর জীবনাবসানের কথা। এর মধ্যেও মাঝেমধ্যেতাঁরডায়েরি লেখার কাজ চলে। এর আখ্যানকে সরল আখ্যান বা প্লট বলেই ধরে নেয়া যায়। কারণ সদাশিবের জীবন-কাহিনিকে আবর্তিত করে আসা টুকরো টুকরো ঘটনা মূল কাহিনির বয়ানে কোনোরকম হ্যাম্পার হয়নি।

প্রধান চরিত্র সদাশিবকে ঘিরে হাটেবাজারের অসংখ্য চরিত্র যারা তাঁর প্রতিদিনের জীবনকে কর্মমুখর ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।প্রতিটি চরিত্র বাস্তব জীবন থেকে উঠে এসেছে যাদের সংস্পর্শে এসে তাঁর সামনে নতুন জগৎ উন্মোচিত হয়েছে। আলী চরিত্রটি লেখকের ব্যক্তিগত মোটরের ড্রাইভারের চরিত্র এবং সিফিলিসগ্রস্ত অশিক্ষিত মাতাল সিতাবীও তাঁর ব্যক্তিগত মেথর ছিল। ভাগলপুরে বনফুলের মোটর জগতের প্রধান গাইড ছিলেন মোটর ওয়ার্কসের মালিক শ্রীমান অমল মুখোপাধ্যায়হাটেবাজারে হয়ে গেছেন 'কমল'। "জীবনে যত চাকর পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আমার মেথর চাকর সিতাবী" (বনফুল; ১৯৯৯: ২৩৯)।তাছাড়া আছে কেবলি, ছিপলি, গীতা, আজবলাল, জগদীশ, আবদুল, জগদম্বা,ভগলু, রহমান, কমল, সুখিয়া, বিলাতিসহ অনেক নগণ্য লোক সদাশিবের আত্মীয় হয়ে উঠেছে। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সইতে না পেরে সদাশিবের কাছে আশ্রয় চায় গীতা। স্বামী এলে তাঁর কাছে না যাওয়ার কথা জানায় সে তাঁকে। বলে– "আপনার কাছে পালিয়ে যাব। আপনি বলবেন আমি ওকে চাকরানি রেখেছি, ওকে যেতে দেব না।" (বনফুল, ২০১৩/১০: ৫৫৭) এসব অসহায় চরিত্র গভীর মমতার বন্ধনে স্পন্দিত করেছে তাঁর জীবন। এদের সম্পর্কে *পশ্চাৎপটে* বনফুল বলেছেন –

> মোটর কিনিয়া আমার চতুর্থ লাভ হইয়াছে– বাজারের লোকদের সহিত পরিচয় এবং হৃদ্যতা। আমি প্রত্যহ মোটরে করিয়া বাজারে যাইতাম। মাছ, মাংস, তরিতরকারি কিনিতাম। ক্রমশঃ মেছোদের সহিত, মাংস বিক্রেতাদের সহিত এবং তরকারিওয়ালা ও তরকারি-উলীদের সহিত একটা ভালোবাসার বন্ধনেও আবদ্ধ হইলাম। একটা নতুন জগৎ আবিষ্কার করিলাম তাহাদের মধ্যে। (বনফুল, ১৯৯৯: ৩৩)

বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা পার্শ্বচরিত্রগুলোর মুখে প্রাসঙ্গিক সংলাপ আরোপ করে লেখক তাদের মুখের ভাষাকে জীবন্ত করে তুলেছেন।এখানে সদাশিবের জীবন-কাহিনি যতটা আন্তরিক করে গড়ে তুলেছেন লেখক,তার চেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর চারপাশের অবহেলিত চরিত্রগুলো। চরিত্রদেরসংলাপ তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক অবস্থাকে বোঝাতে সহায়ক হয়েছে। রাস্তার মাঝে সদাশিবের গাড়ির টায়ার ফেটে গেলে আলী তাকে আশ্বস্ত করে বলে–"কুছ ফিকির নেই হুজুর, আভি হাম সব ঠিক কর দেঁতে হেঁ।"(পৃ. ৫৩৪)

কাহিনির চলমান ঘটনা পাঁচ বছরের অধিক সময় অতিক্রম করেছে। এরই মাঝে উঠে এসেছে প্রধান চরিত্রকে আবর্তিত করে অতীত সময়ের অনেক নিঃস্ব চরিত্রের কথনপ্রবাহ।"মনে হচ্ছে এই সেদিন এসেছি। সকালের পর সন্ধ্যা, তারপর আবার সকাল। কালের প্রবাহ বয়ে চলছে অবিরাম গতিতে। দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল।"(বনফুল ২০১৩/১০: ৫৫৫) সর্বজ্ঞ কথক লেখক এ কাহিনির কথনের নিয়ন্ত্রক হলেও প্রধান চরিত্রের ডায়েরির আমি বাচক টুকরো ঘটনাগুলো পরম্পরাহীনরূপে সন্নিবেশিত হয়ে এক স্বতন্ত্র কথনপ্রবাহ তৈরি করেছে এবং মূল কথনের শ্রীবর্ধনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। (ভূমিকা, অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, বনফুল, ২০১৩/১০: ১৮)

৬. নাট্য-উপন্যাস

নাট্য আঙ্গিকে লেখা উপন্যাসকে নাট্য-উপন্যাস বলে। বনফুলের 'নমুনা' নামে অসাধারণ একটি নাট্য-গল্প রয়েছে। *ত্রিনয়ন* উপন্যাসটি নাট্য আঙ্গিকে লেখা। এখানে তিনটি নাটক রয়েছে। প্রথমটির নাম 'ঠুংরি', দ্বিতীয়টির নাম 'চ-বৈ-তু-হি' এবং তৃতীয়টির নাম 'কৈকেয়ী'। প্রথম ঠুংরির প্রধান চরিত্র 'আমি' এবং দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র 'ফিরিঙ্গি'। 'আমি' একটি ট্রেন রিজার্ভ করে সপরিবারে যাত্রা করেছে। বাইরের যারা এ ট্রেনে যাচ্ছে তারা সবাই ফ্রি যাচ্ছে। তবে একটি শর্তে– সবাইকে নিজেদের জীবনের একটি করে গল্প শোনাতে হবে। এটি একটি স্বপ্নের ট্রেন। ট্রেনে আছে প্রচুর খাবার আর সোনার মোহর। ট্রেনের ভেতর সব শ্রেণি-পেশার লোকের সবরকম সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা রয়েছে। রাজনীতিক নেতা, সংস্কৃতি-রক্ষক, ভিক্ষুক, অভাবী লোক, বেকার যুবকের ডাকাতের ছদ্মবেশসহ অনেকের সমস্যার সমাধান করে দেন ট্রেন রিজার্ভার 'আমি'। 'আমি' চরিত্রটি বনফুলেরই মানস-চরিত্র। স্বাধীনতার দুই যুগ পরও দেশের দুরবস্থা তাঁর চিত্তকে অস্থির করে তুলেছে। তাই 'আমি' চরিত্রের অন্তরালে লেখক একটা যুগের মানুষের জীবনের হাহাকারকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। সবশেষে পাঠক জানতে পারে সর্বস্বান্ত দেশহিতৈষীর একটি অবাস্তব স্বপ্ন ছিল এটি। 'আমি'র অন্তর্নিহিত সত্তা ভকে তাই বলতে শোনা যায়– 'তুমি যে দেশের জন্যে প্রাণপণ করে সর্বস্বান্ত হয়েছিলে, জেলে কষাঘাতে জর্জরিত হয়েছিলে, সে দেশের দুর্দশাই কি তোমাকে এমন বিচলিত করেছে?'(বনফুল, ২০১৩/১৪: ৬৫৩) 'আমি' চরিত্রটা অনেকটা যেন আলাদিনের চেরাগের মতো। সমস্যার কথা বলতে যতটুকু সময় লাগে ঠিক তারপরই সমাধানের ব্যবস্থা হয়ে যায়। দীর্ঘদিন সমস্যায় জীবন অতিবাহিত করার ফলে মানসচিত্ত যেন আলাদিনের চেরাগেরই স্বপ্ন দেখে। সিমু নামে একটি চরিত্র রয়েছে যে কিনা তার ভালোবাসা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে সবাইকে স্নেহের বাঁধনে বেঁধে ফেলে, তাদের অভাব দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেয়, অনেকটা যেন জগদ্ধাত্রীরূপ। ফিরিঙ্গি চরিত্রটির মধ্য দিয়ে একজন চিত্রকরকে প্রতিভাত করেছেন যে, আকাশ থেকে সূর্যকে মুছে দিয়ে তার জায়গায় বসিয়ে দেয় প্রকাণ্ড একটা হীরের চাঙড়, আবার সন্ধ্যায় আকাশের ওপর আলকাতরা দিয়ে কালীমূর্তি আঁকে আবার 'আমি'কে বিরাট সমুদ্রের মধ্যে তুষার শুভ্র মর্মরের স্তম্ভরূপে এঁকেছে যে স্তম্ভ আকাশের দিকে উঠে গেছে। গান এবং কবিতা দিয়ে 'ঠুংরি' নাটকটিকে উপভোগ্য করে তোলা হয়েছে।

'চ-বৈ-তু-হি' নাটকে দেখানো হয়েছে– দেশের শাসকের অন্তরালে ক্ষমতাধররাই দেশ পরিচালনা করে থাকে। তাদের হাতেই দেশ জিম্মি হয়ে থাকে। প্রকৃত অর্থে তারাই দেশের কলকাঠি নাড়ে। লেখক নাটকে তাদের নামটিও দিয়েছেন জুতসই, যেমন– বিরাটদিল বিশালজি। তাদের ইচ্ছায় এ দেশের নীতি নির্ধারণ হয়। বিরাটদিল নব হবু রাজা ও নব গবু মন্ত্রীকে তাদের ভোল পাল্টে ফেলতে আদেশ দিয়েছেন। আরো বলেছেন–"আপনি আর গবু রোজ শুধু একবার সিংহাসনে বসবেন। ব্যস আর কিছু করতে হবে না। রাজ্য আমরা চালাব।" (পৃ. ৬৭৮) বনফুল আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থার প্রকৃতস্বরূপ তুলে ধরেছেন ব্যঙ্গের আকারে। এখানে সূত্রধারের মাধ্যমে আঙ্গিকটি পালা নাটকের আঙ্গিকে উঠে এসেছে। শুরুতে সূত্রধারের কাহিনির সংক্ষিপ্ত বয়ান এবং শেষে বয়ানের সত্যতা যাচাই। সংস্কৃত শ্লোকে অক্ষরের কমতি হলে চ-বৈ-তু-হি অব্যয়গুলো ভারসাম্য রক্ষা করে তেমনি রাজ্য ডুবতে থাকলে কেউ না কেউ এসে হাল ধরে ভারসাম্য রক্ষা করবে চ-বৈ-তু-হির মতো।

কৈকেয়ী নাটকটির ভেতরে রয়েছে আরেকটি নাটক। রামের বনবাসের কারণদেখিয়ে গল্পের নবরূপায়ণ করেছেন বনফুল। শতদল পদ্মকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। কাহিনির শুরুই হয়েছে পদ্মের মহিমার সাথে মহারাণীর মহিমা, তাঁর মনের পবিত্রতার তুলনায়। ফলে শতদল পদ্মকে ঘিরে নাট্যরস জমে উঠেছে। এখানে লেখক আর্য-অনার্য মিলনই কেবল ঘটাতে চেয়েছেন তা নয়, চিরাচরিত সৎমার প্রকৃত মাতৃত্বের স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। অনুরূপ মায়ের আরেকটি চরিত্র লেখক *অগ্নীশ্বর*-এ অঙ্কন করেছেন যে কিনা অসুস্থাবস্থায় নিজের জন্য বরাদ্দ পথ্য-দুধটুকু না খেয়ে সতীনের ছেলেকে খাইয়েছেন। লক্ষ করার বিষয়, কৈকেয়ী বারবার করে রামচন্দ্রের মনের অবস্থা জানতে চেয়েছেন। প্রকৃত কাহিনি শোনার পর রাম আসলেই আর্য-অনার্য মিলনে সিংহাসন ত্যাগ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত আছে কিনা। কারণ রামের মানসিক প্রস্তুতি ছিল সিংহাসন আরোহণের। সব অপবাদ মাথায় নিয়ে কৈকেয়ী আর্য-অনার্য মিলনে তার প্রতিশ্রুতি রেখে ইতিহাস রচনা করেছেন। সাধারণত নাটকে যে গঠন কাঠামো থাকে যেমন– অঙ্ক; দৃশ্য-১, দৃশ্য-২ উপন্যাসে সেভাবে নেই। বনফুল যেহেতু বিষয় ও আঙ্গিকের নিয়ত পরীক্ষাপ্রবণ শিল্পী, তাই তিনি অঙ্ক, দৃশ্য– শব্দ ব্যবহার না করেও স্বতন্ত্র ধারায় নাট্য আঙ্গিক বজায় রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭. কোলাজধর্মী উপন্যাস

কোলাজ কী

ফরাসি কলার থেকে উদ্ভূত হয়েছে কোলাজ শব্দটি। কলার মানে গ্লুইং বা আঠালো। কোলাজ শব্দের অর্থ বিমূর্ত শিল্পকর্ম। রংতুলি ব্যতীত যে ছবি হয় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ কোলাজ পদ্ধতি। এটি চিত্রশিল্পে ব্যবহৃত একটি শব্দ। কোলাজকে একটি মিশ্র মিডিয়া ফর্ম বলে আখ্যা দেয়া হয়। কোলাজ আধুনিক শিল্পের একটি নতুন আঙ্গিক। কোলাজ চিত্রের উপকরণ হলো চারপাশে পড়ে থাকা কাগজ, আলপিন, খবরের কাগজের ক্লিপিং, ছবি ওয়ালপেপার, কাপড়ের টুকরো, ধাতু, দেশলাইয়ের কাঠি, রিবন, তার, নষ্ট হয়ে পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেট প্রভৃতি। এসব উপকরণ কোনো সমতল অবলম্বন যেমন– ক্যানভাস, বোর্ড বা কাঠে আঠা দিয়ে লাগিয়ে যে চিত্রকর্ম তৈরি করা হয় তা-ই কোলাজ চিত্র। তাছাড়া বিভিন্ন আলোকচিত্র কেটে সেগুলো জোড়া দিয়েও কোলাজ সৃষ্টি করা হয়। ঠিক তেমনি কাঠ-কোলাজও সৃষ্টি করা হয়। পুরনো কাঠ, ভাঙা কাঠ বা আসবাবপত্রের অংশ দিয়ে কাঠ-কোলাজ তৈরি হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে লুইস নেভেলসন কাঠ-কোলাজের কাজ করেন কিন্তু তা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। পাবলো পিকাসো এবং ব্র্যাকের সিনথেটিক কিউবিস্ট আমলে (১৯১২-১৪) কোলাজ একটি শিল্পরূপ হয়ে ওঠে। (থটকো ডট কম)

বনফুলের *কিছুক্ষণ*কে কোলাজধর্মী উপন্যাস বলা চলে। ট্রেন-স্টেশনরূপ ক্যানভাসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানা মানসিকতার (জাতির) যাত্রীদের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো সন্নিবিষ্ট হয়ে কোলাজ-উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। উপন্যাসের প্লটের প্রকৃতির দিকে লক্ষ রেখেই সরল, জটিল ও যৌগিক– এ তিন রকমের প্লট তৈরি হয়। উত্তম পুরুষে রচিত কিছুক্ষণের প্লটকে যৌগিক প্লট বলা যায়। একাধিক শাখা কাহিনি ও উপকাহিনির মাধ্যমে যৌগিক প্লট তৈরি হয়। এ ক্ষেত্রে শাখা কাহিনি বা উপকাহিনিগুলো কোনো জটিলতার সৃষ্টি করে না। এর মূল কাহিনি হলো– ট্রেন ডিরেল্ড হয়ে যাওয়ার প্রধান হোতা পয়েন্টসম্যান ও গাঁজাখোর রামদীনকে শাস্তি থেকে বাঁচানো। মূল কাহিনি থেকে শাখা কাহিনিগুলোকে পৃথক করা যায় না। টুকরো টুকরো শাখা কাহিনিগুলো এক-একটি চিত্র হয়ে ভেসে উঠে চোখের সামনে। আসলে চিত্রধর্মিতাই হলো *কিছুক্ষণ*-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে বিষয়বস্তু ও রচনারীতিতে প্রবহমানতা চোখে পড়ে। ছবির পর ছবি সাজিয়ে গল্প যেভাবে এগিয়ে গিয়েছে, তাতে নদীর গতিময়তার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। (ঊর্মি নন্দী, ১৯৯৭: ১৪০)

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্র চিত্রণের আলোচনায় বলা যায়, এখানে বহুরকম চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ,পরোপকারী,স্বার্থপর, নিন্দুক, মিথ্যাবাদী–প্রতিটি চরিত্র স্বমহিমায় উজ্জ্বল। উপন্যাসের মূল চরিত্র– কথক। তিনি স্টেশনে ট্রেন ধরতে আসেন। এসে দেখেন প্ল্যাটফর্মে হাজার হাজার যাত্রী। একটি ট্রেন ডিরেল্ড হয়ে যাওয়ায় এ ট্রেন ঠিক না হওয়ার আগপর্যন্ত কথকের ট্রেন আসতে পারবে না। ট্রেন আসার মধ্যবর্তী এ সময়টুকুতে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমাণ চরিত্রগুলো নিয়ে শাখা কাহিনি গড়ে উঠেছে। প্রতিটি চরিত্র বিকাশে লেখক স্থান-কালের ঐক্য বজায় রেখেছেন। সব চরিত্রকে তিনি বাস্তব করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। টেলিগ্রাফ-মাস্টার মাখনলাল এবং স্টেশন-মাস্টারের চরিত্র দুটির মিথ্যাচার (রামদীনকে বাঁচাতে গিয়ে বলা মিথ্যাচার) তৎকালীন সমাজের অসংগতির চিত্রটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তবে ব্রাউন সাহেবের বাগদত্তা স্ত্রীর চরিত্রটির পেছনের ইতিহাসটিতে ভাবনার খোরাক রয়েছে।

উপন্যাসের আঙ্গিকবিচারের গুরুত্বপর্ণ দিক হলো চরিত্রের মুখে সংলাপের সার্থকতা। প্লাটফর্মের সাধারণ জনতা, হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারি, বাঙালি, বিহারি, খ্রিস্টান মেয়েটি–প্রতিটি চরিত্রের সংলাপেই নিহিত রয়েছে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা। লেখক চরিত্র উপযোগী সংলাপ দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে লেখক বাংলা, পশতু, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। যথাযথ সংলাপ যথাযথ চরিত্রে উঠে এসেছে। এক যুবক কাবুলিওয়ালার ছুরি কেনার কথা বলে সেটি দিয়ে হাত-পায়ের সব নখ কেটে ফেরত দেয়ার অভিযোগে বলে ওঠে–"উজুর, আপ দেখিয়ে, আপ বালা আদমি, ইনসাফ কর দিজিয়ে।" (বনফুল. ২০১২/১: ৪৪১) তখন এ শ্রেণির মানুষটির স্বভাব-চরিত্রের স্বরূপটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে। শীর্ণকান্তি ভদ্রলোকের ক্ষুধার্ত নাতিটি যখন জিলেপি খাওয়ার বায়না করে না খেতে পেয়ে চুরি করে খায় এবং তাকে ঘিরে যে কলরব ওঠে, তা দোকানদার বনশি যখন কথককে বলে–"ও কুস নেই আসে বাবু, এক শালা লৌন্ডাজিলেবি চোরাথা থা।"(পৃ. ৪৩৫) মিস মার্থা এবং ব্রাউন রঙের সাহেবের কথোপকথনে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে সেখানে বাংলা উচ্চারণে ইংরেজির ব্যবহার রয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় ক্রিশ্চান মেমসাহেবের মুখে সরাসরি ইংরেজি ভাষা দিয়েছেন। বেআব্রু, বরাত এমন কিছু আরবি শব্দের ব্যবহার করেছেন লেখক। উপন্যাসে মিশ্র ভাষার ব্যবহারে বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের স্পষ্টতায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি। উপন্যাসে লেখকের বহু ভাষার ব্যবহার সহজাতভাবেই উঠে এসেছে অবহেলিত মানুষরা যেভাবে তাঁর উপন্যাসে ঠাঁই পায় তেমনিভাবে। বনফুলের ভাষারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অনুচ্চারিত কথন। উত্তম পুরুষে রচিত এ উপন্যাসে লেখকের দৃষ্টিকোণ (উত্তম পুরুষ যেখানে উহ্য থাকে) থেকে

Dhaka University Institutional Repository

কাহিনির মাঝেমধ্যে অনুচ্চারিত কথন রয়েছে। যেমন, "আহারাদির পর দেখা গেল, বেলা তিনটা বাজিয়াছে। পাবদা মাছের ঝাল সত্যিই ভালো হইয়াছিল।" (পৃ. ৪৫৪) আবার এগারো পরিচ্ছেদের মাঝামাঝিতে অনুচ্চারিত কথন বা লেখক-কথকের কথা রয়েছে– "একজন খাঁটি শ্বেতাঙ্গ, আর একজন ব্রাউন রঙের। তবে ব্রাউন রঙের হইলেও তিনি একজন পদস্থ অফিসার, তাহা মাস্টার মহাশয় ও মাখনবাবুর ব্যবহারে বোঝা গেল।" (পৃ. ৪৬০) দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাত্রীদের অবস্থা বোঝাতে বর্ণনা করা হয়েছে–

> ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়াছে প্রায় ঘণ্টা দুই হইল। এই দুর্ঘটনার আকস্মিকতা প্রথমে সকলের মনকে নিশ্চয়ই নাড়া দিয়াছিল, এখন দুই ঘণ্টা পর সেভাবটা আর নাই। এই দুর্ভাগ্যটাকে মানিয়া লইয়া এখন সকলে খানিকক্ষণের জন্য থিতাইয়া বসিয়াছে। ছোট বড় নানাদলে বিভক্ত হইয়া সকলে নিজ নিজ সুবিধা অন্বেষণে তৎপর হয়াছে। (পৃ. ৪২৬)

উত্তম পুরুষের জবানিতে সাধুরীতির এবং পাত্রপাত্রীদের মুখে ভাষার চলিতরীতির ব্যবহার করেছেন লেখক। বনফুলের উপন্যাসে বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, স্বভাবগতভাবে বা প্রকৃতিগতভাবেই সব লেখাতেই প্রকৃতি বা পরিবেশের বর্ণনায় নামসহ পাখির প্রসঙ্গ থাকে। বলা সংগত, প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা লেখকের এটা তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা। বনফুলের আঙ্গিকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বাক্-সংক্ষিপ্তি বা পরিমিত বাক্-বিন্যাস। একটি বর্ণ, একটি শব্দ, দুটি শব্দ, তিনটি শব্দের পর যতি চিহ্ন দাড়ির ব্যবহার করেছেন এবং শব্দগুলোর পরে খালি জায়গা রেখেছেন। যেমন– 'না', 'আসুন', 'বসুন', 'গেলাম', 'কলকাতা', 'মেডিকেল', 'পয়েন্টসম্যান'; 'রামদীন কে', 'চতুর্দিক ধূমাচ্ছন্ন', 'বহুত খুব', 'কি হল', 'কি রকম', 'আমি পড়ি', 'দাঁড়াইয়া পড়িলাম; 'কি পড়েন? কোথায়'? 'আপনি ক্রিশ্চান নাকি'? 'চুপ করিয়া রহিলাম', 'খানিকক্ষণ নীরবেই কাটিল।

লেখকের সব উপন্যাসেই চরিত্র অনুযায়ী উপমা, উৎপ্রেক্ষা, প্রবচন, রূপক, পরিবেশ বর্ণনার যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয় ক্রিশ্চান মেমের মেকআপের বর্ণনায় উপমা ব্যবহৃত হয়েছে– "যেন মাগুর মাছকে কুটিবার পূর্বে ছাই মাখা হইয়াছে।" (পৃ. ৪২৭) প্ল্যাটফর্মে হাজারো যাত্রীর উপমায়–"একটা মেলা বসিয়াছে গিয়াছে যেন" (পৃ. ৪২৬)।

ভুবন সোম উপন্যাসে যেমন যাত্রার আগে ডিম খাওয়াকে যাত্রার শুভ লক্ষণ মনে করা হয়নি তেমনি এখানে শেয়াল দেখার কারণে ট্রেন দেরিতে আসার কারণ দেখানো হয়েছে। তাছাড়া হিন্দু সমাজের কুসংস্কার, খালি পায়ে জল আনলে হিন্দু বিধবা সে জল স্পর্শ করে না।

কিছুক্ষণ যেমন রচনা রীতিতেই সার্থক উপন্যাস তেমনি এতে রয়েছে শিশু থেকে শুরু করে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ, পৌঢ়-পৌঢ়া, হিন্দু, বিহারি মুসলমান, ক্রিশ্চান, বাঙালি বহু মানুষের বহু সংস্কার-কুসংস্কার, নীতি-নৈতিকতা,

Dhaka University Institutional Repository

আচার-ব্যবহার, মন-মানসিকতা, মিথ্যাচার, আতিথেয়তা এবং ইংরেজদের উদার মানসিকতা, ক্রিশ্চানদের মানবতা– এমন অনেক কিছু স্থান পেয়েছে প্রাসঙ্গিকক্রমে ও যথাযথ মর্যাদায়।

সীমার মাঝে অসীমের ব্যঞ্জনা। কাহিনির শুরুতে বলা আছে–"সময়ের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে...আমিও চলিয়াছি আর কাহিনির শেষে আছে– "ওই ট্রেন আসিতেছে। একটু পরেই আমিও আর এখানে থাকিব না।" সময়ের সাথে সাথে সবকিছুই আবর্তিত হয়ে চলছে ক্রমান্বয়ে। উপন্যাসে লেখকের এই জীবনদর্শনই স্পষ্ট হয়েছে কাহিনি ও চরিত্র নির্মাণে।

বনফুলের উপন্যাসের আঙ্গিক বিচারের আলোচনান্তে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে তিনিই একমাত্র লেখক যিনি তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের গঠন কাঠামোতে পরিবর্তন আনয়ন করেছেন। তিনি যেমন প্রচলিত রীতির গঠন কাঠামোয় উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি উপন্যাসের আঙ্গিক পর্যালোচনায় সতত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিতে নবতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সাত রকম আঙ্গিকের উপন্যাসের আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসই আরেক উপন্যাস থেকে ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। তবে তিনি তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই মিথের ব্যবহার, বাংলা সাহিত্যের অগ্রজদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাঁদের নাম বা মুখাবয়বের উল্লেখ করেছেন। তবে বেশি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি। প্রতিটি উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গানের কথা লক্ষ করা যায় চরিত্র বা কাহিনির তাৎপর্যে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বনফুল সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের মধ্যে দিয়েই বেড়ে উঠেছেন। বাড়িতে রাখা সেকালের জনপ্রিয় *বান্ধব*, *সুপ্রভাত*, *সাহিত্য*, *প্রদীপ*, *প্রবাসী*, *বসুমতী*, *হিতবাদী* ও *বঙ্গবাসী* পত্রিকা-পাঠ, মায়ের যাত্রা পালা দেখে বাড়িতে এসে পুরোটাই না দেখে আবৃত্তি করে শোনানো, বাবার থিয়েটারের প্রতি ঝোঁক, সাহিত্য-প্রীতির কারণে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের বই কিনে আনা এবং সেগুলোর ওপর নিয়মিত সান্ধ্য-পাঠের আয়োজন এবং তাতে সবার সানন্দে অংশ গ্রহণ – বনফুলকে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। মনিহারীর সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়াকালীন বনফুলের মনে সাহিত্য-প্রেরণা জেগে উঠে। এ সময় তিনি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা 'বিকাশ' বের করেন। স্কুলের বিকালের খেলাধুলার সময়টুকুতে তিনি উক্ত পত্রিকার জন্যে লেখা তৈরি করতেন। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধসহ সম্পাদকীয়তে তিনি লিখতেন। এ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বনফুলের সাহিত্য জীবনের শুরুতে তারকদাস মজুমদার এবং তাঁর ছোট ভাই সুধাংশু শেখর মজুমদার (বটুদা), সাহিত্যোৎসাহী প্রবোধচন্দ্র চট্টপাধ্যায় এবং পরিমল গোস্বামীর সাথে পরিচয় ঘটে। থার্ড ক্লাসে পড়াকালীন (খুব সম্ভবত ১৯১৫ সালে) বটুদার উদ্যোগে শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকায় বনফুলের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। মেডিকেল কলেজে পড়াকালীন ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের (১৮৮৬-১৯৬৫, সাহিত্যিক) সংস্পর্শে এসেছেন। পরবর্তীতে গল্প, উপন্যাস, নাটক লেখায় মনোনিবেশ করেন তিনি। তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় সাহিত্য-চর্চা করেই। সাহিত্যের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে বলেই তিনি আজিমগঞ্জে মিউনিসিপ্যালিটির হাসপাতালের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ভাগলপুরে প্যাথলজিকেল ল্যাবরেটরি করে প্রাইভেটে প্র্যাকটিস শুরু করেন। স্কুল-কলেজের লেখাপড়া, ডাক্তারি পড়া, ডাক্তারি পাস, বিয়ে, সংসার, সন্তান মানুষ করা, তাদের প্রতিষ্ঠিত করে বিয়ে দেয়া অর্থাৎ জীবনচলার অবিরাম পথে বনফুলের সাহিত্যিক-গাড়ি সচল ছিল।

বহুমাত্রিক লেখক বনফুল বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রম ধারার শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে এবং কল্লোল পত্রিকার সমকালীন লেখক হয়েও তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন। তাঁর জীবনে ডাক্তারি পেশা ও সাহিত্যের নেশা একে অপরের পরিপূরকরূপে বিরাজমান ছিল। বনফুলের মৌলিক উপন্যাসের সংখ্যা পঞ্চাশ। সুনির্দিষ্ট কোনো ছকে বা প্রচলিত আঙ্গিকে তাঁর উপন্যাসকে ফেলা যাবে না। উপন্যাসে তিনি বিচিত্র বিষয়কে যেমন বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন তেমনি এর কলাকৌশলের ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র রীতির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি জীবনকে অবলোকন করেছেন কখনও রাজনীতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে আবার দর্শন,

Dhaka University Institutional Repository

পুরাণ এমনকি পক্ষী তত্ত্বের মতো বিষয় তাঁর রচনায় সমান গুরুত্বে ও ভিন্ন প্রকাশ রীতিতে উঠে এসেছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বনফুলের উপন্যাসকে – মধ্যবিত্ত ও অন্ত্যজজীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস; রাজনীতি অবলম্বী উপন্যাস; ইতিহাস আশ্রয়ী; অতীতের নৃতাত্ত্বিক মানবসমাজ এবং সামন্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস এভাবে কয়েক শ্রেণিতে বিন্যাস্ত করেছি। এ শ্রেণি বিভাগের বাইরেও তাঁর উপন্যাস রয়েছে।

মধ্যশ্রেণির জীবনবৈচিত্র্য ও অন্ত্যজ জীবনের কথকতা – পর্বে আমরা লেখকের পনেরোটি মৌলিক উপন্যাস নিয়েআলোচনা করেছি। মধ্যশ্রেণির চরিত্রদেরও জীবনচলার পথে অন্ত্যজ শ্রেণির চরিত্রগুলোর কথা অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে। তাই তাঁর উপন্যাসে কেবল মধ্যশ্রেণির জীবনের স্বাতন্ত্র্য নয় পাশাপাশি অন্ত্যজ জীবনচরিত্রগুলো সর্বত্রই ক্রিয়াশীল ভূমিকা রাখতে দেখা গেছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান বনফুল মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলোতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে বৈচিত্র্যতা আনয়ন করেছেন। মধ্যবিত্তের মানসিকতাকে তিনি নানা প্রান্ত থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলো কখনও হৃদয়ের রক্তক্ষরণে জর্জরিত হয়ে কখনও শহরের স্বার্থপর মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, কখনও রাজনীতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মেনে নিতে না পেরে অন্তজ্য মানুষদের সাথে জীবন কাটাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। মধ্যবিত্ত চরিত্রের ভণ্ডামী, স্বার্থপরতা, নীচতা, হীনতা, মিথ্যাচার, ক্রুরতা, প্রেম-ভালোবাসা, সংস্কৃতিবোধ, রাজনীতি, দেশপ্রেম, পারিবারিক বন্ধনের প্রতি উদাসীনতা ও শ্রদ্ধা – এসব ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রান্তকে রূপদান করেছেন অভিজ্ঞতার আলোকে। মহাকাব্যিক উপন্যাস *জঙ্গম* এর প্রধান চরিত্র শঙ্করের জীবনে দেশপ্রেমই ছিল মূল লক্ষ্য। যৌবনের প্রথম দিকে সে খাদি পড়তো এবং অন্যকে পড়ানোর জন্যে তা প্রচার করে বেড়াত। দেশের প্রতি ভালোবাসার আরেক পন্থা অবলম্বন করে সে বিজ্ঞান-চর্চা এবং সাহিত্য-চর্চায় মন দিলো। জীবিকার তাগিদে টিউশনি, প্রুফ-রিডার এবং পরে পত্রিকা সম্পাদনা, লেখালেখি করে সাহিত্য জগতে পরিচিতি পাওয়া এবং দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থেকে শহর ছেড়ে গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নকর্মী হিসেবে গরীব, অশিক্ষিত মানুষের সাথে মিশে কাজ করার ব্রতী গ্রহণ করা – প্রকৃত অর্থে তা দেশের প্রতি টান থেকেই সম্ভব হয়েছে। এ উপন্যাসের বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্রগুলো বনফুলের বাস্তব জীবন থেকে নেয়া। যেমন ভন্টু চরিত্রটি বনফুলের মেডিকেল কলেজ জীবনের বন্ধুর ছাপ রয়েছে। ভন্টু জীবন সংগ্রামের কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে। নিদারুন অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে ভাই-বৌদি সংসারের সবাইকে আগলে রেখেছে সাধ্যমতো। সংসারের খরচ চালানোর জন্যে নিরুপায় হয়ে কুৎসিত মেয়েকে বড় অংকের টাকার বিনিময়ে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে আবার অন্য দিকে অফিসের বসের মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিতে পারেনি – এভাবেই চলেছে তার জীবনচাকা। *সে ও আমি* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'আমি' এর ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করে দেয় তার নারীরূপিনী বিবেক। ধনীর মেয়েকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার কাছ থেকে টাকা

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে বিলেত গিয়ে সেখানেও ভণ্ডামি করে ফিরে আসে। মধ্যবিত্ত এ চরিত্রটি উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটিয়ে সবশেষে সৎভাবে জীবনযাপন করার সংকল্প করে। সে বুঝতে পারে তাতে দেশ ও সমাজের কল্যাণ নিহিত আছে। জীবনের যে অবস্থানেই থাকুক না কেনো তাঁর মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলোর পরিণতি জীবনের ইতিবাচকতার দিকেই ধাবিত হতে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত জীবন সম্পর্কে তারা একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে। বনফুলের সৃষ্টি মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলো পরিবার ও সমাজের হিত সাধনে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করার চেষ্টা করে থাকে। তাঁর অনেক উপন্যাসে মধ্যবিত্ত চরিত্রের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে অন্ত্যজ চরিত্রগুলো জড়িয়ে রয়েছে। কোনো কোনো উপন্যাসে মধ্যবিত্ত চরিত্রকে ঘিরে অন্ত্যজ চরিত্রগুলোর জীবন আবর্তিত হয়েছে। যেমন, *এরাও আছে*, *হাটেবাজারে*, *প্রচ্ছন্ন মহিমা*, *অধিকলাল* উপন্যাস। বনফুলের অনেক উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই ডাক্তার চরিত্র রয়েছে। মধ্যবিত্ত এ ডাক্তার চরিত্রকে ঘিরে অন্ত্যজ চরিত্রের জীবনকথা সমাজ বাস্তবতায় উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসে। ডাক্তার চরিত্র ছাড়াও সাংবাদিক, রাজনীতিক-কর্মী, সরকারি চাকুরে, ব্যবসায়ী এরকম অনেক মধ্যবিত্ত চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছে অন্ত্যজ চরিত্রগুলো। তাঁর প্রথম উপন্যাস *তৃণখণ্ড* এরূপ একটি উপন্যাস। তাঁর এ জাতীয় আরও উপন্যাস রয়েছে যেখানে মধ্যবিত্ত প্রধান চরিত্র ডাক্তার, যেমন – *কিছুক্ষণ*, *নির্মোক*, *অগ্নীশ্বর*, *হাটেবাজারে*। তিনি ভাগলপুরের অন্ত্যজ মানুষদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে তাদের জীবন বাস্তবতাকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন সহমর্মিতার আলো ফেলে। অন্ত্যজ চরিত্রগুলো লেখকের জীবন-ঘনিষ্ঠ, বাস্তবে দেখা এবং চিকিৎসা সূত্রে এসব চরিত্রের সান্নিধ্যে আসায় তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। *তৃণখণ্ড* এর ডাক্তার তাঁর পেশার বাইরে যেয়ে অসহায় মানুষদের প্রতি যে বিশেষ নজর রেখেছেন, নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে ওষুধ দিয়েছেন, নানা ব্যস্ততার মাঝে সময় বের করে অসময়ে রোগীর ডাকে সাড়া দিয়েছেন তা কেবল পেশাদারিত্বের দায়িত্ব থেকে করেছেন তা নয়। তিনি অতি দরিদ্র রোগীর পরিবারে অর্থ দিয়ে সহায়তাও করেছেন। *নির্মোক* এর নায়ক বিমলের দুখীয়ার স্ত্রী সুনরির আপিং খেয়ে আত্মহত্যার কারণ জানতে চাওয়া এবং তাকে শাড়ি কিনে দিতে দুখীয়াকে পয়সা দেওয়া, হাটে-বাজারের সদাশিব ডাক্তারের ছিপলিকে গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া, *অগ্নীশ্বর* উপন্যাসে ডাক্তার অগ্নীশ্বরের অতি-দরিদ্র রোগীর ফি কৌশল করে ফিরিয়ে দেয়া – অসহায়দের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো এসব কাজ বনফুলের মানবদরদি মনেরই পরিচয় বহন করে।

আমরা বনফুলের রাজনীতি অবলম্বী জীবনের চালচিত্র বিষয়ক *সপ্তর্ষি*, *অগ্নি*, *স্বপ্নসম্ভব*, *পঞ্চপর্ব* ও *ত্রিবর্ণ* – এ পাঁচটি উপন্যাসকে বেছে নিয়েছি। তাঁর রাজনীতি ভাবনা এবং তাঁর উপন্যাসে রাজনীতি কীভাবে পরিচালিত হয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। বনফুল সক্রিয় রাজনীতি-কর্মী ছিলেন না কিন্তু রাজনীতি সংক্রান্ত খবর সবসময় তাঁর মনকে বিচলিত করতো। একজন উঁচু দরের সাহিত্যিক সমাজ বাস্তবতায় রাজনীতিকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই রাজনীতি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি লিখে ফেলেন রাজনীতি-বিষয়ক উপন্যাস। আমরা দেখতে পেয়েছি, এই পর্যায়ের প্রথম উপন্যাস *সপ্তর্ষি*-তে বনফুলের রাজনীতি বিষয়ে কোনো স্পষ্ট মতবাদ প্রকাশিত হয়নি। সাতটি চরিত্রের দৃষ্টিকোন থেকে তিনি সমসাময়িক রাজনীতির ধারাকে তুলে ধরেছেন। উক্ত উপন্যাসে বনফুলের রাজনীতি বিষয়ে কোনো পক্ষপাত নেই। কিন্তু পরবর্তীকালের উপন্যাস *অগ্নি*, *স্বপ্নসম্ভব*, *পঞ্চপর্ব* ও *ত্রিবর্ণ* তে রাজনীতি বিষয়ে তাঁর মতামত অনেকটা স্পষ্ট বলে ধরে নেয়া যায়। *অগ্নি*-তে তিনি বেয়াল্লিশের রাজনীতির আন্দোলনকে উপজীব্য করেছেন। প্রকাশ্যভাবে তিনি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, ঠিক। তবে চেতনাগত দিক থেকে তিনি কমিউনিস্ট পন্থী ছিলেন। তিনি শনিবারের চিঠির একজন নিয়মিত লেখক এবং এ গোষ্ঠীর অনেকেই প্রগতিশীলতার বিরোধী ছিলেন। কোনো প্রপাগানিস্ট তাঁকে আমরা বলব না। কোনো ইজম তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাঁকে আঘাত করেছিল তা অবশ্যই গণতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা নয়। এর কিছু কারণ ছিল সেটি হচ্ছে, রুশ বিপ্লবের পরে অনেকে সমাজতান্ত্রিকের প্রতি আকর্ষণবোধ করেছিলেন। ১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পর ১৯৩৫-৩৬ এর দিকে সমাজতন্ত্রবাদী আন্তর্জাতিকভাবে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের দিকে সক্রিয় হয়ে উঠে। এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়া ... . অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম অপশক্তির বিরুদ্ধে চলার আন্তর্জাতিক লড়াইকে দুর্বল করবে– এ বিশ্লেষণ থেকে কমিউনিস্ট পার্টি বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিপক্ষাচার করেছেন। এ বিপক্ষাচার এবং সে সঙ্গে পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে, মুসলিমদের পাকিস্তানের দাবিতে অবিমিশ্র সমর্থন দেওয়ায় বনফুল এবং তাদের মতো কংগ্রেসপন্থী যারা ছিলেন উত্তর আধুনিক থেকে তাঁরা এ বিষয়গুলো মেনে নিতে পারেননি। এসব কারণে বনফুল সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। মূলত সমাজ-ইতিহাস-কমিউনিজম সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন – রাশিয়ায় যে অর্থে সমাজতন্ত্র সম্ভব হয়েছে আমি মনে করতাম না, এ দেশে তা সম্ভব। আমরা বুঝেছি, আর্য সভ্যতার আলোকে এদেশে যে সাম্যবাদ চলে এসেছে তাই শ্রেয়। সাম্যবাদ কেবল অর্থের সমতায় বিচার্য নয়, বিচার্য মনে। তিনি কংগ্রেসপন্থী ছিলেন বটে তবে সব ক্ষেত্রে তিনি কংগ্রেসের সব সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পেরেছেন বিষয়টি এমন নয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের যে প্রতারণা, তাদের অসততা – সে সবের তিনি কিন্তু কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। আমরা বলতে পারি যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। তাঁর রাজনীতি অবলম্বী *সপ্তর্ষি* উপন্যাসের যে সময়সীমা ১৯৩৫-৩৮ সেখানে রাজনীতির বিভিন্ন ধারার পরিচয় রয়েছে এবং বনফুলের বিশেষ কোনো রাজনীতিক দলের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দৃশ্য হয়নি। নিরপেক্ষভাবেই তিনি বিভিন্ন ধারার রাজনীতির মতাদর্শগুলো তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্নসম্ভব, *অগ্নি*, *পঞ্চপর্ব*, *ত্রিবর্ণ* উপন্যাসগুলোতে পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থক কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বনফুলের একরকম বিরাগ সেখানে প্রকাশিত হয়েছে।

বনফুলের ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাসের আলোচনায় আমরা তিনটি উপন্যাসকে নির্বাচন করেছি – *মহারাণী*, *গোপালদেবের স্বপ্ন* ও *সন্ধিপূজা*। উপন্যাস ত্রয়ীকে সরাসরি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়নি, ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস না বলার পেছনে কারণগুলো হলো – ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ উপন্যাসগুলোতে পরিস্ফুট হয়নি। উপন্যাসগুলোতে ঐতিহাসিক ঘটনাকে পরিপূর্ণভাবে তুলেও ধরা হয়নি। ঐতিহাসিক ঘটনার স্রোতধারায় চরিত্রগুলো বিকশিত হয়েছে – এমন বলা যাবে না। *গোপালদেবের স্বপ্ন*-তে অনুসরণীয় ঐতিহাসিক চরিত্র গোপালদেবের প্রভাব দেখানো হয়েছে সৃষ্টিশীল চরিত্র গোপালদেবের মধ্যে। কাহিনিতে গোপালদেবের চরিত্র সৃষ্টি করার পেছনে রয়েছে লেখকের সমসাময়িক দেশের মানুষকে অরাজকতা থেকে উদ্ধারের উপায়স্বরূপ। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতবর্ষের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে লেখক মাৎস্যন্যায়ের সাথে তুলনা করে তা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ গোপালদেবের মতো দেশ-নেতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন গভীরভাবে। ইতিহাসের ঘটনার সত্যতা *সন্ধিপূজা* উপন্যাসে অনুপস্থিত। সেখানে ঐতিহাসিক চরিত্র নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে কেন্দ্র করে কাল্পনিক কাহিনি গড়ে উঠেছে। চরিত্রগুলো ইতিহাসের আবহ মেনে সৃষ্টি হয়নি। তবে অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রগুলোতে ইতিহাসের ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে প্রভাব ফেলেছে। কিছু কিছু চরিত্র ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড ঘটনার দ্বারা আলোড়িত হয়েছে চরমভাবে। *সন্ধিপুজার* প্রধান চরিত্র – ধুর্জটিমঙ্গল চরিত্রটির কথা ধরা যাক। ধুর্জটির পরিবার নবাবের কালো থাবায় কীভাবে নিঃস্ব হয়েছে এবং তার ফলে ধূর্জটির জীবনে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলে উঠেছে তারই বয়ান উপন্যাসের বিষয়বস্তু। আবার কাহিনির ধারাবাহিকতায় নয়, অনেক চরিত্রের স্মৃতিতে ইতিহাসের টুকরো টুকরো ঘটনা উঠে এসেছে। যেমন, ধূর্জটিমঙ্গলের দূর সম্পর্কের বোন ঝকমারির মানসপটে কখনও রানি দুর্গাবতী, সম্রাট আকবর, সেনাপতি আসফ খাঁর কথা উঠে এসেছে। *মহারাণী*তে প্রধান চরিত্র মহারাণীর মধ্যে দেশপ্রেম ছিল, ফলে তার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ঐতিহাসিক চরিত্র নানা সাহেবকে শত্রুর হাতে ধরা পড়তে না দেয়ার দুঃসাহসিক চেষ্টা সফল করা। উপন্যাসের অনেক ঘটনার মধ্যে নানাসাহেবের সাথে মহারাণীর আলাপচারিতার অংশটুকু বা নানা সাহেবকে পালাতে সুযোগ করে দিতে মহারাণীর যে সাহসী পদক্ষেপের কথা রয়েছে তা আদতেই পাঠককে ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি দিতে বাধ্য করে থাকে।

অতীতের নৃতাত্ত্বিক মানবসমাজ অংশে আমরা লেখকের দুটি উপন্যাস *স্থাবর* ও *প্রথম গরল* আলোচনা করেছি। মানবজাতির যে কাহিনি ইতিহাসের অন্ধকারে স্থাবর হয়ে আছে তারই ধারাবাহিকতার জঙ্গমতা *স্থাবর* উপন্যাসের

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়বস্তু। এ বিষয়বস্তুকে জঙ্গমতায় রূপদান করতে লেখক নৃতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সাংস্কৃতিক দিকের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন সার্থকভাবে। উপন্যাসটিতে কৃষি-সভ্যতা গড়ে উঠার পূর্ব পর্যন্ত ধারাবাহিক কাহিনির ইতি টেনেছেন। সৃষ্টিশীল নতুনত্বই বনফুলের সাহিত্যের ধর্ম। বৈচিত্র্য সন্ধানী বৈজ্ঞানিক মেজাজের লেখক বনফুল তাই মানবজাতির ক্রমবিবর্তন ধারার চিত্র তুলে ধরতে কাল্পনিক আখ্যায়িকাকে নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করেছেন যার ইতিহাসে সমর্থন রয়েছে। নিরন্তর পথ চলার অমোঘ চরিত্র 'আমি'র জীবনের ধারাবাহিক সময়ের ঘটনাংশ স্থান পেয়েছে এ উপন্যাসে। সময়ের প্রয়োজনেই ইশারা-ইঙ্গিতের ভাষার পর মুখের ভাষার ব্যবহার উত্তম পুরুষের জবানীতে লক্ষণীয়। পাশাপাশি পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়, আমি'র হিংস্র আচরণ থেকে মানবিক আচরণ, নারী মাংস ভক্ষণ থেকে নারীকে জীবন চলার পথে অপরিহার্য করা, বিয়ে, বংশ স্থাপন, সন্তানকে না মেরে না খেয়ে তাকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা, গোত্র-গোত্র লড়াই, ভূমি দখল, কল্পনাশক্তির বিকাশ, রোমান্টিক হয়ে ওঠা, কৃষিকাজ করে জীবন ধারণ করা – মোদ্দা কথা মানবজাতির সভ্য সমাজে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্রমবিন্যাস দক্ষতার সাথেই বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশের বর্ণনাও আদিম যুগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নৃ-তাত্ত্বিক মানবসমাজের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস *প্রথম গরল*, *স্থাবর* প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘ তেইশ বছর পর প্রকাশিত হয়। কৃষি-সভ্যতার অনেক ধাপ পেরিয়ে যে-জীবন সে-জীবনে নায়ক জংলা থেকে হয়েছে টালা। এতো বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত হলও মনে হয় *প্রথম গরল* সময়ের ব্যবধানকে ছাপিয়ে গেছে। কৃষি সভ্যতা যুগের সব বৈশিষ্ট্যকে লেখক তুলে ধরেছেন। ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন যে সংকটাপূর্ণ হয়েছে, তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তাই ভূমিকেই মানুষের জীবনের প্রথম গরল বা বিষ বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ভূমি দখলকে কেন্দ্র করেই যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয় মানুষের জীবনে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সামন্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের আলোচনায় রয়েছে *দ্বৈরথ* এবং *মৃগয়া*। *দ্বৈরথ* এর তিন বছর পর প্রকাশিত হয় *মৃগয়া*। *দ্বৈরথ* এ সামন্ত শ্রেণির যথাযথ চিত্র অংকনে রবীন্দ্রনাথ বনফুলের উচ্চ-প্রশংসা করেছেন। স্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথ যথার্থ মন্তব্যই করেছেন। তবে উপন্যাসটি ভালোভাবে পড়লে যে-কারোরই মনে হবে এখানে তৎকালীন সামন্ত জীবনের বাস্তব রূপটি কতটা নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে। যেখানে বনফুল নিজেই বলেছেন, খুব ছোটবেলায় তিনি তাঁর বাবার সাথে রোগী দেখার কাজে জমিদারদের বাড়িতে গিয়েছেন এবং তাদের তখনকার জীবনাচার বনফুলের মনে গেঁথে ছিল। শৈশবের দেখা এবং অধীত অধ্যয়নের ফলেই বনফুলের পক্ষে সম্ভব হয়েছে *দ্বৈরথ* এর মতো অসাধারণ সামন্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস লেখার। বনফুলের অনেক উপন্যাসেই অসহায়, দরিদ্র প্রজাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের চিত্র উঠে এসেছে। তবে *দ্বৈরথ* ও *মৃগয়া* উপন্যাস দুটিতে স্বাভাবিকভাবেই

Dhaka University Institutional Repository

বিহারের জমিদারদের নিপীড়নের চিত্র রয়েছে। বনফুল জীবনের দীর্ঘ আটষট্টি বছর কাটিয়েছেন বিহারের পরিবেশে। তাই সেখানকার পরিবেশ-প্রতিবেশ-পারিপার্শ্বিকতায় লালিত জমিদার ও প্রজাদের মধ্যকার শোষণের জীবন ছবিই উঠে এসেছে *দ্বৈরথে*। উপন্যাসটিতে উত্তর-পূর্ব বিহারের দুই জমিদারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বন্ধুত্বের অন্তরালে জিঘাংসু মনোবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং পাশাপাশি আধুনিক ধ্যান-ধারণার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে প্রাগ্রসর মানসিকতার প্রকাশ। *মৃগয়ায়* তথাকথিত সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার বদলে দেখতে পাওয়া যায় ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। যার মধ্যে নতুন যুগের প্রবেশকে স্বাগত জানিয়েছেন বনফুল। জমিদারের মা, সেকেলে বৃদ্ধা গৃহিণীর যুগের সাথে একালের মেয়েদের ব্যবধানকে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে দুই কালের শিক্ষা, সংস্কৃতি, উৎসব-পার্বণ, পোষাক-পরিচ্ছেদ, জীবনধারা, পরিবার-প্রথা – এসব প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে আঙ্গিকবিচারে আমরা, বনফুলের মৌলিক উপন্যাসগুলোকে মূলত সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। প্রচলিত রীতির উপন্যাসের তালিকায় রয়েছে – *দ্বৈরথ*, *ভুবন সোম*, *নবদিগন্ত*, *ওরা সব পারে*, *মহারাণী*, *তীর্থের কাক* ও *সন্ধিপূজা;* গদ্য-পদ্যে রচিত উপন্যাস – *মৃগয়া* ও *তৃণখণ্ড*; মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উপন্যাসে রয়েছে *জঙ্গম*, *স্থাবর* ও *ডানা*; পত্রোপন্যাস – *কষ্টিপাথর;* ডায়েরিধর্মী উপন্যাস – *অগ্নীশ্বর* ও *হাটেবাজারে*; নাট্য-উপন্যাস – *ত্রিনয়ন* এবং কোলাজধর্মী উপন্যাস *কিছুক্ষণ*। প্রচলিত রীতির উপন্যাসের আঙ্গিক বিচারে – প্লট, ভাষা, চরিত্র, সময়, দৃষ্টিকোণ ও লেখকের জীবন দর্শনকে তুলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষয় ও রচনারীতিতে বনফুল আধুনিক, গতিশীল ও গবেষণাধর্মী মননের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস শুধুই সুসংহত গ্রন্থিবদ্ধ সরল কাহিনির সমষ্টিমাত্র নয়, তা কখনো আত্মজীবনী বা ডায়রিধর্মী রচনা, যেমন- উদয়অস্ত, কিছুক্ষণ; কখনো অলৌকিক রূপক, যেমন- *বৈতরণী তীরে*; গদ্যে-পদ্যে রচিত তৃণখণ্ড, কবিতা, নাটক ও গদ্য-বিবরণের সংমিশ্রণে রচিত *মৃগয়া*; আবার *দ্বৈরথ* নামে একটানা দীর্ঘ কাহিনিও লিখেছেন। কখনো উপন্যাসের সমগ্র কাহিনিটিই বিবৃত করেছেন উত্তম পুরুষের জবানিতে, যেমন- *স্থাবর*। তিনি বাস্তব ও মায়ার জগতের মধ্যে যে সমন্বয় সাধন করেছেন তা তাঁর প্রকরণের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র নিরীক্ষার ফল। *বৈতরণীর তীরে* এবং *সে ও আমি* রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর এ ধরনের উপন্যাস রচনার শুরু। *অগ্নি*, *স্বপ্নসম্ভব*, *পক্ষীমিথুন মানসপুর রূপকথা এবং তারপর* জীবনবৈচিত্র্যের ভিন্নধর্মী প্রকাশ। বৈজ্ঞানিক মনন, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনীতির প্রসঙ্গ, নৃতাত্ত্বিক বিষয়, অতিপ্রাকৃত উপাদান, ঐতিহাসিক আবহ, পুরাণতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় তাঁর উপন্যাসে জীবনের বিচিত্র দিককে উদ্ভাসিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণার মাধ্যমে আমরা বনফুলের সমসাময়িক সমাজ, কাল, পরিপ্রেক্ষিত, বিষয়, সর্বোপরি তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে জানার চেষ্টা করেছি। আমরা জানি, সহজাত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি সাহিত্যে প্রবেশ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির তিনিই পথিকৃৎ। উপন্যাসের সনাতন রীতিনীতি ভেঙে দিয়ে বনফুল নতুন নতুন কাহিনি, চিত্র ও চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তাঁর মানস সত্তাকে প্রকাশ করে গেছেন। তাতে তাঁর কল্পনার বিস্তার থাকলেও সেগুলো বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল ও গতিশীল, উদ্ভট বা অ্যাবসার্ড নয় – তাঁর রচনারীতি পর্যালোচনায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

বিংশ শতাব্দীর অর্থনীতির জটিলতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং দুই বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানব সভ্যতায় যে চূড়ান্ত সংকট দেখা দেয় তা তাদের অস্তিত্ববোধকে এতটাই বিপন্ন করে তোলে যে, জীবন বিকাশ ও প্রকাশের রূপও জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠে। সঙ্গত কারণেই খেয়ালি ও সাহসিক অনেক কল্পনাই মানুষকে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। তার মানস-প্রবণতাগুলোও নানা পরীক্ষামূলক মনোবৃত্তির দ্বারা নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। ফলে সাহিত্যিকের বিষয়বৈচিত্র্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও কলাকৌশলের ধরণও হয়েছে বহুমুখী। বনফুলের মানসপ্রবণতাও এসব পরিপ্রেক্ষিতকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। তাঁর উপন্যাস সমাজতাত্ত্বিক, মনোজাগতিক ও নান্দনিক দিক পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া সমাজবিকাশের পরম্পরায় তাঁর উপন্যাস বিষয়-বৈচিত্র্য এবং রচনা রীতির নতুনত্বে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সবশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বনফুল বিচিত্র বিষয় এবং বহু আঙ্গিকের শিল্পসফল ঔপন্যাসিক।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

বনফুল (২০১২)। *বনফুলের রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড -পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদনা: বীতশোক, বাণী শিল্প, কলকাতা

বনফুল (২০১৩)। *বনফুলের রচনাসমগ্র*, ষষ্ঠ খণ্ড-সপ্তদশ খণ্ড, সম্পাদনা: বীতশোক, বাণী শিল্প, কলকাতা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৯৬০)। *বনফুল উপন্যাস সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলকাতা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (২০০০)। *বনফুল উপন্যাস সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড-অষ্টম খণ্ড, নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলকাতা

সহায়ক গ্রন্থ

অমল কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯৯) । *বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯৯)। *কালের প্রতিমা: বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর:* ১৯২৩-১৯৮২। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯৪)। *মধ্যহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৪)। *বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অরূপ কুমার দাস (২০১১)। *ষাট ও সত্তুর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

অলোক রায় (২০০০)। *বাংলা উপন্যাস: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*। পুস্তক বিপনি, কলকাতা

অশ্রুকুমার সিকদার (১৯৯৩)। *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*। অরুণা বাগচি, কলকাতা

অসীম কুমার মুখোপাধ্যায় (২০১১)। *কিংবদন্তি বনফুল*। একুশ শতক, কলকাতা

আবুল কালাম আজাদ (১৯৮৯)। *ভারত স্বাধীন হল* (সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত)। ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা

আবুল কাসেম ফজলুল হক (২০১২)। *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি ও বাংলা সাহিত্য*, জাগৃতি, ঢাকা

আবদুল ওয়াহিদ (১৮৮৩)। *উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (২০০৮)। *উপন্যাসে জীবন ও শিল্প*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

ঊর্মী নন্দী (১৯৯৭)। *বনফুল: জীবন, মন ও সাহিত্য*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

কংকর সিংহ (২০১৫)। *আমি শুদ্র, আমি মন্ত্রহীন*। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

কার্তিক লাহিড়ী (১৯৭২)। বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি। সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা

তাপস ভট্টাচার্য (২০০৫)। *বাংলা উপন্যাসে উদ্বাস্তু জীবন*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

ক্ষেত্র গুপ্ত (১৯৯৬)। *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড)। গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা

গুরুদাস দাশগুপ্ত (১৯৯৯)। *রাজনীতি, এখন।* আজকাল, কলকাতা

গোপাল হালদার (১৪০০)। *বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (২০০০)। *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী (১৯৯১)। বাংলা কথাসাহিত্য: প্রকরণ ও প্রবণতা। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া (২০১৩)। *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ।* খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা

ধীমান দাশগুপ্ত (১৯৮২)। *বনফুলের কথাসাহিত্য*। বাণীশিল্প, কলকাতা

নীহাররঞ্জন রায় (১৪০২)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৬৪)। *রবীন্দ্র জীবনী* [চতুর্থ খণ্ড]। বিশ্বভারতী , কলকাতা

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত (২০০০)। *বনফুল*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, কলকাতা

প্রিয়কান্ত নাথ (২০০৭)। *কাল-বিভাজিত বাংলা উপন্যাস*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

বনফুল (১৯৯৯)। *পশ্চাৎপট*। বাণীশিল্প, কলকাতা

বিনয় ঘোষ (১৯৪৮)। *বাঙলার নবজাগৃতি*। শ্রী, এন ভেম্বু আয়ার,কলকাতা

বিনয় ঘোষ (১৯৬০)। *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*। গ্রন্থকার কর্তৃক ৪৭/৩ যাদবপুর, সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা

বিপ্লব মাজী (২০০৮)। *বাংলা উপন্যাস ২০০ বছর*। অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০২)। *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৯৮)। *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস: সমাজ ও রাজনীতি*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২০০৯)। *গোষ্ঠী জীবনের উপন্যাস*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৯৩৭)। *ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*। বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স লিমিটেড, কলকাতা

রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৩৫৫)। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা

রামেশ্বর শ (২০০৬)। *আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

রুমা বন্দোপাধ্যায় (২০০৫)। *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

শর্মিষ্ঠা নিয়োগী (২০১৪)। *বনফুলের উপন্যাস : গঠন ও শৈলী বিশ্লেষণ*। সঞ্জয় সামন্ত এবং মুশায়েরা, কলকাতা

শীতল চৌধুরী (২০১৩)। *বাংলা উপন্যাসের নানা কথা।* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৭২)। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (২০০০)। *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সমরেশ মজুমদার (২০০৪)। *বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর (১৯২৩-৪৭)*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৫)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সরোজ বন্দোপাধ্যায় (১৯৯৬)। *বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ।* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

সাঈদ-উর রহমান (১৯৮৩)। *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম (২০১০)। *ঐতিহাসিকের নোটবুক*। কথা প্রকাশ, ঢাকা

সুকুমার সেন (১৯৯৯)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* [পঞ্চম খণ্ড]। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সুবোধ দেবসেন (১৯৯৯)। *বাংলা সাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ*। কবিতা দেবসেন, কলকাতা

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৮১)। *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চেতনালোক ও শিল্পরূপ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

হীরেন চট্টপাধ্যায় (১৯৮২)। *বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি।* রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা

হীরেন চট্টপাধ্যায় (২০১১)। *উপন্যাসের রূপরীতি।* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

Andrew Heywood (2002). *Politics* (2nd Ed.). Palgrave Macmillan Press, New York

Harold Dwight Lasswell (1936). *Politics: Who Gets What, When, How*, Whittlesey house, McGraw-Hill book Company, New York

Rod Hague and Martin Harrop (2004). *Comparative Government and Politics, An Introduction.*
Palgrave Macmillan Press, New York

সম্পাদিত সহায়ক গ্রন্থ

আনন্দ দাশগুপ্ত [সম্পা.] (২০০৮)। *স্বাধীনতা স্বদেশ সমাজ সংস্কৃতি।* গাঙচিল, কলকাতা

পবিত্র সরকার [সম্পা.] (১৯৯৯)। *বনফুল শতবর্ষের আলোয়*, বনফুল জন্ম শতবর্ষ সমিতি, কলকাতা

প্রিয়কান্ত নাথ ও রামী চক্রবর্তী [সম্পা.] (২০১৭)। *বাংলা উপন্যাস: সংজ্ঞার সন্ধানে*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

বীতশোক ভট্টাচার্য [সম্পা.] (২০০৭)। *বাংলা উপন্যাস সমীক্ষা*। এবং মুশায়েরা, কলকাতা

সুধীর চক্রবর্তী [সম্পা.] (২০১০)। *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

সাধন চট্টপাধ্যায় [সম্পা.] (২০১৬)। *দেশভাগের গল্প: রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য।* গাঙচিল, কলকাতা

সহায়ক প্রবন্ধ

সরলাবালা সরকার (১৯৯৯)।'বনফুলের কথা সাহিত্য': *বনফুল: শতবর্ষের আলোয়*, বনফুল জন্ম শতবর্ষ সমিতি, ১৯ জুলাই, সম্পাদক: পবিত্র সরকার, কলকাতা

সরোজমোহন মিত্র (১৯৯৯)।'বনফুলের অভিনব কয়েকটি উপন্যাস': *বনফুল: শতবর্ষের আলোয়*, বনফুল জন্ম শতবর্ষ সমিতি, ১৯ জুলাই, সম্পাদক: পবিত্র সরকার, কলকাতা

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী (১৯৯৯)।'বনফুলের উপন্যাস': *বনফুল: শতবর্ষের আলোয়*, বনফুল জন্ম শতবর্ষ সমিতি, ১৯ জুলাই, সম্পাদক: পবিত্র সরকার, কলকাতা

উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (১৯৯৯)।'বনফুলের বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস': *বনফুল: শতবর্ষের আলোয়*, বনফুল জন্ম শতবর্ষ সমিতি, ১৯ জুলাই, সম্পাদক: পবিত্র সরকার, কলকাতা

শিশির কুমার দাস (১৯৯৯)।'মৃগয়ার চার কথন': *বনফুল: শতবর্ষের আলোয়*, বনফুল জন্ম শতবর্ষ সমিতি, ১৯ জুলাই, সম্পাদক: পবিত্র সরকার, কলকাতা

উদয় কুমার চক্রবর্তী (১৯৯৯)। 'বনফুল এর উপন্যাস : রচনারীতি': *বনফুল: শতবর্ষের আলোয়*, বনফুল জন্ম শতবর্ষ সমিতি, ১৯ জুলাই, সম্পাদক: পবিত্র সরকার, কলকাতা

তপোধীর ভট্টচার্য (১৯৯৯)।'স্থাবর: প্রত্ন সময়ের কথনবিশ্ব': *বনফুল: শতবর্ষের আলোয়*, বনফুল জন্ম শতবর্ষ সমিতি, ১৯ জুলাই, সম্পাদক: পবিত্র সরকার, কলকাতা

সুমিতা চক্রবর্তী (১৯৯৯)।'ইতিহাসবোধ ও বনফুল': *বনফুল: শতবর্ষের আলোয়*, বনফুল জন্ম শতবর্ষ সমিতি, ১৯ জুলাই, সম্পাদক: পবিত্র সরকার, কলকাতা

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী (১৯৯৯)।'বাস্তব ও কল্পনায় বিচূর্ণ সীমা : বনফুলের উপন্যাস': প্রাগুক্ত

বুদ্ধদেব গুহ (১৯৯৯)।'বনফুল একজন সামান্য পাঠকের চোখে': প্রাগুক্ত

নিশীথ মুখোপাধ্যায় (১৯৯৯)।'যুগ সমাজ ও সাহিত্যেও অতন্দ্র প্রহরী': প্রাগুক্ত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৯৯)।'বনফুল ঃ একটি ধ্রুপদী কণ্ঠস্বর': প্রাগুক্ত

সরোজ বন্দোপাধ্যায় (১৯৯৯)।'সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব: রীতিনীীত: বনফুল': প্রাগুক্ত

বনফুলের সৌরভ (১৯৯৯)।'সুচিত্রা ভট্টাচার্য':প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত (১৯৯৯)।'প্রবন্ধকার বনফুল': প্রাগুক্ত

বিষ্ণু বসু (১৯৯৯)।'বনফুলের গল্প : স্বপ্ন ও বাস্তবের সমন্বয়': প্রাগুক্ত

ইংরেজি প্রবন্ধ

Prithwindra Mukherjee (1999). `Banaphul (1899-1979): A Rambling Through The Evolution of The Short Story: Banaphool: Satabersher Aloye, Banaphool Birth Centenary Committee, 19 July 1999, Edited: Pabitra Sarker.

সহায়ক বাংলা পত্রিকা

এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা)। *বাংলাদেশের উপন্যাসের পটভূমি: শিল্পরূপের সন্ধানে*। রফিকউল্লাহ খান, ঊনবিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০৮, ঢাকা

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (সম্পা.)। *তারাশঙ্করের সাহিত্যভাবনা।*, ভীষ্মদেব চৌধুরী, ৪২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৪০৫, ঢাকা

ভাষা-সাহিত্য পত্র, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা)। *রবীন্দ্র প্রবন্ধে ইউরোপ ও ইংরেজ বনাম ভারত ও ভারতবাসী*, হুমায়ুন আজাদ, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩০৮, ঢাকা

লোকায়ত, মিজান রহমান (সম্পা)। *দিগভ্রান্ত মধ্যবিত্ত ও ক্ষীয়মাণ জীবন-সংস্কৃতি*। হুরে জান্নাত, বর্ষ ২৮, সংখ্যা ১, মার্চ ২০১১

লোকায়ত, মিজান রহমান (সম্পা)। *আমাদের মুক্তি ও উন্নতির কর্মসূচি*। (প্রাগুক্ত)

সাক্ষাৎকার

বনফুলের পড়াশোনা এবং প্রতিদিনের খুঁটিনাটি নিয়ে ১৯৭১ সালে কলকাতার প্রসাদ সিংহ পরিকল্পিত এবং মনোজ সেনগুপ্ত সম্পাদিত চলচ্চিত্র পত্রিকা *উল্টোরথ*-এ পৌষ সংখ্যায় বর্ষ ২০, সংখ্যা ১০, ১৮৯৩, (পৃ. ১৮৭-১৯০) অমিতাভ বসুর সঙ্গে বনফুলের নাতিদীর্ঘ সাক্ষাৎকার, মুক্তাঙ্গন ব্লগ, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সালে ছাপা হয়।